স্বপ্নময় চক্রবর্তী

শ্রেষ্ঠ গল্প

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর নাম সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। বাংলা ছোটগল্পকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন নানা আঙ্গিকের নানা বিষয়ের বিচিত্র গল্পে। তাঁর গদ্যশৈলীও নতুন ধারার। প্রথম গল্প সংকলন 'ভূমিসূত্র' ১৯৮২ সালে প্রকাশিত ও সমাদৃত। তারপর আর পিছনে ফিরতে হয়নি স্বপ্নময়কে।

ছোটগল্পের জন্য নানা ধরনের পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। অনূদিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়। না, সিরিয়াল হয়নি।

জন্ম ১৯৫২। কলকাতা। রসায়নের ছাত্র। পেইন্ট-ভার্নিশ টেকনোলজির পাঠ অসমাপ্ত রেখে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ। দেশলাইয়ের সেল্‌সম্যান, মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ, ল্যান্ড রিফর্ম অফিসার, আবহাওয়া দপ্তরের রাডার চালনা, দূরদর্শনের ফ্লোর ম্যানেজারি, আকাশবাণীর অনুষ্ঠান প্রযোজনা ইত্যাদি অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ধরনের লেখার রসদ জুগিয়েছে।

বাংলা কথাসাহিত্যের নব্যধারার এই লেখকের গল্পগুলি পাঠককে অনন্য অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করবে।

শ্রেষ্ঠ গল্প

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

শ্রেষ্ঠ
গল্প

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

SRESTHA GALPA
Selected best stories *by* Swapnamoy Chakraborty
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone 2241-2330/2219-7920 Fax (033) 2219-2041
e-mail deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
₹ 250.00

ISBN 978-81-295-2249-8

প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা ২০০৩, মাঘ ১৪০৯
পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪

প্রচ্ছদ মিলন

২৫০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা দিলীপ দে, লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্‌স
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ধ্রুব কিংবা অম্লানকুসুম
তোদের জন্য

এই লেখকের অন্যান্য বই

ছোটগল্প সংকলন

ভূমিসূত্র
অষ্টচরণ ষোল হাঁটু
ভিডিও ভগবান নকুলদানা
জার্সি গরুর উল্টো বাচ্চা
স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্প
কৃষ্ণা, গিরিবালা ও অন্যান্য
নির্বাচিত গল্প
সতর্কতামূলক রূপকথা
চমক চম্পূ ও অন্যান্য হাসি
ফুল ছোঁয়ানো

উপন্যাস

চতুষ্পাঠী
নবম পর্ব
বাস্তুকথা
কম্পিউটার গেম্‌স
চলো দুবাই
অবন্তীনগর

দু'একটি কথা

ভালবাসি বলেই জীবনকে বকাঝকা করি। অনুরাগ থাকে বলেই অভিমানও থাকে। জীবনের কাঁধে হাত রেখে পথচলার চটির আগায় লেগে থাকা দুব্বোঘাস বা পেরেকের খোঁচা সমন্বিত ভ্রমণ-কথাকেই কি গল্প বলে থাকি আমরা?

গল্প কোনো ঘটনার ধারাবিবরণীও নয়। ঘটনাটি হ'ল সেই ধুলোর কণিকাটি, যাকে কেন্দ্র করেই বাষ্প ঘনীভূত হয়, বৃষ্টি-ফোঁটা তৈরি হয়। কিংবা বাস্তবের ঘটনাটি হ'ল সেই শূককীট, গুটিপোকার মতন থাকে। ভালবাসা ওকে প্রজাপতি করে। অথবা ছোট্ট কুঁড়িটি, যা গল্পে ইচ্ছে-কুসুম হয়ে ফুটে ওঠে। আমার গল্প মানে সেই ইচ্ছে-কুসুম ফোটানো। তা থেকে কিছু গল্প নিয়েই এই সংকলন।

এই সংকলনের একটা ভূমিকা দরকার ছিল। কোনো সমালোচক বা সাহিত্যিককে সংকোচবশত বলতে পারিনি, একটা ভূমিকা লিখে দিন। ফলে নিজেকেই কয়েকটা কথা বলতে হচ্ছে।

গত ২৫ বছর ধরে লিখছি বলা যায়। দুশোর কাছাকাছি গল্প ছাপা হয়ে গেছে। এই সংকলনে তিরিশটা গল্প ধরানো গেল। বেশ কয়েকটি চান্স না পাওয়া গল্পের যেন অভিযোগ শুনতে পাচ্ছি। ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে বলি, যে কোনো নির্বাচনেই তো গণ্ডগোল হয়, একটু মেনে নাও, আবার সুযোগ পেলে দেখা যাবে।

এই সংকলনের অধিকাংশ গল্প বিভিন্ন গল্প সংকলনে আগে ছাপা হলেও কোনো সংকলনে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পাঁচটি গল্পও আছে। কবে ও কোথায় প্রথম ছাপা হয়েছিল উল্লেখ করেছি। বোঝাই যাচ্ছে, লিটল ম্যাগাজিনেই নীড় পেয়েছিলাম আমি। হয়তো চেয়েও ছিলাম তাই।

আমার শৈশব কেটেছে উত্তর কলকাতায়, যৌবনে গ্রামকে দেখেছি খুব কাছ থেকে। কয়েকটি গল্পে রয়েছে কাছ থেকে দেখা গ্রামজীবন। একটা সময়ে আমার মনে হয়েছে প্রযুক্তি-মস্তানি মানুষকে যন্ত্রদাস বানাচ্ছে। যে প্রক্রিয়া মানুষকে ভূমিদাস করে, সেই প্রক্রিয়ারই প্রলম্বিত ছক মানুষকে যন্ত্রদাস বানায়। এই অনুভবেরই গল্প হ'ল 'লজ্জা মুঠি', 'ঝড়ে কাক মরে', 'ক্যারাক্কাস', 'হনুমান', 'এ জীবন লৈয়া কী করিব' ও 'অ্যালুমিনিয়ামের ডানা'। 'হুলো' ও 'গিরিবালার গল্পে' রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু কথা, আর্সেনিকের সমস্যা নিয়ে গল্প 'ফুল ছোঁয়ানো', 'শনি' গল্পে আছে তেজস্ক্রিয়তার সমস্যা। 'বাতিল রেকর্ড'-এ রয়েছে আকাশবাণীর কথা। 'অ' এবং 'হাতি ও পিঁপড়ের গল্প' দুটিকে অনেকে বলেছেন প্রেমের গল্প।

গল্প গড়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পছন্দ করি আমি। আর যা বিশ্বাস করি না, তা লিখি না।

বাংলা ছোটগল্পের স্রোতধারা এখন ঊর্মিমুখর। সেখানে সামান্য জলসিঞ্চন আমার এই গল্পগুলি।

৮ জানুয়ারি ২ স্বপ্নময় চক্রবর্তী

সুচিপত্র

সর্ষে ছোলা ময়দা আটা ৯
ভালো করে পড়গা ইস্কুলে ১৭
রত্নাকরের পাপের ভাগ ২৫
অষ্ট চরণ ষোল হাঁটু ৩৩
রক্ত ৪২
কাননে কুসুম কলি ৫৩
বিদ্যাসাগর! বিদ্যাসাগর ৫৯
আরওয়ালের হাত ৬৬
শনি ৭৫
পতাকার কাপড় ৮৪
লাপিস লাজুলি ৯১
বেহেশ্‌তের কুঞ্জি ৯৯
বিমলাসুন্দরীর উপখ্যান ১০৮
ঝড়ে কাক মরে ১১৯
ক্যারাক্কাস ১২৫
হনুমান ১৩১
এ জীবন লইয়া কী করিব ১৪০
অ্যালুমনিয়ামের ডানা ১৪৭
লজ্জামুঠি ১৫৩
ইতিহাস কথা ১৬৩
হুলো ১৭২
গিরিবালার গল্প ১৮২
দেশের কথা ১৯১
বাতিল রেকর্ড ২০৫
আত্মজীবনীমূলক রচনা ২১৪
অ ২২৩
হাতি ও পিঁপড়ের গল্প ২৩২
দুধওয়ালা ২৩৯
ফুল ছোঁয়ানো ২৪৫
ইচ্ছেকুসুম ২৫৮

সর্ষে ছোলা ময়দা আটা

গোবিন্দ॥ চুপ মাইর‍্যা আছস ক্যান—ও পরাইন্যা....বনবিবির গান গা'বি কইছিলি, অখন কর না ক্যান?

পরান ॥ চারিপাশে মনমরা জোছনারে—মায়ের প্রথম দিনের সাদা থানের মতন, মায়ের প্রথম ভাঙা শাঁখার রং, বালির চড়া ঝ্যানো বিধবা মায়ের কষ্ট।

গোবিন্দ ॥ তর বাপ্ ক্যামনে রে মরছিল? আমার বাপ মরছিল ঝড়ে, ফেণী নদীর ঝড়ে, মাছের নৌকায় ছিল আমার বাপ।

পরান॥ আমার বাপ্ জঙ্গল করত, বাঘে খেইছিল তেনাকে।

গোবিন্দ ॥ হের লইগ্যা তুই বুঝি জঙ্গল ছাড়চস্? আমি চাইস্—মাছ ছাড়ুম না।

পরান ॥ কিন্তু মাছ একদিন তুকে ছাড়বে। বলতিছি ক্যানো। মোদের ইচ্ছায় কি মোদের জীবন চলে? আবাদের মানুষদের শুনি বাপ্-পিতেমোর ঝাগা ছিল বিহারদেশে। জঙ্গল হাসিলের তরে এদিকি নে আসল টুঙ্গিরা, এখন ফের কলকাতা ধায়, ইস্টিশনে কিংবা রাস্তার ধারে থাকে, বড়লোকের বাড়ি কাজে যায়। মোর গেরামের আলোমণিরাও গেছিল, আলোমণি বড় ভালো মেয়ে—আলোমণির বাপ মা ফিরে এল ফের, আলোমণি ফিরলনি।

পরান আর গোবিন্দ আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। সমুদ্রের একটানা শব্দ। চাঁদের আলো মাছধরার জালের মতো ছড়িয়ে পড়ে আছে। পিছনে হাওয়ায় শুকোচ্ছে লটে, শংকর, ফ্যাঁসা, চিংড়ি, চাঁদা আরও কত মাছ। ঐ মাছের গন্ধকে চাপা দিয়েছে—একটু দূরে পচতে থাকা একটা বিরাট সামুদ্রিক কচ্ছপের পচা গন্ধ।

বকখালি থেকে পাঁচ-ছ মাইল দূরে এই দ্বীপের নাম জম্বুদ্বীপ—এখন জমজমাট। অঘ্রান থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত মাছ ধরা আর মাছ শুকনো করার কারবার চলে। কয়েক বছর আগেও ঐ দ্বীপ নিঃসঙ্গ ছিল। পয়সার ধান্ধায় ঘোরা এপারে চলে আসা নোয়াখালি আর চট্টগ্রাম জেলার কিছু লোকের নজরে পড়ল এই দ্বীপ। তারপরই শুরু হয় মাছের ব্যবসা। আসে মহাজন, দাদনদার, পাইকার, ফড়ে—কারবার চলে।

বকখালি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বেশিরভাগ মানুষই এসেছে দু-তিন পুরুষ আগে মেদিনীপুর জেলা থেকে। তাই সমুদ্রতীরবর্তী মানুষের গুণপনা অর্জন করতে পারেনি এখনো। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা সামুদ্রিক মাছ পছন্দ করে না। সমুদ্রে মাছ ধরতে জানে না, এমন কি, স্থানীয় গরিব মানুষরাও জম্বুদ্বীপে মাছ শুকোবার কাজে যেতে ইতস্তত করে। "যারা উখেনে যায়, তাদের শরীলে পচা গেস্—ঐ গেসে বুকের কাঠিতে পোকা ধরে।"তাই ব্যাপারিরা চট্টগ্রাম, সন্দীপ, হাতিয়া, নোয়াখালি থেকে লোকজন নিয়ে আসে এখানে।

উত্তরের বাতাসে পাল খাটিয়ে মাছধরার নৌকাগুলো দক্ষিণ সমুদ্রে যায়, মাছ ধরে। মাছ শুকোবার কারবারিরা দ্বীপের মধ্যে কিছুটা এলাকা বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়ে মাছ শুকোয়, ঝুপ্‌ড়ি বেঁধে থাকে। একেই বলে ‘খুটি’। জম্বুদ্বীপের খুঁটিগুলো থেকে নামখানা বা কাকদ্বীপ হয়ে কলকাতা চলে যায় মাছ।

পরান আর গোবিন্দ কাজ করে মহাদেব দাসের খুঁটিতে। গোবিন্দ এসেছে নোয়াখালি থেকে—ওর কাকার সাথে। আর পরানের দেশ ছিল গোসাবার কাছে কয়েদখালিতে। পরানের বাবা জঙ্গল করত। পরে ‘গুণের বাওলে’ হয়েছিল।

‘বাওলে’ মানে হল গিয়ে গুনিন—যারা বাঘের মুখ বাঁধে, খিলেন করে, জ্বালান করে। বাওলে দুরকমের। হুকুমের, বাওলে আর গুণের বাওলে। হুকুমের বাওলেরা কোনো হুকুমদার পীরের বা ফকিরের শিষ্য। আর গুণের বাওলেরা এখান থেকে কায়দাগুলো শিখে নেয়। কিন্তু পরানের বাবা শেষ পর্যন্ত বাঘের হাতে পড়ে মরল। খিলেন জ্বালান বৃথা গেল।

কয়েদখালির মেয়েমানুষদের মধ্যে বেধবাদের সংখ্যা অনেক। “চল্লামরে—ঝ্যানো ফিরে আসি, বনবিবির দহায়” বলে যারা জঙ্গলে যায়, তাদের অনেকেই ফেরে না। তবু মনিষ্যিগুলো যায় ; জঙ্গলে যায়, আবার যায়। জঙ্গল ছাড়া বাঁচার অন্য উপায় কী? পরানের মা বেওয়াপাড়ার আরেক বেওয়া হল। কিছুদিন পরে দারোগাবাবুর বাড়ি বাসন মাজার কাজ জুটে গেল।

দারোগাবাবুর শালা বকখালির বাসিন্দে। বকখালিতে বাবুদের-দিদিমণিদের ভিড় দিনদিন বাড়ছে দেখে দারোগাবাবুর বুদ্ধিমতো দারোগাবাবুর শালা বকখালিতে হোটেল দিলে—“হোটেল বালুকাবেলা”। পরানের মা কমবয়সী বেওয়া এবং কর্মঠ। দারোগাবাবু পরানের মাকে হোটেল বালুকাবেলায় পাঠিয়ে দিলেন বাসন মাজাঘষার কাজে। পরান ঐ হোটেলে বয়-এর কাজে লাগল। তারপ একদিন জম্বুদ্বীপের খুঁটিদার মহাদেব দাস হোটেল বালুকাবেলায় খেতে আসে।

“মাছ-বাত-জল্‌দি”—হেঁকে মহাদেব দাস বেঞ্চিতে বশেই চ্যাঁচাল—“টেবিলে হাইগ্যা থুইছে, উচ্চিষ্ট নিব কেডা?” পরানের মা রান্নাঘর থেকে ধেয়ে আসে—মালিককে যেন জবাবদিহি দেয়—মশলা বাটতেছিলাম। প্যাঁচানো শাড়ির ভিতর থেকে একটা নিটোল হাত ন্যাকড়া দিয়ে টেবিল ঘষছিল। মহাদেব দাস দেখল একটা সদ্যতাজা আড় মাছ টেবিলের উপর লুটোপুটি খাচ্ছে।

মহাদেব দাস এবার থেকে পরানকে মাঝে মাঝে দশ পয়সা পাঁচ পয়সা বখ্‌শিশ নিয়ে পান সিগারেট আনাত। একদিন দোকান থেকে ডেকে নিল পরানকে।

—মাইনা কত-নি পাস্‌ পরান?

—খাওয়া থাকা, আর আট টাকা।

—ত’র মায় কত পায়?

—খাওয়া-থাকা পনের টাকা।

—থাকন ত পাইবই, খাওন ত পাইবই—হেয় আবার কওনের কী, মাইনা বড় কম দেয় ব্যাটা। তর মায় শোয় কৈ?

—আমি আর মা হুটেলে শুই।

—হুটেলে আর কে শোয়?

মহাদেব প্রশ্ন করার সময় ক্রমশই গলা নামাচ্ছিল।

হুটেলে আর কে শোয়, প্রশ্নটা যাত্রার ষড়যন্ত্রের বাজনার মতো মনে হল।

পরান পালায়।

আরেক দিন পরানকে ধরল মহাদেব দাস।

—তুই আর ত'র মা খুঁটিতে চল। ডবল মাইনা দিমু। পেট পুইর‍্যা মাছ খাবি। দ্যাশ-বিদেশের কত লোক কাম করে সেখানে—খায় দায় ফুর্তি করে, পইসা কামায় ; তর মা ক্যান্ চাক্‌রানি হইয়া দুঃখ পায়, তুই ক্যান চাকর হইয়া মরস্।

পরান বলল—এক কুড়ি টাকা হলে যেতে পারি—

—হ্-হ্, বিশ ক্যান, ভাল কইর‍্যা কাম কইরলে আর দুই টাকা বেশি দিমুনে। তর মারে চল্লিশ দিমু, আহা রে হুটেলে কীরকম খাইট্যা খাইট্যা সোনার অঙ্গ কালি করে—আইচ্ছা পাচ্চল্লিশ্ দিমু—রাজি করা।

—মা, বাঙাল ব্যাপারির মাছের খুঁটিতে যাবি? আমি পঁচিশ, তুই— পঁয়তাল্লিশ। বাঙাল ব্যাপারি রোজ বলে, সাধে রে মা—

মা কথা বলে না।

—চল না রে মা ; টাকা জমাব, নৌকো কিনব, জঙ্গল করব, নিজের নৌকো ভর্তি করে কাঠ আনব—

পরানের মুখে হাত চাপা দিল ওর মা—না, উকথা লয়, জঙ্গল লয়, জঙ্গলে মিত্যু, টাকা হলে চাষী হবি, জমি কিনবি, জমি!

পরান মায়ের আঁচল থেকে বাতাস টেনে নিল, পেতে চাইল সেই পুরোন গন্ধ পেচ্ছাপ করা কাঁথার, মায়ের বুকের ঘাম আর হোগলা চাটাইয়ের ঘাম গন্ধ মিলে একত্রিত ছোটবেলা।

পরদিন হোটেল মালিককে কথাটা পাড়তে হোটেল মালিক আঁতকে উঠল—তুমি খেপেছ পরানের মা—সব বাঙাল পুরুষের পাল যে তোমাকে ছিঁড়ে খাবে, উখেনে বেবুশ্যেরা পর্যন্ত যায় না। পরানের এই কাঁচা বয়েস—মাছ পচা গন্ধে ওর বুকের কাঠিতে পোকায় ধরবে। এখেনে দিব্বি ছিলে—আবার বায়নাক্কা ক্যানো?

পরান তবু এল এই জম্বুদ্বীপ। মহাদেবের খুঁটিতে।

—গোবিন্দ—

—কী কস পরান।

—তোর পাকিস্তান কেমুন দেশ রে?

—অহন আর পাকিস্তান কৈ? বাংলাদ্যাশ হইয়া গেছে গিয়া। আমার দ্যাশে বাঁশের সাঁকোয় দাঁড়াইয়া খইল্‌সা মাছের নাচন দ্যাহা যায়, দুপুরে বুড়া বটগাছের তক্ষকটা হঠাৎ হঠাৎ ডাইক্যা উঠে, বিকাল চাইরডায় চালতাতলির ইস্কুলে ছুটির ঘণ্টা বাজনের শব্দ নদীর কিনারে বইস্যা শুনি। কালবৈশাখীর ঝড়ে শিমূল গাছের তুলাগুলি খইস্যা পড়লে বাতাসের রং হঠাৎ সাদা হইয়া যায়, রাত জাইগ্যা পঞ্চানন সাহার বাসায় মনসার গান শুনি, মৌলভী সাহেবের মাইয়ারা বোরখা পইরা শ্বশুরবাড়ি যায়, তাঁর বাগানে কাঁচা-মিঠা আম চুরি করতে গিয়া ধরা পড়লে মৌলভী কয়—ইন্ডিয়ায় চইলা যাও, কাফের কাহাক্কা, আর জিনিসের দাম

বাড়ে, কেবলই বাড়ে—

—আমার দেশ কয়েদখলিও তোর দেশেরই মতন, সেই বুড়ো বটগাছ, সেই বাঁশের সাঁকোর তলায় মাছের খেলা, সেই জিনিসের দাম বাড়া—সেই....

মহাদেব দাস আসে, সবুজ লুঙ্গি, উরু চুলকোতে থাকে।

—কিরে পরাইন্যা, খাইচস্? লইট্যা মাছের ঝাল হইছিল কেমন?

—বড় ঝাল, জিভে শিরশিরানি লাগতি ছিল।

—ঝাল খাওয়ন অইব্যাস্ কর।

মহাদেব দাস আসার পরই গোবিন্দ উঠে চলে গেছে। পরান একটু আঁচ করতে পারে খুঁটিদারের মতলব কী। তাই পরান হাই তোলে। বলে—ঘুম আস্তিচে—শুতে পালাই। মহাদেব পরানের হাত ধরে টেনে বসায়। এই জোছনার মইধ্যে বইস্যা হাওয়া খা। চৈত্রের জোছনা কী মনোহর। কাম লাগে কেমুন, শিখ্যা গেছস্ নি বেবাক?

—শিকছি।

—লইট্যার মুখে মুখে গিটা দিয়া, শুকাইলে পরে হেই গিট্টা ছাড়াইতে পারস তো?

—পারি।

—শংকর মাছের ল্যাজখানা কাইট্যা রাখস্ ত'?

—রাখি।

—চান্দা মাছ শুখাস্ ক্যামনে?

—শলায় গাঁথি।

—তবে ত' কাম শিখছস্ ঠিকই। মহাদেব যেন আবেগে জড়িয়ে ধরে পরানকে। দু হাত দিয়ে পিষতে থাকে। পরান ওর নাকে প্রচণ্ড বিড়ির গন্ধ পায়।

পরানের গালে মহাদেব দাসের লালা। পরান কুঁচে মাছের মতো ছট্‌ফট করতে থাকে।

—বুঝলিনিরে পরাইন্যা, একজনের সুখ দেখলে আরগজনের পোন্ ফাটে। তরে বাগড়া দিয়া কইছিল না হুটেলের মালিক, তর বুকের কাঠি পোকায় খাইবো, কিন্তু দ্যাখ্ মাছ খাইয়া তর বুকে মাংস লাগছে, পাছায় মাংস লাগছে, কেমন সুপুরুষ হইছস্। মাংসের পরিমাপ করতে থাকে মহাদেব।

—আইজ খুব খাটালি গেছে, মাছ চালান দিলাম, শরীলডারে একটু টিপ্যা টুইপ্যা দে দেখি, এই পাশডায় একটু দে, লাজের কি, তুইও মরদ, আমিও মরদ—দে—। শোল মাছ ধরা শিখস নাই?

মহাদেবের সামনের দাঁত দুটো সোনার। ঢাকা শহরের চীনাদের দোকানে তৈরি করিয়েছিল। ওর সোনালি দাঁতের মধ্যে ময়লার মতো এখন ঢুকছে চাঁদের আলো, পরানের মনে হল ও কিছুক্ষণ ধরে একটা কামটের চামড়া ছাড়াল, তারপর উল্টে দিল বালিতে শুকোতে।

এর পর পর পরান বলে কাল মায়ের সাথে দ্যাখ্যা করে মাইনেটা দিয়ে আসবে। কাল সকালেই যেন মাইনেটা দেয় মহাদেব।

মহাদেব বলে, সকালে গিয়া দিনে দিনেই চইল্যা আসিস। তর লাইগ্যা চাইর টাকার গঞ্জি আনলাম না? আর আট টাকার ইংলিশ্ প্যান্ট আনলাম না? আর আট টাকা পাবি। এই মাসে কুড়ি দিমু। সামনের মাস থিক্যা পঁচিশ পাবি। নোয়া পোশাক পইর‍্যা যাইস্ তর মার কাছে, মায় খুশি হইব খুব। তর মারে আইতে কইস্, তর মা আর তর লাইগ্যা আল্‌গা ঘর বানাইয়া

দিমু।

হোগ্‌লা পাতার ঝুপড়িতে শুতে গেল পরান। সমুদ্রের ধারে পড়ে থাকা কচ্ছপটা পচছে। বদ্যিনাথ কাকা গান গাইছে।...কোন্ রসের বিনোদিনী...গান থামিয়ে বলল, তর লাইগ্যা জাইগ্যা আছি। বনবিবির পাঁচালি গাবি কইছিলি না, গোবিন্দ ঘুমাইয়া পরছে, আমারেই শুনা।

পরান চোখ বোজে। কয়েদখালির হাটের পাশের মাঠে জিলিপি ভাজার গন্ধ, মায়ের সবুজ শাড়িতে লেপ্‌টে থাকা হ্যাজাক বাতির আলো। রাধারমণ কয়াল বনবিবির গান গাইছে...

ধনা মৌলে মনা মৌলে দুই ভাই। উরা বোরোলোক। ধনা মৌলে মন করল জঙ্গলে যাবে মধু আনতে। উর লৌকা আছে। মনা বলে—দাদা, ট্যাকাতো অনেক আছে, আর জঙ্গল করার দরকার কী? ধনা মৌলে উকথায় কান দেয় না।

মধু আনিবারে যাবে—লৌকা সাজায়।
একজন লোক তার কম পড়ে যায়।।
ধনা মৌলে তারপর লোক খোঁজে যায়
ধনা দেখে দুখে মাঠে ছাগল চরায়।।

—কী রে দুখে ভাল আছিস্? কী করিস্ তুই? ধনা মৌলে শুধাল। দুখে ভাবল, কত বোরোলোকে তার খপর নিতেছে, দুখে আনন্দে গলে যায়।

—কী আর করব, লোকের গরু-ছাগল চরাই।

—আহারে, তুই ছাগল চরাস, চ' মোর সাথে, তোর বাপ মরার সময় কোয়ে গেছিল তুদের খোঁজখপর করতে। একটা ভাল কথা বলি, মোর সাথে জঙ্গলে চ। তুই শুধু বইসে থাক্‌বি। ফিরে এসেই তোর বিয়া দুব।

তারপর দুখে ওর মাকে রাজি করাল। ধনা মৌলে দুখের মাকে বলল—

কোনো চিন্তা নাই তব, থাকিবে সে সুখে
ঝ্যাতক্ষণ আমি আছি ত্যাতক্ষণ দুখে।।

সিবার ঝ্যাখন জঙ্গলে গ্যালো অনেক মধু পেল, আট কুড়ি আর পাঁচ ঘড়া মধু হল। কিন্তু ফেরার সোময় দখিনরায় স্বপন দিলেন—মধু লিয়ে যাচ্ছ ভাল কথা, মোকে কী দিলি?

ধনা মৌলে বলল—তবে তুমি দুখেকেই লিয়ে যাও—

পরদিন ধনা বললে দুখেকে—রান্নার কাঠ নেইকো, যা দুখে—জঙ্গল ভেঙে রান্নার কাঠ নে আয়।

দুখে কুড়ুল হাতে ঝ্যাকনি নামল, ধনা মৌলে, "বাবা দখিন রায় তোমার সেবার লাগে হে" বলেই লৌকো দিল ছেড়ে—আর দখিন রায় বাঘের রূপ ধরে হাজির হলেন দুখেকে খাবার জন্য, ত্যাখন দুখে দুহাত জোড় করে ডাকল ওগো মা বনবিবি, রক্ষা কর রক্ষা কর...রক্ষা কর...

পরানের ঘুম আসে। ঘুমের মধ্যে পরান স্বপ্ন দেখল বনবাদাড় ভেঙে একটা বাঘ আসছে—বাঘটার সামনের দাঁত সামনের দাঁত দুটো সোনা বাঁধানো—মা বনবিবি এসে ওকে কোলে তুলে নেয়। বনবিবির মুখটা তার মায়ের মতো অবিকল।

সকালের ব্যাপারিদের নৌকোয় বকখালিতে চলে এল পরান। হোটেলের সামনে বসে পান-সিগারেট বিক্রি করে নিশিকান্ত। নিশকান্ত বলল, কীরে পরান, একেবারে বাবুর সাজে এসেছিস্ দেকতিছি। নিশিতান্ত পরানের গেঞ্জির ভিতর হাত ঢুকিয়ে দেখল—বাঃ কী

মোলাম। এই প্যান্ট, এই গেঞ্জি বাঙাল ব্যাপারিরা দিল!

পরান গৌরবের ঘাড় নাড়ায়।

নিশিকান্ত আস্তে আস্তে বলল, আমার বিদ্যেধরটারেও উখেনে ভর্তি করে দিবি?—মন্দ কী, চিন্তে দেখলাম কোনো কাজই খারাপ লয়।

হোটেলে গিয়ে দেখল ডাক্তার দিদিমণি এসেছেন। উনি সমুদ্দুর খুব ভালবাসেন কিনা, তাই পেরায় পেরায় এখানে আসেন। জানালাটির পাশে বসেন।

জানালার পাশে কিছুটা নাবাল জমি, সেখানে জল জমে থাকে। ডাক্তার দিদিমণির মনে হয়, তিনি জাহাজে বসে আছেন। ডাক্তার দিদিমণিকে নিয়ে হোটেলের মালিক এখন ব্যস্ত।

রান্নাঘরে মায়ের কাছে যেতেই মায়ের মুখ ইলিশের গায়ে পড়া রোদ্দুরের মতো হয়ে গেল।

মায়ের হাতে টাকা কটা দিল পরান আর অম্‌নি সমুন্দুর থেকে উঠে আসা বাতাস উলু দিয়ে উঠল।

মা টাকা কটা কাপড়ের কোণায় বাঁধল। আর কাপড়ের অই কোন্‌টা একটা লজ্জাবতী কাঁকড়ার মতো কোথায় লুকোবে ঠিক করতে পারছিল না।

হোটেলের মালিক একটু নাক কোঁচকাল। তোর গায়ে মাছপচা গন্ধ—গ্যাস আসতিছে—সরে দাঁড়া।

ডাক্তার দিদিমণির নাম উর্মিলা খান। উনি পরানকে চিনতে পারলেন।

—আরে, পরান না? দেখতে পাইনি তোকে কাল থেকে।

পরান ওর নতুন কাজের কথা বলল। ডাক্তার দিদিমণির কাছে ৮/১০ জন লোক জড়ো হয়ে আছে।

অন্নপূর্ণা হোটেলের মালিককে ডাক্তার দিদিমণি বললেন—কোনো চিন্তা নেই আপনার, ভাল করে দেব। তার আগে একটা বুকের ছবি তুলতে হবে। এই ঠিকানায় চলে যাবেন, ওরা যত্ন করে তুলে দেবে। আপনাদের জন্য বুধবার বুধবার ডায়মন্ডহারবারে বসছি। এই নিন ঠিকানা। বুধবারে যাবেন, দেখে দেব।

—এদিকে হাসপাতাল নাই। কলকাতার বড়ো হাসপাতাল আমাদের জন্য নয়। কী-যে করি। বলল গাঁয়ের চৌকিদার।

—ওই জন্যই তো ডায়মন্ডহারবারে বসচি। বকখালির লোকেদের জন্য আমার মায়া পড়ে গেছে—যেয়ো—ভালো করে দেখে দেবো। যেয়ো, কেমন?

—ডাক্তার দিদিমণি, আমার পরিবারের পেটের বেদনাটা এক্কুনো চলছে। শ্যালদায় আপনার ওখেনে তিনবার গেলাম, বত্তিরিশ টাকা পিতিবারে দিলাম, ওষুধের জন্য এঁড়েটা বেচলাম—কিন্তু...

ঐ জন্যই তো ডায়মণ্ডহারবারের চেম্বার করেছি। ওখানে তোমাদের জন্য কম ফি করেছি। আমিতো অনেক পাশ করেছি, তাই কলকাতায় কম ফি নিলে মান থাকে না, নাহলে লোকে ভাববে খারাপ ডাক্তার। ডায়মন্ডহারবারে যেয়ো, কম খরচায় হবে।

ডাক্তার দিদিমণির চুল যাত্রার মহাপ্রভুর মতো ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। হাতের রং লটে মাছের মতো সাদা। গুরজালি মাছের কানকোর মতো ঠোঁটের রং। হাসলেন।

এবার পরানের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই আগের বারে কী বলেছিলি শুনবি?....দ্যাখ, মজা, বলেই নখ চকচকে আঙুল দিয়ে কালো মতো একটা বাক্স টিপলেন আর সেই বাকসো

থেকে বেরিয়ে এল পরানের গলা।

—জঙ্গলে যাবার আগে ঘুটখালির চড়ায় দখিণরায়ের নাম করে মুরগি দিতি হয়। লোকে বলে সেই মুরগিতে দোষ ছিল। আমার বাবা ছিল বাওলে। জঙ্গলে লেমে কু'দে কু'দে এগু করছিল।

—কু'দে কু'দে মানে!

—মানে হল গে—লোকজন জঙ্গলে গেলে হারিয়ে যাবার ভয়ে একজন 'কু' শব্দ করলে আরজন 'কু' বলে সাড়া দেয়। তবে না বুঝবে কে কোথায় থাকছে। তারপর বেঘোমরি মিথ্যে 'কু' দিলে।

—বেঘোমরি মানে?

—মানে হল গে জঙ্গলের শয়তান। বাঘে মানুষকে মারলি সেই মরা মানুষ জঙ্গলের ভূত হয়। উ শয়তান মিথ্যে 'কু' দিলে আর আমার বাপ অবোধপানা অন্যদিকি চলি গেল। মিথ্যে 'কু' দে বাবাকে বাঘের মুখির সামনে লিয়ে গেল। তারপর....

পরান বললে, বন্ধ করে দেন! আমার কথাগুলি ঐ যন্তরের মধ্যে রেডিওর কথা করে রাখলেন কেন? ওসব তো দুঃখের কথা।

দিদিমণি লাল নখ ছুঁইয়ে কথাগুলি বন্ধ করলেন। তোর দুঃখ আমি বুঝি রে পরান, তাইতো বলছি মাছের ঐ পচা কাজ ছেড়ে কলকাতা চল আমার সাথে। আমার বাড়িতেই থাকবি, আমার গাড়িটা পরিষ্কার রাখবি, ঘরদোর পরিষ্কার রাখবি, বাজারটা করবি, কাজ কিছু না। সন্ধ্যের পর টি-ভি, মানে একটা বাক্সের মধ্যে তাকিয়ে নাচ গান দেখবি। খুব আরামে থাকবি। তোর মাকে ডাক, তোর মার সাথে কথা বলছি।

পরান ওর জীবনে এই সারবস্তু বুঝে গেছে যে দুনিয়ার সব জায়গায় সব জিনিস সমানভাবে পাওয়া যায় না। যেখানে যা শস্তা সেটা দামি জায়গায় নিয়ে যাওয়ার নাম কারবার। যারা এটা করে, তারা ব্যাপারি। জঙ্গলে মধু পাওয়া যায়। জঙ্গল থেকে হাটে মধু নিয়ে যাওয়া হল আরেক কারবার। সমুদ্রে মাছ আছে, শহরে নেই, সমুদ্র থেকে মাছ যায় শহরে। ব্যাপারিরা তাই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় ঐ সব। তা হলে ত লাভ হয়। লাভ হলে—তবে হয় লাভের কারবার।

পরান বলল—মাসে মাসে ছত্রিশ—না চল্লিশ—না পঁয়তাল্লিশ টাকা চাই, খাওয়া চাই, বছরে ইংলিশ প্যান্ট, জামা আর হাওয়াই চটি চাই। মাঝে মাঝে চানাচুর খাব।

হাত থেকে কাচের গ্লাস পড়ে যাবার মতো ঝনঝন শব্দে হাসলেন দিদিমণি। চল্লিশ নিস্। এরপর বাড়াব। চানাচুর কেক বিস্কুট লজেন্স সব খাবি। বোকা ছেলে।

অনেকে বলল, পরানের বরাত ভালো তাই ডাক্তার দিদিমণির মতো ভলো মানুষের কাছে চাকরি করতে পারছে।

কথা হয়ে গেছে। পরদিন কলকাতা যাবে পরান। সেদিন রাত্রে মায়ের কাছে শুয়ে শুয়ে ছোটবেলাকার ভেজা পেচ্ছাপ হোগলামাদুর আর মায়ের দুধের গন্ধ পাবার বৃথা চেষ্টা করল। তারপর ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্ন দেখল ধনা মৌলে ওকে ঝুড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে হাটে। চানাচুরওয়ালার মতো ঘুঙুরের শব্দ বাজছে। ধনা মৌলের পায়ে। আর মেলায় দ্যাখা কাঠের বাক্সোর কাচের মধ্য দিয়ে সিনেমা দেখার সময়কার কলের গানের শব্দ। শ্মশানঘাটের বুড়ো বটতলার পাশ দিয়ে যে-রাস্তাটা সোজা চলে গেছে হাটতলায় সে-রাস্তায় ঝুড়ি মাথায়

দৌড়োচ্ছে ধনা মৌলে, ঝুড়ির উপর হাত পা ছিটিয়ে কাঁদছে পরান। ধনা মৌলের গায়ের চামড়ায় ডাক্তার দিদিমণির শাড়ির মতো ফুল ফুল ছাপা।

দিদিমণি চলে যাবেন সকালের বাস-এ। এখন দিদিমণি ডিমের মামলেট খাচ্ছেন। পরানের মা তখন পরানের কড়ে আঙুল কামড়ে দিল। মাথায় থু থু ছিটোল। কানে কানে বলল...খোশ্‌মার বাক্সের বালিশ ফতেমার সিতানে। নিশি ভরে জেগে দেখি আলি গেছে বনে। বালাই যত হয়ে যাবে দূর। মা বনবিবির দহায়, মা কালীর দহায়—বালাই যত হয়ে যাবে দূর। পরান যাবার জন্য তৈরি। মাছের কাজের রোজগার নতুন গেঞ্জি আর ইংলিশ প্যান্ট পরেছে পরান।

ডাক্তার দিদিমণি বললেন, কিছু ভেবো না পরানের মা। আমি তো মাঝে-মাঝে আসছিই। আমার কাছেই খোঁজ খবর পাবে। তোমার পরান সুখেই থাকবে। পরানের মনে পড়ে—

"কিছুই ভেবো না তুমি থাকিবে সে সুখে,
য্যাতক্ষণ আমি আছি ত্যাতক্ষণ দুখে।"

পান বেচে নিশিকান্ত। সে পরানকে ডেকে একবার বলল—আমার বিদ্যেধরটাকে জম্বুদ্বীপের মাছের কাজে দেবার ইচ্ছে ছিল, কোনো কাজই খারাপ লয়—ভেবেছিলাম তোরা দুজনাতেই একসাথে থাক্‌বি...

পরানের মা বাস পর্যন্ত এল। ন'টার বাস। পরান প্রণাম করবার সময় বলল কাঁদছিস ক্যানো মা ; এমন ভাব করতিছিস ঝ্যানো জঙ্গলে নে যাচ্ছে সাঁইদার।

বাসে উঠে পরানের একবার আলোমণির কথা মনে পড়ল ; আলোমণি কলকাতা গিয়ে আর ফেরেনি।

জঙ্গলে গিয়ে পরানের বাবাও ফেরেনি আর।

ডায়মন্ডহারবার গিয়ে ওরা রেলগাড়ি চাপল। রেলগাড়িটা ছাড়বার ঠিক আগে শব্দ করল, ভোঁ...

জঙ্গলের শয়তান বেঘোমরি মিথ্যে 'কু' দিয়ে হারিয়ে নেয়—

মিথ্যে শব্দে নিয়ে যায় জঙ্গলের গভীরে—কলকাতার ট্রেন গাড়ি....সমুদ্দুরের হাওয়া আবাদ হয়ে উত্তরে কলকাতার দিকেই নাকি যায়, সমুদ্দুরের মাছও যায় কলকাতা, শীতের পাখিরা কোথায় যায়—উত্তরে?...

ট্রেন শব্দ করে, ভোঁ...

জঙ্গলের শয়তান বেঘোমরি মিথ্যে শব্দে হারিয়ে নেয়। পরানের অল্প মনে আছে, বাবার কাছে শেখা খিলেন মন্ত্র—যে মন্ত্রে নাকি জঙ্গলের বাঘের মুখ বন্ধ হয়। পরান বিড়বিড় করে—এ আলী নামে দহায় দিয়া আছি—তোমার আল্লার নবীর সাজলঙ্গী বাবা, মাগো কোথায় আছ তুমি বিচ্‌মা মিলন আছমান জমিন খিলোন এই খালে জালে—জঙ্গলে...পেরেত সত্তুর দহায় মা কালী, দহায় মা বনবিবি, একলাখ আশি হাজার পীর দহায় ফতেমা বিবি।

ট্রেন চলে, ট্রেনের শব্দে পরান শোনে স্বপ্নে দেখা ধনা মৌলের পায়ের ঘুঙুরের শব্দ।

প্রমা, ১৯৮১

ভালো করে পড়্‌গা ইশ্‌কুলে

ও। এই বুঝি অজয়? বন্ধুপত্নীর জিজ্ঞাসায় চাঞ্চল্যহীন বিস্ময়। জলই নেই।

বন্ধু বলল বর্ষায় এটাই রাক্ষসী হয়ে যায়।

শতরঞ্চি বিছিয়ে বসলাম। বিধবার গ্রাম্য দুঃখের মতো ছড়ানো এলানো বালি; কিছু বক, বালির মধ্যে গরুর খুরের দাগ। দুটো কমবয়সী ছেলে নদীর ওপার থেকে মাথায় করে কী যেন বয়ে আনছে।

টুম্পা নদীর দিকে যেতে চাইল।—ওদিকে যেয়ো না টুম্পু, চোরাবালি থাকতে পারে—টুম্পার মা বলল। টুম্পার বাবা, যে আমার বন্ধু, শান্তিনিকেতনী ব্যাগ থেকে বোর্ড, কাগজ, ব্রাশ আর রং বের করে টুম্পাকে দিল। বলল—ছবি আঁকো তো দেখি।

টুম্পা ভালো ছবি আঁকে। হ্যাঁ, এ বছরের আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় টুম্পা ফার্স্ট হয়েছে। সেই ছবি আমি দেখেছি। ছবির নাম মায়ের সংসার। রান্নাঘরে ফ্রিজ খুলছে মা, গ্যাস্ ওভেনে প্রেসার কুকার থেকে স্টিম বের হচ্ছে, স্টিমের আড়ালে মায়ের মুখ কিছু অস্পষ্ট। বাঃ! বাচ্চাটার কালার ও পার্সপেক্‌টিভের বেশ ধারণা জন্মে গেছে।

টুম্পার মা স্কুলে পড়ায়। টুম্পা ওর মাকে বলল—অজয় নদীর পদ্যটা আমি জানি মামণি, বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বুকে, জল সেখানে....এভাবে নখ দিয়ে বালি খুঁড়ছ কেন টুম্পু, বালির মধ্যে বিষাক্ত পোকা-টোকা থাকতে পারে।...

কিন্তু কাশফুল দুলছিল! বন্ধুর স্ত্রী বললেন—যাই বলুন, কাশফুল জিনিসটা একটা অদ্ভুত সুন্দর ব্যাপার। কী রকম একটা তরল রুপালি রং,—তাই না?

আমি মাথা নাড়লাম। বন্ধু মাথা নাড়াল খুব মৃদু।

—নাও, এবার চুপচাপ ছবি আঁকো টুম্পু, তোমার একটা ছবি কম্‌প্লিট হলেই আমরা খাব। স্টিলের টিফিন ক্যারিয়ারের গায়ে চল্‌কে পড়া আলুর দমের ঝোল কাশফুল ছিঁড়ে মুছিয়ে দিল টুম্পার মা। টুম্পা হলুদ রং-এ বালুচর আঁকল, সাদা রং-এ বক। আমরা সিগারেট ধরিয়ে শিশু-প্রতিভা দেখছি।

মাথায় বোঝা চাপিয়ে যে ছেলে দুটি অজয়ের বালি ভেঙে আসছিল, তারা নিকটতর হল। আমি ওদের চিনতে পারলাম। হারান আর কার্তিক। আমার স্কুলের ক্লাস ফোরের ছাত্র। ওরাও দেখতে পেয়েছিল আমাকে, ওরা বেঁকে দূরে সরে যাচ্ছিল, আমি ওদের ডাকলাম।

—এসব কী তোদের বস্তায়?

—গাট্টি কচু বটে।

—কোত্থেকে আনলি?

—ও পারে পেলাম সার, পঞ্চাশ পয়সা কিলো, আসানসুলে নে যাব, সেথা আশি পয়সা কিলো।

—ইস্কুলে যাস্ না কেন?

—এখুন যে গাড্ডি কচুর জো সার, এখুন ইস্কুলে গিলে বাবা ঠেঙান দিবে সার।

—তা আসানসোল যাবি কী করে?—

—কেনে, পীচ্ রাস্তা ঠেঙে বাসে ওঠা করব। আমি আমার বন্ধুকে বললাম পীচ রাস্তা মানে জি টি রোড, এখান থেকে ছ-মাইল দুর।

টুম্পা ততক্ষণে অজয়ের ওপারের গাছগাছালি ঘন সবুজে এঁকে ফেলেছে। আমার ছাত্র দুজন দূর থেকে টুম্পার ছবি দেখছে। আমি বললাম—দেখছিস কার্তিক, কেমন ছবি আঁকছে বাচ্চাটা, কার্তিক আস্তে আস্তে বলল—উ পোটো হবে বটেক্।

ওরা চলে গেল। টুম্পা বলল আমাকে—এখানে রাখাল বালক নেই কাকু?

আমি বললাম, আছে, কিন্তু বইয়ের ছবির মতো ওরা বটগাছের তলায় শুয়ে বাঁশি বাজায় না।

—তা হলে কী করে?

আমাকে বাঁচালেন বন্ধুপত্নী। টুম্পাকে টেনে নিয়ে বললেন দ্যাখো দ্যাখো, কী সুন্দর ফ্রেম, ঐ বটগাছ আর পেছনের বাড়িঘরগুলো—

বন্ধুটি বলল ওর মেয়েকে—দেখছ তো টুম্পা, আমাদের দেশের মানুষেরা কত গরিব, ছেলেদুটো তোমারই বয়সী, অথচ দ্যাখো, তুমি ছবি আঁকছ আর ওরা পয়সা রোজগারের জন্য এখনই কীরকম ইয়ে করছে।

বন্ধুপত্নী একটু কপাল কুঁচকোল—মৃদু বিরক্তিতে যেমন হয়—আমার দিকে চেয়ে বলল, সব জায়গায় কম্‌রেডি কি ভালো?

আমার বন্ধুটি সাহিত্যিক। প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকায় লেখেন- টেখেন!

আমাকে বলেছিল মেয়েটাকে এমনভাবে মানুষ করতে চায় যাতে সাধারণ মানুষের দুঃখবোধ নিয়ে ও বড়ো হবে। কিন্তু ওর স্ত্রীর ইচ্ছেতেই টুম্পা এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে।

টুম্পা চুইংগাম চিবোচ্ছে আর ছবি আঁকছে। দুটো বাচ্চা ছেলে উঁকি দিয়ে দেখল, একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

—ফটো বানাইছে রে!

—উ ধম্মরাজের বট গাছটো লয়? সব বুঝা যাইছে বটে, দ্যাক্ ওটা ছোট বাবুদিগের গয়াল বটেক্?

আমার বন্ধুটি বলল, কাছে এসেই দ্যাখো না কেন, বোসো এই শতরঞ্জিতে, ওরা লাজুক হেসে দাঁড়িয়ে রইল।

—নাম কী তোমাদের?

—আমি হাবু।

—হাবু কী?

—হাব্বু।

—হাবু মণ্ডল, না রাই, না দাস, না বাগদী, কী?

—হাআবু বটে।

—পড়?

—না।

—কী কর?

—বাগালি করি।

আমি জানালাম—বাগাল মানে রাখাল।

টুম্পা ওদের দিকে ভালো করে তাকাল। টুম্পা রাখালবালক দেখল। বাঁশি বাজাতে পার?—টুম্পা জিজ্ঞাসা করল।

হাবু বলল, পেলাসটিকের বাঁশি ফুঁ মেরে বাজাই।

এরকম আরও দুটো একটা কথা হল পরে, ছেলে দুটো শতরঞ্জির ধারে বসল। শতরঞ্জির ধারের লাল রং-এ হাত বুলোল, তারপর শতরঞ্জির হলুদ রং-এ আঙুল রাখল, তারপর বুড়ো আঙুলের ছোঁয়ায় রং-এর টিউবের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করল। টুম্পার মা অবশ্য এইসব কথাবার্তা শুনছিল না। হাঁটুর উপর থুতনি রেখে মৃদু গলায়, দূরে কোথায় দূরে...দূরে—এই গানটা অস্ফুটে গাইছিল। এমন সময়, হাবুর সঙ্গীটির পরনের গামছাটা বীরভূম থেকে ছুটে আসা দমকা হাওয়ায় একটু সরে যেতেই হাঁটুর উপর খোস-পাঁচড়ার ঘা বের হয়ে পড়ল আর অমনি হুড়ুপ করে কোত্থেকে উড়ে আসা একটা মেটে রং-এর মোটা মাছি ঘায়ের উপর ভনভনাতে থাকল, আমার বন্ধু তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখল ও অজয়ের শোভা দেখছে, তাই একটু নিশ্চিন্ত হল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল—দেখ ইশ্—পায়ে কী সব ইয়ে—শতরঞ্জি থেকে সরে বসতে বল।

সন্ধ্যায় আমার স্কুলের সেক্রেটারিমশাই এলেন। পঞ্চায়েতের লোক। পুরনো সেক্রেটারিকে হটিয়ে উনি নতুন হয়েছেন, সঙ্গে এলেন আমার সহকর্মী দু-একজন শিক্ষক। আমার সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। যদিও আমার বন্ধুর লেখার সঙ্গে কেউই পূর্ব-পরিচিত নন, তবু সেক্রেটারিমশাই সাহিত্যরসিক, আমার বন্ধুকে একটা গল্প শোনাতে পীড়াপীড়ি করলেন। বন্ধু বললেন, ভালো গল্প সঙ্গে নেই। তবে সাথে একটা ম্যাগাজিন ছিল সময় কাটাবার জন্য, তার মধ্যে একটা গল্প আছে। বন্ধু বললেন, যাদের জন্য লেখা, তাদের কেমন লাগবে গল্পটা শুনে, সেটা জানতে ইচ্ছে করছে।

আমি আমার স্যুইপার অবনী রুইদাসকে ডেকে আনলাম। অবনী কিছুতেই ঘরে বসল না, দরজার চৌকাঠের বাইরে বসে রইল।

গল্পের নাম পঁচা বাউরীর অলিন্দ নিলয়। গল্পের শুরুটা এরকম—গাজন পরবের আগের দিন একটা রুদ্র স্বপ্ন দেখল পঁচা বাউরী। আদিম মানুষের মতো রোমশ হাতে পঁচা বাউরী একটা বর্শা নিয়ে বিদ্যাধরীর বাঁধের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। শিব শিব বল শিব হে—এই স্বপ্নের ফ্রয়েডীয় বা ইয়ুংগীয় ব্যাখ্যা কী হতে পারে জানবার দরকার নেই ওর, তবে ঘুম ভেঙে ওর মনে হয়েছিল শিবের তৃতীয় নয়নের তেজ ওতে লেগেছে, পার্বতী ঘোষকে খুঁজতে হবেই। পার্বতী ঘোষের কথা মনে হতেই একটা অদ্ভুত নস্টালজিয়া তার নিউরোন শৃঙ্খলে খেলা করে...। গল্পটা শেষ হবার পর সেক্রেটারিমশাই বললেন—পাক্কা কম্যুনিস্ট গল্প মশাই। বাঃ!

অবনী রুইদাসকে জিজ্ঞাসা করা হল। ও বলল, আমি হলাম মুখ্যু মানুষ, কী বুঝি বলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পঁচা বাউরী কেন মরল কিছু বুঝলে না? অবনী বলল, কালে পেয়েছিল, কপালে নেকা ছিল, তাই মরল।

একটু পরেই টুম্পাকে নিয়ে মেতে উঠল ওরা। টুম্পার ছবি দেখে, ওর কবিতা আবৃত্তি

শুনে, আমার স্কুলের সেক্রেটারিমশাই বিভোর হলেন। আগামীকাল আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে একটা ফাংশন হবে স্কুলে, আমার বন্ধুকে প্রধান অতিথি থাকতে হবে।

বন্ধু বললেন, কেন এম, এল, এ বা ঐ জাতীয়...

—আরে, আজ এম, এল, এ খবর পাঠালেন, বিশেষ কাজে উনি জলন্ধর যাচ্ছেন। তা কলকাতার সাহিত্যিক যখন পেয়েছি, ছাড়চি না। আর আপনার মেয়েটি হবে বিশেষ শিল্পী। একে দেখে আমার ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা শিক্‌তে পারবে, ব্রাইট এক্‌জাম্পেল্‌ মশাই,—

বন্ধু বললেন, আমার মেয়ে বিশেষ শিল্পী হোক আপত্তি নেই কিন্তু আমি ওসব হতে পারব না।

—আরে, আপনি না করলে শুনচে কে?

আমি স্কুলে মাস্টারি পেয়ে বয়স্ক শিক্ষার স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বয়স্কদের পড়াতাম। অবনী আমার একজন সে-রকম ছাত্র। সম্ভবত বন্ধুর কাছে আমার কৃতিত্ব দেখানোর জন্যই অবনীকে যেতে নিষেধ করলাম।

বন্ধুকে বললাম, আমার ছাত্র। ইলিটারেট ছিল। এখন চিঠিপত্র লেখে। কাগজও পড়তে পারে। আজকের কাগজটা অবনীর হাতে দিলাম। পড়তে বললাম।

অবনী বলল, মিছা খেদ্‌মত। আমার ভালো লাগে না, আপনাদিগের ভালো লাগবেক অবইশ্য, আপনারা বুঝেন, খবরের কাগজের লিখা আমি বুঝি না।

অবনী পড়তে থাকে, মুহ মুহ লোডশেডিং জীবনযাত্রা অচল। লোডশেডিংটি কী বটে? এয়ার কন্ডিশনার ফিরিজ স্তব্ধ। মেম-বৌরা বাঙালি স্বামী ডিভোস্‌ করে স্বদেশ যাচ্ছেন। ফিরিজ কি? জে পি অসুস্থ, জে বি সুস্থ। ইনকাম্‌ট্যাক্স পদ্ধতি পুরন বিন্নাস। লীগ পাবে মোহনবাগান। আবার পাওয়া যাচ্ছে রাজদূত। নতুন সেনেটারি ন্যাপকিন্‌। এ পাতায় টেন্ডার নোটিশ—খড়ির গণ্ডী, সেকস বোম্‌ মিস্‌ জে। এ পাতার অদ্দেকে নেকা আছে ন্যাশনাল টোবাকোর শেয়ার কিনুন সুদের হার একের পিঠে দুই বার। বাকি অদ্দেকে একটা লম্বা-পানা ছবি—কচি কচি পা আমরা মুড়ে দিই নরম জুতোয়,—শিশুবর্ষে আমরা ছোটদের ভুলিনি। কাগজ শেষ। একটা বন্নও বুঝলাম না। এ সবের কী মানে হয় বটে, মুখ্যু মানুষ। আপনারা বোঝেন।

রাত্রে লুচি-মুরগি। বন্ধু-স্ত্রী ভিনিগার পেলে চাইনিজ কায়দায় প্রিপারেশনটা করতে পারতেন। হ্যারিকেনের আলোয় অসুবিধা হচ্ছে খুব, তাই না? আমি জিজ্ঞাসা করি। কলকাতায় এখন সবার হাতে হ্যারিকেন। অভ্যেস হয়ে গেছে। বাব্বাঃ, বাইরেটা কী অন্ধকার, অমাবস্যা বুঝি? কী করে থাকেন, কলকাতার মেয়ে বিয়ে করতে হলে এই চাকরি ছাড়তে হবে আপনার। টুম্পারও ভালো লাগছে না। হাই উঠছে। টুম্পা তেমন রাখালবালক দেখেনি, যে বটগাছের ঝুরিতে হেলান দিয়ে এক পায়ের উপর অন্য পা টেরচা ভালে তুলে দিয়ে বাঁশের বাঁশি বাজায়। টুম্পা সে রকম ছোটো নদী দেখতে পেল না, যার ধারে হাট বসে, বংশীবদন গাড়ি চালালে তার ভাগ্নে মদন পাশে বসে থাকে। সমাজের বন্ধু চাষী ভাইয়ের ছবি যেমন দেখেছে বইতে, মাথায় ইয়া বড়ো থানের তোড়া, অরণ্যদেবের মতো পায়ের গুলি, রিপ্‌ কার্বির মতো মুখ, বেতালের মতো বুক, অথচ সত্যিকারের চাষী যখন দেখল, তখন বুঝল রাঙামামার চাইতেও রোগা, স্কুলের ইউনিফর্মের বেল্টের ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া প্লাস্টিকের হলুদ বোতামের মতো চোখ, উপুড় করা ওষুধ খাবার গ্লাসের মতো থুতনি। বইতে এ ভিলেজ অব্‌ বেঙ্গল-এর ছবিতে দেখেছে পুকুরে ফুটে আছে কত পদ্ম, অথচ সত্যিকারের

পুকুর দেখে মনে হয়েছে সায়েন্স বইয়ের বিওয়্যার অফ্ পলিউটেড্ ওয়াটার ছবির কথা।

—কাল কোন্ কবিতাটা আবৃত্তি করবে ঠিক করেছ টুম্‌পা?

—'প্রশ্ন'টা করব মামণি?

—না, ওটা থাক্, 'বীরপুরুষ' কর, আর...'ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা' করতে পারো।

—ঐ মাঠে হ্যারিকেন নিয়ে বাচ্চাগুলো কী করছে?

—ইঁদুর খুঁজছে। ওখানে ইঁদুরের গর্ত আছে, বোধ হয় ওরা সাঁওতাল, ওরা ওদের খাবার খুঁজছে।

—আমি কখনো সাঁওতাল দেখিনি। দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম্ ডিম্ রবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর টুম্পা ঘুমোচ্ছে। আমরা আমার বাসাবাড়ির ছোট্ট বারান্দায়।

—বাড়ি ফিরেই বাড়িওলার সাথে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিও কিন্তু, বন্ধুপত্নী একটু উত্তেজিত।

—রিল্যাক্‌সিং মুডে আছি, এখন এসব তুলছ কেন?

—এ ভাবে সবই অ্যাভয়েড্ করছ তুমি। টুম্পার টিউটরের ব্যাপারেও কোনো ডিসিশন নিলে না তুমি।

—ডিসিশন তুমিই নাও।

—না। আমি নিজে কোনো ডিসিশনে যাব না। ফ্রিজের ইনস্টলমেন্টের ব্যাপারে আমার শিক্ষা হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যই বোধ হয়, বন্ধুটি বললে—তোর ডাইরির কী সব শোনাবি বলেছিলি, শোনা এখন।

১৪ই নভেম্বর

আজ শিশুদিবস। সকালে বিস্কুট বিতরণ। স্কুলে সবাই এসেছে। সবাই দুটো দুটো। শিশুদিবস শেষ।

১৭ই নভেম্বর

এখন ধান উঠেছে। মাঠের কাজ করলে পয়সা পাওয়া যায়। ছেলেপুলেরা গতরখাটা বাপকে সাহায্য করতে গেছে। বড়লোকের ছেলেমেয়েরাই আছে এখন স্কুলে। একটা লোক এল।

একটা পার্থনা আছে মাস্টার। আমার বেটা গন্‌শাকে একটু ডেকে দেন।

গণেশকে পাঠালাম। ক্লাসের বের হতেই গণেশের ঘাড় চেপে ধরল ওর বাপ।—শুয়ারের পো, বাবু হবার শক্ পোঁদে ঢুইক্যে দিব। হাত থেকে শ্লেট কেড়ে নিয়ে পায়ে মাড়িয়ে দিল। রোজ রোজ বইলছি মাঠ থে ধানগুলো বাবুবাড়ি পৌঁছে দে আয়,—আমি এই গুষ্টি গিলুব,—আর বেট্টা বাবু হঁন্‌ছে—অ্যাঁড় ছিনছে দুব।

২২শে নভেম্বর

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটা দেয়া ছিল—ঐ দেখ মা বর্ষা হল ঘনঘটায় ঘিরে/বিজুলি

ধায় এঁকে বেঁকে আকাশ চিরে চিরে/দেবতা যখন ডেকে ওঠে থরথরিয়ে কেঁপে/ভয় করতেই ভালোবাসি তোমার বুকে চেপে।

আমি পড়া ধরলাম, বিষ্টি পড়লে কী ইচ্ছে করে?

—মাছ নাপিয়ে আসে নাবালে, কৈ, শিঙি, পোল্যো দে ধরতে ইচ্ছে যায়,

একজন বলল, বিষ্টি পড়লে খড়ের ঘরে জল পড়ে, ভালো লাগে না তকুন।

মায়ের কোলে বসে থাকতে ভালো লাগে না? আমি জিজ্ঞাসা করি।

মা তৈড়ে দেয় মাস্টার, মা বলে জল হইয়েছে, গেঁড়ি-গুগলি খুঁজ্যে নে আয়।

২৫শে নভেম্বর

তবু গণ্‌শা স্কুলে এল। আজ ওর হাতে শ্লেট অর্ধেকটা আছে। গণ্‌শার ইচ্ছে ও লেখাপড়া শিখে দারোগা হবে।

যে-বাবুবাড়ি মাথায় করে ধান বয়ে নিয়ে যেতে হয়, যে-বাড়ির গরু চরাতে হয়, যে-বাবুকে তেল মালিশ করে দেয় মা শীতের দিনে, দারোগা হয়ে সে-বাবুকে একদিন খুব করে মেরে দেবে।

২৮শে নভেম্বর

কাঙালের বয়স কত? ১২।১৩ হবে। ওকে দেখলাম একটা ন্যাকড়া একটা ষাঁড়ের মূত্রযন্ত্রে বার বার লাগাচ্ছে। আমি ভাবলাম এটা বালকবয়সের দুষ্টুমি। আমি ধমক দিলাম।—একী হচ্ছে বাঁদরামো।

—নালুই বানাচ্ছি মাস্টার।

—নালুই আবার কী?

—ও আমাদের গাই-গরুটা ডাকছে বটে। এখন উয়ার পাল খাবার টেইম। গঞ্জের গরুর হাসপাতালে নে গেলে কলের পিচকিরি দে পাল খাওয়ালে বড় জাতের গাই হবে। কিন্তুক আমাদের গাইটা বড় ছেঁচড়া। কলের পিচকিরির ইনজিশনের সময় খুব নাপানাপি করে। এই নালুইটা গাইয়ের মুকির সামনে ধইরলে আর নাপাবেনি, চুমমেরে থাইক্‌বে।

ওরে সবুজ। ওরে আমার কাঁচা।....

১লা ডিসেম্বর

গণ্‌শার বাবা মরেছে। গন্‌শা দুর্গাপুরের চায়ের দোকানে কাজে লেগেছে। গন্‌শার দারোগা হবার ইচ্ছে ছিল। দারোগা হয়ে...

৩রা ডিসেম্বর

সামনেই পরীক্ষা, অথচ আমার স্কুলে ছাত্র নেই। চাষের ধান যাদের ঘরে যাবার, চলে গেছে এত দিনে। এরপর রৌদ্রের প্রান্তর জুড়ে শুকনো ঘড়ের গায়ে গায়ে অথবা মাটির বুকে লেগে থাকা একটা একটা ধান ঘুঘু আর শালিখের সাথে খুঁটে নেবার প্রতিযোগিতার উৎসবে মেতেছে ছেলেপুলেগুলো। সাজিয়েছে ওর উনুন, পাঁপড়ওলা পাঁপড় ভাজবে। কুড়োনো ধানের উৎসব।

৭ই ডিসেম্বর

মুড়ির ঠোঙায় দেখি, 'ছোট শিশু মোরা তোমার করুণা হৃদয় মাগিয় লব।' এই বই কোথায় পেলে—মুড়িওয়ালা বলল, গণ্শার মা ঠোঙা বিক্রি করে গেছে।

রাত হল। এবার থাক। ডায়েরিতে সবই এ রকমই। বন্ধুর ঘুম পাচ্ছে।

পরদিন স্কুলে ঢুকেই রাগ হয়ে গেল। লাল শালুর উপর তুলো দিয়ে আঠা মেরে লাগিয়েছে—

সিসুবর্ষ উপলক্ষে

বিচিত্রানুষ্ঠান।

ওটা খোলালাম। স্কুলের অনেক ছেলেমেয়ে হাজির। ওদের মা-বাবাও। সামনের সারিতে বিশিষ্ট অতিথিরা, থানার বড়ো, মেজো ছোটো বাবু। পোস্টমাস্টার, কানুনগো সাহেব, চালকল মালিক আনন্দ ঘোষ, পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি, ইত্যাদি।

টুম্পাকে ওর বাবা বলে দিল,—ওদের উচ্চারণটা একটু অন্যরকম, কলকাতার মতো নয়, হেসো না কিন্তু।

স্কুলের ছেলেমেয়েরা আবৃত্তি করল। মানে, পাঠ্য বইয়ের কবিতাগুলো মুখস্থ বলে গেল। টুম্পার আবৃত্তি হলে ডাকঘর নাটকের একটা অংশের অভিনয় হবে।

টুম্পা স্টেজে উঠলে সবাই জুল্‌জুল্ করে তাকাল।

—বোড় ঘরের মেয়্যা বটেক—

—রেডিওর মেয়্যা, আমি খপর ন্যেয়ছি—

—বঃ, ঠিক পুতুলটি গো—

একজন চোয়াড় ধরনের লোক বলে উঠল—মাখন-ননী খাওয়ালে তোমার বেটিও অমনপানা হবেক—বুঝলে হে!

বীরপুরুষ হল। এবার ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা—

সন্ধ্যাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এখুনি আসছি বলে ভাগল—এখনো আসে নি—ধনঞ্জয় মাস্টার আমাকে বললেন। উনিই নাটকটা করাচ্ছেন।

—যাবে কোথায়,—ওর পার্ট আছে যখন আসবেই।

—তা কখন আসবে, মেক্‌আপ নেয়নি, কতক্ষণ সিন ফেলে রাখবে?

বন্ধুপত্নী বললেন—ও না এলে—টুম্পাই করে দিতে পারবে, গত মাসেই ও সুধার অভিনয় করেছে ক্লাবে।

ধনঞ্জয় মাস্টার খুব খুশি হলেন।—তা হলে তো খুবই ভালো হয়, যদি ওকে বলেন...

বন্ধু বললেন,—এর মধ্যে আপনাদের সন্ধ্যা যদি এসে যায়,—

—এলে বাদ যাবে। ওর 'শ'-এর উচ্চারণটা ডেন্টাল,—তা ছাড়া এখনো আসেনি যখন...

আমার বন্ধুর স্ত্রী একটু রসিকতা করলেন—দেখুন গে যান,—ও হয়তো কোথাও অমলের জন্য ফুল কুড়োচ্ছে।

বন্ধুটি বলল,—টুম্পা রিহার্সালে ছিল না, নতুন নামলে ওরা ঘাবড়ে যাবে না তো?

ধনঞ্জয় মাস্টার বললেন—সুধার সাথে তো অমলেরই কথা আছে, তা অমল হল কানুনগো সাহেবের ছেলে। ঘাবড়াবে না।

টুম্পা প্রথমে রাজি হয়নি। পরে রাজি হল। ওর যখন ও শাড়ি পরা হয়ে গেছে, তখন সন্ধ্যা এল, ফ্রকে গোবর। হাতে পায়েও লেগে আছে।

সবাই হৈ-চৈ করে উঠল।

—সবার সাজ হয়ে গেল। তুই বাদ। শহরের মেয়েটাই সুধা হবে।

সন্ধ্যা ক্লাস 'টু'র ছাত্রী। মিষ্টি চোহারার মেয়ে। চোখে কাজল দেয়া ছিল। কেঁদে দিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় গেছিলে সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা কাঁদো-কাঁদো গলায় যা বলল তার মানে—শিবপুকুরের মাঠে যে গাইগুলি চরে বেড়ায় তার গোবর কোনোদিনই ও পায় না। ক্ষেপী, দুর্গা, ওরাই নিয়ে যায়। আজ সব্বাই ইস্কুলে গান শুনতে এসেছে। এই মওকায় ও তাড়াতাড়ি কিছু গোবর কুড়িয়ে নিতে গেছিল। ঘুঁটের এখন অনেক দাম,—তাই,...

আমি বললাম,—তুমি কি সুধা হতে চাও,—পার্ট মনে আছে তো?—

সুধা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলতে লাগল—আমি তোমার জন্য ফুল কুইড়ে আনব অমল, যেখানে হাত যায়, না, উঁচা উঁচা ডাল, সেখান থে ফুল নিয়ে আসব লীল ফুল—

থাম।

ধনঞ্জয় মাস্টার ধমক দিলেন।

ইতিমধ্যে ঘোষণা হল—থানার বড়বাবু বীরপুরুষ আবৃত্তির জন্য খুশি হয়ে—টুম্পা চ্যাটার্জিকে ১০ টাকা পুরস্কার দিচ্ছেন। ডাকঘর-এর সবচেয়ে ভালো অভিনয়ের জন্যও দশ টাকা প্রাইজ। সন্ধ্যা দর্শকদের সারিতে, চটে বসেছে। আমি ওকে গ্রীনরুমের পাশে নিয়ে এলাম। টুম্পা খুব আস্তে আস্তে বলল, প্রাইজ পেলে ঐ টাকাটা তুমিই নিয়ো, কেমন? আমি নেব না।

সন্ধ্যা বলল, তুমার টাকা আমি নেব কেনে?

সন্ধ্যার সারা মুখে লেপটানো কাজল। ও এখন অন্য সুধার অভিনয় দেখবে। এর আগে একবার হিসাব করার চেষ্টা করে দেড় টাকা শ' হলে দেড়শো ঘুঁটের দাম কত।

প্রমা, ১৯৮০

রত্নাকরের পাপের ভাগ

কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে যাবার পর এখন জেল্লা দেয়া চকচকে রোদ্দুর। আকাশের এখানে ওখানে ধোঁয়াজমা বোতল-দৈত্যের মতো সাদা ধবধবে কুড়ি-মুড়ি দিয়ে বসা মেঘ। বু-বু-বু-বু বাতাস বইছে। স্টেশন থেকে যে কাঁচা রাস্তাটা সোজা চলে গেছে—তার দুপাশে শুধুই সবুজ রং—সেই ততদূর পর্যন্ত যেখানে আকাশ মাটিতে নুয়ে মিশে গেছে। হাওয়ায় সবুজের রং উঠে আসে। এই রাস্তা ধরেই ডিহিলা, দাদার শ্বশুরবাড়ি, দুমাইল আর।

এপাশেরগুলো জয়া ওগুলো রত্না ধান বুঝলি, ঐ ভুঁয়ে—ড্যাঙা জমিতে দ্যাখ, আখ লাগানো হয়েছে। আর দূরের ওই লম্বাপানা ধানগাছে ঝিঙেশাল ধান হবে—এসব কথা, যা আমি বুঝি না অনর্গল বলে যাচ্ছিল বলরাম। বলরাম আমার বউদির ভাই। ওরই সাথে যাচ্ছি ওদের ঘর।

একগুচ্ছ প্রজাপতি কেঁপে কেঁপে উড়ছে। ওরা আমাদের সাথে সাথে চলছে। সেই প্রজাপতির ঝাঁকটা ভেঙে সাইকেল এল একটা—কি ভাইপো, শহর বেড়ানি হল বাব্বা। এদ্দিকে গ্রামে মাপ আসচে রব পড়েছে—ইটি কে? বলরাম বলল—দিদির দ্যাওর। লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কলকাতা থাকা হয়? আমি "হুঁ" বলতেই আমার হাওয়াই শার্টের হাতাটার মধ্যে আঙুল দুবার ঘষে বলল—কত করে মিটার দাদা? বলরাম বললে—এর আবার নিকেশ লাগাচ্ছ? এ তো গলসীর হাটের সাহা ব্রাদার্সেই পাবে। আমার প্যান্ট দেখছ? কলকাতার যেখানে রাইটার্স বিল্ডিং, আমাদের মন্ত্রীরা থাকেন—তার কাছেই নিউ মার্কেট। এটা সেখানকার মাল। এই দ্যাখ সামনে চেইন। চারটে পকেট।

বেলা এগারোটা নাগাদ পৌঁছলাম বলরামদের গ্রামে। কাদামাখা কতগুলো পুরুষ-মেয়ে বিড়ি খাচ্ছে, এর মুখেরটা কেড়ে নিয়ে টানছে ও। যে রাস্তাটা, যার দুধারে লঙ্কা গাছ—সেই রাস্তা দিয়ে এগুলেই উঠোন। বলরামদের বাড়ি। দোতলা বাড়ি। ইস্কুল ঘরের মতো লম্বা গোয়ালঘরে দশ-বারোটা গরু-মোষ বাঁধা, সারা বারান্দায় শস্যের ঘ্রাণ। এখানে ওখানে ডাঁই করা বস্তা। বস্তার ফাঁক-ফোঁকর থেকে ডাল, তিল, এই সব বেরিয়ে পড়েছে। বস্তার ফাঁকে দুটো ইঁদুর মারার কল দ্যাখা গেল।

আমরা যাবার পরই ধনা নামে একটা কুঁজো লোককে ডাব পাড়তে বলল বলরাম। ধনা ছিনে জোঁকের মতো ছেঁচড়ে গাছে উঠল। তারপর এক অদ্ভুত কায়দায় এক কাঁদি ডাব নিয়ে যখন নিচে নামল, তখন ওর সারা গায়ে লাল পিঁপড়ে। হাত দিয়ে রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে যেমন গায়ের নোংরা পরিষ্কার করে বাজারের আলুওলা, ঠিক ঐ কায়দায় পিঁপড়ে মারছিল ধনা। ওর সারা গা ফুলে যাচ্ছিল। আমি বললাম—খুব জ্বালা করছে? ধনা শুধু মাথা নেড়ে বলল—পিঁ-মড়ে। বলরামের বাবা বল—এসব ওদের ওব্যেস আছে। তারপর চাক হয়ে যাওয়া শরীরের জ্বালা মেটাবার জন্য মাঠাক্‌রুণের কাছ থেকে একটু সরষের তেল মেগে নিল ধনা। সুপারভাইজার বলরাম কোঁৎ কোঁৎ করে চারটে ডাব খেল।

আমি দুটো খেতে পারলাম। বলরাম আরও খেতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলরামের বাবা

বললেন—হ্যাঁরে অগস্ত্যমুনির মতো সমুন্দুর পেটে নিবি নিকি? কানুনগো সাহেবদের জন্য রাখ।

পুকুরে স্নান করতে গেলাম বলরামের সাথে। মিহি শ্যাওলায় ভরে আছে পুকুর। একটা মাছ ঘাই মারল বোধ হয়, কিছুটা সবুজ রং সরে জেগে উঠল কালো ঢলঢলে জল। পুকুরের পাড়ে কলাবতী গাছের মতো পাতা নিয়ে উজ্জ্বল সবুজ গাছ।—ওতে ফুল ফোটে না বলরাম?—বোকা কোথাকার, হলুদ গাছে ফুল হয় নাকি? বলরাম দুহাতে শ্যাওলা সরিয়ে স্নান করে। খেজুর পাতা দিয়ে জিভ ছুলিয়ে ঘড়ঘড় শব্দে মুখ ধোয়। আমি পাড়ের খুব কাছে দাঁড়িয়ে কানে আঙুল দিয়ে ডুব দিলাম। খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেল চরাচর। আমি বললাম পুকুরটা বড়ো সুন্দর। বলরাম বলল—তিন হাজার টাকার মাছ আছে এতে। এবার যদি আরও পাঁচ কেজি চারাপোনা ছাড়া হত....

দুপুরে কয়েকজন লোক এলেন। বলরামের বাবাই সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। বারান্দায় লম্বা করে শতরঞ্জি পাতা হয়েছে। সাইকেল ছুটিয়ে উইল্‌স সিগারেট নিয়ে এল বাড়ির সরকারমশাই। মাঝখানে কমবয়েসী চশমা-পরা এক ভদ্রলোক। উনিই বোধ হয় কানুনগো সাহেব হবেন, কারণ ওনাকেই সর্বদা মাঝখানে রাখা হচ্ছে। ছোটবেলায় খেলতাম দুই পাশে দুই কলা গাছ মধ্যিখানে মহারাজ।

বলরামের বাবা আগত অতিথিদের বললেন—তা কাল যেখানে ছিলেন সেখানে থাকতে কোনো কষ্ট হয়নি তো! তোষক জাজিম্ দিতে পারিনি স্যার সবাইকে, তা স্যার—একটা নিবেদন ছিল। সেট্‌লমেন্ট যতদিন চলবে ততদিন নাওয়া খাওয়া গরিবের বাড়িতেই করবেন।

কানুনগো সাহেব বললেন, আপনাদের বাড়িতে রোজ খেলে সামন্তমশাই রাগ করবেন, মিত্তিরমশাইও বলে রেখেছেন আগে থাকতে—তা যাই হোক।

কানুনগো সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন বলরামের বাবাকে—তিনকড়িবাবু, পোস্ট-অফিস বাড়িটার মালিক কি আপনি? বলরামের বাবা মাথাটা অনেক হেলিয়ে, যাত্রার 'বন্দেগী জাঁহাপনা' বলার সময় যেরকম করে, সেভাবে 'আজ্ঞে হ্যাঁ' কথাটা উচ্চারণ করলেন। তারপর কচ্ছপের খোল থেকে গলা বাড়িয়ে জন-মনিষ্যি আছে কিনা দেখার মতো সন্দিগ্ধ ও ভীত চোখের প্রশ্ন হল—কেন? তোনো ইন্‌কোয়ারি...

কানুনগো বললেন—ওটার ভাড়াটা বড্ড বেশি। একটা চিঠি এসেছে...আচ্ছা তিনকড়ি বাবু—ঐ আমবাগানটা কার?

—আজ্ঞে, গরিবের।

—ঘাট-বাঁধানো পুকুরটা?

—এই গরিবের। ওটা দেবোত্তর। গৃহ-দেবতার নামে আছে।

আমি দেখছিলাম—বলরামের বাবা কথা বলার সময় বাঁ হাতটা ডান দিকের বগলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখেন।

—আচ্ছা এই দালানটা তো আপনার। আর যে বাড়িতে আমাদের থাকতে দিয়েছেন?

—আজ্ঞে এই গরিবেরই বটে।

—ডাঙা জমিটা, যেখানে শ্যালো পাম্প বসানো আছে একটা?

—গরিবেরই।

পাতা দেয়া হয়েছে, মসৃণ কলাপাতা থেকে টাটকা গন্ধ বেরুচ্ছে—বড়ো কুটুম তুমিও বসে যাও। আমাকেও বসিয়ে দিল অতিথিদের সাথে। সরু ঝরঝরে ভাত, ঘি, ভাজাভুজি।

বাটিভরা ধোঁয়া-ওঠা মাংস। অতিথিদের একজন চেঁচিয়ে উঠলেন, করেছেন কী তিনকড়িবাবু, অ্যাঁ? তিনকড়ি হেসে বললেন, কী আর আয়োজন, গরিবের বাড়ি ডাল-ভাত, পেট ভরে...। বলরামের বাবা বাঁ হাতটা ডান বগলে ঢুকিয়ে রাখেন। এরপরে একগলা ঘোমটা দিয়ে বলরামের মা অনেকের পাতে মাংস দিয়ে গেলেন। আমি দেখছিলাম একটা মোটা লালপেড়ে শাড়ির ভেতর থেকে শুধু একটা হাত কলের যন্ত্রের মতো—মাংসের হাঁড়িতে ডুবছে আর উঠছে। বাড়িতেই পাঁঠাটা কাটা হয়েছে, বুঝলেন একেবারে কচি। কানুনগোর পাশে বসা একজন বলল—কচি পাঁঠা বৃদ্ধ মেষ...অন্য ভদ্রলোক তাঁর বাঁধানো দাঁত দুপাটি পাতের এক কোণায় রেখেছেন। তার ওপরে উচ্ছিষ্ট অস্থির স্তূপ, আধচেবানো মাংসের ছোবড়া, তিনি হাড় চুষছিলেন। দন্তহীন উচ্চারণে বলেন—খুবই টেষ্টফুল। আমিও ঘাড় কাত করে হাড় চিবুচ্ছিলাম, দেখি বারান্দার সামনে ধানের গোলাটার পিছনে কাঁঠাল গাছের ডালে পাঁচ-ছটা ল্যাংটো ছেলে-পিলে বসে বসে শেষ ব্যাটারির টর্চলাইটের মতো চোখে আমাদের খাওয়া দেখছে, দেখছে শেফালিফুলের মতো ঝরঝরে ভাতের সাথে মাংসের কুচি মিলিয়ে যাচ্ছে আমাদের মুখের ভেতরে, দেখছে হাড়ের ভেতর থেকে মজ্জা চুষে বার করার কায়দা। দই আর রসগোল্লা এল। কাঁঠাল গাছ থেকে একটা সমবেত চিৎকার শোন গেল—গজু গজু রে মোণ্ডা দেখবি আয় মোণ্ডা। একটা চার পাঁচ বছরে ল্যাংটো ছেলে উঠতে চেষ্টা করছে কাঁঠাল গাছে—আপ্রাণ, পারছে না, বারবার পিছলে পড়ছে সে। আমি মণ্ডা খাই।

অতিথিরা সব মুখ ধুয়ে দাওয়ায় বসে পান চিবুতে লাগলেন। সিগ্রেট ধরালেন। বালিশ এনে দিই—এই কথা তিনকড়িবাবুর মুখ দিয়ে বেরুতেই বলরাম বগলে চেপে কয়েকটা বালিশ নিয়ে এল। ওরা বলল, আর কেন!—এবার কাজে নামব। এর পরে বলরাম আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল—চ' একটু ঘুরে আসি কেনে। বাইরে বেরিয়ে বলল—বাগ্দি পাড়ায় লদাই সিগ্রেট রাখে।

একটু দূরে একটা পুকুরের তিন পাশে দেখা যাচ্ছে কতগুলো ঝুপড়ি ঘর। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ফ্যাকাশে ধোঁয়ার রং। পুকুরের পাশে পাশে শুকনো বিষ্ঠার সাথে মরে পড়ে আছে দুটো বিরাট কৃমি। একটা মেয়েলোক তার সম্পূর্ণ উলঙ্গ শরীর নিয়ে প্রায় দৌড়ে এসে পুকুরে নেমে গলাজলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মাথার ওপর ঘুরছে ফড়িং।

বলরাম আমার দিকে চেয়ে চোখ নাচাল। বলল—এর নাম বাগ্দি পাড়া। আমি জিজ্ঞেস, করলাম ল্যাংটো হয়ে এরা স্নানে আসে নাকি? বলরাম বলল—ধুরোঃ, ঐ তো ওর কাপড়খানা শুকোচ্ছে ঘাসে। চান সেরে গলা জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপড়খানা জলকাচা করে নিয়েছে। তারপর ওটাকে শুকোবার জন্যে ঘাসে মেলা করে দিয়ে আবার জলে নেমেছে, শুকনো হওয়া পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে থাকবে। একটাই তো কাপড়—তাও আমরা পুজোর সময় দিই, তাই।

দেখি, নীল রং-এর শাড়ির মধ্যে আছড়ে পড়ছে রোদ্দুর, আর সেই শাড়িটার ফাঁক-ফোকর দিয়ে মাথা গলিয়ে কাশফুলগুলো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাতাসে নড়ছে। গলা জলে দাঁড়িয়ে বাগ্দিবউ, রোদ্দুরে উত্তাপের জন্য তার অপেক্ষা, মাথার উপর ঘুরছে ফড়িং।

রান্না হচ্ছে, বোঁটকা গন্ধ, ডালপালা পুড়বার কালো ধোঁয়া।

একটা করবী গাছের ডাল ধরে ঝাঁকাচ্ছিল কতকগুলো ন্যাংটো ছেলে-মেয়ে। আর এখটা ফুল ঝরে পড়তেই—সেটা নেবার জন্য কামড়াকামড়ি মারপিট, মা-বাপ তুলে গালাগালি।

যে পাচ্ছে শেষ পর্যন্ত, সে ফুলের বোঁটায় মুখ দিয়ে মধু চুষে খাচ্ছে। আমি হাত বাড়িয়ে কতগুলো তাজা করবী ফুল পাড়লাম। কী লাল! এগুলো কি রক্তকরবী? তোমার চোখে রক্তকরবীর ইশারা। নন্দিন...

মোকে দ্যাও, মোকে দ্যাও করতে করতে বাচ্চাকাচ্চাগুলো আমাকে ঘিরে ধরল, ওদের কাবুর সারা মুখে শিকনি, কাবুর মাথায় দগদগে ঘা, একটা প্যাঁচড়াময় হাত আমার ফুলধরা হাতের দিকে এগুচ্ছে... আমি তাড়াতাড়ি ফেলে দিলাম ফুল। বোঁটার একবিন্দু মধুর জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

সারা বাগ্‌দি পাড়ায় মদ্দ পুরুষ একটাও নেই, সবাই খাটতে গেছে। হাঁপু বুড়ো কেউ কেউ হাঁপাচ্ছে। শাপলা, কচু এই সব রান্না করছে বউ-ঝিরা মালসায়, কাঠপাতা জ্বালানো ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে। একটা ঘরের সামনে তিন-চারটে ঘেয়ো কুকুর সমানে চ্যাচাচ্ছে। একটা খোঁড়া মানুষ লাঠি দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে কুকুরগুলোকে, ওরা ভয় পাচ্ছে না। বলরাম বলল—এটা ধনার বাড়ি, ল্যাংড়াটা ওর বাবা। ধনার বাবা বারান্দায় কলাপাতায় বিছানো কাটা নাড়িভুড়ির উপর বসা ভন্‌ভনানো মাছি সরিয়ে তার কাপড়ের অর্ধেকটা খুলে নাড়িভুঁড়িগুলোকে আড়াল করল। তার নিজের লজ্জা আর আড়ালে নেই।

আমাদের থেকে চেয়ে এনেছে ধনা ঐ নাইভুটুরী, একটা টাকাও চেয়ে রেখেছে মদ খাবে বলে। বলরাম বললে—আজ ওদেরও উৎসব।

সিগারেট কিনলাম। বলরাম বললে—দিশলাইয়ের কাঠি খরচ কর একটা লদাই। দোকানদার বললে—খেঁচাকল আছে এজ্ঞে, তারপর হাত দিয়ে ভাল করে মুছে একটা লাইটার দিল লদাই। সিগ্রেটের ধোঁয়া ওড়াতে এ জায়গাটাই নিরাপদ। লুকুতে হয় না।

বলরামই তাড়া দিল। আর নয়। আজ জমি মাপ হবে, প্রায় দাগগুলোই আমাদের—পা চালিয়ে।

বাগ্‌দি বউয়ের নীল শাড়ি তখনও রোদ্দুরে। আর বুনো শাপলার মতো পুকুরে ভেসে আছে বাগ্‌দি বউয়ের মুখ।

হঠাৎ একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করলাম বলরামকে। বললাম—আচ্ছা ধনা তো তোদের বিশ্বস্ত চাকর, ওকে শুধু নাড়িভুঁড়ি দিলি। —ওঃ, মায়া দেখাতে যেওনি। অজয় ডাক্তারের ছেলেটা বেশি মায়া দেখাতে গিয়ে নক্‌শাল হয়েছিল। পুলিশে মেরে ফেলেছিল ওকে, জানো?

আর তা ছাড়া ভাল জিনিস ওদের সয় না এক্কেবারে। একবার এক বাগ্‌দিরপোকে পাঁউরুটি দিয়েছিলাম খেতে, ও করলে কি খুঁটে কিছুটা পিম্‌ড়ের মত খেল। বাড়িতে নিয়ে গেল না পাছে ওর মা-ভাই-বোন ভাগ বসায়, তাই বাড়ি কাছে এক গাছের ফোকরে লুকিয়ে রাখল। রাত্তিরে খেতে-টেতে পায়নি, অন্যদিন হলে কেঁদে-কেটে ঘুমিয়ে পড়ত হয়তো, কিন্তু সেদিন তো তার মজুত খাদ্য ছিল, রাত্রে চুপি চুপি বের হল সে। সেই ফোকরে হাত ঢোকাতেই সাপের ছোবল। ব্যস। বাঁচল না, এদের দিয়েও জ্বালা।

চারিদিকে সবুজের সমারোহ। মাঝখানে বলরামের দালানবাড়ি জয়ধ্বজার মতো স্থির।

আমরা যখন ফিরলাম, তখন দেখি মাঠের এক জায়গায় একটা তেপায়া টেবিল দাঁড় করানো। একটা ম্যাপের মতো কিছু পাতা রয়েছে টেবিলের উপর। কত সব মোটা মোটা

বই। কানুনগো সাহেব আর তার কর্মচারীদের ঘিরে বারো-চোদ্দজন ভদ্দর লোক। সবার হাতেই কাগজপত্র। পৌঁছতেই বলরামের বাবা হেঁকে উঠলেন—এতক্ষণ ছিলি কোথা? অ্যাঁ! এদিকে সেটেলমেন্টের মাপ শুরু হয়ে গেল!

তিন নম্বর জমি কার? কানুনগো হাঁকলেন।

—এটা বলরামের ভাগে। ওকে দিয়ে দিয়েছি, এই যে ট্রান্সফার দলিল।

—চার নম্বর?

—এটা আমার।

—মায়ারানী দাসী কার নাম। ৫ নম্বর দাগের মায়ারানী দাসী?

—আজ্ঞে এটা আমার স্ত্রীর। ১০ আর ১৩ দাগও তার নামেই আছে। বলরামের বাবা কানুনগো সাহেবের দিকে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বললেন—১৭ দাগ পর্যন্ত চোখ বুজে করে যান স্যার, কোনো ঝামেলা নেই, সবই আমাদের জমি, ১৮ দাগে এসে তবে মিত্তিরদের জমি পড়বে।

তারপর বললেন—এখানে এতো লোকের ভিড় থাকলে কাজের অসুবিধা। এর পরে, বৃত্ত বাঁধা লোকগুলোকে হাত জোড় করে কিছু বলতেই তারা একে একে আমগাছতলায় পাতা শতরঞ্জির উপর বসল।

—কেষ্ট বাগ্দি কোথায়, ৮ নম্বর দাগে কেষ্ট বাগ্দির নামে তিন কাঠা।

—আজ্ঞে ওটা একুন আমার। কেষ্ট বেচে দিয়েছে—এই যে দলিল, বলরামের বাবা বললেন।

—আমার কেষ্টকেই দরকার। সিডিউল কাস্টদের অনেক জমিই বাঁধা নিয়ে বিক্রি দলিল করা হয়। আমি তাই সামনাসামনি ক্রেতা বিক্রেতা দুজনকেই প্রশ্ন করব। জানব, বিক্রেতা দলিলে লিখিত দাম পেয়েছে কিনা।

—কাগজের জোরে করবেন না?

—না কেষ্টকেই চাই। এ ব্যাপারে আমি একটু স্ট্রিক্‌ট্।

—আচ্ছা ডেকে পাঠাচ্ছি খ'নে।

বলরামের বাবা বলরামকে আড়ালে ডাকলেন। বলরামের হাতে দশটা টাকা দিলেন। বললেন—কী হ্যাপা দেকিচিস্। টাকাটা ধনাকে মদ খেতে দিবি। ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে ওকে নিয়ে আয় এখানে। ও যেন বলে ওর নাম কেষ্ট বাগ্দি ওর বাপের নাম মদন। ও যেন বলে গত বৈশাখ মাসে ও জমি বেচে বলদ কিনেছে। কানুনগো ব্যাটা যদি বলদ দেখতে চায়, তবে যেন বলে ঝিম্‌রোগে মারা গেছে। কাজ সেরে ফেল, দেখি কেমন বিষয়ী তুই? বলরাম বললে—আচ্ছা ফ্যাচাং বাঁধালে তো। তোমার পাঁঠা-মারা জলে গ্যালো। বলরামের বাবা বললে—কানুনগোটাকে যেমন ভেবেছিলাম তেমন নয়, টেঁটিয়া আছে।

হালকা বাতাস যেমন রাস্তার দুঃখী শালপাতা ওড়ায়, সেরকম করে কুঁজো ধনা এল; বলরামের বাবা দাঁতের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে পান-সুপুরির টুকুরো পরিষ্কার করতে লাগল।—এই যে স্যার কেষ্ট এসেছে।

—তুমিই কেষ্ট?

কলাপাতার মৃদু কাঁপনের মতো মাথা নড়ে।

—তুমি জমিটা বেচে দিয়েছ?...

ভাবলেশহীন মুখ।

—কত টাকা পেয়েছ?

কোনো উত্তর নেই। একটা কলাগাছ দাঁড়িয়ে আছে।

—নশো টাকা পাস্‌নি?—পাস্‌নি তুই?—বলরামের বাবা বলে।

মাথা নড়ে ওঠে। কানুনগো সাহেব কেষ্ট বাগ্‌দির নামটা কেটে দিয়ে সবুজ কালিতে লেখেন—তিনকড়ি সামন্ত।

একটু পরই ওরা টেবিল গুটিয়ে চলে যায়। যাবার সময় বলে যায় আগামী কাল সকাল থেকে আবার শুরু হবে মাপ। তখন বিকেল। তালগাছগুলোর পিছনে নুয়ে পড়েছে সূর্য। তেরচা আলোয় ধানগাছের রং অন্যরকম। জমিতে আট্‌কে থাকা জলে সূর্যের টুকরোগুলো। সাঁওতাল মজুরেরা তখন শ্রান্ত ঘর্মাক্ত। বাড়ি ফেরার তাড়ায় ওরা সন্ধ্যার অবগাহন করছে।

বলরামকে বললাম—দামোদর যাবি?

—কেন, ওখানে কী?

—না, কিছু নয়, এটা বর্ষাকাল তো, নদীটা হয়তো ভরে গেছে। দেখব ভরা নদীতে কী রকম শব্দ হয়।

—ধুর্‌র্যোঃ। খরচ। তাস পেটাব।

—এসে খেলবখন। চল না, কালই তো চলে যাব।

কাঁচা রাস্তা ধরে দামোদরে চললাম। আকাশের সাথে মিশেছে সবুজ। বলরাম বলল—ঐ ডানদিকের জমিগুলো আমাদের। বাঁদিকেরগুলো মিত্তিরদের। গত বারের চেয়ে এবারে ফলন বেশি হবে বলে মনে হয়—যদি মাজ্‌রা পোকা না ধরে। এবার মিত্তিরদের ডাউন দেব্বই।

খুব লাভ হবে?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম। ধুর্‌র্যোঃ, চাষে আর লাভ করতে হচ্ছে না। লেভি দাও, হ্যানা দাও, ত্যানা দাও, ঘুষ দাও, ট্যাকসো দাও।

একটা গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে হাটে চলেছে ধানের বস্তা। এক গাড়ি ধান। সামনে গাড়োয়ান। জমির আলে এক ন্যাড়া খেজুর গাছের তলায় বসে বসে এক বুড়ো খেতমজুর তাকিয়ে থাকে। কার ধান, কে চষে, কোথায় যায় সে জানে না, তাকিয়ে থাকে। হয়তো ঐ ধানগুলোই পুঁতেছিল সে—।

—পা চালা জলদি। আকাশ কালো হয়ে আসছে। বৃষ্টি নামবে। হাওয়ায় হাওয়ায় ধানখেত দুলিয়ে বৃষ্টি এল। এরকম বৃষ্টি দেখিনি কখনো কলকাতায়। বিশ্ব-চরাচর জড়ে শুধু জলের ফোঁটার খেলা। হাজার ঘোড়া টগবগাচ্ছে। দূরে আকাশ থেকে ঝরছে আকাশগঙ্গার ফেনা। আমার ঘুরে ঘুরে ভিজতে ইচ্ছে করছিল। বলরাম বলল, কাজ সারল। কালই বাবা ফলিডল স্প্রে করিয়েছে, গেল সব ধুয়ে। কী লোসকান বলদিকি?

বৃষ্টি বাচাঁতে কাছেই একটা কুঁড়ে ঘরের দিকে বলরামের পিছন পিছন ছুটলাম। জীর্ণ ঘর, দেয়াল হেলে গেছে। বলরাম বলল—কেষ্ট বাগ্‌দির ঘর।

বাইরে কী ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি! আমার ভিজতে ভিজতে গাইতে ইচ্ছে করছিল, মম চিত্তে-নিতি-নৃত্যে.....তা-তা-থৈ-থৈ....ঘরের চাল ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে বৃষ্টির সাথে কিছু আলো এসে ঘরে ঢুকছিল, সেই আলোয় দেখতে পেলাম একজন মেয়েমানুষ ঘরের কোণায় চুপ করে বসে আছে, ঘরে বৃষ্টি পড়ছে, কাদা কাদা, তারই মধ্যে সে দ্রুত ছুটে গিয়ে মেঝেতে কাদা-মাখা তার বাচ্চাকে বুকে চেপে ধরে লজ্জা বাঁচাল, বাইরে হৈ হৈ করে বৃষ্টি। জলের ফোঁটার খেলা। মম চিত্তে নিতি নৃত্যে....মেয়েটা একটা ধুতি পরে ছিল লুঙির মতো

করে। অন্য পাশের দেয়ালে ঘেঁষে একটা মানুষ শুয়ে আছে, তার বুক থেকে কোমর পর্যন্ত প্লাস্টার করা। কাপড় ছিল না। বোঝা গেল পুরুষের কাপড়টা কোমরে জড়িয়ে রেখেছিল মেয়েলোকটা। আমাদের দেখতে পেয়ে একটা বস্তার টুকরো দিয়ে স্ত্রীলোকটা পুরুষের নিম্নাঙ্গ আচ্ছাদিত করার চেষ্টা করল।

বলরাম প্লাস্টার বাঁধা স্থবির লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল—কী কেষ্ট কেমন আছ এখন, ব্যথাটা কমেছে তো?

সেই লোকটা তার ডান হাতটাকে ক্রেনের মতো আস্তে আস্তে উপরে ওঠায়, কপালে ছোঁয়ায়। তারপর সেই হাত দিয়েই কপালে হাতুড়ির মতো বাড়ি মারতে থাকে। কেষ্টর বুকের সাদা প্লাস্টারের উপর জল পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। সমস্ত ঘরটাই কর্দমাক্ত। একটু পরে কেষ্ট বাগ্‌দি ঘড়ঘড়ে গলায় বলল—বাবু, বাবু গো, তোমাদের কাছে যে শালি জমিটো তিন শো টাকায় বাঁধা রেখেছিলাম, সেটো আর ছাড়াতে পারবক্‌নি গো বাবু। ওটার বাজার দর যা হয় হিসেব করে বাকি ট্যাকাটা মোকে দিয়ে দাও। তারপর তোমাদিগের নামে করে লাও জমিটো। আমি যন্তরনায় মরি। চারদিন কুনো খাবার জোটেনিগো।

সেই কখন সবুজ কালিতে কেষ্টর নাম কাটা গেছে—কেষ্ট জানেই না।

বলরাম বাইরে তাকিয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওর সারা গায়ে প্লাস্টার কেন? কী হয়েছিল?

—বলদ গুঁতিয়েছিল। আমরা খরচপাতি করে প্লাস্টার করিয়ে দিয়েছি।

—ওর নিজের বলদ?

—উঁহু, আমাদের জমি চষতে গিয়ে.....

বলরামের উৎসুক চোখ বাইরের মাঠে। বলরাম চিৎকার করে উঠল—গোবিন পুকুরটা ভেসে গেছে বোধহয়.....দু হাজার টাকার মাছ...বলরাম ছোটে। বৃষ্টি কমেছে অনেক। আমিও একটু দূরে। একটা পুকুরের একদিকের পাড় ভেসে গেছে। লেজের ঘাই দিয়ে মাছেরা সরসর করে বেরুচ্ছে। লাফাচ্ছে। শোল-মাগুর! কৈ মাছ কানে হেঁটে এগুচ্ছে ডাঙায়। বলরাম দৌড়ে গিয়ে কেষ্ট বাগ্‌দির ঘরে আসে। হাঁড়ি, মালসা যা পায় নিয়ে যায়। মাছে মাছে ভরে ওঠে পাত্র। কেষ্ট বাগ্‌দির ঘরে বাইরে কী উৎসব চলছে, কৈ মাগুর কিলবিলোচ্ছে। কাঁকড়া গুটিগুটি হাঁটছে পুকুর পাড়ে, কচুরপাতায় মুক্তোর মতো জল। কেষ্ট বাগ্‌দির বুকের প্লাস্টারের উপর টপটপাচ্ছে জলের ফোঁটারা। হাড্ডিসার বাচ্চাটা ভীষণ জোরে চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার থামে না। বাচ্চাটার চিৎকারে অস্থির হয়ে পুরষাঙ্গে চাপা দেয়া বস্তার টুকরোটা এক ঝট্‌কায় টেনে নিয়ে হাঁ চিৎকার শিশুর মুখে ঠেসে ধরে। তার মা বলছে—মর মর আবাগীর পো, দোম বন্ধ হয়ে মর।

বলরামের আরও পাত্র চাই। কেষ্টর ঘরে আর কিছু নেই। বলরামের নজরে পড়ে ঘরের কোণায় বাঁশের সাথে একটা হাঁড়ি ঝোলানো রয়েছে। বলরামের সারা গায়ে কাদা মাছের আঁশ, মাছেদের গায়ের ঘ্রাণ। ওর হাতে সময় কম। দেরি হলে মাছেরা হারিয়ে যাবে গভীর জমিতে। সে ছুটে এসে টান মেরে হাঁড়িটা নামায়।

ঠিক সেই সময় ডুবন্ত মানুষের চিৎকারের মতো তুমুল আর্তনাদ করে ওঠে কেষ্ট বাগ্‌দির বউ। কোলে তার সন্তানের অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে দুহাত বাড়িয়েছে কলসীটার দিকে। ধপ শব্দ করে ভুঁয়ে পড়ে গেছে তার সন্তান। কেষ্টর বউয়ের অবিন্যস্ত চুল, হাওয়ায় দুহাত কাপড় খসে যাচ্ছে দেহ থেকে—দোহাই আমার ওটা লিওনি গো বাবু, ওটা দেবনি।

—কী আছে কী ? কী আছে ওতে!—

—পোয়াটাক পচাই আছে বাবু। ছেলেটা খাওয়ার জন্য চিৎকার পাড়লে ওটা দে ভুলুই। আঙুলে চুষিয়ে ঘুম পাড়াই, ছেলের বাপেরেও ওটা দে ভুলুই বাবু।

রাত্রে জোর খাওয়া-দাওয়া। মাছের চার পদ! কিন্তু সুন্দর স্বাদ। তাজা প্রাণীর স্বাদ। সবার পাতের পাশে কাঁটার পাহাড় জমেছে। এখন দুধ। বাটিতে ভরা। দুধের বাটিতে কব্জি পর্যন্ত ডুবে রয়েছে আমার। বাইরে গোঙাচ্ছে ব্যাঙ।

বলরাম বললে বাবাকে—কেষ্ট আছে মজায়। বলছিল আরও কিছু টাকা পেলে ও জমিটা বেচবে আমাদের।

বলরামের বাবা হাসেন। তাঁর মুখের মধ্যে সরমাখানো ভাতের মণ্ড। এখনো টেঁটিয়া আছে দেখছি। এবার শিক্ষা হবে ওর।

বলরামের বাবার মুখে সরমাখানো ভাতের মণ্ড। নাড়ুগোপাল যশোদাকে কি এই ভাবেই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়েছিল?

আমার কব্জি পর্যন্ত দুধের বাটিতে ডোবানো। পাশে মাছের কাঁটার পাহাড়। আমার সামনে দাদার শ্বশুর, আমার আত্মীয়—যে কিনা দাদার বিয়েতে যৌতুক দিয়েছিল ফ্রিজ , তার আইসক্রিম আমি খাই, সোফা—তাতে বন্ধুদের আপ্যায়ন করি, রেডিওগ্রাম—তাতে গান হয়, টেপ রেকর্ডার তাতে আমার কবিতা আবৃত্তি করেছি—অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে....

আমার হাত দুধে, কব্জি পর্যন্ত। বাইরে ব্যাঙ। গলাজলে বাগ্‌দি বউ ; বনের শালুক।

সন্ন্যাসী বলেছিল রত্নাকরকে—দস্যু, তুমি নিরপরাধ মনুষ্যদিগকে এরূপ করিতেছ কেন! তুমি কি জান না, তুমি পাপ করিতেছ?

—পাপ যদি হয়, তবে সে পাপ আমার কেবল একাই হইবে কেন?

এইরূপে যে সম্পদ উপার্জিত হইতেছে তাহাতে আমার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ হইতেছে। সুতরাং তাঁহারাও পাপের ভাগী হইবেন।

—তুমি কি নিশ্চিত যে, উহারাও তোমার পাপ গ্রহণ করিবেন? তুমি উহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।

আমার বাবার মতোই রত্নাকরের বাবা খুবই ভদ্রলোক ছিলেন। তাই দস্যুবৃত্তির পাপের ভাগ নেননি উনি।

আমিও ভদ্রসন্তান।...সুতরাং...

দুধের ভিতরে আঙুল নড়ে, খেলা করে।

মধ্যাহ্ন, ১৯৭৮

অষ্টচরণ ষোলো হাঁটু

'মানসিংহ বাংলাদেশ জয় করে দিল্লি ফিরে যাচ্ছিলেন, পথে এই জায়গাটা পড়ল, আমরা এখানেই সেইথেকে রয়ে গেলাম।'

এই জায়গাটার নাম মাতঙ্গী। মাতঙ্গীর রাজবাড়িতে এখন ষোলোটা হ্যাজাক শোঁসাচ্ছে। নাটমন্দিরে লাল গালচে পাতা। মণ্ডপে অষ্টধাতুর দেড়ফুট সিংহবাহিনী দুর্গামূর্তি। বাতাসে মৃদু কেরোসিন গন্ধের সঙ্গে মিশেছে ভুড়ু, ইনটিমেট, জরদা, হুইস্কির মিশ্রগন্ধ। গালচের চারপাশে বসে আছে সিংহবংশের সবাই, টেপরেকর্ডারে লো ভলুমে অনুপ জালোটা চলছে। 'মহানন্দ সিংহ ছিলেন বলতে গেলে মানসিং-এর ডান হাত। বড় সেনাপতি, এই জায়গাটা কেন যে ভালো লাগল তাঁর, বল্লে—না ; দিল্লি ফিরব না। এখানেই তিনি জায়গীর নিয়ে রয়ে গেলেন।' এবার পান মুখে দিলেন সিংহবাড়ির বড় তরফের বড়কর্তা সূর্যনারায়ণ সিংহ—'আমরা টাঁরই বংশঢর।'

রক্তিম গালিচার উপর মহানন্দ সিংহের বংশধরেরা আছেন, বালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, যোধপুর পার্ক, জামসেদপুর, পাটনা, এমনকি ছোট তরফের মেজকর্তা জব্বলপুর থেকে তার মেয়ে পিংকিকে নিয়ে এসেছেন।

'এ শোর্ড ইজ লেইং ডাউন ডেয়ার, সী—সী—'

সূর্যনারায়ণের আঙুল রূপার বেদীর উপর শায়িত একটা তরবারির দিকে। রক্তজবা ঢাকা।

সূর্যনারায়ণ জিন্‌স্ ও পাঞ্জাবিপরা পিংকিসমেত অন্যান্য ইংরিজি-মিডিয়ামে পড়া নাতিনাতনীদের দিকে তাকিয়ে বললেন—দ্যাট শোর্ড ওয়াজ ইউজ্‌ড্ বাই হিজ হাইনেস মহানন্দ সিং। সেজন্য ঐ ছোরাটাকে আমরা সবাই ইয়ে করি। একটু পরেই দেখবে, কেমন ব্লাডশেডিং সিরেমনি হচ্চে।

সূর্যনারায়ণ সিংহ মাতঙ্গীতেই থাকেন। সিংহবাহিনীর নামে দেবোত্তর সম্পত্তি ছাড়াও বিভিন্ন শরিকের ভাগে যত জমি আছে তার মোট আয়তন বিশাল। সূর্যনারায়ণ ও অম্বুজনারায়ণ মাতঙ্গী ও পার্শ্ববর্তী ছয়-সাতটি গ্রামের ১০/১২ টি পুকুর, বাঁশঝাড় ধানজমি এই সাতমহলা বাড়ি সমেত ভোগ দখল করছেন। অন্যান্য শরিকরা, যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন কাজকর্মে বিভিন্ন জায়গায় আছেন, সম্পত্তির ব্যপারে তাঁদের অন্তর্নিহিত অসন্তোষ মাঝেমাঝেই প্রকাশ পায়। সূর্যনারায়ণের ইংরেজি সংলাপের সময় জব্বলপুরের অজিতনারায়ণ জামসেদপুরের বীরনারায়ণকে কনুই-খোঁচা মারল যেন।

মনীষা কলকাতা থেকে এসেছে এই দুর্গাপুজোয়। সেই ছোটবেলায় বাবার সাথে একবার এসেছিল। এবার জব্বলপুরের কাকু পিংকিকে নিয়ে কলকাতা এল। বলল—চল মানু, দেশে যাই। মনীষাদের তেমন সম্পত্তি নেই দেশে, বাবা বেঁচে থাকতেই কিছু বেচে দিয়েছিলেন। মা'র হিসেবে বসতবাড়ির ভাগ আর বিঘে আটদশ ধানীজমি আছে ; মায়ের ইচ্ছে ওটাও বেচে দেবে। হাতে পয়সাকড়ি নেই,...মনীষা আসতে চায়নি। হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়া

খুব মুশকিল। মনীষা এম বি বি এস পাশ করে হাউসস্টাফশিপ করছে। মনীষা না গেলে পিংকিও যাবে না। শেষকালে বলেকয়ে কয়েকদিনের জন্য এসেছে মনীষা। লাল গালচেতে বসা একজন টাকমাথা লোক বলল—এবার-একটু গান-বাজনা করলে হয় না? সূর্যনারায়ণ আঙুলের টুস্‌কি মারতেই একজন মুনিষ হারমনিয়াম নিয়ে এল। তারপর মুখের চর্বিত পানের ছিবড়ে ঠোঁটের কাছে এনে মানুষটাকে কি একটা ইশারা করল। মুনিষটা অবলীলায় ঠোঁটের সামনে হাত পেতে দিল। সূর্যনারায়ণ পানের ছিবড়ে ওর হাতে ফেলল। হারমনিয়াম বেজে উঠল। হ্যাজাক্ আলোয় লোকটার আঙুলের তিনটে পাথর ঝলকাচ্ছে, লোকটাকে চেনে না মনীষা, এরকম অনেককেই চেনে না। জব্বলপুরের কাকু অনেকের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন যদিও।

গান চলছে, লাল গালিচা থেকে দূরে দূরে থামের আড়ালে আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল মুনিষ-মাহিন্দার। 'নিঝুম সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখিরা' থেকে 'বেড়াল বলে মাছ ছোঁব না' অব্দি দশখানা। ঢাকুরিয়ার কেয়া বৌদি 'ওই আসনতলের মাটির 'পরে' গাইল। দশবছর আগে বিয়ের বাসরে এই গানটাই গেয়েছিল কেয়াবৌদি, মনীষার মনে পড়ল। কলেজে কমার্স পড়ে অমিতাভ, কিশোরের গলা নকল করতে পারে—'মুশকিল হ্যায় তেরি' গাইল। তারপরেই 'মানব না বাধা, মানব না ক্ষতি, চোখে যুদ্ধের দৃঢ় সম্মতি' গাইল। কলেজে ইউনিয়ন করে। সমবেত শ্রোতা হাঁটুতে তাল দিল। সূর্যনারায়ণ বলল—বেশ জমাটি গান তো....।

ঠাকুরমশাই এসে গেছেন, পিছনে লাল কাপড়-পরা জবাফুলের মালা গলায় একটি রোগা লোক। সেই হল অভিরাম। অভিরাম এখন আরতির জন্য নারকোলের ছিবড়ে ধরাচ্ছে। ঠাকুরমশাই এখন পুজোয় বসেছেন। সুতরাং গানটান বন্ধ।

লালপেড়ে গরদ, বড়সড় সিঁদুরটিপ ও আলতামণ্ডিত খালি পায়ে সূর্যনারায়ণের পত্নীও বেশ জমাট মহিলা। তিনি বল্লেন—এই যে সব নাতিনাতনিরা, অনেক তো নেকাপড়া করেচো পাশ দিয়েচো, শোলোক্ ভাঙাও তো দেখি?

চোখ নাচিয়ে বললেন ঃ

এইমাত্র হঠাৎ একটা কথা শোনা গেল
ঐ মেয়েটার বগল থেকে ছেলে বেরিয়ে এল।

অনেকে হাসছে। পিংকি কিছু না বুঝে জিভ উল্টে ঠোঁটে লাগাচ্ছে। মনীষার একবার মজা করে মনে হল এনলার্জড্ আর্মজয়েন্ট্ লিম্ফ্‌গ্ল্যান্ডস্। সবাই ভাবছে। থামের আড়ালের রগড়-দেখাদের কে একজন বলে দিল—কলাগাছ। গিন্নিমা ওদিকে তাকিয়ে ধমকে উঠলেন—তোদের ফাজলামো করতে কে বলেছে, আরেকটা বলছি, কেউ বলে দিও না যেন ঃ

অষ্টচরণ ষোলোহাঁটু
মাছ ধরিতে যায় লাটু
শুকনো ভূমে পেতে জাল
মাছ ধরে সে চিরকাল।

লালগালচের কেউ পারছে না। ঠাক্‌মা বললেন—একদিন টাইম দিলুম, চিন্তা করো।

অভিরাম আরতি করছে, ঢাক বাজছে, ধোঁয়ার আচ্ছাদন, পিংকির ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ঝলকে উঠছে।

পিংকি শাটার টিপবার সময় হাতে অবেলায় খাওয়া মাংসের গন্ধ পায়। পাঁঠাবলি হয়েছিল। অভিরাম আজ খায়নি। ওর খেতে নেই। ও হল ধনাতকন্যি। ওর তিনদিন হবিষ্যি। নবমীর দিন শুধু ফলপ্রসাদ, দশমীর দিন সকালে ও বুক থেকে রক্ত দেবে। সেই রক্তে মহানন্দ সিংহের প্রাচীন তরবারি স্নান করবে।

অভিরাম নাচছে, ঝাঁকড়া চুল উড়ছে, পিংকির ফ্ল্যাশ্ ঝলক দিচ্ছে।

অভিরাম হঠাৎ পড়ে যায়। ধূপদানি ছিটকে গেছে হাত থেকে। জ্বলন্ত আগুন ছিত্তিছান ।গালচের লোকজনও ছিত্তিছান হয়। ঢাক থেমে গেছে। অভিরামের জ্ঞান নেই। মনীষা নাড়ি দ্যাখে। বলে—সকাল থেকে উপোস, তাই না? ক'টা বাতাসা-টাতাসা দাও শিগ্‌গির। হাইপোগ্লাইসিমিয়া। কিছু খায়নি তো, সুগার লেভেল নেমে গেছে।

'বাতাসা দেব কি, ও না আজ একাহারী!' রাঙাঠাক্‌মার আপত্তি। মনীষা বলে, 'তাহলে বাঁচবে না ও।'

দুটো প্রসাদী বাতাসা গুঁড়ো করে মুখে দিয়ে একটু জল দিতেই, কী আশ্চর্য, উঠে বসে অভিরাম। ন'পিসি বলে, পেসাদী বাতাসার মাহাত্তো দ্যাখো! আজ সকাল থেকেই ঢাক বাজছে। পাথরবসানো উঠোনের সামনে শুকনো হাড়িকাঠে এখন গরদপরা এয়ো রমণীর মত রোদ। রূপোর বেদীসমেত পূর্বপুরুষের তরবারি হাড়িকাঠের কাছে রাখা হয়েছে। একটা বিশাল ছাতা ধরে রাখা হয়েছে তরবারির উপর—রক্তদান হবে। দু'জন মুনিষ বড় একধামা রসকদম্ব ধরাধরি করে সিংহবাহিনীর সামনে রেখে দিল—মিষ্টিমুখ হবে। পুরোহিত অভিরামের মাথায় হাত রেখে মন্ত্র পড়ল। কপালে সিঁদুর, মাথায় জবাফুল। বেজে উঠল তুমুল ঢাক, কাঁসরঘণ্টা। অভিরাম আসছে, ও মাথা ঘুরিয়ে চারপাশ দ্যাখে। থামের পিছনে অভিরাম ওর বৌ-ছেলে-মেয়েকে দেখতে পায়। অভিরাম জানে না, পিংকির জাপানী ক্যামেরায় ফুজিকালার ঘুরছে এখন।

মনীষা রাঙাপিসিকে আস্তে আস্তে বলে, 'ঐ লোকটার শরীরটা খুব খারাপ, জানো, এসব বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।' পিসিমা বলেন, মায়ের কৃপায় ওর কিচ্ছু হবে না। দেখিস্, কালই ও মাটি কোপাবে। একী আমরা? ওরা বহুপুরুষ ধরে এভাবেই রক্ত দিয়ে আসছে।

জব্বলপুরের কাকুকেও বলে মনীষা, 'অভিরামকে বেশ অ্যানিমিক লাগছে পরে কিছু হয়ে গেলে কী হবে?' প্রচণ্ড ঢাকের শব্দর মধ্যে জব্বলপুরের কাকু মনীষার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'আরে, আমরা তো কালই কেটে পড়ছি।' অভিরাম তরবারিটা প্রণাম করল।

জয় জয় মা সিংহবাহিনী দুর্গতিনাশিনীকি
জয় জয় মহানন্দ সিংহকি
জয় জয় মাতঙ্গীর সিংহবংশকি।

অভিরামের ছেলে থামের আড়াল থেকে শুধু একা একা বলল—জয় জয়, অভিরাম বাগ্‌দীকি।

মনীষা এবার সূর্যনারায়ণের কাছে গিয়ে বলল, 'জাস্ট কয়েক ড্রপ হলেই ওকে ছেড়ে দিও। ও কিন্তু অ্যানিমিক।'

'মায়ের ভাবনা মা-ই ভাবছেন। মা কি আর বেশি নেবেন!'

অভিরাম কি একটা লতাপাতাবাটা কচুপাতায় মুড়ে এনেছে। পাশে রাখল। হাড়িকাঠের সামনে বসল। তরবারি খাপ থেকে টেনে নিয়েই নিজের বুকে পোঁচ দিতে লাগল। রক্তে

মাখামাখি হল মহানন্দ সিংহের তরবারি।

জয়, মহানন্দ সিংহকি..............

অভিরাম বুকের একফোঁটা রক্তে হাড়িকাঠের মাঝখানে ফোঁটা দিল। ঢাক বাজে, ঢাকীরা নাচে, আশ্বিনের রোদ নাচে, আহা নাচে নাচে।

অভিরামকে পদ্মপাতায় ফলার দেয়া হয়েছে এবার। অভিরাম পাতা গুটিয়ে নেয়, মৃদুকণ্ঠে বলে, 'বাড়ি গিয়ে খাব।'

অভিরামের ছেলেটা ওর বাবার কাছে চলে আসে।

অভিরাম ছেলের কাঁধে হাত রেখে স্মিত হাসে, ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ি যায়। পুরোহিত আম্রপল্লবে কাটোয়া থেকে আনা গঙ্গোদক সিঞ্চিত করে শান্তিজল ছেটায়—ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি!

মনীষা ওর বাবার সঙ্গে সেই ছোটবেলায় যেবার এসেছিল, বাবা ওকে চিনিয়ে দিয়েছিল আমলকি গাছ, আমলকি গাছের ঝিরঝিরি ছায়া, কার্নিসে বসা একজোড়া হলুদ পাখির নাম ইষ্টিকুটুম, বাঁশবনের কিশোর বাঁশের মসৃণ শরীরে হাত বুলিয়েছিল, ভোরবেলার গন্ধমদির শেফালিতলা মনে পড়ে।

একজন রোগা মতন বুড়ো লোককে মনে পড়ে, পুজোর ক'দিন পিছনের বারান্দায় জবাফুলের মালা পরে খালি গায়ে বসে থাকত, সে ছিল অভিরামের বাবা। যখন মানুষের গোল ভিড়ের ভিতর বুড়োটা ছিল, ঢাকঢোল বাজছিল, তখন মনীষার বাবা মনীষাকে নিয়ে খিড়কির পুকুরে চলে গিয়েছিল। শাপলা ফুলে ভর্তি ছিল সে-পুকুর। ফড়িং-এর ঝাঁক শাপলা বনে উড়ছিল, ঘুরছিল, এমন সময় দূর থেকে ভেসে এসেছিল—'মহানন্দ সিংহ কি.... মনীষার বাবা বলেছিল—ঐ রক্তদান হচ্ছে।

আজ, বিজয়াদশমীর রাত্রে অন্দরমহলের দাওয়ায় সবাই বসে আছে। মালপোয়া-সমেত মণ্ডা-মেঠাইয়ের রেকাবি সবার হাতে। মালপোয়ায় ক্ষীর পড়েছে কি পড়েনি এই আলোচনার মধ্যে হঠাৎ মনীষা প্রশ্নটা ছুঁড়ল।

'আচ্ছা, অভিরামরা কতপুরুষ ধরে এভাবে রক্ত দিয়ে আসছে?'

'মহানন্দ সিংহ থেকে আমি হলাম গিয়ে—আঠেরো পুরুষ, তা ওরা একটু কম বাঁচে, পঞ্চানন্দ বাগ্‌দী থেকে অভিরাম পর্যন্ত তা হবে ধরো ২৪/২৫ পুরুষ...।'

'আচ্ছা অভিরামরা যদি রক্তদান বন্ধ করে দেয়?'

'এ আবার কী ধরনের অলুক্ষুণে কথা!' রাঙাপিসি বললেন, 'মায়ের আদেশ আছে না?'

অম্বুজনারায়ণ গম্ভীরভাবে বললেন, 'এই পুজো শুধু আমাদের সিংহ বংশের নয়, এ গাঁয়ের সবার। এই যে বাগ্‌দী জাতি, জল চলে না, ওদের পক্ষে এটা কম গৌরবের? মহানন্দসিংহের তরবারি স্পর্শ করতে পারছে, এজন্য বাগ্‌দীদের সমাজে অভিরামরা আলাদা সম্মান পায়, পাঁচজনে ওদের কথা শোনে, ওরা হল ধনাতকন্যি, ওদের সমাজে অভিরাম ছাড়া কোন কাজ হয় না।'

'আচ্ছা, এ নিয়ম চালু হল কেন?'

সূর্যনারায়ণের কপাল কুঞ্চিত—'কিছুই জানো না যে! আমার লেখা একটা বই আছে, তোমার বাবাকেও পাঠিয়েছিলাম, পড়োনি নিশ্চয়ই।' সূর্যনারায়ণ এরপর একটা হলদেটে হওয়া পুরোন চটি বই দিল। 'মাতঙ্গীর সিংহ বংশ, সূর্যনারায়ণ সিংহ, আই. এ. কর্তৃক

অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত।

ঐ বইটার এক জায়গায় পেয়ে গেল মনীষা
রাজ্য জুড়িয়া যবে লাগিলা মড়ক
মানুষ যাইছে সবে শমন ভবন—
যত্রতত্র। হইতেছে রুধির বমন,
রাজ্য হইতে লাগিল শ্মশান, সবে জোড় করি
হাত, সিংহবাহিনীরে কয়, কোন
অভিশাপ হেতু হইছে এমন!
কহ কহ কৃপা করি ইহার কারণ।
রাজা ভীমনারায়ণ সিংহ ছিলেন শয়ানে
সিংহবাহিনী দেবী আসিয়া স্বপনে
দেন দরশন তিনি রাজার নিকটে।
(আহা, কী শান্তি!) মণিমুক্তা ঝলসায় দেবীর মুকুটে।
দেবী কন—আমার ভোগের মাংস—যেজন—
আমার পূজার আগেই চুরি করে করেছে ভক্ষণ
সে পাপিষ্ঠ নিজের বুকের রুধিরের সাথে
যদি পূজে মহানন্দের তরবারী দশমী প্রভাতে
বংশ বংশানুক্রমে—একান্ন পুরুষ—
জানিও, তবেই হবে সব পাপক্ষয়।
পঞ্চানন্দ বাগ্‌দী ছিল লেঠেল সর্দার,
সে আসিয়া নিবেদিল ছেলেটা আমার
পাপিষ্ঠ, সেই করিয়াছে চুরি—
বলির পাঁঠাটির ছাল ছাড়াইবার কালে।

মনীষা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বংশের বড় ছেলেকেই তো রক্ত দিতে হয়, যদি কারুর ছেলেই না হয়!'

'তবে আমরা আবার বিয়ে দিই।'

'যদি নিঃসন্তান হয়!'

'মায়ের আশীর্বাদে হয় না।'

পরদিন সকালে একে ওকে জিজ্ঞাসা করে অভিরামের ঘরে গেল মনীষা। অভিরামের বৌ আর ছেলে মাটি খুঁড়ে একটা কচু তুলছিল। মনীষা অভিরামের ছেলের পিঠে হাত দিল। জিজ্ঞাসা করল—'বাবা কোথায়?'

'ঘরে শুয়ে জিরেন করছে। ডেকে দুব?'

'না না, আমিই যাচ্ছি।'

মনীষা শুনে ফেলল, নিচুস্বরে ছেলেটা মাকে বলছে, 'এটা হল সেই দিদিমণিটা গো মা, ডাগ্‌দার, কলকাতা থাকে, কি লরম লাগল যখন পিঠে হাত দিল।'

মনীষাকে দেখেই অভিরাম হুড়মুড় করে উঠে বসল। পরনের গামছা ঠিক করল।

'আম্‌নি?'

'তোমায় দেখতে এসেছি। কেমন আছ?'

চোখের পাতা টেনে পরীক্ষা করে মনীষা। ঠোঁট কামড়ায়।

'দুধ টুধ খাও?'

'হেঃ'

'তবে ডুমুর, কাঁচকলা এইসবই খেয়ো। একটু বেশি করে। কলকাতা হলে কিছু ওষুধ টষুধ দিয়ে দিতে পারতাম।'

অভিরামের বউ আর ছেলেটা কেমন অবাক হয়।

ঘরে দুটো ঝুড়ি, একটা মাচা, আর দড়িতে ঝুলছে নোংরা কাপড়, ন্যাকড়া। বাইরে খঞ্জনার ডাক। অভিরাম শুয়ে আছে, বুকে ন্যাকড়ার পট্টি, কয়েকটা কালো দাগ দেখা যাচ্ছে।

'ঐ দাগগুলো সব রক্তদানের চিহ্ন, তাই না!—'

মাথা নাড়ে অভিরাম।

'ক'টা দাগ আছে?'

'এটা নিয়ে চোদ্দ, বাবার আটতিরিশ হইছিল, আমি বাপের বুকের ট্যাঁড়া গুণে ছোটকালে এক দুই শিকিছি।'

'এখন তোমরা অভিরামকে কাজ করতে দিও না ক'দিন।'

'হেঃ'

'তোমার নাম কী?' ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করে মনীষা।

'আমার নাম শ্রীপবনকুমার বাগ্‌দী—'

'পবনকুমার মানে জানো!'

'না'

'নিজের নামের মানে জানো না! বাঃ!'

ছেলেটা মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, 'সেদিন আম্‌নিও তো শোলোক ভাঙাতে পারেন নি।'

'কি শ্লোক!'

'সেই যে,

অষ্টচরণ ষোল হাঁটু
মাছ ধরিতে গেল লাটু
শুকনো ভূমে পেতে জাল
মাছ ধরে সে চিরকাল।'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কীরে ওটা, তুই জানিস্?'

পবন আঙুল দেখাল—'ঘরের কোণায় মাকড়সার জাল। জালে পোকামাকড় পড়েছে, মাকড়সাটা বসে আছে। মহারাজ।

'অষ্টচরণ ষোলোহাঁটু।'

'স্কুলে যাস্?'

'পাঁউরুটি দিলে যাই।'

'কোন ক্লাসে যাস।'

'কেলাস থিরি।'

'কচুটা খাবি যে, গলা কুটকুট করবে না!'

'ওটা তো মানকচু, দু-টাকা কিলো, ওটা খাব ক্যানে? বেচে দুব। আমরা গেঁড়ি কচু খাই, ৮০ পয়সা কিলো।

'তোর দাদা আছে?'

'ঐ একটিইছেলো আমার' অভিরাম বলে। 'দুটো মেয়া ছিল, বে দেয়েছি।'

'তাহলে তোমার পরে তো ওকেই দশমীর দিন—...।'

'হ্যাঁ।'

'খারাপ লাগে না?'

'কী করব দিদিমণি?'

'অন্য জায়গায় চলে যাও না কেন!'

'ছিঃ, সেকথা বলতে নাই।'

'জমিটমি আছে তোমার?'

'আম্‌নাদিদের দেবোত্তর জমির সাতবিঘা চষি। মায়ের ভোগে অদ্দেক দি, অদ্দেক খাই।'

'বর্গা রেকর্ড করেছ?'

'বাবু বলল, ওসব করিসনি।'

'পঞ্চায়েত কী বলছে!'

'বলছে, তুই হলিগে বাবুদের চামচা। ফুড়ফরাক পাবি না।'

মনীষা ফিরে আসে। বাঁ হাতে চটি, মনীষার পিছন পিছন পবন। পবনের কালো পিঠে হাত দেয় মনীষা, পবন শামুক মাংসের মত কুঁকড়ে যেতে চায়, মনীষা মৃদু চাপ দেয়, বলে—কলকাতা যাবি?

পবন প্রথমে মনীষার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারে না। যখন তাকায়, মনীষা দ্যাখে, পবনের চোখে জল।

'নিচ্চয় যাবো, লিবেন?'

সেই মুহূর্তে মনীষা ভেবেছিল, ওকে সঙ্গে করে কলকাতা নিয়ে যাবে, স্কুলে পড়াবে, মাকে বলবে...

...হয়না, তা হয় না, সবাই জেনে যাবে, জেনে গেলে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে এখানে। ও কি তখন টিভির রজনীর মত কোমরে হাত দিয়ে বলতে পারবে যে, এ আমার আশ্রিত, নাও দেখি এখান থেকে? আমি চাই না তোমাদের সম্পত্তি।

মনীষা আবার ফিরে যায় অভিরামের ঘরে। পবনের কিশলয় বইয়ের পিছনের পাতায় ওর ঠিকানাটা লিখে রেখে যায়। বলে যায়—'দরকার হলে চিঠি লিখিস্।'

ট্রেনে আসবার সময় জব্বলপুরের কাকুকে মনীষা বলতে চেয়েছিল—এই যে প্রতিবছর একজন রক্ত দিচ্ছে, ২০০ সি. সি. বা ২৫০ সি. সি. রক্ত বড় কথা নয়, এর চেয়ে বেশি রক্ত নানা কারণে ক্ষয় হয়। তবে কথা হচ্ছে —এই স্পেস্-শাট্‌ল, ইলেকট্রনিক্স্-এর যুগে এই জিনিস চলতে দেয়া ঠিক নয়, এটা সিংহবংশের ডিসক্রেডিট্। জব্বলপুরের কাকু বলেছিল—দিস্ ইজ ইনডিয়া, উই রেসপেকট হার রিলিজিয়াস্ ট্রাডিশন। পিংকি ঝালমুড়ির

ঠোঙা হাতে দিতে কথাটা চাপা পড়েছিল, কিন্তু মনীষা সিংহের ঠোঁট অনেকক্ষণ দাঁতে চাপা ছিল। কলকাতায় ফিরে মাকে অভিরামের কথা বলেছিল। মা বলেছিল—এ আবার নতুন গপ্পো কী! মনীষা বলেছিল, অভিরামকে দেখে মনে হয় যেন বেশিদিন বাঁচবে না, ওর ছেলে পবন, বাচ্চা ছেলে। ওকে নিয়ে আসা যায় না?

—দশমীর দিনে তাহলে কী হবে? মনীষার মা খুব সহজেই বলেছিল।

মনীষার এক বান্ধবীর প্রেমিক খবর কাগজে কাজ করে, তাকে এইসব কথা বলল মনীষা। ভদ্রলোকের অনেক সোর্স, পবনের যদি কিছু...। সেই সাংবাদিক বলেছিল—প্লীজ মনীষা, আমাকে ঐ ঘটনাগুলোর কয়েকটা ছবি আনিয়ে দাও না, কী ইনটারেস্‌টিং ফীচার হবে, প্লীজ!

মনীষার এক মাসতুতো দাদা এন্‌থ্রোপলজির ডক্‌রেট। সে এইসব শুনে মনীষাকে বলেছিল আগামী বছর মাতঙ্গী গ্রামে নিয়ে যেতে। তাঁর বিশ্বাস—ঐ দেবী কোন প্রিমিটিভ মাদার গডেস। ওখানে নরবলি হত। হাঁড়িকাঠে রক্তের ফোঁটা দেয়া হল সেই সিম্বল।

মনীষার সেই মাসতুতো দাদার স্ত্রী, মানে বৌদি বলেছিল—প্লীজ মানু, ছেলেটাকে আনিয়ে দাও না, তোমার দাদাকে জানো তো, কি সব প্রজেক্ট নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, এদিকে সংসারে...একটা ছেলে ভীষণ দরকার। পিওর গ্রামের ছেলেরা খুব বিশ্বাসী হয়।

হস্‌পিটালে ডাঃ সেনগুপ্তর আণ্ডারে হাউসস্টাফ্‌শিপ করছিল মনীষা। মনীষা শুনেছিল, ঐ স্যারের সঙ্গে কিছু স্যোসাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের যোগাযোগ আছে। একদিন তাঁর কাছে পবনের কথা পেড়েছিল মনীষা। স্যার বলেছিলেন—পাঠিয়ে দিও, ব্যবস্থা করে দেব একটা।

একদিন সক্কালবেলা, বলা নেই, কওয়া নেই, পবন একটা বোঁচকা নিয়ে হাজির। মনীষা অবাক! পবনের নেড়া মাথা। হাতে কিশলয় বই, তাতে ঠিকানা লেখা...।

‘কীরে কী ব্যাপার?’

‘বাবা মরে গেছে। আমি পলায়ে এলাম।’

‘কবে মারা গেছে, মা কোথায়?’

‘এক মাস। মা গাঁয়ে আছে, খেটে খাবে। আমি পরে চুপিচুপি নিয়ে আসব।’ রাস্তায় সিঙ্গাড়া জিলিপি খাইয়ে সোজা ডাঃ সেনগুপ্তর বাড়ি নিয়ে যায় মনীষা।

‘স্যার, একটা ভাল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে...’

‘রেখে যাও, দেখি কী করা যায়।’

কিছুদিন পর মনীষাকে একটু আলাদা ডেকে স্যার বললেন—‘দারুণ ছেলেটা দিয়েছো, ভীষণ কাজের, ওকে অন্য কোথাও পাঠাই নি, বুঝলে? আমার কাছেই রেখে দিয়েছি, গাড়িটা মোছে, টুকটাক কাজ করে। খুব অনেস্ট। ছাতে কয়েকটা মুরগি রেখে দিয়েছি, তোমার পবনই দেখাশোনা করে। যখন জানলাম ও দুধও দুইতে পারে, গ্যারেজে পার্টিশন করে একটা জার্সি গরুও কিনে দিলাম ওকে। খাটি দুধ খেয়ে ওর চেক্‌নাই এসে গেছে, দেখলে চিনতে পারবে না।’

স্যার খুব গম্ভীর আর রাসভারি লোক। এখন হাসছেন।

—তুমি পোস্টগ্রাজুয়েট করবে না? ডি. সি. এইচ-এ অ্যাপ্লাই করে দাও, আমি দেখব কী করতে পারি।

আরও একমাস পর পবনকে দ্যাখে মনীষা। ফ্রি বেডে। খাঁচা থেকে পালিয়ে গিয়ে একটা মুর্গী ছাতের কার্নিশে বসেছিল, পাকামি করে ধরতে গিয়ে বেচারা পড়ে গেছে—স্যার চুপি চুপি মনীষাকে বলেছেন।

এখন মনীষা পবনের পাশে বসে আছে। পবনের নাকে অক্সিজেনের নল। ওর বিধবা মা খেটে খাচ্ছে মাতঙ্গী গ্রামে। কপালে হাত রাখে মনীষা, পবন বুঝতে পারছে না ওর হাতের নরম। মনীষাই তো আসতে বলেছিল কলকাতা। চুলে মৃদু হাত বুলোয় মনীষা। মনীষা নিজের বুকের তুমুল লাবডুব টের পায়, স্যার আসেন।

'প্রেসার?'

'নাইনটি বাই ফিফ্‌টি।'

'পাল্‌স?'

'ফরটি।'

'রিফ্লেক্‌স?'

'বাঁদিকটা প্যারালিসিস্ হয়ে যাচ্ছে স্যার...।'

'ড্রিপের সঙ্গে স্টেরয়েডটা চালিয়ে দাও।'

'ওর মাকে খবর দিয়ে দেব, স্যার!'

মনীষা ডুকরে ওঠে।

'খুব ক্যাওস্ হবে। পরে দ্যাখা যাবে—' খুব আস্তে আস্তে বলে চলে যান ডাঃ সেনগুপ্ত।

মনীষা নিজের গায়ে চিমটি কাটে। আবার চিমটি কাটে। ওর হৃদপিণ্ড ঢাকের মত বাজছে, একটু নসিয়া মতন লাগে।

মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে মনীষা। পাল্‌স নেয়।

ফোঁটা ফোঁটা নুনজল ঢুকছে পবনের শরীরে। ফোঁটা ফোঁটা। বিছানার পাশে খাটের সঙ্গে ঝুলছে বেড নম্বর আর অবজারভেশন রিপোর্ট।

পবন তুই বেড নম্বর হয়েই থাকিস না পবন, তুই সিক্সটিন বি হয়ে থাকসি না, প্লীজ! তুই তোর ক্রমশ নিঃসাড় হওয়া বাঁ-পায়ে লাথি মেরে দে অবজারভেশন রিপোর্টে, তুই ওঠ, তুই উঠে যা, তুই আমাকে বাঁচা।

পবনের শরীরে নুনজল ঢোকে, নুনজল, ফোঁটা ফোঁটা।

পবনের মাকে জানানো দরকার, নিশ্চয়ই জানানো দরকার—মনীষা ভাবে। একটা টেলিগ্রাম। পবনের মা, তোমার পবন সিরিয়াস। কাম শার্প। গ্রাম মাতঙ্গী, জেলা বাঁকুড়া। কিন্তু পবনের মায়ের নাম? কী নাম মনীষা জানে না। মনীষা মাতঙ্গী গ্রামের সূর্যনারায়ণের নাম জানে, অম্বুজনারায়ণের নাম জানে, পবনের মায়ের সঙ্গে কথাও বলেছে, অথচ—।

মনীষার হাতে চিবুক। মনীষা বসে থাকে।

অনুষ্টুপ, ১৯৮৩

রক্ত

—নাম?

—লেখেন—অমিতাভ বচ্চন।

—বয়স?

—লেখেন না যা খুশি।

—জণ্ডিস ফণ্ডিস ভিডি আছে?

—না ছ্যার?

এবার একটা স্লিপ পেল লোকটা। যিনি স্লিপটা লিখে দিলেন, তিনি আস্তে আস্তে বললেন—বচ্চনের যায়গায় বাগ্‌চী করে দিয়েছি। মিনিট দশেক আগেই অন্য একটা অমিতাভ বচ্চন এয়েছেল।

লোকটা লুঙ্গিটা একটু ঢিলে করে শুয়ে পড়ল। হাতটা ছড়িয়ে দিল। ছাত থেকে নেমে আসা লম্বা ডাঁটির ফ্যানের ডগায় কিচির-কিচির, ওষুধের গন্ধ, হাতের মধ্যে সূঁচ ঢুকে গেল। লাইলন শাড়ি আর পাইলট পেন, উত্তমের পকেটে সুচিত্রা সেন, এই বাক্য দুটো জপ করতে থাকে, আটবারের মাথায় চোখ খোলে, ঘাড় কাত করে দেখে নেয় আজকের মেনু,—দুধ, কলা, পাঁউরুটি, আর লাড্ডু। ধুস্ আজও ডিম নেই'! মোট বারোবার জপ করতেই ওর শরীর থেকে ২৫০ সি. সি. বস্তু টানা হয়ে যায়। তারপর প্রথমে লুঙ্গির গিঁট বাঁধে, তারপরেই ডান হাতটা কিছু একটা ধরবে বলে মোক্ষম এগিয়ে যায়, এবং দুধের গেলাসটি ধরে।

স্লিপটার তলায় একটা ডট্‌পেনের আঁকিবুকি পড়ল। সই। সিলিপ পোয়াতি হলো। লোকটা অমনি ওটা নিয়ে গিয়ে একটা ঘুলঘুলির ভিতর বাড়িয়ে ধরল।

ঘুলঘুলির ভিতর থেকে একটা শব্দ এল—অমিতাভ বাগ্‌চী, মুখটা দেখি?

লোকটা নীচু হয়ে ঘুলঘুলি বরাবর মুখটা রাখে।

ঘুলঘুলি বাবু বলেন—ওঃ তুই, পাঁচু?

চার পাঁচ দিন আগে এসেছিলি না?—সেদিন নাম ছিল কিশোরকুমার। তার ক'দিন আগে বিনাদ খান্না নামে পয়সা নিয়ে গেলি...।

পাঁচুর হাতটা কিন্তু সাপের ফণার মত ঘুলঘুলির গর্তের পাশে স্থির। টাকা ক'টা ওখানে রাখতেই ছোবল মারল হাতটা।

—ছ্যার?

—বল।

ইবার একটু বেশি কেটে নিলেন যে?

এক লোক সাত নামে পয়সা নিচ্ছিস যে?

পাঁচু নিশ্চুপ।

—শোন পাঁচু। একটু দাঁড়া। কথা আছে।

বাবু বাইরে আসেন।

—এত যে রক্ত দিচ্ছিস্, তোর মাথা ঘোরায় না! দুব্‌লা লাগে না?

—সে-এট্টু পেটে পড়লি, আর ঘুমুলি সব বরাব্বর হয়ি যায়।

—আজ বিকেল নাগাদ আসিস। এইখানে আসবি। তোর একটা মহা উপকার করে দেব।

পাঁচু বাইরে বেরিয়েই দেখল জবা ঢুকছে। পাঁচু দাঁত বার করে হাসল। জবা বলল—ক্যালাসনি। পাঁচু বলল—কলা খাবা? জবা বলল—তুই খা। পাঁচু বলল—কী নাম রাখিচো আজ। জবা বলল—তুই বলে দেনা। পাঁচু বলল—হেমা মালিনী। জবা বলল—মরণ দশা।

জবা ভিতরে গেল, পাঁচু সামনের সিঁড়িতে বসে রইল। বিড়ি ধরালো। দেখতে লাগল চলমান রক্তের ট্যাংকি। ঐ ফর্সা বৌটা, বডিটা থালুস্ থালুস্ করছে। ডেরহাজার ট্যাকার রক্ত আছে লিচ্চয়, জবার বডিতে কত রক্ত আছে?...

বছর দুয়েক আগে লাইন রেখে বিড়ি কিনতে যাবার সময় যাকে বলে গিয়েছিল, সে-ই জবা। জবা ঠিক পাঁচুর আগে ছিল লাইনে।

পাঁচু ফেরার সময় দেখল, বৌবাজারের মোড়ের কাছে রাস্তার ধারে রোয়াকে শুয়ে আছে জবা। হিন্‌চে-কলমি-বেচা মেয়েছেলেরা জলের ঝাপোট মারছে। আহা রে ভদ্রঘরের মেয়েছেলেটা, অভাবের দোষে শরীলের রক্ত বেচতি এয়েচে, শরীলে সহ্যনি, কল্‌জের জোরনি, নেতিয়ে পড়িচে....

জবা চোখ চেয়ে দেখল পাঁচুকে।

বলল—এট্টু ঘরে পৌঁছে করে দেবেন?

পাঁচু জবার সঙ্গে মুচিপাড়া থানার কাছাকাছি একটা গলির মুখ পর্যন্ত গিয়েছিল। জবা বলেছিল—এই গলির মধ্যেই আমার বাড়ি। এবার একাই চলে যেতে পারব।

পাঁচু বলেছিল—আমনার বাড়িটা একবার চোখে দ্যাখা দেকি যাই!

জবা বলেছিল—বাড়ি দেখতে হবে না। তুমি যাও ভাই, যাও।

পাঁচু এরপর খুব আস্তে, যেন পাব্লিক না শোনে, যেন জবাও না শোনে, বলেছিল—টা-টা বাই বাই আবার ঝ্যানো দ্যাকা পাই....

বৌবাজার থেকে মুচিপাড়া, এই স্বল্প দূরত্বের পথে এক ভদ্দরলোকের ঘরের মেয়ের পাশে পাশে চলতে গিয়ে জানতে পেরেছিল—মেয়েটার নাম জবা। দাদার সোম্‌সারে থাকে। দুপুরবেলা বৌদির সঙ্গে বসে ঠোঙা বানায়। তাতে যা হয়, সব পয়সা বৌদি নেয়।

আরও জেনেছিল, পরের বারে। জবা বেধবা। দুই বাচ্চার মা। বাচ্চা দুটোর এডা সেডা, ল্যাবেনচুস্ সিলেট পেন্‌সিল, বেলুনবাঁশি, সাবানসোডা কোথায় পাবে পয়সা?

পাঁচু সিঁড়িতে ঠায় বসে। জবা ফিরে আসে। পাঁচু তখনো ওর খাবারটা খায়নি।

—লাও, তুমি খেয়ে লাও। রক্ত দেছো।

—তা তোর খাবার আমি খাব ক্যানো?

—খুশি হয়ে দিচ্ছি, খেয়ে লাও। রক্ত দেছো, তোমার কলজে লরম, খাও—

—দূর পাগ্‌লা, তোর হাতেরটা খাব আমি! তুই হেগে ছোঁচাস না।

—খাবানা তবে, ভাল মনে দিতি চেয়িছিলাম কিন্তু। ঝাক্‌গে যাক্। আজ কী রেঁধিচো?

—তা তোকে বলব ক্যানো?—

—কতদিন গেরস্তবাড়ির খাবার খাই না, মাছেরমুড়ো দে মানকচুর তরকারি....তাতে অবশ্য খরচ অনেক। একদিন ঢেঁকিশাক ভাজা খাওয়াবা?

—ঢেঁকি শাক? খাবি? আজই হয়েছে, নারকেলকোরা দিয়ে।

—কাঁচানংকা?

—হ্যাঁ।

—চল তবে যাই।

—না, তুই এখানে বোস্ থাক্। ঠিক এইখেনে। চুপ্ মেরে বোস্ থাক। আমি বাড়ি থেকে নিয়ে আসছি।

পাঁচু ফুটপাতের উপর বসে থাকে।

আহা, কত মায়া বলদিনি ওর শরীলে, শরীলে মায়া থাক্‌লি কল্‌জে ঢিলে হয়, লরোম হয়। তাইতে রক্ত দিলি পরে মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে। আমার বাবা ওসব মায়া দয়া নি। কার তরে মায়া করবো?

যেখেনেই যাই, বলে—যা পাগোল—ভাগ।

জবার কচি দুটো রাস্তা দে যাচ্ছে।

দেখেই চিনতে পারল পাঁচু। কিছুদিন আগে ওদের মায়ের সঙ্গে দেখিছিল পাঁচু। বাঃ বেশ। বরোনোকের ছাবাল পানা দেখতি! বিনুনিতে সিলিকের ফুল এঁটিছে। রক্ত ব্যাচা ফুল গো। মাত্তি অংগের রক্ত কন্যার মাথায় ফুল হয়ে ঝুলতিছে।

পাঁচু হাসে। বলে—অ কচি, ইস্কুল যাচ্ছো?

—না, বাড়ি যাচ্ছি। ইস্কুল স্টাইক্।

—তোমরা জবার ছাবাল না? হাত বাড়ায় পাঁচু, ছোটটা ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে। রাস্তার লোক একটা থাবড়া ওঠালো পাঁচুর দিকে। বাচ্চাদের পিছে লাগা?—যা, ভাগ...

পাঁচু তো ভাগ্‌বে না, এখানেই বসে থাকবে। জবা ঢেঁকিশাকভাজা আনবে। নারকেলকোরা কাঁচানংকা দে ভাজা।

পাঁচু বসে থাকে।

একটু পরে একটা ইটের টুকরো খুঁজে নেয়। ফুটপাথের চৌকো ছকগুলো গুনতে থাকে। এক লাইনে এককুড়ি চৌকো আছে। বাঃ!

আপনা দিল
পন্দে মারো ঢিল
পন্দে হোলো ঘা
ডাক্তার বাড়ি যা
ডাক্তার বাড়ি যাব
পয়সা কোথায় পাব
বেলাড বেংকে যাব
তবে যেতে পারব।

পুরো গানটা একবার গেয়ে একটা চৌকায় দাগ মারে। মোট চার কুড়িবার গাইবে। এর মধ্যে যদি জবা আসে তো আসবে, না আসে তো ভেগে যাবে পাঁচু।

দুই কুড়ি আঠারো বারের মাথায় জবা এলো। একটা ঠোঙার মধ্যে পেলাসটিকের

প্যাকিট্। তাতে ভাত। অন্য প্যাকিটে শাকভাজা। নংকা ভাজা—প্যাঁজ দে মাখা আলুসেদ্ধ।

পাঁচুর মুখে লাজুক হাসি। প্যাকেটের গায়ে নাক লাগিয়ে শ্বাস টানল। বলল—বৌ থাকলি এমন রকমারি গেরস্ত খাবার পাওয়া যায়। জবা ওর চোখের দিকে চেয়ে বলল—মরণ দশা! তারপর ছোট থলেটার মধ্যে হাত দিয়ে আর একটা ছোট্ট প্যাকেট বার করল তেলাপিয়া মাছের ঝাল। পাঁচু এবার এমন লজ্জা পেল, যেন বৌটা ছেঁড়া গামছাপরা ভাসুরঠাকুর দেখে ফেলেছে। মাথা নিচু করে, নখ কাম্‌ড়ে একসা কাণ্ড।

প্যাকেটগুলোতে পাঁচুর দুহাত ভরে যায়, বলে—ঘরে গিয়ে আরাম করে খাব। জবা ফিরে যায়। পাঁচু সঙ্গ ছাড়ে না। পাঁচু বলে—তোমার কচি দুটো ঝ্যানো চাঁদের কণা। একটু থামে—তারপর বলে—একটা কথা তোমার কাছ যে আর নিকেশ করতি পারলাম না। এই রক্তব্যাচা লাইনির হদিশ পেলে কন্‌থে?

—তা তোর এসব জেনে কী হবে?

—তবে আর একটা কথার নিকেশ লিচ্ছি জবাব দেবা কিন্তু। গত শুক্কুরবারে বৌবাজারের মোড়ে একটা লোকের সঙ্গে তোমারে দ্যাক্‌লাম, সেনিমা হলটার দিকে যাচ্ছিলে, তারপর সেনিমায় ঢুকে গেলে, তোমার লোকটা কে?

—খুব ইয়ে হয়েছিস্ দেখছি। যা....এখন যা তো....।

পাঁচু ফিরে যায়। যাবার সময় দুবার পিছু চায়। জবা তাকায় না। পাঁচু ওর ডেরায় ফেরে।

পাঁচুর ডেরা মানে পার্কসার্কাস বাজারের কাছে আইনুলের মাংসের দোকান। মাংসের দোকানের পিছনে আইনুলের পাঁঠা-খাসি থাকে। পাঁচু ছাগল-নাদি পরিষ্কার করে। পাঁচু ছাগলনাদিগুলো দেখে রোজই আশ্চর্য হয়। প্রত্যেকটা নাদি কী রকম সমান সমান। ভগমানের কী লীলা! এক রকম রং। পালিশ করা। ওদের কি পেট গরম হয় না? পাঁচু রোজ দুগুলি ছাগলনাদি জল দিয়ে গিলে খায়। বিম্‌লাক্ষেপী বলেছিল—এতে নাকি পেট ভাল থাকে। ছাগলকাটা রক্ত ড্রেনের মুখটায় জমে থাকে। চারছয় খাবলা তুলে একটা মালসায় তুলে রাখে। পাঁচু এবার জল-ঝ্যাটা দিয়ে দোকানঘরটা পরিষ্কার করে। মাংসের ছাটমাট্ যা আছে জড়ো করে মালসায় তুলে রাখে। জলিল একটু পরেই এসে এসব নিয়ে যাবে।

গু-নাদি পোস্কার করা আর রাত্রে পাহারা দেবার জন্য রোজ কিছুটা রক্তের চাক রেখে যায় আইনুল মিঞা, জলিল নিয়ে যায়। জলিল কাগজটাগজ কুড়োয়। ও ব্যাটাই সব একসঙ্গে সেদ্ধ করে। সেদ্ধ করে জলিল মালসা ভরে দিয়ে যায়। পাঁচু খায়। রান্না করা বড়ো হুজ্জোত। পাঁচুর এসব পোষায় না। আগুনের আঁচে শরীলের রক্ত শুকিয়ে যায়। রক্ত শুকোলে ওর চলবে? খাওয়ার পর পাঁচু দোকানের সামনের রোয়াকটায় শুয়ে থাকে। সর্বাঙ্গে মাছি ভ্যানর ভ্যানর করে। মশার চেয়ে মাছি অনেক ভাল। মাছি রক্ত খেতে পারে না। মাছিরা পার্কে বসে গপ্পো করে। তাতে পাঁচুর কি! পাঁচুর বিশ্রাম চাই। নিয়মমত বিশ্রাম। তবে না রক্ত হবে! নারকেল গাছে য্যামোন, ঐ শক্ত খোলসের মধ্যে ভিতরে ভিতরে জল তৈরি হয় চুপে চুপে, গাছটাও জানে না। মানুষের শরীলেও তেমনি। মানুষ জানে না। বিকেলে জলিলদের ওখানে গিয়ে একটু গাঁজা খায় পাঁচু। তারপর গোবরা বা পার্কসার্কাসের কবরখানার ভিতরের দিকে চলে যায়।

গাছের গা ফুঁড়ে নরম আর কচি পাতা বেরিয়ে আসে, কচি পাতার নরম গায়ে লাগায়,

চোখে লাগায়, কখনো পেয়ারা বা আতা পেয়ে গেলে খুশি হয়, গাছদের ছায়ার ভিতরে ভিতরে হাঁটে। গাছেরা শুধুই বৃষ্টির জলে স্নান করে। অন্য জলে স্নান করে না তো! পাঁচুরও স্নান করতে ইচ্ছে করে না, শুধু রাতদুপুরে বৃষ্টি নেমেছে টের পেলে, পাঁচু আইনুলের ডেরা ছেড়ে মাঝে মাঝে রাস্তায় নেমে আসে, উলঙ্গ হয়। ভেজে। নারকেলের শক্ত খোলসের মধ্যে যেমন মিঠা জল। নারকোল গাছ বৃষ্টিতে একা একা ভেজে। রাত্রিবেলা হামিদের দোকানে দেড়টাকায় রুটিতরকারি পায়। পয়সা না থাকলে হামিদ বলে—দুটো গান শোনা, দুটো খিস্তি শোনা। তাহলে দুটো রুটি ফিরি পায় পাঁচু। আর যেদিন যেদিন ইনকাম হয় সেদিন পার্কশো হাউসের লাইনে দাঁড়িয়ে যায় পাঁচু। যা সিনেমা হয়, দেখে। মেয়েদের শরীর বলতে পাঁচুর যা জ্ঞান, তা ঐ নীতু সিং, জীনত আমনদের থেকেই এসেছে। রাস্তার ভিখিরি পাগলীদের কাছেও ততটা পায়নি।

আজ জলিলকে সব দিয়ে দিল পাঁচু। পাঁচু এ বেলা খাবে না। পাঁচু প্লাস্টিকের প্যাকেটগুলো বের করে। গেরস্থ ভদ্রলোকের মত জলের ছিটে দেয়। এবার বলে—কই গো, দিয়ে গেলে না? তারপর ভাত ঢালে। একপাশে শাকভাজা, আলুসেদ্ধ আর একপাশে মাছ। বসার খবর কাগজে লিরিল সাবানের বিজ্ঞাপনের দুফালা করা পাতিলেবুর ছবিটা ছিঁড়ে নিয়ে পাতের কোণায় রাখে। গেরস্থরা ভাতপাতে লেবু খায়। হাত ধোয়। মুখ কুলকুচি করে। কতদিন পরে মুখ কুলকুচি করে খাবার আগে। গেরস্থ মানুষের মত আসন পিঁড়ি হয়ে বসে। পাঁচআঙুল খেলা শুরু করে দেয়—ভাতের সঙ্গে, শাকভাজার সঙ্গে...।

সেই যে...জলের মধ্যে কিরকম কুঁচি কুঁচি শেওলা, তার পাশ দিয়ে মাঠ, মাঠের মধ্যে শোঁ-শোঁ হাওয়া, তার ভিতর দে সোজা রাস্তা, বলহরি—হরিবোল—মা চলেছেন, পাঁচু ল্যাংটাটা, পিছন পিছন ধায়, নাকে শিকনি, হাতে মাদুলি, শামুক খোলায় পা কেটে রক্ত পড়ে ভুঁয়ে...। সৎমায়ের সোম্সার। বাপ নি। আগের পক্ষের বড় ভাই কলকাতার এক গমকলে পাঁচুর জন্য কাজ ঠিক করল। দাদা ওকে নিয়ে এল কলকাতা। যেদিন কলকাতা আসে, সেদিন পিঁড়িতে বসে দুপুরের ভাত খেয়েছিল, ঢেঁকিশাক ছিল, কড়াই-এর ডাল ছিল; বিষ্টি ছিল সেদিন, উঠোনের কদম গাছটা গোল গোল কদম ফুলে ভরা ছিল...।

বেলাড ব্যাংকে যেতে হবে ফের, আজ বিশ্রামটা তেমন জুতের হল না পাঁচুর।

ঘুলঘুলির সামনে গিয়ে বলল—আমি পাঁচু। ওপার থেকে শব্দ এলো—চ চ চ—তোর জন্যই বসেছিলাম এতক্ষণ।

বাবু ওকে রাস্তায় নিয়ে এল। বলল—গায়ে কী গন্ধরে তোর! তোকে কী করে নিয়ে যাই বলতো...

—কোথায় লিয়ে যাবেন?

—এক যায়গায় নিয়ে যাব, সেখানে রক্ত দিলে অনেক টাকা পাবি। এখানে যা দাম তার ডবল।

একটা সাদা পরিষ্কার দোতলা বাড়ি, দেয়াল বেয়ে মাধবীলতা, যুঁইলতা। সিঁড়িতে লাল গাল্‌চে, খালিপায়ে পাঁচুর পায়ের তলায় নরম লাগে, আরাম লাগে। দোতলায় একজনের কাছে নিয়ে যায়।

বাবু বলে—এই যে, একটা 'ও' গ্রুপ এনেছি। ফাসক্লাস বোন ম্যারো ফাংসান। মাসে আটবার রক্ত দিচ্ছে, ফিট বডি। তবে একটু ছিটেল আছে, এই যা।

—নাম কী? বাবু জিজ্ঞাসা করে।

—লিখেন...লিখেন...

ঠিক নামটা বল। এখানে নাম ভাড়ানোর দরকার নেই, ব্লাডব্যাংকের বাবু বলে।

—তবে লিখেন পাঁচু।

—পাঁচু কী?

—লিখেন যা খুশি।

—বয়স?

—লিখেন যা খুশি।

—যা খুশি হয় নাকি! বয়সটা ঠিক করে বল।

—সেটা জানি না।

—স্বাধীনতার সময় কতটুকু ছিলে?—

—সব বছরই তো হয়, বোঁদে খেতে দেয়...

—চীনযুদ্ধের সময় কতবড় হয়েছিলে?

—এ্যাঁ?

—কোলকাতার কোন ঘটনা মনে আছে তোমার...

ঝ্যাকোন কলকাতা আলাম, গমকলে, তখন আমি ছোট, কচি, ত্যাকোন খুব বাজি পটকা, রাস্তার লাইটের অং সব লালি-লাল। সবাই বলতিছে? নতুন মন্ত্রী এয়িচেন, আর গরিব কেউ থাকবেনি, তখন আমি ছোট।

—ছোট মানে কি? গোঁপ উঠেছিল?

—না, না, আমি ত্যাকোন কচি, এইটুকুন, মা মরেছে...

বাবুরা হিসেব করে। বলে, ছাব্বিশ-সাতাশ হবে। অথচ অন্তত দশ বছর বেশি মনে হয়।

তাইতেই পাঁচু জানতে পারল ওর বয়স ছাব্বিশ।

সাদাবাড়ির বাবুর সাদা জামা গায়ে। পাঁচুকে বলল—'লাস্ট কবে দিয়েছে'?

—আজ সকালে।

—সাতদিন পরে এসো।

ব্ল্যাডব্যাংকের বাবু বলে—চারদিনেই...ও পারে, ও কামধেনু স্যার...

—না, সাতদিন পরেই এসো। সপ্তায় একবার রক্ত নেব। পঞ্চাশ টাকা পাবে।

প-ন-চ-াস? মেহেবুবা—মেহেবুবা, খগচর নগধর হতদশ বদন....

পাঁচু নিয়মিত সাদাবাড়িতে আসে। খাকি হাফপ্যান্ট আর খাকি জামা দিয়েছে ওরা। কলারের পিছনে সুতো দিয়ে লেখা আছে ওর রক্তের গ্রুপ।

পরিষ্কার জামা-প্যান্টে বসে থাকা পাঁচুর কেমন সুড়সুড় করে গা। পোষায়? আরও কয়েকজন বসে আছে এই ঘরে। পাঁচু হঠাৎ বলে—এই সাদাবাড়ির বাবুরা বড় ভাল লোক, ভগবান এদের ভাল করবে। কত ট্যাকা দেতিছে বল দিনি, লালবাড়ির বাবুরা বড় কিপ্টে...

অন্য একজন বলে—পাগলার কথা শোন—আমাদের পঞ্চাশ দিয়ে ওরা কতয় ব্যাচে জানিস?—তিনশো, চারশো।

তবে কি ঢেঁকিশাক আর রক্ত এক বস্তু? দেশগাঁয়ে ঢেঁকিশাক য্যামোন, কুড়িয়ে লাও, খাও, কোন দাম লাগে না, না হয়তো রাখাল বাগালকে চার-আনা পয়সা দাও এক এক বোঝা পেয়ে যাবে। এখানে সরু সরু লিকলিকে আঁটি আট আনা। আবার—শ্রীদুগ্‌গা

হোটেলে যাও, শাকভাজা এক টাকা পেলেট লেবে।

পাঁচু কে আছো, পাঁচু? 'ও' মাইনাস? পাঁচু দাঁড়ায়। একটা লোক পাঁচুর জামার কলার উল্টে দেখে নিয়ে পাশের ঘরে যায়। বাব্বাঃ ব্যাপারই আলাদা। তক্তপোষে তোষক পাতা, সাদা চাদরের উপরে শুতে বলছে—খগচর হতদশ বদন। হাত টানটান, ওষুধের গন্ধ, সাঁই সাঁই ফ্যান ঘুরছে, সুঁচ ফুটে গেল হাতে...লাইলন শাড়ি আর পাইলট পেন...

একটা লোক চেয়ারে বসে আছে। তার হাতে রক্তের বোতলটা দিয়ে দিল ওরা। পাঁচু দেখে নিজের রক্ত। রক্তের ফেনা।

লোকটা বোতলের দেয়ালে হাত দিয়ে বলে—গরম।

—আমরা রক্ত মজুতে বিশ্বাস করি না। এক্কেবারে টাটটা পাচ্ছেন। তাই দামটা একটু বেশি পড়ে।

পাঁচুর ডেরার কাছে খাটাল আছে একটা। বাবুরা ভোর থেকে বসে থাকে। সামনে দুইয়ে দুধ নেয়। গরম। বেশি টাকা লাগে।

সপ্তাহে একদিন করে এখন ওখানে যায় পাঁচু। ওর রক্তের গ্রুপ নাকি ভাল, ওর রক্ত নাকি সবার ফিট করে। জামা পরিষ্কার না হলে বাবুরা বকাঝকা করে। কোম্পানির সাবানে স্নান করে পাঁচু। জয়বাংলা জামা কিনেছে একটা, একটা পাজামা, আইনুলের দোকানের দড়িতে জামা-কাপড় ঝোলে, গামছা ঝোলে—সংসারটা ঝোলে।

জবার খোঁজে বেশ কয়েকদিন ও পাড়ায় যাবার পর একদিন ওকে পেয়ে গেল পাঁচু। জবা তখন ব্যাগভর্তি ঠোঙা নিয়ে বাজারে বেরিয়েছে।

—বাব্বাঃ কতদিন খুঁজতেছি...পাঁচু দাঁত বার করল। জবা পাঁচুর আপাদমস্তক দেখল। 'ব্যাপার কী?'

হেঁ-হেঁ, হেঁ, পাঁচু হাসে। বলে—একটা ভাল মহাজনের বাড়ি নে যাব তোমারে। পঞ্চাশ টাকা দেয়, তেনাদের সঙ্গে বলা-কওয়া সেরে রেখিচি। ওদের ওখেনে মেয়েছেলে নাই। তোমাকে নেবে। আমি ওখেনে রক্ত দি। এই দ্যাকো নতুন জামা, এই দ্যাকো পাজামা। যাবা ওখেনে? চল...

জবা আঙুলের কোণাটা ঠোঁটের কোণে লাগিয়ে একবার ঝল্‌কা তাকায় পাঁচুর দিকে। বলে—না, যাব না।

—যাবা না?—তোমার কথা বললাম যি?—

—রক্ত বেচব না।

—তবে ভাল কথা। পাঁচু গম্ভীর হয়।

—ও পাঁচু?

—কি?

—জিজ্ঞেস করিলি না—আর রক্ত বেচব না ক্যানে?

—তুমি তো বলবে—তোর দরকার কী?

হি-হি করে হাসল জবা। তারপর বলল—আমার বিয়ে হচ্ছে রে, এই বুড়ো বয়সে। আমার বৌদির একটা দাদা আছে, একেবারে পণ করেছে—আমাকে সে বিয়ে করবেই। তুই তো দেখেছিস ওকে।

—সেই যে, সিনেমাঘরে যার সঙ্গে তোমায় দেখেছিলাম, সেই বুড়োপানা লোকটা? পাঁচুর গলায় ঝাঁঝ।

—একটু বুড়ো দেখায়, মাথায় টাকের জন্য।

—অ।

—তোকে একদিন খাওয়াব।

—বিয়ার ভোজ দেবা?—

বিয়েতে ভোজ-টোজ হবে না। বৌদির খুব আপত্তি। তোকে এমনি খাওয়াব। আমার ইচ্ছে।

—মাছের মুড়ো দে মানকচু খাওয়াবা?

—ঠিকাছে, তাই খাওয়াব। কিন্তু কী করে খবর দেব তোকে?

—পার্ক সারকেস মার্কিটে গিয়ে আইনুলের মাংসের দোকান, বলবে পাঁচু কই? লোকে যদি বলে কোন পাঁচু নাটা পাঁচু না পাগলা...

—তখন বলবো পাগলা পাঁচু। ঠিক আছে, তুই যা, আমি এখন মুদি দোকানে ঠোঙা বেচব।

—আমি ব্যাগ ধরি তুমি ব্যাচো...

—কিচ্ছু দরকার নেই—তুই যা—

শিশুর মত থপাস্ থপাস্ পায়ে পাঁচু রাস্তা পার হয়। মিনিবাস ব্রেক কসে। ট্যাক্সি ড্রাইভার মা তোলে। পাঁচু ফিরেও তাকায় না।

এরপর তিনমাস কেটে গেছে।

পাঁচু এখন মাংসের দোকানের সামনের ফুটপাথে শুয়ে আছে। ঠোঁট, চোখের পাতায় মাছি বসছে। আজ সকালে দু'বার বমি হয়েছে। শরীরে যেন বশ নেই। জলিল খাবার জন্য ডেকেছে, যেতে ইচ্ছে নেই। আগামীকাল আবার রক্ত ব্যাচার ডেট। চোখ বুঁজে ঝিম মেরে পড়ে আছে পাঁচু। তন্দ্রার মধ্যে মধ্যে ও দ্যাখে—কীরকম সারিসারি কদমগাছ, ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজছে গাছগুলো। এক ন্যাংটো ছেলে লাফিয়ে লাফিয়ে গাছ থেকে কদমফুল ছিঁড়তেই বোঁটা বেয়ে রক্ত পড়ছে, কদমের রেণু খসে খসে পড়ছে। কদমফুলে ওষুধের গন্ধ। ও তবু সেই ছিন্ন কদমফুলগুলো নিয়ে ফাঁকা মাঠের গা চিরে ধূ-ধূ পায়ে চলার পথ দিয়ে ছুটে যায়, মিহি শ্যাওলা ঢাকা বিল। পিছনে মোটরের হর্ন, ন্যাংটো খোকাটা মা-মা করতে করতে ছোটে।

পাঁচুকে ধাক্কা মেরে ওঠায় একজন, 'আ বে পাঁচু, ওঠ। তোকে ঢুঁড়ছে....

১৪/১৫ বছরের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

—জবা পিসি পাঠিয়েছে। বাবা বলেছে আপনাকে এক্ষুণি যেতে হবে।

—ও, বুঝিচি। ভোজ খাওয়াবে। মাছের মুড়ো দে মানকচুর তরকারি। কথার দাম আছে দেকতিচি। কিন্তু আজকের দিনে মুশ্‌কিল, শরীরে ওয়াক্ ওয়াক্ ভাব মোটে রুচি নেই...

—পিসি হাসপাতালে, আপনাকে যেতে বলেছে, বলেছে আমার নাম করবি ঠিক চলে আসবে।

—হাসপাতালে কিসির কারণে?

—জানেন না? রক্ত বেচতো পিসি, বাড়িতে বলতো না। শরীরটা একেবারে শেষ করে দিয়েছে। এখন অনেক রক্ত লাগবে। হাসপাতালে বলে দিয়েছে রক্ত নেই। পিসি যেখানে রক্ত দিত, সেখানেও বাবা গেছিল। রক্ত নেই। কয়েকটা লোক বলেছিল রক্ত এনে দেবে,

অনেক টাকা দিতে হবে। বাবা কোথায় পাবে এত টাকা?—

পাঁচুর শরীরটা ঝম্‌ ঝম্‌ করে উঠল।

—তা তোমার পিসি পুনরায় রক্ত বেচত কিসের কারণে! —ওর বুড়ো ভাতার ভাত দেয় না বুঝি।

—পিসি তো বিধবা। আমাদের বাড়িতেই তো খায়।

—সে কথা হচ্ছে না। তোমার পিসির সেদিন বে হলনি?

—কই? না তো।

—তোমার মায়ের দাদার সঙ্গে বে হবার ঠিক ছিল যি!—

—মামার সঙ্গে তো হয়েছিল...তা পিসিতো...একটু থামে ছেলেটা। আপনি অতশত জানলেন কী করে?

জানব না! তোমার পিসি তো আমারে সব মনের কতা ঝেড়ে বলত। তা আমুও তোমার পিসিরে মনের কথা বলতাম।

ছেলেটা অবাক হবার মত পাঁচুর দিকে তাকায়।

পাঁচু বলে—তা শেষ পজ্যন্ত কি বে-টা হয়নি?

—পিসিতো মামাকে জুতোর বাড়ি মারল একদিন।

—ক্যানো?—

—তা অনেক কথা, পিসির...

ছেলেটা চুপ করে যায়। পাঁচুও কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে—এখন তার রক্তের দরকার পড়িচে, তাইত?—

—হ্যাঁ। আপনিও কি টাকা নেবেন?

—কি বললে? ট্যাকা?—বাঁ হাতটা দিয়ে গলার কাছটা ঘসে পাঁচু। ময়লা বের হয়। ফুঁ দেয়। ট্যাকা গায়ের ময়লা।

পাঁচু ঐ ছেলেটার পিছন পিছন হাসপাতালের যে বাড়িটায় ঢোকে, সেই বাড়িটার দেয়ালে একটা হাসি হাসি মুখ মেয়েছেলে আর তার দুটো কচির ছবি। একটা তেকোণা জায়গায় লাল রং। বারান্দায় দাঁড়ানো তিন-চারজন মানুষের জটলার সামনে ছেলেটা থামে।

খুঁজে পাওয়া গেছে। টাকা লাগবে না বলেছে বলেই ফুরফুরে নিঃশ্বাস ফ্যালে।

একজন লালচোখো ভুড়িওয়ালা বেঁটে লোক বলল—এই পাগলা না হয় এক বোতল ফিরি দিল। বাকি তো কিনতেই হচ্ছে আপনাদের।

গালের ভিতরে পান, বাইরে ছুলির দাগ, এক মাঝবয়েসী গিন্নী বলে—কিনতেই হচ্ছে মানেটা কী? কিনতে বাধ্য নাকি? তিনশো টাকা দর চাইলে কিনবটা কী করে?

লোকটা বলল—ডাক্তার বাবুতো আপনাদের সামনেই বলে গেলেন—বেলাড না দিলে আম্‌নাদের পেশেন্ট বাঁচবে না। আম্‌নাদের পেশেন্টের বহুৎ ঝামেলার গুরুপ্‌। অনেক খুঁজে জোগাড় করেছি, কাল তা-ও পাবেন না।

পাঁচু ভাবে—সবই মহাজনের হাতের কেরামতি। সকল বস্তু। লাইলন শাড়ি বল, পাইলট পেন বল। উত্তমকুমার বল, সুচিত্রা সেন বল। শালা পাঁঠাটা, ঘাস খায়, তরকারির খোসা খায়, যেইনা আইনুলের হাতে পড়ল, ওম্‌নি নাড়ী-ভুড়ি ছাল চামড়া সবকিছুর মূল্য হয়ে গেল। শরীলডার মধ্যি রক্তগুলান আছে, চুপচাপ আছে. দাম নি, ঝ্যাখনি মহাজনের হাতে পড়ল...

একটা প্রায় বুড়ো হয়ে যাওয়া চিম্‌সে লোক পাঁচুর কাঁধে হাত দিয়ে বলল— অ ভাই, তোমাদের সঙ্গে তো ব্লাডব্যাংকের লোকেদের চেনাজানা, একটু দ্যাখো, না, কমসম করে...

পাঁচু জবুথুবু হয়ে থাকে, কিছু বলে না।

এমন সময় একজন ছোকরা ডাক্তারবাবু আসে। বলে—কি, ব্লাড জোগাড় হয়েছে?—

চিম্‌সে লোকটা পাঁচুকে দেখায়।—ঐ যে, ও দেবে। ডাক্তারবাবু পাঁচুকে জিজ্ঞাসা করে?—কি গ্রুপ?—

—ও গুরুপ।

—রেগুলার রক্ত বেচো তুমি? কোথায় বেচো?

—সাদাবাড়ি। ঝুম্‌কোলতা দোতলায় উঠিছে। সেখেনে রক্তের মহাজন আছে।

ডাক্তারবাবুর চোখ পাঁচুর মুখের দিকে ছিল।

ক্রমশ কপাল কুঁচকে ওঠে। দৃষ্টিতে ফোকাস্‌বাতি জ্বলে ওঠে। চোখে টর্চবাতির আলো ফেলেন, চোখের পাতা টেনে কী যেন দেখলেন, নখ দেখলেন। জিভ। পেটের ডান দিকটা টেপেন।

পাঁচু বলে 'ব্যাথা লাগে'।

—বমি হয়?

—হয়।

—ক'দিন ধরে?

—৮/১০ দিন।

—লাস্ট কবে রক্ত বেচেছো?

—এক হপ্তা।

—সর্বনাশ করেছ। ওরা বলেনি কিছু?—

—পাঁচু ঘাড় নাড়ে।

—ছিঃ!

ডাক্তারবাবু বলে—ওর জন্ডিস হয়েছে। একদম রক্ত খারাপ হয়ে গেছে। ওর রক্ত চলবে না। ছুচ্‌ফুচ থেকে হয়ে গেছে বোধহয়। যা-তা ব্যাপার।

জবাইয়ের সময় ছাগলের যে শেষ আর্তনাদ, সেরকম কিছু পাঁচুর সর্বশরীর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। রক্ত খারাপ হয়ে গেছে পাঁচুর। ওর রক্তের আর কোন দাম নেই! ও তবে শেষ। শেষ। ও তবে কিছু নয়।

ওরা এখন পাঁচুর দিকে আর তাকায় না। সবাই অন্য কোথাও গেল। পাঁচু একা পানের পিক্‌ফেলা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

আস্তে আস্তে হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঢোকে পাঁচু। ও ওর ট্যাংকিতে কিছুটা পচা রক্ত বয়ে বেড়াচ্ছে।

ঐ সাদাবাড়িতে, যুঁইলতার গন্ধমাখা জানালার কাছের টেবিলটায় গেলে, ওর এই খাঁকি জামাপ্যান্টটাও কি খুলে রেখে দেবে? দিক।

হাসপাতালের ঘন্টা বাজে। রুগীদের প্রিয়জনরা একে একে ফিরে আসে। পাঁচু ওয়ার্ডের ভিতরে আস্তে আস্তে চলে যায়। দেয়ালের ধারে একটা সিটে জবাকে দেখতে পায় পাঁচু। জবা চোখ বুঁজে আছে। কমলালেবুর খোসা। শূন্য টুল।

পাঁচু দ্যাখে জবার গায়ের রং পাঁচুর ছোটবেলার মরা মায়ের থান কাপড়ের মত হারানো,

লাল কম্বলের বাইরে পড়ে থাকা সাদা হাতের নীল শিরাটা ধূ-ধূ মাঠের মাঝখানে ফুঁড়ে যাওয়া রাস্তাটার মত নিঝ্‌ঝুম। পাঁচুর হাত আস্তে আস্তে ঐদিকে এগিয়ে যায়। নীল শিরাটা ছোঁয়।

"তুই এ্যাতো রক্ত দিলি, তুই এক ফোঁটা রক্ত পালি না"—

জবা তাকায়। ওর চোখের কোণায় একফোঁটা জল এসে জমে। মুখটা তবু হাসি হাসি হয়। পাঁচুর হাতটা আস্তে আস্তে জবার হাতের মুঠোর মধ্যে চলে যায়। জবার ঠোঁটটা নড়ে ওঠে। পাঁচু যেন বোঝে—আমাকে বাঁচা, আমাকে বাঁচা।

পাঁচু বলে—তোর শরীলের রক্ত মহাজনরে দেছিস্। আর আমার রক্ত পচা...

এরপর জবা, জবার শরীরে যা শক্তি বাকি ছিল, তাই দিয়ে চেপে ধরে পাঁচুর হাত। বাঁচা, আমাকে বাঁচা...ছাত থেকে ঝোলানো পাখায় টের পায় হারানো মাঠের গোঁ-গোঁ হাওয়া, পাঁচুর শরীরে নীল শিরা বহে যায়, মাঠের বুক চিরে চলে যাওয়া রাস্তাটা ওকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরে।

কিরকম কান্না বের হয়ে আসে পাঁচুর পচা রক্তের শরীরটায়। পাঁচু চোখ বুজে থাকে। দাঁতে চাপে দাঁত, চোয়াল কঠিন হয়।

লাইলন শাড়ি আর পাইলট পেন....

অগ্রণী, ১৯৮৬

কাননে কুসুম কলি

জ্যামে যখন মিনিবাসটা আটকে পড়েছে, জানালা দিয়ে দেবাশিস দেখল ফুটপাতে অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা জাঁতি দিয়ে সুপুরি কুচোচ্ছে। খুশি হল।

দেবাশিস টেলিভিশনে চাকরি করে। শিশুশ্রমিকদের উপর একটা ডকুমেন্টারি করার কথা ভাবছিল বেশ কিছুদিন। এ ব্যাপারটাও লাগানো যেতে পারে। 'এর চেয়ে হাঁটলে আগে পৌঁছব' কন্ডাকটারকে এই কথা ছুঁড়ে দিয়ে নেমে গেল দেবাশিস।

ডানহাতে জাঁতি বাম হাতে সুপুরি কী দ্রুত চলছে দু'হাত। কালো বুটিজামার মেয়েটা বলল আজ আমি আইস্‌কিরিম, তুই? হলদেটে হওয়া, আসলে সাদা টেপ-জামার আরো ছোট মেয়েটা বলল মাংস, বলেই ও ফুটপাতে বসা রোগা লোকটার পেল্লায় অ্যালুমিনিয়ামের ডেক্‌চির দিকে তাকায়। সিগারেট কিনতে ও ফুটপাতে গেলে একটুর জন্য মাছিসমেত গু মাড়িয়ে ফেলতো। কাছেই ঐ মাংসওয়ালা। উবু হয়ে বসা দুটো লুঙ্গি পরা লোক যা খাচ্ছে, তা হল ছোট করে কাটা নাড়িভুরি। গন্ধে বুঝল পাশেই কোথাও চুল্লু বিক্রি হয়। কুচো সুপুরির স্তূপের সামনে বাচ্চারা কথা বলছে ঃ

—তোর ক'কেজিরে চিনু?

—এই ধামা হ'লে পাঁচ হবে।

—ইস্‌রে, আমার তিন চলছে। মাথাটায় উকুন খাজলাচ্ছে, চুলকোতে গেলে হাত বন্ধ। তোর উকুন না বেছে দিইচি সেদিন, চারটে চুলকানি পাওনা আছে, ওটা দিবি এখন?

—কাজের পরে সন্ধ্যাবেলায় দেব। তুই এখন ডিস্কো কাটনা, তাড়াতাড়ি হবে।

মেয়েটা বাম হাতের তালুতে দুটো করে সুপুরি এক সঙ্গে রাখে এবং জাঁতি দিয়ে এক সঙ্গে কাটতে কাটতে বলে ডিস্‌-কো-ডিস্‌-কো।

দেবাশিস মেয়েটাকে নাম জিজ্ঞাসা করে।

—হাসি।

—না-না, হেলেন। অন্য একটা ছেলে বলে। কথা বলার সময় নাচে, মালিক তাই হেলেন নাম দিয়েছে। দাঁত ফোকলা ছেলেটা হাসে।

—সারাদিনে কতটা কাটতে পার?

—আমি চার কিলো।

—আমি পাঁচ কিলো।

—আমি একদিন ছ'কিলো করেছি।

—কিলোতে কত করে মজুরি?

—আধা ফালা চার আনা, চৌকো আট আনা, ছক্কা একটাকা, ঝিরি ঝিরি দুটাকা।

—সারা দিনে কত রোজগার কর?—

—তিন টাকা—

—সাড়ে তিন।

—পয়া দিনে চারটাকার উপর।

দেবাশিস পয়া দিন ব্যাপারটা অনুমানে অনুধাবন করে।

যেদিন মাথায় উকুন কম থাকবে, কিম্বা যেদিন ঘন ঘন ঘাম মুছতে হবে না, কিম্বা যে দিন পায়ে ঝিম ধরবে না। পয়া দিন।

—কখন এসেছ আজ?

—আমি সাইরেনের আগে।

—আমি বাবুদের রেশন তুলি। যখন এলাম তখন কলের জল চলে গেছে।

—তোমাদের মা-বাবা কী করেন?

—আমার বাবা মরে গেছে। মা...

—ওর মা ভিকিরি। দাঁত ফোকলা বললে।

—তোমার মা-বাবা?

—আমার আসল মা চলে গেছে। বাবার নতুন বৌ আমায় প্যাদায়। আমি যা কামাই, খেয়েলি। রাস্তায় শুই।

দেবাশিসের তেমন কোন প্রেমিকা নেই। সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে একটা চায়ের দোকানে আড্ডা মারে। সেদিন ওখানে না গিয়ে মামাবাড়ি গেল। দুটো মামাতো বোন আছে। একজন বি.এ বিটি করে বিয়ের জন্য বসে আওছে, ছোটটা এম. এ. পড়ছে রবীন্দ্রভারতীতে। টি. ভি. তে চাকরি পাবার পর মামার বাড়িতে ওর গ্ল্যামার হয়েছে। এখন মামার বাড়ির সবাই ওকে ঘিরে বসে। দেবাশিস সংবাদ পাঠক অমুকের চরিত্রদোষ, বিখ্যাত প্রযোজক অমুকের পদোন্নতির গোপন রহস্য বা অমুকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর মনোমালিন্যের কারণ ইত্যাদি রকম টিভি-স্টারদের গোপন কথার গল্প বলে।

আজ মামাবাড়ি যেতেই—আরে এসো এসো দেবাশিসদা, বলেই উচ্ছ্বসিত ছোটবোন হাত ধরে ভিতরে নিয়ে তার দুই বান্ধবীর কাছে গিয়ে বলল—এই যে দেবাশিসদা, যার কথা বলি।

—টি. ভি.-তে?

মেয়ে দুটোর চোখে টুনি বাল্বের অস্তিত্ব টের পায় দেবাশিস। এই মওকায় বলে ফেলে—মামাতো বোনের দিকে চেয়ে—একটা যা প্রোগ্রাম প্ল্যান নিয়েছি না সুজাতা—টেরিফিক্। ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে লাইটার হাতে নিল।

চাইলড লেবারদের নিয়ে। —সিগারেট ঠোঁটে নাচল।

দেবাশিস অফিসে এই প্রোগ্রামটার ব্যাপারে প্রোপোসাল পাঠাল। প্ল্যানিংটা এই রকম।

চায়ের দোকানের বয়।

ট্রেনের শিশু হকার।

ট্রেনের মোটবওয়া কিশোর।

সুপুরিকাটা বাচ্চাগুলো।

হাওড়ার লেদারকাখানাগুলোর শিশুশ্রমিক।

শিশুশ্রম সম্পর্কে আইনের ব্যাখ্যা এবং ল-ইয়ারের সঙ্গে ইন্টারভিউ।

শিশুশ্রম সম্পর্কে একজন সমাজতাত্ত্বিকের সঙ্গে ইন্টারভিউ।

স্টেশন ডিরেকটার ডেকে পাঠালেন।

—কোন্ ল-ইয়ারকে ইন্টারভিউ করতে চাও?

—ঠিক করিনি, স্যার।

—ঠিকাছে। আমি একজনকে ফোন করে দিচ্ছি।—সোসিওলজিস্ট?

—ডাঃ বিনয় বসু।

—ওতো লেবেলড্ লোক। পাল্টাও।

—কাকে নেব স্যার?

সেটা তুমি দেখ। এমন কাউকে নিও না যে রুটটুট্ খুঁজবে। তাহলে টেলেকাস্ট করা যাবে না। আর একটা কথা, প্রোগ্রামে ওটা রাখোনি? হাউ গভ্মেন্ট ট্রাইস টু প্রিভেন্ট দিস্ প্রাক্টিস অফ্ ইউজিং চাইল্ড লেবারস্? লেবার কমিশনারের সঙ্গে একটা ইন্টারভিউ রাখ। রিভাইস্ ইওর প্ল্যান। ওকে?

গাড়িতে বসেই ক্যামেরা প্যান করানো হ'ল।

রাস্তা, লোকজন, যানবাহন, দোকানের সারি।

মিড্শট। একটা দোকান।

ক্লোজ মিড্শট। দোকান মালিকের বাস্ট। সামনে সুপুরির স্তূপ।

জুম ইন্। সুপুরির স্তূপ।

(একজন মালিক বলল—ক্যা হোতা হায় সার

—সুটিং হোতা হায়, সুটিং সিনেমাকা।

—কেয়া নাম সার সিনেমাকা?

—নসিব কলকাতা কি)

ক্লোজ্শট। সুপুরির স্তূপ।

ক্যামেরা আস্তে আসে বিভিন্ন সাইজের সুপুরি কুচির স্যাম্পল রাখা মাটির সরাগুলির উপর দিয়ে প্যান করে।

পরের শট-এ রাস্তায় বসা বাচ্চাগুলো সুপুরি কুচোচ্ছে।

প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ক্লোজশট্ নিল দেবাশিস। দেবাশিস পকেট থেকে একমুঠো টফি বের করে দেখাল, বলল, ছবি তোলা হয়ে গেলে সব্বাইকে দেবে। তারপর বলল যে যে পারো, ডিস্কো সুপুরি কাটো। সিনেমার ছবি উঠবে।

একটা ১৪/১৫ বছরের ছেলে বলল বুঝেছি, কাটিং সিনেমা উঠবে, আসল সিনেমার আগে হয়। দেবাশিস হাতের উপর এম্ফাসিস্ দেবার জন্য ক্যামেরা তাক করে।

ক্লোজশট্। বাচ্চাদের হাত, হাতের খেলা, সুপুরি ঝরে পড়ছে।

এক সঙ্গে দুটো করে সুপুরি, জাঁতিতে চাপ, শিরা ফুলে যাচ্ছে, হাতের শিরাগুলো টানটান, সুপুরি খসে পড়ছে।

আবার দুটো সুপুরি জাঁতিতে, আঙুলের আড়ালে। অন্য হাত কাঁপছে, চাপ, ছিটকে গেল জাঁতি, ছড়িয়ে গেল সুপুরি, নখসমেত আঙুলের একটু অংশ কুচোন সুপুরির পাশে পড়ে আছে। সুপুরির কুচি শুষে নিচ্ছে রক্ত। ক্যামেরা টালমাটাল।

মেয়েটার জামা রক্তময় হয়ে উঠেছে, কী ঘটনা বুঝতে মেয়েটার কয়েক সেকেন্ড সময়

লেগেছিল। এবার মেয়েটা তুমুল আর্তনাদ করে ওঠে । ছিন্ন ডানার মত ঝাপট মারে হাত, আর রক্ত ছিটোয়। কি সর্বনাশ হল সমবেত স্বরে এই আর্তনাদ , দেবাশিস পেছতে থাকে। ক্যায়া হো গিয়া রে?—মালিকরা নেমে আসে।

দেবাশিস ছুটে গিয়ে গাড়িতে ঢোকে, স্টার্ট, এখুনি। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দেয়, তীব্র বাজে ইলেক্‌ট্রিক হর্ন।

প্ল্যানিংটা একটু চেঞ্জ করল দেবাশিস। সুপুরির ব্যপারটা রাখল শেষের দিকে। জাঁতিতে আঙুল কেটে টুকুরো হয়ে পড়ে যাওয়াটা অদ্ভুত এসেছে। নাম রাখল 'এই সব শিশুগুলি।' টেলেকাস্ট হল। পরদিন অফিসে ঢুকতেই একজন সহকর্মী হাত বাড়িয়ে দিল।

—এ রিয়াল ডকুমেন্ট, মাইরি, এক্‌সিলেন্ট। দেবাশিস তার সবগুলি আঙুল সমেত করমর্দনের ঝাঁকুনি পেল, তখন থ্যাংকিউ উচ্চারণ বড় দুর্বল ও কাঁপা শোনাল।

সমাজসেবিকা গায়ত্রী দেবী শিশুমেলার তরফ থেকে স্টেশন ডিরেক্টারকে ফোন করলেন দুঃসাহসিক প্রোডাক্‌শনের জন্য। ওয়ার্লড লুথেরান ফোন করল।

দেবাশিসের কলিগ্‌রা অনেকেই বলল, রীলটা একবার দেবেনতো, পরে দেখে নেব। স্টেশন ডিরেক্টার ডেকে নিয়ে বললেন—এ গুড প্রডাক্‌শন। আই উইল সেন্ড ইট ফর ন্যাশানাল অ্যাওয়ার্ড।

চায়ের দোকানে বন্ধুদের আড্ডায় যেতেই ওরা 'এইযে এসেছে শালা, মার', বলে হাসল। শালা গোবিন্দ নিহাল্‌নি। কেমিস্ট কিন্তু ফিল্‌ম পত্রিকার সম্পাদক-বন্ধু বলল—মেয়েটার আঙুলখানা নিয়ে নিলি?

দেবাশিস বলল—না মাইরী, ওটা একটা অ্যাক্‌সিডেন্ট। হয়ে গেল। বড্ড গিল্‌টি লাগে নিজেকে।

—ক্যামেরাই কি মেয়েটার অ্যাটেনশন ডাইভার্ট করেছিল?

দেবাশিস বাসের টিকিট পাকাচ্ছিল।

একজন লেকচারার বন্ধু বলল, বাচ্চাগুলোর কাজটার মধ্যে তো রিস্‌ক্‌ ইন্‌ভল্‌ভড রয়েছে। হয়তো এমনিতেই হতে পারত, অ্যাকসিডেন্টালি ক্যামেরাটা সেখানে গিয়ে পড়েছিল। এর আগেও হয়তো এরকম ঘটে গেছে, তখন তো ক্যামেরা যায়নি।

এই ব্যাখ্যাটা দেবাশিসের সবচেয়ে ভাল লাগল। সিগারেট ধরাল।

ইঞ্জিনিয়ার অথচ ছোট গল্পকার বন্ধু বলল, আই এগ্রি। সেদিন না হলেও অন্যদিন হ'তে পারত। আসলে রেক্‌লেস প্রফিট ওরিয়েন্টেশনের আউটকাম এসব। একজন অ্যাডাল্টের ওয়ান ফোর্থ পেমেন্ট দিয়ে হাফ কাজ পাওয়া যাচ্ছে মানে হান্‌ড্রেড পার্সেন্টি মোর প্রফিট ইন রেসপেক্‌ট অফ লেবার পেমেন্ট।

বয় চা নিয়ে এল । গল্পকার ওকে দুটো টাকা দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে পাঠাল। কুইক্‌।

ফিল্ম পত্রিকার সম্পাদক বলল—এ-ও কিন্তু সিসুশ্রমিক দাদা। বয় সিগারেট এনে টেবিলে রাখল। ওর হাতের চামড়া কিছুটা কুঁচকে আছে।

কী হয়েছে রে এখানে?

—চায়ের জলে!

—কবে?

—পুজোর সময়।

—অথচ...

ওরা এ ওর চোখের দিকে তাকাল এবং আলোচনার মোড় ঘোরাল। বল দেবাশিস, তোর বোনের বান্ধবীর খবর কী?

দেবাশিস আজকাল বাসে উঠবার আগে জিজ্ঞেস করে নেয়—ভায়া এস. এন ব্যানার্জী?—কন্ডাকটার যাবে না বললেই ও নিশ্চিন্তে ওঠে। সুপুরির দোকানগুলোর সামনে দিয়ে বাসে যেতেও ভয় পায় ও।

খবরের কাগজে টিভির ঐ 'এইসব শিশুগুলি'র রেফারেন্স্ দিয়ে শিশুশ্রমিক আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে কয়েকটা চিঠি বেরিয়েছে। ফিচারও বের হল। এই ভাবে শুরু ঃ

কলকাতা কর্পোরেশন দেয় ট্রেড লাইসেন্স্ কি ট্রেড সিক্রেট আছে যাতে কর্পোরেশন ভবনের নাকের ডগায় সারবন্দী শিশুরা বিপজ্জনকভাবে সুপুরি কুচোচ্ছে?

কিছুদিন পর দিল্লি থেকে খবর এল জাজেরা বলেছেন দেবাশিসের 'এই সব শিশুরা' বেস্ট ডকুমেন্টারি। নগদ আড়াই হাজার টাকা অ্যাওয়ার্ড।

যে প্রডিউসারটি সর্বদা দেবাশিসের নিন্দা করে সে ডান কাঁধে মৃদু থাপ্পড় দিল। এ এস ডি, গতবার যিনি খুব খারাপ সি আর দিয়েছিল, বাম কাঁধে মৃদু থাপ্পর দিল।

যে সুন্দরী মহিলা লাইব্রেরিয়ান্টির সাথে বই ফেরত দেয়া নিয়ে বিশ্রী ঝগড়ার পর তিক্ত সম্পর্ক বহু চেষ্টাতেও দেবাশিস ভাল করতে পারেনি, সেই মহিলা সিঁড়িতে লাল আঁচলের বাতাস দিয়ে ন্যাপথলিন গন্ধের সাথে জানাল দারুণ খবর। এমনকি দেবাশিসের মোটা বেল্টের স্টিলের বগলসে একবার টোকা মারল। বলল লাইব্রেরিতে আসবেন, কফি খাওয়াব।

দেবাশিস হাফ্ সি.এল. নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। ফ্যান ছেড়ে ঘুমলো। মা বোন, কাউকে জানাল না অ্যাওয়ার্ডের কথাটা। সন্ধ্যায় ছাতে উঠলে, যখন বাতাস মাথার চুল ফালি ফালি করে ওড়াচ্ছিল, তখন দু-হাতে মাথার চুল চেপে ধরল, ঝাঁকাতে লাগল। সূর্য ডোবার পর আকাশের শেষ লাল রং ঐ মেয়েটার আঙুলের চোঁয়ানো রক্তের মত। ছাতের রেলিং-এর ধারে চলে আসে। গা গোলাচ্ছে। অফিসে গেলে ও যেন খাটালের পাশের পাঁচিল। সবাই ঘুঁটে মারছে—কনগ্র্যাচুলেশন, অ্যাওয়ার্ড, পুরস্কার। পরের দিন টেলিফোনে অসুস্থতার কথা জানাল অফিসে। সহকর্মীটি জিজ্ঞাসা করল—কী অসুখ—অ্যাওয়ার্ডের গ্যাস?

চায়ের দোকানের আড্ডায় বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে ঠিক করল অ্যাওয়ার্ডের পুরো টাকাটাই যার আঙুল কাটা গেছে, সেই মেয়েটাকে দিয়ে দেবে।

তিনমাস পরে অ্যাওয়ার্ডের টাকাটা এলে দেবাশিস ওর চার বন্ধুর দল নিয়ে এস. এন ব্যানার্জী রোডে এল। ফিল্ম পত্রিকার সম্পাদক বলল—ক্রিমিনোলজির সেই ট্রাডিশন—দ্যাখ—অপরাধী যাচ্ছে অকুস্থলে।—যাবেই। দেবাশিস বলল—ও দূর থেকে চিনিয়ে দেবে মেয়েটাকে, তারপর বাকি বন্ধুরা যা হয় করবে। মেয়েটার বাড়ি গিয়ে ওর অভিভাবকের হাতে তুলে দেবে টাকাটা। দেবাশিস পিক্চারে থাকবে না।

এই যে সুপুরির দোকানগুলো। কিন্তু কৈ? ফুটপাথের ধারের সারবন্দী বাচ্চারাতো নেই! কী ব্যাপার? আজ তাহলে ওরা আসেনি?

দেবাশিস পিক্চারে নেই তাই ওর এক বন্ধু এক দোকান মালিককে জিজ্ঞাসা করল—যেসব বাচ্চালোগ সুপারি চিপ্স্ করতা থা, কাঁহা গিয়া?

—কৈ নেহি হায় সার। আপনা মর্জিসে সব বিলকুলি মিশিন বৈঠা দিয়া সার।

আস্তে আস্তে ব্যাপারটা বুঝল ওরা। গভর্নমেন্ট থেকে চাপ দিয়ে ওদের সুপুরি কুচো করার মেশিন কিনিয়েছে সম্প্রতি। ওদের সরকারী অফিসার ভেবেছে। তাই লস্যি মাঙিয়েছে! বাচ্চাগুলোর খবর ওরা জানে না। যার আঙুল কেটে গিয়েছিল সেই মেয়েটার খবরও ওরা রাখে না।

ইন্‌জিনিয়ার অথচ ছোট গল্পকার বন্ধুটির প্রশ্নের উত্তরে মালিকরা জানালো বাচ্চা-কাচ্চাগুলোকে হাটিয়ে এখন অনেক ঝামেলা কমে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, মেশিনে লেবার খরচ কম। 'যো হুয়া সার আচ্ছাই হুয়া, সার আচ্ছাই হুয়া।'

ব্যাপারটা এখানেই শেষ। কিন্তু দেবাশিস কাউকে পুরো ব্যাপারটা বলতে গেলে আর একটু না বলে পারবে না।

কিছুদিন পরে 'শিল্পগঠনে ব্যাংক' এই নামে একটা ডকুমেন্টারি করতে গিয়ে ব্যাংকের সাহায্যে গড়ে ওঠা বেলেঘাটা অঞ্চলে একটা গ্রাইন্ডিং মেশিনের কারখানা প্রিকভারেজে গিয়ে দ্যাখে কারখানার মালিক ওর সহপাঠী ঘোতন। পরীক্ষায় ভাল টুকতে পারত আর গুলির টিপ্ ছিল খুব। যাক্ ঘোতন 'এইসব শিশুগুলি'-র ব্যাপার কিছু বলল না, বাঁচা গেল।

ঘোতন খুব খুশি হ'ল, মনের কথা বলল দেবাশিসকে। বলল, তুই আছিস ভাল মাইরী, টিভিতে কত মেয়ে ফেয়ে...।

ঘোতন কারখানার কথা বলল মন্ত্রীর চামচে থেকে ব্যাংক অফিসার পর্যন্ত কাকে কি ধান্ধা করতে হয়েছে, কাকে কত দিতে হয়েছে। এসব কাহিনীতো আর টিভিতে বলা যাবে না।

ঘোতন একদিন বিয়ার খাওয়াতে চাইল।

কতজনকেই তো খাওয়াতে হয়।...বিয়ে করিস নি! বাঃ চাস্‌তো নিয়ে যেতে পারি। বাঁধা আছে।...

ঘোতনের খুশি মুখ থেকে সুঘ্রাণ সিগারেট ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে ওড়ে। ভাল প্রফিট থাকছে। ডোমেস্টিক্ গ্রাইন্ডারের সাথে আর একটু ভারি ধরনের বিট্‌লনাট চিপিং মেশিন তৈরি করছি। একটা মেশিনেই বিভিন্ন সাইজের সুপুরি কাটা যায়। গভর্নমেন্টের লেবার ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্টের থ্রুতে সুপুরি-মার্চেন্টরা কিনছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল ফাইভ্ পার্সেন্ট দি। সাউথ ইন্ডিয়া থেকেও দুচারটে অর্ডার পেয়েছি। চ'না, কারখানা দেখবি। ষোলজন কাজ করে।

দেবাশিস কারখানায় গিয়ে দেখল পাঁচ-ছজন বাচ্চা ছেলে, কেউ ঘষছে লোহার পাত, কেউ দুহাতে চক্‌চকে ইস্পাতের ফলা টানটান করে ধরে রেখেছে ঘুরন্ত লোহার চাক্‌তির উপর। শান দিচ্ছে। তারাবাজির মত ঠিক্‌রোচ্ছে আগুন।

আমি আজ আইস্‌কিরিম্।

তুই?—

আমি ঘুগ্‌নি।

লোহার শব্দে, মেশিনের শব্দে ঐ বাচ্চাগুলোর কথাবার্তা শোনা যায় না।

দুটো বাচ্চা মেয়ে সরু তামার তার জড়াচ্ছে। আরমেচারে তাদের সরু-সরু আঙুলে।

আঙুলগুলো ঠিকই তো আছে আপাতত।

সত্তর দশক, ১৯৮৫

বিদ্যাসাগর! বিদ্যাসাগর

—আপনার বয়স?
—উনিশশো চল্লিশে জন্মেছি।
—চাকরিতে কবে ঢুকেছিলেন?
—যে বছর চীনের সঙ্গে যুদ্ধ হল।
—কী পোস্টে কাজ করছেন?
—ইউ. ডি. সি.। আমাকে বড়বাবু বলে।
—দেশ কোথায়?
—খণ্ডঘোষের কাছে, কেওটাগ্রাম।
—তা আপনি ঐ খোঁড়া মেয়েটাকে নিয়ে অন্ধকারে নদীর পাড়ে গেলেন কেন?

থানার বড়বাবুর চোখ টর্চলাইটের ফোকাস মেরে আছে। মেজবাবু, জমাদার, পিওন, সবাই ঘিরে আছে। বড়বাবু টেবিলের উপর রাখা পেপারওয়েটে হাত বুলোচ্ছেন, সেই হাতের দু-আঙুলে চাপা সিগারেট ছোট হয়ে এসেছে। দেয়ালে জেলার ম্যাপ। ম্যাপ-এ নীল রং-এ দামোদর নদী।

(আমি চাষীর ছেলে। জাতে মাহিষ্য। বংশে আমিই প্রথম ম্যাট্রিক পাশ করি। তাইতে আমার বাবা হরিসংকীর্তন বসিয়ে ছিলেন। বঙ্গীয় মাহিষ্য সম্প্রদায়ের সেক্রেটারি বর্ধমান সদর থেকে এসেছিলেন ঐ হরিসংকীর্তনে। যাবার সময় আমার পিঠে হাত রাখলেন, মাথায় হাত রাখলেন, তারপর একটা চিঠি লিখে আমার হাতে দিলেন। সেই চিঠি নিয়ে মেমারির এম.এল.এ-র কাছে যাই। তখনকার দিনে এম. এল. এ-রা আজকালকার মত ছিল না। অত ঘোরায়নি। চাকরিটা হয়ে গেল।)

—কী করেন? কোন্ ইউনিয়ন? ফেডারেশন না কো-অর্ডিনেশন?
—অ্যাঁ?
—কোন্ ইউনিয়ন করেন?
—ঐতো, মাধব যশ মাসে দুটাকা করে চাঁদা নেয়, ইউনিয়নের চাঁদা।
—কোন্ ইউনিয়ান সেটা, ফেডারেশন না কো-অর্ডিনেশন?
—সেটা তো ঠিক...মানে খোঁজ করিনি স্যার...।

(আমি সাতেও নেই। পাঁচেও নেই। অফিসে কোন পার্টি মিষ্টি খাবার টাকা দিতে চাইলে আমি নিজে কখনো নিই না, পিওন জগবন্ধুকে দেখিয়ে দিই। জগবন্ধু প্রতি হপ্তায় আমাকে যা দেয়, আমি তাতেই খুশি। আমার অত লোভ নেই। পালবাবু, জানাবাবুদের মত পিওনদের

সঙ্গে খিটিমিটি করি না। কাজের ব্যাপারে আমার কোন ইয়ে নেই। সাহেব যা করতে বলে করে দিই। তক্কো করি না।)

—আপনার অফিস থেকে দামোদরের পাড় কত দূর?

—দু-তিন কিলোমিটার হবে।

—কিসে গেলেন?

—রিক্‌শায়।

—বে-থা করেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বাচ্চাকাচ্চা?

—চারটি।

—পরিবার কোথায়?

—দেশে।

—চারটে বাচ্চা? বাচ্চাগুলো আপনার তো? হেঁ-হেঁ। তা আপনি খোঁড়া মেয়েটাকে নিয়ে কী ধান্ধায় ঐ অন্ধকারে দামোদরের ধারে গেলেন? ক'দিন হল জয়েন করেছে মেয়েটা?

—তা বছরটাক হবে।

(সাইকেল রিক্‌শাটা অফিসের সামনে গাছতলায় দাঁড়ালো। একটা রোগা মত মেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল—এটাই কি বি. ডি. ও অফিস? আমি বললুম—হ্যাঁ।

তারপরই মেয়েটা গাছটার দিক তাকিয়ে বলল—এটা বুঝি কৃষ্ণচূড়া গাছ? আমি বললুম তেঁতুল। তারপর একটা ছেলে মেয়েটাকে ধরে রিকশা থেকে নামালো। তখনই আমি দেখ্‌লুম মেয়েটা খোঁড়া। ছেলেটা ব্যাগ থেকে অশোকস্তম্ভের ছাপমারা একটা খাকি খাম বের করল। বলল জয়েন করতে এসেছে।

—কে?

—এইযে এ, আমি এর দাদা।)

—মেয়েটার নাম বলুন।

—পূরবী। পূরবী দত্ত।

—বয়স?

—সার্ভিসবুক না দেখে...।

—আন্দাজে বলতে পারেন না একটা যুবতী মেয়েছেলের বয়স?

—না-না-না, যুবতী নয় স্যার, মানে বয়স অনুযায়ী যুবতী বলতে পারেন, ঠিক যুবতী নয় স্যার। মানে রোগা, খোঁড়া...।

—আপনি তো মহা ঘোড়েল লোক মশাই, যুবতী কিন্তু, যুবতী নয়... এবার বলুন মেয়েটাকে কিভাবে রেপ্‌ করা হয়েছিল, বেশ ভালভাবে ডিটেল্‌স-এ বলবেন।

—ঠিক বলতে পারব না স্যার। আমাকে আগে ওরা মাথায় মারে। জ্ঞান হবার পর দেখি আমি দামোদরের বালির চড়ায় শুয়ে আছি। আমি ওনার নাম ধরে ডাকলাম। কেউ নেই স্যার, শুধু ক্র্যাচ্‌টা পড়ে আছে।

—এবার বলুন আপনি কী ধান্দায় ঐ সন্ধ্যেবেলা অফিসের মেয়েটাকে নিয়ে দামোদরের পাড়ে গিয়েছিলেন।

—মেয়েটা দামোদর দেখতে চাইছিল স্যার, সেই জয়েন করার পর থেকেই। আমাদের অফিসে স্যার একটা ম্যাপ, আপনাদের মতই, আমাদের দেয়ালে ঝোলান থাকে। ওখানে স্যার, নীল রং-এ দামোদর নদী আছে। মেয়েটা স্যার, ম্যাপে দামোদরের নাম দেখেই কেমন যেন—বিশ্বাস করুন—কি বলব, বর্ষার খল্‌সে মাছের মত, কি বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর তো দামোদর পার হয়ে...।

——পুরনো কথা ছাড়ুন। আজকের কথা বলুন।

—সেই কথাই তো বলছি স্যার, মেয়েটাতো কেবল দামোদর যাব দামোদর যাব প্যাঁচাল পাড়তো। আমি বলতাম কী হবে ওখানে গিয়ে? ও বলতো—না যাবোই, একদিন নিয়ে চলুন না। তা আজ আমি স্যার, ছুটিতে ছিলাম। কারণ আজ সকালে বর্ধমান যেতে হয়েছিল। আমার জমিতে স্যার, বর্গা রেকর্ডিং হয়ে গেছে। বর্ধমানে সেট্‌লমেন্টের এক সাহেবের বাড়ি দুটো মুরগি আর মিহিদানা নিয়ে যেতে হয়েছিল স্যার, আমার সম্বন্ধী নিয়ে গিয়েছিল। ফিরল. বিকেলে। চায়ের দোকানে বসে জল-দুধ খাচ্ছিলাম, চা খাই না। তখন ক্র্যাচে ভর দিয়ে মেয়েটা যাচ্ছিল স্যার, আমাকে দেখে ফেললে। বলল—এই যে আপনি, আজ চলুন, নিষেধ শুনব না। আমি বুঝলাম—দামোদর যাবার বায়নাক্কা। মেয়েটা বলল—কতদিন বাদে রোদ উঠেছে। আমি বললুম— রোদ উঠেছে ভাল কথা। ধানে কীট-পোকা লাগবে না।

উনি বললেন—সেদিন আসবার সময় ট্রেনে দেখেছি দামোদর পাড়ে কতো কাশফুল, আর সেই ছোটবেলায় পথের পাঁচালীতে দেখেছিলাম। চলুন না দাদা, রিক্‌শা করে দামোদর পাড়ে যাই। আমি বললুম—কাশ একগোছা নিয়ে আসবখনে। কাশফুলের ডাঁটি দিয়ে বেশ ভাল ঝাঁটা হয়।

উনি বললেন—আপনার দাদা খালি গেরস্থালীর চিন্তা। চলুন না রোদ্দুরটা কমলা রং-এর হয়ে যাচ্ছে, কাশফুলগুলোর রংটাও আস্তে আস্তে পাল্টে যাবে না? দেখব। আমার যদি পা ভাল থাকতো, আপনাকে বলতাম না। একাই চলে যেতাম—ছুটে চলে যেতাম। তাই রিক্‌শা করলাম।

—তখন বিকেল ক'টা?

—সাড়ে চার-পাঁচ হবে।

—তারপর রাত্তির পর্যন্ত কাশফুল দেখালেন! একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে কান খোচাচ্ছেন বড়বাবু। দেয়ালে জেলার ম্যাপ। পাশে একটা মাকালীর ক্যালেন্ডারও আছে। তাতে জবাফুলের মালা পরানো। থানার মধ্যেও মাকালী? মাকালী সর্বত্র। টেপে হিন্দি গান বাজছে। পুলিশ শুনছে। এটাও সর্বত্র।

—সর্বত্র রেপ্ হচ্ছে বুঝলেন, সর্বত্র। আপনার ওখানে ঐ মহিলাকে নিয়ে যাওয়াই উচিত হয়নি, বুঝলেন।

(ঠাকুর্মার নাকি বিয়ে হয়েছিল দশ বছর বয়সে। এখন যিনি আমাদের গুরুদেব তাঁর বাবা শ্রীশ্রীষড়ানন গোস্বামী গুরুপ্রসাদী করেছিলেন ঠাকুর্মাকে। সেটা কি রেপ্ ছিল? সবাইতো তাতে সায় দিয়েছিল। ঢাকঢোল বেজেছিল। বর্ধমান স্টেশনে এক ভিখারিনী, ডি. এ-বৃদ্ধির আলাপে ব্যস্ত দুজন ভদ্রলোককে ভিক্ষার জন্য বিরক্ত করেছিল। একজন ভদ্রলোক

বলল—ভিক্ষা তো করছ, ছানাপোনা হওয়া কমাতে পারো না?

ভিখারি মা বলেছিল—ছানাপোনা কি এমনিতে হয় বাবু? পুলিশের নোকেরা কিছু না পেলে পেলাটফরমে থাকতে দিবে কেনে? লোক দুটো হাসলো। আমি হাসলাম। মানে কী ন্যায্য কথা ভাবলাম, হক্ কথা ভাবলাম?

এখানকার বাসন্তী সিনেমাহল-এ একটা সিনেমা চলছে। ডেস্‌প্যাচে যে ছেলেটা বসে সে নাকি তিনবার দেখেছে। সেখানে নাকি পাঁচবার রেপ আছে। ছেলেটা অফিসের চৌকিদারকে ঐ পাঁচটা রেপের বর্ণনা দিচ্ছিল। সেই গল্প শুনে মণ্ডলবাবু দাঁত ক্যালালো। মিত্রবাবুও। আমিও। রেপ্ কি দাঁত ক্যালানোর মত ব্যাপার?—তবুও....)

—তা ওই মেয়েটা খামোকা চাকরি করতে কলকাতা ছেড়ে এখানে মরতে এল কেন?

—ওর বাবা গ্যাস্ট্রিকে মারা যান। কমপেনসেটরি গ্রাউন্ডে, সরি, কমপ্যাসনেট গ্রাউন্ডে চাকরি। সরকার এখানেই পোস্টিং দিয়ে দিল। ধরা-করার কেউই ছিল না।

—ওনার সঙ্গে কে থাকতেন?

—ওনার মা থাকতেন। তবে বোধ হয় মাসখানেক ধরে উনি একাই আছেন।

—দাদাটি?

—পিসতুতো। শিবপুরে থাকে।

—তাহলে মাসখানেক ধরে একা?

—হ্যাঁ স্যার।

—তবেতো ও জিনিস হয়েই গ্যাছে।

কয়েকজন হেসে উঠল। জেলার ম্যাপ, গান্ধিজীর ছবি, বিড়ির গন্ধ, ফ্যাকাশে আলো...।

—তারপর?

—মানে?

—শুরু করুন। কাশফুল থেকে শুরু করুন।

—উনিতো রিক্‌সা থেকে নেমে ক্র্যাচে ভর দিয়ে নদীর দিকে এগুতে লাগলেন। বালিতে ঐ ক্র্যাচ-লাঠির গোড়া সেঁধিয়ে যাচ্ছিল। উনি আঙুলটা পশ্চিমের দিকে রেখে বললেন—দেখুন, ওদিকে কী হচ্ছে। আমি বললুম—ওদিকে তো খড়্গপুর যাবার রাস্তা তৈরি হচ্ছে। উনি বললেন—আঃ! সূর্যটাকে দেখুন না, কীরকম রং দেখুন, জলের মধ্যে চিকিচিকি, কাশফুল সোনালি হয়ে গেছে। আমি বললুম—এমনকী আর, এরকম তো রোজই হচ্ছে। তিনি আমাকে বসতে বললেন। আমি একটু বসলাম। উনি দামোদরের দিকে তাকিয়ে বললেন—বিদ্যাসাগর। আমি তাঁর চোখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন— ছোটবেলায় বইতে বিদ্যাসাগরের ছবি দেখেছি, সাঁতরে পার হচ্ছেন তিনি দামোদর, সেই থেকেই, বুঝলেন, দামোদরের কথা শুনলেই বিদ্যাসাগর মনে পড়ে। দামোদরের এপার-ওপার জুড়ে বিদ্যাসাগর, তাই না? আমি বললুম—বিদ্যাসাগরের দামোদর কি আর আছে? সব চড়া পড়ে গেছে।

এমন সময় স্যার, ঝোড়ো বাতাস আসে। কোত্থেকে শুকনো অশ্বত্থ পাতা হাওয়ায় উড়ে এসে ওনার শাড়িতে লাগে। উনি ঐ পাতাটা গালে ঘষছিলেন আর আপন মনে কেমনধারা যেন বকবক করছিলেন। বলছিলেন—সেই কবে ছোট বয়সে উনি শিবপুরে পিসিমার বাড়ি

গিয়েছিলেন, ওনাকে রিক্‌শায় চাপিয়ে পিসতুতো ভায়েরা গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেল, একটু পরেই ঘন আর কালো মেঘ। আকাশ ফালা-কালা—তারপর হাওয়া, বৃষ্টি। রিক্‌শাওয়ালাতো জোর রিক্‌শা ছুটিয়ে চলল বাড়ির দিকে। উনি কেবলই বলেন—আস্তে চলো—আস্তে চলো—আস্তে চলো...আমি তখন বলি—এবার উঠুন মিস দত্ত...মিস দত্ত বললেন—পূরবী বলতে পারেন না, পূরবী। উনি সেই অশ্বত্থ পাতাটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে হাতের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন—শুনুন না, একটা জরুরি কথা আছে। আমি বললাম—বলুন না, শুনতে পাচ্ছি। উনি বললেন—আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনি আমায় কত কাজ শিখিয়েছেন অফিসে। কত গাছ চিনিয়েছেন রাস্তায়, আজ কী সুন্দর জায়গাটা দেখালেন...।

আমি উড়ে আসা আর একটা অশ্বত্থ পাতা খপ্ করে ধরে ওনাকে দিতে গেলাম—'নিন', উনি হাসলেন। হাওয়ায় ঐ হাসি উড়ে গিয়ে কাশফুলে মিশে গেল। বললেন—কী হবে? আমি বললুম—ঐ যে এতক্ষণ পাতাটা নিয়ে খেলা করলেন, তাই আর একটা দিলুম। উনি বললেন—শুনুন, আপনার জন্য একটা সোয়েটার বুনছি। শীতের আগেই দিয়ে দেব। আমি বললুম—ঐ সোয়েটারটা, যেটা আপনি অফিসে মাঝে মাঝে বোনেন, সবুজ আর সাদা?

—তারপর? চুপ করে গেলেন কেন মশাই, বলুন, কিছু বাদ দেবেন না।

—অন্ধকার হয়ে আসছিল, আমি বললুম—এবার উঠুন মিস দত্ত, উনি তবু বললেন—আর পাঁচ মিনিট।

এমন সময় স্যার, একটা প্রাইভেট গাড়ি এসে থামল। তিনজন লোক এগিয়ে এল। আমাকে ঠাস্ করে একটা চড় মারল। বলল—শালা, মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি? তারপর ওনাকে বলল—এতক্ষণ তো একে আনন্দ দিলেন, এবার আমাদের একটু দিন। আমি বুঝলুম সামনে বিপদ। গুরুনাম জপ করতে লাগলাম।

আমি ওনাকে আঁকড়ে ধরতে গেলাম, কিন্তু লজ্জায় পারলাম না। ওরা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গাড়িতে তুলল। আমি মধুসূদনকে ডাকতে লাগলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। আমার পকেটে টর্চলাইট ছিল স্যার, গাড়ির নম্বরটা দেখলাম। তিন হাজার দুই।

—তিন হাজার দুই?

সবাই কেন যেন নড়েচড়ে বসল। এ-ওর মুখের দিকে তাকালো।

—নম্বরটা ঠিক দেখেছেন তো?

—হ্যাঁ স্যার, তিন হাজার দুই। পষ্ট দেখেছি।

নম্বরটা জপ করতে করতে আসছি।

বড়বাবু কলম ঠুকলেন টেবিলে। বললেন—আপনি আগে বলেছিলেন যে আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন! ওরা আপনাকে মেরেছিল.......

—স্যার, ওটা ঠিক নয় স্যার, মিথ্যে বলেছিলাম। একজন সজ্ঞান ব্যাটাছেলের কাছ থেকে একটা মেয়েকে ছিনিয়ে নেয়া স্বীকার করতে খুব লজ্জা করছিল স্যার, তাই প্রথমে মিথ্যে বলে দিয়েছিলাম।

—ধুর মশাই, আপনি একজন লায়ার।

—না স্যার, মাকালীর পা ছুঁয়ে বলছি কিচ্ছু মিথ্যে নেই, সব সত্যি বলছি স্যার, শুধু প্রথমটায়...

আপনি অন্ধকারে কি করে গাড়ির নম্বরটা পড়লেন?

—আমার পকেটে টর্চ থাকে স্যার। নতুন ব্যাটারি, পরশুর কেনা, যশোদা ভাণ্ডার থেকে কিনেছিলাম।

বড়বাবু সিগারেট ধরালেন। একটু চুপ থেকে বললেন—দেখুন মশাই চাকরি করতে এসেছেন ঝুটঝামেলায় কেন জড়িয়ে পড়ছেন, এসব ডায়রি ফায়রি কেন করতে যাচ্ছেন, চেপে যান। আমি বললুম—ওদের ধরবেন না? মেয়েটাকে বাঁচাবেন না? গাড়িটার নম্বর তো....

—তাহলে তো প্রথম আপনাকেই অ্যারেস্ট করে দেবো। যদি বলি আপনিই চক্রান্ত করে...

থানা থেকে বেরিয়ে আসি। ঘরে যাই। রান্না বান্না করতে ইচ্ছে করল না, শুয়ে পড়লাম। একটু পরেই উঠে পড়লাম। বাইরে একফালি চাঁদ আলো বমি করছে। পূরবীদেবী যে বাড়িতে থাকেন ঐ বাড়ির সামনে গেলাম। দেখি ঘরে আলো জ্বলছে। পূরবী দেবীর নড়াচড়াও দেখতে পাই। আঃ। ডাকলাম না। যদি কেউ কিছু ভাবে? কিংবা আমার নিজের মুখ দেখার লজ্জা। সারারাত নিজের ঘরে একা একা থেকে পরদিন সকালে ওর ঘরে গেলাম।

আমাকে দেখেই ওর চোখ থেকে জল বেরিয়ে গাল বেয়ে পড়ে। আমি কিছু বলি না, বলতে পারি না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকি।

উনি বললেন—আমাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছিল। গাড়ির একজন বলছিল—একটা খোঁড়া মেয়েকেই শেষ পর্যন্ত...অন্য একজন বলেছিল—দেখি মালটাকে। গাড়ির আলো জ্বালতেই একজন বলল—কাকে ধরে এনেছ? এঁকে চেনো না? এতো বি.ডি ও অফিসে কাজ করে। অন্য একজন বলল—ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও; এখনো ইটভাটার দিকে গেলে সাঁওতাল টাওতাল পাওয়া যাবে।

আমাকে মোড়ের মাথায় নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ঘুরে গেল। আমি বি.ডি.ও অফিসের কেরানী বলে বেঁচে গেলাম। অন্য একজন হয়তো বা মরল, যার চোখে চশমা নেই, গুছিয়ে কথাও বলতে পারে না।

আমি বললাম—খুব বাঁচা বেঁচে গেছেন ম্যাডাম। তিনি বললেন—ছিঃ! 'ছিঃ' শব্দটা বলার সময় মুখ দিয়ে থুথু ছিটালো। ক্ষোভ আর ঘৃণার পুঁটুলি ছুঁড়ে দিল যেন। থুথু-মাখানো 'ছিঃ' শব্দটা চামচিকের মত ঘুরতে লাগল। এই 'ছিঃ' কি আমি? না আমার চারপাশ?

অফিসে আর আমার সঙ্গে কথা বলতেন না পূরবীদেবী। আমি কোনোদিন আগে এসে পূরবীদেবীর ড্রয়ারের ফাঁকে গলিয়ে দিতাম শির বের হওয়া অশ্বত্থ পাতা বা মাছরাঙা পাখির নীল পালক। তবু উনি কথা বলতেন না আমার সঙ্গে। মাঝে মাঝেই মনে হ'ত থুথু ছিটানো 'ছিঃ' শব্দটা চামচিকের মত আমার পাশে পাশে ঘুরছে।

একদিন চিমনি কারখানার কনট্রাক্টর এসে আমায় বলে—জলের ব্যবস্থাটা শিগ্‌গির করে দেন দাদা, বহুদিন তো হল। সন্দেশের বাক্‌সোটা টেবিলে রাখলেন। আমি বললুম, বাকসোটা হঠান শিগ্‌গির। তারপর বললুম—সিরিয়ালি হবে। আপনার টাইম হলেই পেয়ে যাবেন। বিরক্ত করবেন না। বলেই পূরবীদেবীর দিকে তাকালাম।

দেখি উনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বি. ডি. ও সাহেব নিজে এসে বললেন—এবার চিমনি ফ্যাক্টরির জলের ফাইলটা ছেড়ে দিন। আমি বললুম, ওটার প্রায়োরিটি নেই। হাসপাতালের জলটা আগে হবে।

চিমনি ফ্যাক্টরির কনট্রাকটার সাহেব গাড়ি করে এসেছিল। তার নম্বর তিন হাজার দুই।

কিছুদিন পরে গাড়িটাকে আবার দেখলাম অফিসের সামনে। গাড়ির নম্বর তিন হাজার দুই। গাড়িতে বি. ডি. ও সাহেবের পরিবার। গাড়ি যাচ্ছে বর্ধমান-টাউন। আমি বুলটানা স্কেলটা নিয়ে ছুটলাম। বেপরোয়া বাড়ি মারতে লাগলাম গাড়িটার গায়ে। মুখ থেকে থুথুমিশ্রিত 'ছিঃ' শব্দ ঠিক্‌রে বের হতে থাকে। গাড়িতে ঝম্‌ঝম্‌। বি. ডি. ও-র পরিবার চিৎকার করতে থাকে। সবাই আমাকে ধরাধরি করে সরিয়ে দেয়। টেনে অফিসের মধ্যে নিয়ে যায়। আমি একটি মুখ দেখবার জন্য ব্যাকুল—চারিপাশে তাকাই।

আমার ট্রান্‌সফার হয়। মুর্শিদাবাদের খুব ভিতরের দিকে। পানিশ্‌মেন্ট। আমার জিনিসপত্র গোছগাছ করছিলাম। পূরবীদেবী ক্র্যাচে ভর দিয়ে আমার ঘরে আসেন। তখন রাত্রি। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। ব্যাঙ ডাকছে। পূরবীদেবীর হাতে সাদায় সবুজে মেশানো সোয়েটার। বললেন—দাদা, এটা পরবেন।

আর কী আশ্চর্য! যেন কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেল দামোদর, বিশাল ; বিদ্যাসাগর!! বিদ্যাসাগর!!

উনি বললেন—ভালো থাকেবেন। চিঠি লিখবেন। জানাবেন কেমন থাকেন, আর..

আর কিছু দরকার নেই! বাজনা বাজছে ঝিঁঝিঁর শব্দে, বাজনা বাজছে ব্যাঙের ডাকে। হারমনিয়ামের মতো বেজে উঠল মুর্শিদাবাদের রাস্তা।

অমৃতলোক, ১৯৮৪

আরওয়ালের হাত

জানালার ধারে বসে আছে টোটন। বাড়িটার জাস্ট ওপারে টালির চালের ঘরটায় কিছু বিহারের লোক থাকে। ওরা জুতো বানায়, জুতো সারাই করে। ওরা এখন উনুনে আঁচ দিয়েছে, নিচ থেকে ধোঁয়া এসে জানালা দিয়ে ঢুকছে। চন্দ্রমা আটা মাখছে। চন্দ্রমার ছেলে কিশোরীলাল, টোটনেরই বয়েসী। উনুনে হাওয়া করছে।

—'টোটন জানালা বন্ধ করে দাও। বলেছি না, সন্ধেবেলায় জানালা বন্ধ রাখবে'—মা সোফায় বসে আছে। লাল বল কালো বল নাচছে। উলের বল। মায়ের হাত নড়ছে। কলিং বেল বাজল। সুমনদা। 'একটু দেরি হয়ে গেল'। সুমনদা পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে। ফ্যানের রেগুলেটারে মায়ের নখ-চকচক আঙুলের স্পর্শ। ফ্যান ফুলস্পিড হয়। সুমনদা ঘুরন্ত ফ্যানের দিকে একবার এবং টোটনের মায়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বলে, যা জ্যাম....টোটনের মা ঐসব কৈফিয়ৎ গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে বলল—আপনার ছাত্র জানেন, হিস্টরির মান্থলি টেস্টে হাইয়েস্ট পেয়েছে। সুমনদা বাঁ হাত দিয়ে টোটনের কাঁধে টোকা মেরে বলে—কন্‌গ্রাচুলেশন, কন্‌গ্রাচুলেশন টোটন।

সুমনদা দারুণ পড়ান। স্পেশালি, হিস্টরি আর জিওগ্রাফি। এখন জিওগ্রাফি পড়তে চাইল টোটন। ক্যারিবিয়ান আইল্যান্‌ড্‌স পড়াচ্ছে ক্লাসে। অ্যাটলাস খুলে ধরে সুমনদা বলে—দ্যাখো—অ্যালান্টিক ওসেন। সমুদ্রের বুকে ভাসছে দ্বীপগুলি...ক্রমশ টোটন জেনে যায় ঐ দ্বীপগুলোর আখের খেতের কথা, তামাক চাষের কথা, সমুদ্রের ওপার থেকে ধেয়ে আসা শকুনিরা নেমে পড়ল চাষের ক্ষেতে। ঐ অ্যামেরিকান ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ক্যারিবিয়ানদের ফুঁসে ওঠা, তারপর কিউবা, ফিদেল ক্যাস্ট্রো, যদিও বইতে এসব নেই, গল্পের মত পড়ান সুমনদা।

মা চা নিয়ে এলে সুমনদা চেয়ারে ঝোলানো ঝোলা থেকে একটা বই বার করেন।

—একটা বই কিনুন বৌদি। কবিতার বই।

—কবিতা একদম বুঝি না, তোমাদের ঐসব আধুনিক কবিতা। 'কেন চেয়ে আছো গো মা?' দেবব্রতর গানের নামে বইটার নাম? বাব্বা?

—ওটা রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন।

—তোমার কবিতা আছে?

—আছে একটা।

—দিয়ে দাও একটা, কত দাম করেছ? তোমার দাদার ঐ সব পড়ার বাতিক আছে। আমার ভাই একদম সময় হয় না। আমাদের সুভেনিরে একটা লেখা দিতে পারো, ছেপে দেবো।

—কিসের সুভেনির?

—এবার আমরা মহিলারা পাড়ায় দুর্গাপূজা করছি।

সুমনদা কিছু বলে না। এসময় মায়ের ফ্রেন্ডরা সব আসে। বোধহয় দুগ্‌গা পুজোর মিটিং।

পড়া হয়ে গেলে সুমনদাকে এগিয়ে দেবার জন্য নিচে নামে টোটন। চন্দ্রমাদের অড়হড় ডাল ফুটছে। কী ফ্যান্টা গন্ধ! টোটন চন্দ্রমাদের ওখানে দাঁড়ায়।

চন্দ্রমা বলে—আরে, গাঁধী মহারাজ আ গইলে।

চন্দ্রমারা মুচি। দেশ গয়া আর আরার মাঝে কোথায় যেন। সারাদিন ঠুকঠুক্ চামড়া পেটে, চামড়া কাটে, সেলাই করে, জুতো বানায়। দেয়ালে ঝুলছে কাঠের ডাইস্। জুতো তৈরির এই ব্যাপারগুলো দেখতে বেশ ভাল লাগে টোটনের। টোটন মেঝেতে বসতে যায়—

চন্দ্রমা হা-হা করে ওঠে। আরে আরে মহারাজ, ই কাঁহা বৈঠতানি, আরে এ কিশোরিয়া, আরে গাঁধী মহারাজকে পিঢ়া-ওঢ়া-কুছ দে সাসুর।

চন্দ্রমার ছেলে কিশোরীলাল একটা পিঁড়ি এগিয়ে দেয়। টোটন একবার দোতলার জানালার দিকে তাকিয়ে নেয়। মায়েদের মিটিং চলছে নিশ্চয়ই।

—এবার বলো চন্দ্রমাজী, ক্যা খবর হ্যায়?

চন্দ্রমার ব্যস্ততা শেষ হয় না। 'এ কিশোরিয়া' ডিবিয়ামে তানি তেল-এল দে ভাই, এ শালী কৈসে লুকলুকাতি হ। আচ্ছা বড়বাবু, ই তেল কা দাম তানি কম হোই, ক্যা?—এখানে এলে টোটন নিজেকে বেশ প্রাপ্তবয়স্ক মনে করে। এখানে সবাই যেন ওকে সম্মান দেয়। টোটন কোন কথা বললে সবাই মন দিয়ে শোনে। আবার কখনো কখনো ওর মতামত চায়।

....আচ্ছা বড়াবাবু, ই আদমি লোগ ক্যা চন্দাপর গিয়া হ্যায়? শুনতা ভি হ্যায়, হুয়াপর নাকি ক্ষেতি হোগা? ই স্যাচ্ বাত হ্যায়, ক্যা?

টোটন একটা চামড়া হাতে নিয়ে দেখে। কিশোরী বলে, ছোড় দিহি মালিক, গন্ধা চিজ হো। টোটন যেন লেদার এক্স্পার্ট—এটা মোষের চামড়া, তাই না?—ঠিকই বোলা বাবু। পার্থ, রমেশ, কৃপাল, কেউ বলতে পারতো না। টোটন বলে, সবসে চিপ্ মানে সস্তা কোন্ চামড়া?

—আ—আদমিকা। গরিব হামারা যৈসে চামার দুসাদ আদমিকা। হামার দেশে একটা বহুত বড় রাজপুত লোক আছে। আউর বলেছে কি, চামার আদমিকা চামড়াসে জুতা বনাকর পিন্ধবে। যেতনা চামারান কো উলোগ মারা হ্যায় উতনামে পুরা গাঁওকা রাজপুত লোগ জুতা বনাওয়ানে সেকতা হ্যায়, বুঝলেন?

—মানে?

—মানে না-বুঝলেন? আরে মহারাজ ইত্না পঢ়তে হে আপ, আখবার মে, সন্মার্গ উন্মার্গ মে ই সব খবর না রহেলা ক্যা? আরোয়াল নেহি শুনা? চন্দ্রমার ঠাণ্ডা মুখটা কিরকম অন্যরকম হয়ে যায়।

টোটনের মনে পড়ছে বটে আরওয়াল টারওয়াল এইসব নাম কাগজে পড়েছে, কিন্তু এ নিয়ে আর কিছু শোনে নি তো, মহামেডান স্পোর্টিং-এর সাস্পেনশান নিয়ে ইস্কুলে কী হৈ-চৈ। কিংবা একটা ম্যাগাজিনে গিন্নিদের মাইনে দিতে হবে বলে কি একটা বেরিয়েছিল, তা নিয়ে বাবা, মা, মাসিমনির কি তক্কাতক্কি!

কিশোরীলাল হাঁড়ি থেকে লোহার হাতায় করে এক হাতা ডাল তুলে নিয়ে দেখল সেদ্ধ হয়েছে কিনা। সুগন্ধ ছড়ালো। টোটন বলল—এই কিশোরীলাল, আমাকে একটু তোমাদের ডাল খাওয়াবে?

—আরে, ই ক্যা কহতানি মহারাজ, হামন্ আছুৎ জাত হ্যায়। আপ বড়া আদমি, বাম্হন্। আপকে খিলাওলাগে পাপ লাগি। পাপ হোবে হামার মহারাজ।

টোটন চাঁদমামা বইটাতে স্বামী বিবেকানন্দ কমিক্‌স-এ দেখেছে বিবেকানন্দ কোন এক চামারের ঘরে ভাত খাচ্ছে। টোটন সেই স্কোপ পেয়েছে আজ। ও বলে—পাপটাপ সব বাজে কথা। সবাই সমান। দাও না একটু।

চন্দ্রমা বলে—আপ বাচ্চা হ্যায়, আভি উসব কাঁহা সমঝেঙ্গে মহারাজ। বড়ে হো কর, আপৌ, ঠাকুর দিগ্বিজয় সিং হো জায়েঙ্গে—না ক্যা?

ঠাকুর দিগ্বিজয় সিং? সে আবার কে?

—এ কিশোরিয়া, গরম পানিয়াসে বর্তনোয়া সাফা কর আচ্ছাসে। চন্দ্রমা বলে। মশালা ডালা দালমে, আউর দুচার মিনিট লাগি। একটা বিড়ি ধরায় চন্দ্রমা।

ঠাকুর দিগ্বিজয় সিং হ্যায় বহুত বড়া আদমি-হামারা গাঁওমে। তব কাহানী শুনিয়ে এক।

দুর্গাপূজা ধুম রহে কলকাত্তামে। কুছ কামা লিয়া পইসা। উধার চিটঠি আ গিয়া—হামারা জানানা বেরাম, গাঁওমে। সারা পয়সা রুপিয়া জোড়কে হাম চলা ঘর। টিরেন সে উতারকে দেখা বাস নাই খে। বাসওয়ালা সব হরতাল কিয়া। পইসা থা জেবমে, বৈঠ গিয়া টেকসি মে।

যেন ট্যাক্‌সিতে ওঠা নির্ঘাৎ অবিশ্বাস করছে টোটন, তাই জোর দিয়ে আবার বলে চন্দ্রমা, হাঁ, হাঁ, সাহেব, টেকসি মে। মচামচ জুতো মচকাতে পঁহুচ গিয়া দিগ্বিজয় সিং। হামে দেখতে হি বমক্ গয়ে।

—উতার, উতার সাসুরা টেকসি সে।

মহারাজ, উন্‌কে জবানপর লাগাম নাহি, কেত্‌না কুছ গালি দে দিয়া। হম ভি তনি গয়ে। বোলা—হাম ভি ভাড়া দেঙ্গে!

—সাসুর ভাড়া হাম তুমহারি গাঁড় মে ঘুসা দেঙ্গে। রাজপুতকা সাথ বৈঠ কর টেক্‌সিমে জায়েঙ্গে, কলকাতা রহিস, পেট ভরনে লাগা তো দিমাক সনকায় গিয়া, শালে চামার কা।

চন্দ্রমার বিড়ি নিভে গিয়েছিল। আবার দেশলাই ধরালো।

বলল—মহারাজ, ওহি টেক্‌সিমে আউর একটা চামার ভি ছিলো, লেকিন উ হ্যায় পইসাওয়ালা। এক জুতিয়াকা দুকান বা মারকিট মে। উকে তো কুছ নেহি বোলা, আসলি বাত—হাম গরিব আদমি।

—তোমাকে ট্যাক্‌সি থেকে নামিয়ে দিল?

—হাঁ। তনি দের মে। ডারাইভার তো হুয়াসে ছোড় দিহিস্ টেক্‌সি। বিচমে হামারা ভাড়া ডারাইভার কো দে দিহিস দিগ্বিজয় সিং। টেক্‌সি বুক গয়ী। উতার দিহিস্ দিগ্বিজয় সিং। মেরা গাঁও আউর তিন মিল বাকি বা।

বোলিয়ে টোটনবাবু, গরিব চামার আদমিকা সাথ কৈসে টেক্‌সি সে উত্‌রাবে মানী আদমী, বড়া আদমি? গাঁওকা লোগ কী বোলবে? বাবু, আপ ভি মানী আদমী। দাল খানা হ্যায় তো ছুপকে খাইয়ে।

দোতলার জানালার দিকে একবার তাকিয়ে নেয় টোটন, ডালের বাটিতে ফুঁ দিতে দিতে ছোট্ট ছোট্ট চুমুক দিতে থাকে। ঠিক সেই সময় রিক্‌শাটা থামে।

ঠাম্মা ফিরলেন লেক কালীবাড়ি থেকে। —এটা কী হচ্ছে টোটন?

টোটন চম্‌কে যায়। এ সময় খাওয়া বন্ধ করে উঠে গেলে কী ভাববে চন্দ্রমা? কী ভাববে কিশোরীলাল? এক চুমুকে সবটা ডাল শেস করতে গিয়ে জিভ পুড়ে যায় টোটনের।

ঠাম্মা গলায় ঝাঁঝ নিয়ে বলল—কিরে আয়, আমাকে ধর, আমি নামবো।

মায়ের বন্ধুরা চলে যেতেই মায়ের কাছে নালিশ হয়ে যায়। টোটন মিথ্যে বলে। ও

বলে—খুব জলতেষ্টা পেয়েছিল, জল খাচ্ছিলাম। ঠাম্মা চেঁচিয়ে বলে—জোর গলায় আবার বলছে দ্যাখো মুচিদের ঘরে জল খেয়েছিলাম।

ঠাম্মার বাঁধানো দাঁত লুজ হয়ে যেতে চায়। টোটন বলে—বিবেকানন্দ বলেনি বুঝি, চণ্ডাল ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, মুচি ভারতবাসী আমার ভাই, নিয়ে আসব চাঁদমামাটা? সেদিন টিভি-তে শ্রীচৈতন্য সিনেমাতে কী দেখালো?

—বড়দের মুখে মুখে তক্ক করতে হয় না, মা চিৎকার করল। কতদিন বলেছি না, ওখানে আড্ডা মারবে না, দাঁড়াও—আসুক তোমার বাবা।

টোটনের বাবা একটু রাতে একটা ছবি হাতে করে এল। একাডেমি অফ ফাইন আর্টস্-এ এক কলিগের বোনের আর্ট একজিবিশন ছিল। খুব রিকোয়েস্ট করল, একটা কিনতে হয়েছে। টোটন দেখল ছবিটা। পেট থেকে একটা হাত উঠে এসে একটা ছাগলছানা খামচে ধরে আছে। টোটনের বাবা বলল ছবিটার নাম হাংগার। টোটনের মা বলল কিনেছো তো, ঝোলাবে কোথায়? টোটনের বাবা দেয়ালগুলির দিকে তাকাতে লাগলেন। বেডরুমে এ ছবি চলবে না, ড্রইংরুমের রবীন্দ্রনাথের ছবিটাকে নামিয়ে দিয়ে ওখানে হাংগার ঝুলিয়ে বাবা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—নাইস্। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঠাম্মার ঠাকুরঘরে রেখে দেওয়া হল।

এরপর নালিশ হ'ল জানোতো, টোটন আজ—

—সেকী? এটা কি করেছো টোটন!

হিস্টরি বইতে তো আছে নানক, কবীর, চৈতন্যদেব সবাই বলেছেন—

—না না সেই জন্য নয়, ওরা তো খুব ডার্টি, নোংরা চামড়া ঘাঁটে। আর তুমি তো ফিল্টারড ওয়াটার খাচ্ছো—বাবা খুব একটা না রেগেই বললেন।

টোটনের বাবা অশোকতরু চক্রবর্তী, বড় হয়েছে উল্টোডাঙ্গায়। স্কুল টিচারের ছেলে। এখন একটা বড় কোম্পানির পি আর ও। এই ফ্ল্যাটের ভাড়া কোম্পানি দেয়।

ক'দিন পরে, মায়ের ঘরে যেখানে পুরোনো ম্যাগাজিনগুলো বিক্রীর জন্য থাকে, সেখানে Sports Magazine-গুলো খুঁজছিল টোটন। স্কুলে কুইজ কমপিটিশন। ওখানে ২৩ পল্লী দুর্গাপূজার স্মারকগ্রন্থ, তদন্তকাহিনী আর সাদনন্দার তলায় পেয়ে গেল ঐ বইটা, 'কেন মুখপানে চেয়ে আছোগো মা'।

সুমনদার দেওয়া বইটা। পাতা উল্টে দেখে আরওয়ালের গণহত্যার প্রতিবাদের কবিতা সংকলন। সম্পাদক—সুমন বসুমল্লিক। আরও লেখা আছে—এই বইয়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিহারের কৃষক সংগ্রাম তহবিলে পাঠানো হবে।

আরওয়াল কথাটা চন্দ্রমার কাছে শুনেছে সে। সুমনদার কাছে আরওয়াল ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নেবে টোটন। সুমনদার কবিতাটা বের করে পড়ে টোটন।

'আরওয়ালের অড়হড় খেতের পাশে পড়ে ছিল ভরত শাহুর লাশ।'
সমীর আর স্বপন পড়েছিল কাশীপুরের নর্দমার ধারে।
বারাসতের ঘাসজ্বলা মাঠের উপর অজয় ছিল, সুমিত ছিল হাতের মুঠোয় ধরে রাগ।
অহল্যা মরেছিল কাকদ্বীপে তাই নকশালবাড়িতে সনকা চিৎকার করল।
সনকাও মরেছিল, আরওয়ালের কৌশল্যা তার প্রতিবাদ,
কৌশল্যা মরে গেলে—মানিকতলায় প্রতিবাদ হয়, নাগপুরের রাস্তায় যানজট,
কৌশল্যা মৃত্যুর বদলা বর্ধমানের জমিতে,

ধানবাদের খনিতে এমনকি জোহানসবার্গেও হতে পারে।
ন' কাঠা জমির হক চেয়েছিল আরওয়াল।
অধিকার চেয়েছিল,
বদলে ঝাঁঝরা বুক বুলেট পেয়েছে
বাতাসে বুলেটের ঝুমঝুমি বাজলেও
রক্তস্রোত আজ একাকী অনাথ নয়।
রক্তছাপ পিছে পেলে মানুষ এগোয়।

সন্ধ্যার সময় বিহারের ম্যাপ খুলে দেখছিল টোটন। মধুপুর, দেওঘর, ডালটনগঞ্জ। সেবার মধুপুর বেড়াতে গিয়েছিল সবাই মিলে। ভোরবেলা কী কনকনে ঠাণ্ডা! ঘোড়ার গাড়িতে করে পৌঁছাল শালগাছওয়ালা একটা বাড়িতে। পৌঁছেই গরম সিঙারা আর প্যাঁড়া। বিহারের কথা উঠলেই ভোরবেলার ঠাণ্ডা হাওয়া আর শালগাছ মনে পড়ে। আরওয়াল কোথায়? রাঁচি, হাজারীবাগ, পাটনা... ম্যাপে আরওয়াল পাওয়া যাচ্ছে না তো।

সুমনদা আসে।

—কী খুঁজছো ম্যাপে, এত মন দিয়ে?

—আরওয়ালটা কোথায় সুমনদা?

[illegible] তার আঙুল ম্যাপের মধ্যের হলুদ বেগুনী গোলাপী রং-করা পশ্চিমবাংলা, বিহার, উ[illegible] ভিতর দিয়ে দ্রুত সরে যায়। বলে আরওয়াল সব জায়গায়। টোটন না বুঝে সুমনদার মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলে কবিতাগুলোও পড়েছি, যে বইটা মাকে দিয়েছিলেন।

সুমনদা একটু আশ্চর্য হয়। তারপর মুখটা হাসি হাসি হয়। আমারটাও পড়েছে?

—হ্যাঁ, কিন্তু অহল্যা, কৌশল্যা, কাশীপুর, কাকদ্বীপ, এসব কী!

সুমনদা টোটনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। গম্ভীর হয়ে যায়। বলে—তোমার জন্ম কত সালে টোটন? টোটন বলে—থার্ডমার্চ নাইনটিন সেভেনটি টু। সুমন বললে—কিচ্ছু দেখ নাই। নকশালবাড়ি দেখ নাই, ডেবরা, গোপীবল্লভপুর দেখ নাই, বরাহনগর, কাশীপুর, বারাসাত দেখ নাই... সুবর্ণরেখা দেখলে টিভিতে?

—লাস্ট স্যাটারডে আমরা বাড়ি ছিলাম না।

আরওয়াল জেনে নাও, এটাও তো ইতিহাস। শোন—আরওয়াল, পিপরা, পরশবিঘা এসব হচ্ছে বিহারে সব ছোট ছোট জায়গা। ওখানে যাদের জমি নেই, তারা চাষের কাজ করে বড় বড় জমি মালিকের খেতে। মজুরি খুব কম। ধারদেনার জন্য অনেক সময় ফ্রি সার্ভিস দিতে হয়, যাকে বলে বেগার খাটা। টোটন জেনে নিল কুঁয়ারসেনা, লোরিকসেনার কথা, মজদুর কৃষক সংগ্রাম সমিতির কথা, তারপর প্রাচীরঘেরা আরওয়ালের গান্ধী ময়দানে দিনে-দুপুরে একশোর বেশি মানুষকে ফায়ারিং করে মেরে ফেলার কাহিনী।

একটা খেলা দেখবে টোটন? ইতিহাস ইতিহাস খেলা। সুমনদা বলল। একটা Short Note লেখো জালিয়ানওয়ালাবাগ।

—কেন?

—লেখোই না, একটা খেলা।

টোটনের মুখস্থই ছিল। সেদিন তো পড়েছে। টোটন দ্রুত লিখে ফেলল।

সুমনদা পেনটা নিয়ে 1919 কেটে 1986 করল। 13th April-টা 19th April। ডায়ার কেটে কাসোয়ান। বলল—দেখো, জালিয়ানওয়ালবাগ কী সহজে আরওয়াল হয়ে গেল। সুধু লাস্ট লাইনটার কিছু চেঞ্জ করা গেল না। অন দি প্রেটেস্ট, টেগোর রিফিউজড হিজ নাইটহুড।

সকালবেলায় চন্দ্রমাদের ওখানে চেঁচামিচি। ঘরে বারান্দায় বাচ্চাকাচ্চা। দুটো বৌ কাঁদছে। একটা লোক বেশ উত্তেজিত, ওর হাতের কব্জির পর থেকে বাকিটা নেই।

স্কুল থেকে ফিরে, বাড়ি ঢুকবার আগে চন্দ্রমাদের ওখানে দাঁড়ালো টোটন। চোদ্দ বছরের টোটনকে দেখে মহিলারা ঘোমটা দিয়ে জড়োসড়ো হল। চন্দ্রমা টোটনকে দেখে কপাল চাপড়ে বলল—

—হামলোগস কে সবহিন কে ঘরমে আগ লাগা দেহলস্ বাবু, সবকুছ জ্বল গইল সরকার, কুছ না রহল।

টোটন জানতে পারল, যার ডান হাতের আঙুলগুলো নেই সে হল চন্দ্রমার ভাই সুদামা। সুদামার নিজের আর চন্দ্রমার বৌ-বাচ্চা গাঁ থেকে পালিয়ে এসেছে।

দুটো বাচ্চা বারান্দায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মাছি সারা গায়ে ভনভন করছে। শুকনো শিকনিতে খড়খড়ে গাল। আরও দুটো শিশু মায়েদের কোল ঘেঁষে বসে। আইসক্রিমওয়ালা নির্বিঘ্নে চলে যায়। টোটন হিপপকেট থেকে জেম্স-এর প্যাকেটটা বার করল। বাচ্চাদের দিকে হাতটা মেলে ধরল। ওর হাতের পাতায় লাল নীল সবুজ লজেন্স-এর গুটি। বাচ্চা দুটো একসঙ্গে কেঁদে উঠে মার কোলে মুখ লুকোল। চন্দ্রমা বলল—আরে বাবুয়া, লে-লে গাঁধী মহারাজ দেহলস্। আচ্ছী চিজ। ওরা তবু কাঁদে। চন্দ্রমা বলে—ডর লাগতা। আপ বাবুলোগ হ্যায় না?

সুদামা রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে ঝিমোচ্ছিল। চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করল—আরে এ গুটলিয়া ক্যা, খানেকা চিজ বা? টোটন সুদামাকে দুটো দিল।

টোটন চন্দ্রমার কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে—ওর একটা হাত নেই কেন?

চন্দ্রমা সুদামাকে বলে—শুন সুদামাওয়া, বাবু ক্যা পুছলস্।

—উ হাত ঠাকুর দিগ্বিজয় সিং কাট দিয়া রাহা।

—কেন?

—গড়াইয়া তাল সে মছরী পাকড়ালে রহানে, নিক বড়া মছরী রহে, দেখতে, ঠাকুর কহলস....

ওর ভাষা ভাল বোঝে না টোটন। চন্দ্রমা বুঝিয়ে দেয়—

একটা বড় মাছ ধরেছিল সুদামা দিগ্বিজয় সিং দেখতে পেয়ে বলল—হো সুদামাওয়া। যো, ঘরে হামরা মছরী পৌঁছা দে।

সুদামা বলেছিল—বরখা মে ভিজকে কাদামাটি এক কৈকে কেতনাদিন বাদ মছরী ধইনী, ঘরমে বেমার লেড়কা বা, খায়েগা।

—তু কা মছরী খাইব ; শালা চামার টামার, দে-দে, ঘরপৌঁছা দে, পইসা মিলি। দিগ্বিজয় বলেছিল।

—নেহি সরকার, হাম মছরী না বিক্‌ব।

—বারে ব্বা, দেখতে হাই, গাঁড়ি মে বহুত রস গোইল বা আজকাল। উদিন্ হউ চন্দ্রমাওয়া রহে, শালা টেক্সি মে বইঠকে সাথ চলি। আর তু সসুর মছরী খাইব...

জানেন সুমনদা, মাছটা ছিনিয়ে নিতে গিয়েছিল ঐ রাজপুতের বাচ্চা। সুদামা তখন ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছিল। ওর হাতের কব্জির তলায় তখন পাঁচটা আঙুল ছিল। সুমনদাকে বলে যায় টৌটন, সব বৃত্তান্ত।

—তারপর?

—তারপর একদিন কয়েকজন লোক সুদামাকে অ্যাটাক্ করল। বলল—এই হাতটা দিয়েই না ঠাকুর দিগ্বিজয় সিংকে ধাক্কা মেরেছিল। বলেই কাটারির কোপ মারল হাতে। আচ্ছা, ওরাই কুঁয়ারসেনা, তাই না সুমনদা?

—হুঁ। তারপর?

—তারপর লতাপাতার রস আর ন্যাকড়া জড়িয়ে হাসপাতাল গেল সুদামা।

মাইল দূরে হাসপাতাল। কিন্তু হাতটা সেপটিক হয়ে গেছিল। কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে বছর দুই হল।

কাচের জানলা দিয়ে দেখে, কী আশ্চর্য। সুদামার হঠাৎ শেষ হয়ে যাওয়া হাতের মাংসপিণ্ডটা একটা ঢোলের গায়ে পড়ছে। গান গাইছে। এখনো গান?

টৌটন ঠিক সেই সময় রবিনহুড হয়ে গেছে, মুখে অরণ্যদেবের মত মুখোশ। ঘোড়ায় চড়ে পৌঁছে গেছে চন্দ্রমাদের গ্রামে। হাতে পিস্তল।

—কাম্ অন্। কুইক্। হুইজ দিগ্বিজয় সিং হিয়ার?—

—কেন ওদের ঘরটর জ্বালিয়ে দিয়েছে জানেন সুমনদা!

—তাও জেনে নিয়েছ?

—ওদের ওখানকার চাষিরা এককাট্টা হয়ে একটা সমিতি তৈরি করেছে। ওরা মজুরি বাড়াবার জন্য কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। এই নিয়ে খুব গণ্ডগোল। চন্দ্রমাদের পাশের গ্রামের দুজন মজুর খুন হয়ে গেল। সুদামা বলছিল—এইসাহি মার খাতে রাহি। আউর কেতনা দিন এইসা চলি। একদিন দেখল গইল কি ঠাকুর সুরজ সিং ঘায়েল হো গইল, টাঙ্গিসে। সুরজ সিং হল পাশের গাঁয়ের মহাজন। কে ঘায়েল করেছে জিজ্ঞাসা করাতে ও বলল—ওর পাঁচটা আঙুল জমিদারেরা কেটে নিয়েছে বটে, কিন্তু কত হাজার হাজার আঙুল লকলক করছে যারা শক্ত করে টাঙ্গি ধরতে পারে।

সুমনদা কথা বলছিল না। টৌটনও চুপ। সুদামার গান শোনা যাচ্ছে—

রামকে চরনিয়া ছুঁই
জাগলি অহল্যা
কে করা ছুঁয়ালে গাঁওকে ধরতীয়া
কে করা ছুঁয়ালে...

সুমনদা বলল—হোমটাস্ক করেছ?

টৌটন ঘাড় নাড়ে। হয়নি সুমনদা।

—পরের দিন হোমটাস্ক ঠিক করে রাখা চাই।

—আপনি কখনো শহীদ দেখেছেন, সুমনদা?

কেন টৌটন?

—আমি শহীদ দেখিনি। কত শহীদবেদী দেখেছি। ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটে স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদ, আমাদের স্কুলে যেতে মোড়ের মাথায় একটা শহীদবেদী দেখি, রেলিং-এ ব্যাগ বিক্রি হয়, ওখানে শ্বেতপাথরে লেখা—১৯৫৯ সালের খাদ্য-আন্দোলনের শহীদ স্মরণে। স্কুলের পিছনে আইসক্রিম দোকানটার পাশের একটা শহীদবেদীতে লেখা ১৯৭০ সালের পুলিশের বর্বর বুলেটে নিহত শহীদ আশিস, তরুণ, বিকাশ, তোমাদের স্বপ্ন এখনো জেগে আছে।

—আশিস বেঁচে থাকলে ঠিক আমার বয়সী হত। ও আমার বন্ধু ছিল। ক্লাসমেট।

টোটন কিছুক্ষণ সুমনদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—সুমনদা, আপনার ঐ বইগুলো দেবেন, বিক্রী করে দেব। টাকাগুলো তো ওদের কাছেই যাবে, তাই না?

—কোথায় বিক্রি করবে তুমি?

—কেন, আমার কত ফ্রেন্ড আছে। পার্থ, চঞ্চল, রমেশ, কৃপাল সিং—আমি বললেই টাকা দেবে। এই তো সেদিন আফ্রিকার ড্রট্ অ্যাফেক্‌টেড্ চাইল্‌ড্‌দের জন্য সবাই দশ টাকা করে দিয়ে দিল।

—কিন্তু এই বইতো ওরা বুঝবে না!

—বইটা ইজ নট দি থিং সুমনদা, আমি চাইলেই টাকা দেবে, ম্যাটার অফ ফাইব ব্যাক্‌স। একটা আইসক্রিমের দাম। রোজই তো খাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে।

—তাহলে এক কাজ কর।

সুমন ঝোলা থেকে একটা বিল বই বার করে। বিহারের সংগ্রামরত কৃষকদের পক্ষে আপনার সাহায্য ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হল। দু টাকার কুপন।—দু টাকা মাত্র? নো প্রবলেম। জাস্ট দেখে নেবেন।

হোমটাস্ক করছিল। এরিথমেটিক-এর প্রফিট অ্যান্ড লস্। জবার মার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া চলছে। জবার মা পাঁচ টাকা মাইনে বাড়াতে বলেছে। মায়ের তাই রাগ। জবার মা এখন ফিফটি পায়। ফিফটি ডিভাইডেড বাই থার্টি। ইজকালটু 1.66 পারডে? অনলি 1.66? দুবেলা আসে। নো হলিডে। বাপি পাচ্ছে বোধ হয়, মাসে থ্রি থাউজ্যান্ড। মানে হানড্রেড রুপিস পারডে।

আরওয়াল কোথায়?—সুমনদার আঙুল ম্যাপের লাল হলুদ গোলাপী সব রং-এর উপর দিয়ে দ্রুত সরে গিয়েছিল।

ডোনেশন ফর আরওয়াল? হোয়াট ইস্ দ্যাট?—স্কুলে জিজ্ঞাসা করল কৃপাল সিং!

পার্থ, রমেশ, সুজয় ওরা অতশত কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। টোটন বলতেই কুপন কিনে নিয়েছে! টোটন রাফ খাতাটা খুলল। সেই যে সুমনদা একটা জিনিস করেছিল, জালিয়ানওয়ালাবাগের প্যারাগ্রাফটাই মাইনর কতকগুলি কারেকশন করে আরওয়াল বানিয়ে দিয়েছিল, সেই পেইজটা ছিঁড়ে নেয় টোটন।

—সী, দিস ইজ আরওয়াল। পে টু রুপিস ফর দেম।

—হোয়াই সো নয়েজ? ফাদার গোরে ক্লাসে ঢুকলেন।...

এর কিছুদিন পর টোটনের স্কুল থেকে স্পেশাল মেসেঞ্জার টোটনের মাকে একটা চিঠি

ধরিয়ে গেল। গার্জিয়ান যেন ইমিডিয়েটলি প্রিন্‌সিপালের সঙ্গে দেখা করেন। টোটন স্কুলে পলিটিকস করছে। পলিটিক্যাল প্যামফ্লেট ছড়াচ্ছে। চার্জশিটের সঙ্গে ঐ কাগজটার জেরকস কপি। আরও আছে—

He will not be allowed to attend classes till guardian comes. টোটনের বাবার কাছে টেলিফোনে খবর চলে যায়,—আজ সন্ধ্যের আগেই বাড়িতে এসো।

—তুমি এই প্যামফ্লেট ক্লাশে বিলি করেছ?

—বিলি করিনি, দ্যাখাচ্ছিলাম।

—চাঁদা চেয়েছ?

—হুঁ।

—কে তোমাকে এসব করতে বলেছে।

টোটন উত্তর দেয় না।

—সুমন এসব শিখিয়ে দিয়েছে। এসব তো সুমনের হাতের কারেকশন, তুমি সুমনকে বড় বেশি আশকারা দিয়েছ। টোটনের মাকে বলে টোটনের বাবা।—তুমিই তো সুমনকে বাড়িতে ঢুকিয়েছে। সুমন এসব করে তুমি জানতে না?

—কী করে জানবো, আমাদের হেডক্লার্কের ছোট ভাই, বেকার বসে আছে, ভালই রেজাল্ট...।

কলিং বেল। সুমনদা। টোটনের বাবার কপাল কুঞ্চিত হয়। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায় টোটনের বাবা। যাও টোটন ও ঘরে যাও। টোটন দ্যাখে—দাঁতে ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে আছে ঠাকুর অশোকতরু সিং....।

—খুব রস হয়েছে, না? এইটুকু ছেলেকে স্পয়েল করা হচ্ছে!

—কী বলছেন এসব, স্পয়েল ক্যানো?

—এটা কী? হোয়াট ইজ দিস? জালিওয়ানয়ালাবাগ কেটে দিয়ে আরওয়াল শেখাচ্ছ? এসবের মানেটা কী?

—মানে আবার কী, নিজের দেশের ইতিহাস জানবে না?

—ডোন্ট আরগু।ইউ নিড নট কাম।প্লীজ গো আউট।পেমেন্ট তোমার দাদাকে দিয়ে দেব।

টোটন জানতো সুমনদাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে। টোটন ততক্ষণে ছাতে উঠে যাচ্ছে, ছাত নয় চট্টগ্রামের জালালাবাদের পাহাড়। ১৪ বছরের টেগ্‌রা বল জালালাবাদের পাহাড় বেয়ে উঠছে। মাস্টারদা ওর মুখ চেয়ে বসে আছে পাহাড়ের জঙ্গলে...।

টোটন ওদের ছাতের রেলিং-এ দাঁড়িয়ে আছে। সুমনদা মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। ছোট্ট একটা ইটের টুকরো সুমনদার গায়ে ফেলল টোটন। সুমনদা ওপরের দিকে তাকাল। টোটন হাতের ইশারায় বলল একটু দাঁড়ান। টোটনের কাছে তখন রয়েছে কয়েকটা কুপনের দাম আর বিল বই। টোটনকে ছুঁতে পারলে ভাল হত। টোটন হেসে ওঠে, সুমনদাও টোটনের মনে হল ইথিওপিয়া, আরওয়াল, জিম্বাবোয়ে, চম্পারণ, নিকারাগুয়া—ভূগোলের সব রং হেসে উঠেছে তখন...।

তখন ঢোল বাজিয়ে সুদামা গান করছে। অড়হড় কিংবা তিসি খেতের মাটিতে মিশে আছে ওর আঙুল, আঙুলহীন হাতের উষ্ণ ও নরম মাংস ঢোলের গায়ে নয়, যেন বারবার টোটনের পিঠের উপরে এসে পড়ে, যেন কনগ্রাচুলেশন টোটন, কনগ্রাচুলেশন।

সত্তর দশক, ১৯৮৭

শনি

শনির পড়িলে দৃষ্টি শান্তি নাহি তার।
শনীশ্বর কোপে হয় বৈগুণ্য অপার।।
যদি করে শনিপূজা প্রতি শনিবারে।
যা কিছু দুঃখকষ্ট শনিদেব হরে।।
শনির পাঁচালি কথা হল সমাপন
হরি হরি বল মুখে মিলি বন্ধুগণ....
...শনি প্রীতে হরি হরি বল, হরি বোল, বোল হরি।

এবার সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে শনিদেবতার কাছে মনোবাঞ্ছা জানাতে থাকল।

তাজুদ্দিন পিছনে বসেছিল এতক্ষণ। হিন্দুদের মত ঠিক এভাবে প্রণাম না করে 'সিজদা'র ভঙ্গিতে হাঁটুমুড়ে কপাল মাটিতে ঠেকায়। ওর মনোবাঞ্ছার সংখ্যা এত বেশি ছিল যে অন্যরা উঠে বসার পরেও তাজুদ্দিন ঐ 'সিজদা'র ভঙ্গিতেই ছিল। তাই দেখে বিপ্রদাসবাবু বললেন—দেখেছ, তাজুমিঞা মুসলমান হলে কি হবে, ভক্তিটা দেখেছ, বিশ্বাসই হল আসল কথা!

'বিশ্বাস' কথাটার উপর বেশ জোর দেন বিপ্রদাস বাবু। উনি পঞ্চায়েতের সদস্য। ওঁর বাড়িতেই এই ধুমধামের শনিপুজো। বিপ্রদাসবাবু ঠাকুরনগর প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের কম্পাউন্ডার। টেবিলের উপর দেখা যাচ্ছে সচিত্র অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা, ডাক্তার এম পাণ্ডে প্রণীত। এই ঝাউডাঙা গ্রামে তাঁর ভালো প্র্যাকটিস। তিনি রুগীদের বলেন—বিশ্বাস রাখো, ভাল হয়ে যাবা।

ভোটের বক্তৃতাতেও তিনি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে বলেন। তাঁর মেয়েদের রং ফর্সা। মেয়েরা সিন্নি মেখেছে। বিপ্রদাসবাবু দুটো কম বয়সের ছেলেকে বললেন—কমরেড ভায়া, সিন্নি পেসাদিটা ডিস্টিবিউট্ করি দাও দি'নি। সিন্নি বিতরণ হল। বেশ খাসা সোয়াদ হয়েছে। তাজুদ্দিন আরেকটু চাইল। অনেকটা দুধ পড়েছে।

ওপারে বাংলাদেশ, এপারে ইন্ডিয়া। মাঝে বহে নদী ইছামতি। একটা নৌকা এপার-ওপার করে। এপারে নাইলন গেঞ্জি আর জয়বাংলা প্যান্ট পরা কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে থাকে, ওপারেও কয়েকজন। বর্ডার সিকিউরিটির কয়েকজন ফোর্সও পেলেন ড্রেস-এ, মানে নাইলন গেঞ্জি আর জয়বাংলা প্যান্ট পরে কাছাকাছিই থাকে। ইছামতি বহে যায় আর একটা নৌকা এপার-ওপার করে। এপার থেকে জিনিস যায়, ওপার থেকে জিনিস আসে। এখন চলছে গুড়ো দুধের 'জো'। খুব আসছে।

তিনচাকার ভ্যানগাড়িকে এ অঞ্চলের লোক বলে হেলিকপ্টার। ইছামতির পার থেকে ঐসব জিনিসপত্র হেলিকপ্টার বোঝাই হয়ে চাঁদপাড়া যায়, গোবরডাঙা যায়, তারপর ট্রেনে-টেম্পোতে দেশের রক্তের মধ্যে মিশে যায়। ঝাউডাঙা থেকে যে রাস্তাটা চাঁদপাড়া বাজারের দিকে গেছে, সেই রাস্তার ধারেই ভোমরার বিল মৌজায় তাজুদ্দিনের ছোট মুদি দোকান।

আসলে ওটাই বসতবাড়ি। বারান্দাটা বাঁশের বেড়ায় ঘিরে নিয়েছে।

কীই বা এমন বিক্রী। 'একটা পাঁচ পয়সার নজেন দাও' খদ্দেরই বেশি। দোকানে বসে বসে তাজুদ্দিন দেখছে ডেলি ডেলি গুড়া দুধের বস্তা যাচ্ছে চাঁদপাড়া বাজারের দিকে।

বিপ্রদাসবাবুর বাড়ির শনিপুজোর সিন্নিতে এই দুধই এত স্বাদ দিয়েছে।

কেমন খাতিছ সিন্নি? তাজুদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করলেন বিপ্রদাসবাবু। তাজুদ্দিন অমায়িক হাসি হেসে বলে, দুধ কতটা দেছেন। বিপ্রদাসবাবু দু হাত ফাঁক করে একটা আয়তন দেখালেন। বোঝা গেল বিপ্রদাসবাবু মেপে দেননি। বেশ ক'খাবলা গুঁড়ো দুধ মিশিয়েছে সিন্নিতে। বাড়িতে হয়তো একটা গোটা বস্তাই কিনে রেখেছেন। বিপ্রদাসবাবু তাজুদ্দিনকে বললেন— রাখো না এক বস্তা। এখন হাপেরও কম দামে পাবা ; প্যাকেট করি বিক্রী করবা, লাল হয়ি যাবা।

তাজুদ্দিন পুলকিত হল। তাজুদ্দিন বেশ পাত্তা পাচ্ছে এখানে। মুসলমান হয়েও শনিপুজোয় এসেছে তাজুদ্দিন—এই ঘটনাটা বিপ্রদাসবাবুর পক্ষে গৌরবের, নাকি তাজুদ্দিনের, নাকি শনি ঠাকুরের?

তাজুদ্দিন নিজে ফরজ ওয়াজির ছোন্নত যতটা সম্ভব পালন করার চেষ্টা করে। তবে নিজেকে মোমেন ভাববার মত ভদ্রলোক ও নয়। গরিব লোকের এসলাম একটু আলাদা রকমই হয়। কোন ইমানদার মোমেন মোছলমান কি বটতলায় হিন্দু গণৎকারের কাছে হাত দেখায়?

তাজুদ্দিনের বাচ্চাকাচ্চা পয়দা হচ্ছিল না কিছুতেই। ওর বিবি হাসুনারার ব্যাজার মুখ। আর মুখে লেগে থাকে ভয়। দু-হাতে তাবিজ-তুবিজ। চাঁদপাড়া বাজরের আবদুল ওহাব সাহেবের কাছে গিয়ে জোহল সেতারার নেকনজর লাগার জন্য স্পেশাল এক তাগড়াই তাবিজ নিয়ে এসেছিল। কথা ছিল তিনমাসের মধ্যেই মনের এয়াদা হাছিল হবে। সাড়ে-তিন মাস হয়ে গেল। একদিন সকালবেলা হাসুনারা নাভির নিচে হাত দুটো দিয়ে তাহ্‌রিমা বেঁধেছে, এবারতো চোখ বুজে চুপচাপ দোয়াছানা পড়ার কথা, হঠাৎ কি যে হল ওর, বিসমিল্লাহ রহমানে রহিম বলেই তাজুদ্দিনের পায়ের কাছে ছেস্‌দা করল। তাজুদ্দিন শুনল হাসুনারার কান্না জড়ানো কথা—

ছেলেপেলা দিতে পারলাম না মুয়ে, আমারে তালাক দেবানা। কও, কোনোদিনও তালাক দেবানা? হাসুনারা ওর সমস্ত শরীরটা হেঁচড়ে তাজুদ্দিনের পায়ের কাছে এনেছিল। চোখের পানিতে পা ভিজেছিল তাজুদ্দিনের। মনে হল ওর, একরকম অজু হয়ে গেল। চোখের পানি পাক, না না-পাক?

বনগাঁবাজারের বটগাছতলায় পিস্‌বোর্ডে হাতের ছবি এঁকে যে লোকটা বসে, তার কাছে হাত পেতে দিল তাজুদ্দিন। বলল—দেখে কয়ে দিন দেখি বাবাঠাকুর, বরাতে বাপ হওয়া হবে কিনা। ঠাকুরমশাই মুখটা দেখে নিয়ে হাতটা দেখলেন। তারপর আবার মুখ।

তাজুদ্দিনের লুঙ্গি পরনে ছিল না। জয়বাংলা প্যান্ট আর শার্ট। থুতনিতে নুর ছিল, তাইতেই বোধ হয় ঠাকুরমশায়ের পাকা চোখ ঠিক ঠিক ঠাউরে নিল।

বলল—মোছলমান?

—হু।

শুক্র ডাউন। শনির কুদৃষ্টি। শনিপুজো দিতে হবে। পারবেন?

—নিজের ঘরে?

—কোনো হিন্দুর ঘরে, যেখানে শনিপুজো হয়, সেখানে পাঁচসিকে করে দেবেন! আর শ্বেত-বেড়ালের মূল, রামবাসকের মূল মিশিয়ে মাদুলি দিলাম। নীল সুতোয় শনিবারে ধারণ করবেন।

কোনো হিন্দুর ঘরে প্রতি শনিবারে আজকাল আর শনিপুজো হয় না। বিপ্রদাসবাবু মাসে একবার করে শনিপুজো দেন। চাঁদপাড়া বাজারে প্রতি শনিবারে চাঁদপাড়া বাজার ব্যবসায়ী সমিতি দ্বারা মাইক বাজিয়ে শনিপুজো হয় বটে সে তো বেশ দূর, নিজের সাইকেলও নেই, তাই হেলিকপ্টারের পাইলট, যারা ঝাউডাঙা চাঁদপাড়া যাতায়াত করে তাদের হাতে পয়সা পাঠিয়ে দেয়। তাজুদ্দিন প্রথম দিন জিজ্ঞাসা করেছিল—ঠিক ঠিক দিবি তো? পাইলট কান ধরে জিভ কামড়ে বলেছিল—কিরম আশ্চয্যির কতা কচ্চো, শনিঠাকুরের নামে দেচ্চো, নিজে খেয়ি ফেল্লে মাথাডা আর বডিতে ক্রসিং হয়ে যাবানে।

যেভাবেই হোক, পোয়াতী হল হাসুনারা। তাজুদ্দিনের শনিঠাকুরে ভক্তি হল। বনগাঁ বাজারের ঐ গণৎকারকে ছালাম জানিয়ে এল। এরপরই ঐ গণৎকার পিস্‌বোর্ডে লিখল—হিন্দু-মুসলমান সবাই ফল পাইয়া থাকে। প্রমাণ দিব।

মুসলমানেরা অনেকেই তাজুদ্দিনকে প্যাঁক-বিদ্রূপ করে, এমনকি মোনাফেক পর্যন্ত বলে ফেলে। তাজুদ্দিনও কম যায় না। ও মছলা-মাছায়েল পড়া বিদ্যায় বলে—কেন? মোশরেকরাও তো আল্লাতালার অংশীদারী স্বীকার করে। তারপর তাজুদ্দিনের যুক্তি হল শনিঠাকুরের মধ্যে আল্লাতাল্লার অংশ থাকতেও পারে।

যাক্‌গে যাক্‌। যেভাবেই হোক, হাসুনারার পেটে বাচ্চা এসেছে। জোহলের স্পেশাল তাবিজেই হোক, ঘুটিয়ারী শরীফের মানতেই হোক বা শনির দোয়াতেই হোক, যার কেরদানীতেই হোক, এসেছে। নেমকহারামী করতে পারবে না তাজুদ্দিন। বাচ্চা পয়দা হলে ঘুটিয়ারীতে গিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে সিন্নি চড়িয়ে আসবে তাজুদ্দিন। শনিঠাকুরকে নিয়মমতো পুজো দিচ্ছে। বনগাঁর ঐ বাবাঠাকুর বলেছে, বাচ্চা পয়দা না হওয়া পর্যন্ত শনিপুজো দিয়ে যেতে হবে প্রতি হপ্তায়। দু-টাকা দিয়ে একটা শনির পাঁচালিও কিনেছে তাজুদ্দিন। হাসুনারা পড়তে পারে না, মলাটের নীল বর্ণের ছবিটা হাঁ করে দেখছিল, তাজুদ্দিন যেন খালিফা, হাত নেড়ে বলেছিল—আসলে নৈরাকার, হিঁদুরা একটা এ রকমপানা তাস্‌বির বানায়েছে।

হাসুনারা ওর ঘরে ঐ শনির পাঁচালিকে মছলা-মাছায়েলের সঙ্গে ঘরের কুলুঙ্গিতে রেখে দিয়েছে।

চার মাসের সময়ে একদিন রাত্রে হাসুনারা একটা স্বপ্ন দেখে চিৎকার করে উঠেছিল। ও দেখেছিল এক ঘোর নীল বর্ণের দীর্ঘদেহী পুরুষ, চোখের মধ্যে যেন টর্চ লাইট জ্বলছে, শকুনের পিঠে চেপে এল। সে এসে ভয়ংকর হাত দিয়ে আস্তে আস্তে তুলে ফেলছিল হাসুনারার শায়া। এ সময় তুমুল চিৎকার করে হাসুনারা। বাকিরাত ঘুম আসেনি।

সকাল হতে স্বপ্নটার কথা বলেছিল হাসুনারা। তাজুদ্দিন ওকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—ফেরেশতা রে, ফেরেশতা। ফেরেশতাই শনিঠাকুরের বেশ ধরি এসে তোর যোনিতে রূহ ফুঁকি দে গেছে। সেদিন বড় আনন্দে কেটেছে তাজুদ্দিনের।

হাদিসে আছে—মায়ের পেটে চল্লিশ দিন সন্তান থাকে শুক্রাকারে, পরের চল্লিশ দিন

রক্তের আকারে, পরের চল্লিশ দিন মাংসপিণ্ডের আকারে। তারপর আল্লাতালা ফেরিশতা পাঠিয়ে দেন। ফেরিশতা যোনিদ্বারে ফুঁক দিয়ে রুহ বা প্রাণ ঢুকিয়ে দেন। এ কথা গত সালে সুঁটেবাসায় হাজি কোরবান আলি সাহেবের মজলিশে জেনেছিল।

এখন আটমাস চলছে হাসুনারার, দেখতে এখন মনোহর হয়েছে।

কাঁথা সেলাইয়ে মেতেছে ও। উঠোনের কোণে দুটো তালের আঁটি পুঁতেছে। এক পুরুষ রোয় আঁটি, পরের পুরুষ খায় পরিপাটি। হাসুনারার পেটের উপর কান রেখে আজানের আওয়াজ পেয়েছে তাজুমিঞা। এ সময় পুষ্টির খাবার খাওয়ানো বড় জরুরি। তাজুদ্দিন খুব দুধ খাওয়াচ্ছে, সস্তার দুধ। মিলিক পাউডার। গরম জলে ক'চামচ গুলে দাও, ব্যস, দুধ হয়ে গেল। এ অঞ্চলের গৃহস্থালিতে মিল্ক পাউডারের চল নেই। চায়ের দোকানে দু-একজন মাঝে মাঝে এই পাউডার-দুধের চা-টা করত, এই পর্যন্ত। বাংলাদেশি পাউডার-দুধের হঠাৎ আমদানির কারণে গুড়ো দুধ হঠাৎ শস্তা হওয়ায় ঘরে ঘরে চলছে। এক-টাকার গুঁড়ো দুধে তিনপোয়ার মত দুধ হয়ে যাচ্ছে। চাঁদপাড়া স্টেশনের গায়ে লাগানো দেয়াল পত্রিকায় একটা ধাঁধাঁ বেরিয়েছে—

'মুখ নাই বাঁট নাই আজব এক গরু
বালতি গয়লা কিচ্ছু নাই কর দুধ দোয়ানো শুরু।

উত্তর লেখা আছে—পাউডার মিল্ক।

তাজুদ্দিনও একটা ১০ কেজির ছোট বস্তা কিনেছে। তারপর পঞ্চাশ গ্রাম একশো গ্রামের পলিথিনের প্যাকেট করেছে, কেরোসিন কুপির আগুনে মুখ সাঁটিয়েছে। খাটুনির মানুষেরা এক এক প্যাকেট নিয়ে যাচ্ছে। টাকায় টাকা লাভ।

বনগাঁ থেকে মাল কিন ফেরার সময় ট্রেনের দেরি দেখে বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবি দেখছিল তাজুদ্দিন। বউ পুড়িয়ে পণের লোভে আবার বিয়ে, ষোড়শী বালিকা ও বাহাত্তুরে বৃদ্ধের প্রেম, পরকীয় প্রেমে মজা বেশি কেন? দুধের নানারকম। মলাটের গায়ে ডিশে সাজানো নানারকমের খাবার। মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা। ওর ঘরে এখন অনেক দুধ। দুধের নানারকম করার জন্য একটা বই কিনে নিল তাজুদ্দিন । খুলে দেখে ক্রিম কাস্টার্ড, মিল্ক-চকোলেট আইস্ক্রিম, ভাপা দই, কুলফি মালই।

উপকরণ ঘন দুধ, এসেন্স অফ ভ্যানিলা, কর্ন পাউডার, জিলেটিন ডাস্ট... এসব কী বস্তু, খায় না মাথায় দেয়? এক শনিপুজোর দিনে বিপ্রদাসবাবুকে দিয়ে দেয় বইটা। ওনার কাজে লাগতে পারে। বিপ্রদাসবাবু সহজ অ্যালোপাথি চিকিৎসার দ্বিতীয় খণ্ডের তলায় চাপা দিয়ে রেখে দেয়।

এখন আট মাস, হাসুনারার পেটে এখন বাচ্চাটা কী হালে আছে তা ভালই জানে তাজুদ্দিন। শাদির সময় হাসুনারার ফুফা একটা ছায়েতনামা উপহার দিয়েছিলেন। সেখানে আওরতের হামেল হইলে লাড়কা মায়ের পেটে কী হালে থাকে তাহার বয়ান কতবার পড়েছে তাজুদ্দিন।

এক মাস গর্ভ হইলে মায়ের উদর
তার মাঝে জন্ম লয় এক মনোহর
হাড়ে চামে হৃদপিঞ্জর ছাড়া হয়
দুই মাস গত হইলে মাথা জন্ম লয়...

পঞ্চম মাসেতে ফুল ফুটে হয় মুখ
প্রদীপের মত হয় হাসির চমক
পতির সঙ্গে না মিলিয়ে পঞ্চমাস হৈলে
মিলিলে কুষ্ঠের ঘায়ে মরিবে সে ছেলে
ছয় মাসে সব পদ সব অঙ্গ হয়
মাইনষের আকৃতি হইয়ে পেটে শুয়ে রয়
জ্ঞানবান হয় শিশু সপ্তম মাসেতে
গমনাগমন করে রিতু সহায়েতে
বীর্য্যের জ্বলন শিশু সহিতে না পারে
জনমিয়া আসিতে চায় ভবের মাঝারে
অষ্টম মাসেতে শিশু নিচু হয়ে যায়
এ পাশে ও পাশে হেলে, ভবে আসতে চায়...

কদমগাছের যে ডালটা একেবারে কাছে নুয়ে পড়েছে সেই ডালে একটা দোলনা বেঁধে দেবে তাজুদ্দিন।

ইছামতির ওপার থেকে পলি-ইস্টার—ইলেকট্রনিক্স্ যেমন আসে, পীর মৌলানা হাজিরাও মাঝে মাঝে আসেন। সুঁটেবাসা গ্রামের পীর হায়দার আলির মাজারে উরস্ উৎসবে খুলনার বাগেরহাটি থেকে এসেছেন হাজি কোরবান আলি সাহেব। তিনি এবারে বক্তৃতা দিলেন না। বললেন, যার মনের মধ্যে যা-যা প্রশ্নের এয়াদ হয়, তার জবাব দেবেন।

একজন পরিবার-পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। হাজি সাহেব একটা আয়াত উচ্চারণ করে বললেন—রসুলাল্লাহ বলিছেন—তোমরা সন্তান উৎপাদন কর এবং সংখাধিক্য হও। কারণ আমি আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে কেয়ামতের দিন গর্ব করব।

একজন প্রশ্ন করল—এখনো আর পর্দার দরকার আছে কিনা। হাজি সাহেব একটু মৌন রইলেন তারপর হেসে বললেন—প্যাট্রলের সঙ্গে আগুনের যে সম্পর্ক, জিহ্বার সঙ্গে টকের যে সম্পর্ক, টক দেখলি জিহ্বায় পানি আসবে, তেমনি বেপর্দা নারীকে দেখলি পুরুষের কাম-জিহ্বায় পানি আসবে। নীল নীল মাছি দেখিছো, মাছি আমকাঁঠালের গন্ধে ভোঁ-ভোঁ করি এসি পড়ে। যদি ছাড়ানো না থাকে তবে খোসার বাইরি ভোঁ-ভোঁ করি কাটি পড়ে, মধু আর খাতি পারে না। পর্দা হল সেরকম খোসা। খোসার ভিতরি মধু থাকে। মাছি টাচ করতি পারে না। বোঝলা না?

একজন বলল—শোনা যাচ্ছে গুঁড়ো দুধে নাপাকী আছে। বংলাদেশ সরকার বেআইনি করি দেছেন এই দুধ। এদেশের মোসোলমানেরা কি এই দুধ খাতি পারে?

হাজিসাহেব মুজিবরি কায়দা বললেন—না, এই দুধ তোমরা খাবা না। বাংলাদেশে ইসলামের নব অভ্যুদয় দেখি কাফের ফাচেক্‌দের চোখ টাটাতি লেগেছে, বোঝলা না, এই দুধ রাশিয়া-টাশিয়া দেশ থে আসতিচে। এই দুধের মধ্যে এমন খারাপ জিনিস মিশোচ্চে যাতে জাতি কমজোরি হয়। গর্ভবতী মা-জননীরা মোটে এই দুধ ছোবা না।

তাজুদ্দিন ব্যাকুল জিজ্ঞাসা করে—এই দুধ খেলে গর্ভবতীর কী হয়?

হাজীসাহেব বললেন—সন্তান বিকলাঙ্গ হয়।

তাজুদ্দিনের তখন ভীষণ জলতেষ্টা পেল। ছুটল।

সোজা বাড়ি ফিরলে তাজুদ্দিন। হাসুনারা তখন দুধ গুলছিল জলে।

তাজুদ্দিন বলল, এ দুধ আর খাওয়া চলবে না।

—ক্যানো? দাম বেড়ে গেছে বুঝি?

—দামের কারণে নয়, কেমন উল্টোপাল্টা শোনা যাচ্চে।

তাজুদ্দিন এইরকম উল্টোপাল্টা কথা আবার শুনল ঝাউডাঙা বাজারের মিঠাই দোকানে। প্যাকেট-করা দুধগুলি থলেতে পুরে মিঠাই দোকানে নিয়ে গিয়েছিল। যে দুধ নিজের বিবিকে খাওয়াবে না, সে দুধ হাতে ধরে অন্যকে দেবে কী করে? তাই কেনা দামেই বিক্রী করে দিতে চেয়েছিল তাজুদ্দিন। মেঠাই দোকানের মালিক গদাধর ঘোষ বলল—এ দুধ সে নেবে না। চাঁদপাড়া-বনগাঁর বড় বড় ঘোষেরা এসব নিতে পারে। গদাধর ঘোষ ছোট কারবারী হতে পারে, কিন্তু যে দুধে কলঙ্ক পড়েছে সে দুধে সে মিষ্টি বানায় না।

—কলঙ্কের কতা কচ্চ কেন?

তখন গদাধর ঘোষ বলে—ওর এক সম্বন্ধীর ভাই, খুলনার এক বড় দোকানের মেঠাইমণ্ডার কারিগর। সে বেকার হয়ে দু-দিন হল এখানে এসেছে।

দোকানেই ছিল খুলনার সেই কারিগর। এখন এই দোকানে কাজে লেগেছে। ওর কাছে তাজুদ্দিন শুনল বাংলাদেশে গুঁড়ো দুধ দিয়েই মণ্ডা মিষ্টি তৈরি হয় আর সেই দুধ আসে বাইরে থেকে। বাংলাদেশ সরকার এই দুধের ব্যবহার নিষেধ করে দিয়েছে। তাই বড় বড় মিষ্টির দোকান বন্ধ।

এই দুধ বন্ধ করে দিয়েছে কেন?

—এই দুধে বিষ আছে। 'রেডিও-বিষ'।

—'রেডিও-বিষ' কী বস্তু?

বাংলাদেশী কারিগর মাথা চুলকোয়।

গদাধর বলে—ছাইন্‌ছ মারাচ্চে না সব, ছাইন্‌ছ। সেবেন কেলাসে নাতিটা পড়ে, তার তিনরকম ছাইন্‌ছের বই। এমনিতে হয় না, ন্যাকড়া জড়িয়ে। সার দেচ্ছো, মোটা মোটা মুলো খাচ্চো, রেডিও শোনচো, ঘরে ঘরে রেডিও। টিভিও কতগুলো এসিচে গ্রামে, বাতাসে ইলেক্‌টিরিক ঘুরতেচে না?

এই গুড়ো বাতাস থে রেডিও-টিভির ইলেক্‌টিরি শোষণ করি নেচ্চে। গুঁড়ো দুধের এই খ্যাম্‌তা আছে।

তাজুদ্দিন আবার ব্যাকুল প্রশ্ন করে—এ দুধ যদি কোন গর্ভবতী নারী ডেলি ডেলি খায়...।

—লোকে তো বল্‌চে বিকলাঙ্গ সন্তান হবে।

শনিঠাকুরের শকুনটা যেন ডানা ঝাপ্‌টে ওঠে। বিস্‌মিল্লাহের রহমানে রহিম। সোজা ছুটল বিপ্রদাসবাবুর চেম্বারে। সবকথা বলল তাজুদ্দিন।

বিপ্রদাসবাবু হেসে তাজুদ্দিনের কাঁধে চাঁটি মারলেন। বললেন—অতো ভয় পাবার কী আছে? লোকেতো বলে বিড়ি-সিগারেট খেলে ক্যান্সার হয়। এত লোক তো খাচ্ছে, সবার কি ক্যান্সার হচ্ছে? আমার মেয়ের তো বাচ্চা হবে, সে তো আমার কাছেই আছে। সেও তো কম গুঁড়ো দুধ খায়নি, কিস্‌সু হবে না। গুজবে কান দিতি নাই।

দু-দিন পরেই একটা সর্বাধিক প্রচারিত খবর কাগজের পাঁচের পাতায় বেশ বড় করে

একটা খবর বের হল—তেজস্ক্রিয় দুধ। বাংলাদেশে বড় বড় মিষ্টির দোকানগুলি গুঁড়োদুধের উপর নির্ভর করে থাকে। এই গুঁড়ো দুধ বাংলাদেশ পোল্যান্ড থেকে আমদানি করে। বেশ কিছুদিন আগে রাশিয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেই দুর্ঘটনার পর পারমাণবিক ছাই-এর কিছু অংশ পোল্যান্ডের চারণক্ষেত্রের উপর পড়ে। ফলে ঐ অঞ্চলের ঘাস ও শস্য তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে ঐ অঞ্চলে পশুদুগ্ধেও তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন পাওয়া যায়। সেই দুধ থেকে যে গুঁড়ো দুধ তৈরি হয়েছিল, সেই গুঁড়ো দুধ পোল্যান্ড বাংলাদেশে রপ্তানি করে দেয়। বাংলাদেশের বিজ্ঞানকর্মীরা ঐ দুধে রেডিও-অ্যাকটিভিটি শনাক্ত করেন। বিজ্ঞানকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের চাপে বাংলাদেশ সরকার গুড়োদুধের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন। তবে ভারতবর্ষে এই বিপদের সম্ভাবনা নেই, কারণ ঐ অঞ্চলের দেশগুলি থেকে ভারত দুধ আমদানি করে না।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত এই খবর চাঁদপাড়া-ঝাউডাঙা ভোম্‌রার বিল-এর মানুষজন পড়ে। পারমাণবিক ছাই কী জিনিস? রেডিও-অ্যাকটিভিটি কী? কোথায় চেরনোবিল? কেন চেরনোবিল? ভোমরার বিল-এর তাজুদ্দিনের ঘুম আসে না।

দুধের বাকি প্যাকেটগুলি দোকানে পড়ে আছে। এ তুমুল গাঢ় সমাচার যাদের কাছে পৌঁছায়নি কিংবা যাদের জীবনে এই সমস্ত খবরকে গুরুত্ব দেবার কোন সুযোগ হয়ে ওঠে না, সেরকম কেউ শস্তার দুধের প্যাকেট খোঁজ করতে এলে তাজুদ্দিন বলে, বিক্রী নেই।

তাজুদ্দিন অবহেলায় দোকানঘরের কোণে ফেলে রেখে দিয়েছে দুধের প্যাকেট।

ঝাউডাঙা মৎস্য সমবায় সমিতির অফিসের চৌকিদারের ছেলে বি. এস. সি. পাশ। বেকার। মেলা টিউশানি করে। তাজুদ্দিন ধরতে ও বুঝিয়েছে—রেডিও-বিষ মানে ঘড়ির ডায়াল থেকে রাতের আন্ধারে যেরকম পানা আভা বেরোয়, এই দুধের মধ্যেও সেরমপালা তেজ আছে।

তাজুদ্দিন রাতের অন্ধকারে ওর দোকানের কোণের অবহেলার দুধের প্যাকেটগুলোর দিকে স্থির চেয়ে দেখেছে, কোন আভা, কোন তেজ দেখে নি ; শুধু অনেক ইঁদুর আর আরশোলার উজ্জ্বল চোখ দেখেছে।

পরদিন খবর এল বিপ্রদাসবাবুর মেয়ে একটা সন্তান প্রসব করেছে। মৃত এবং বিকলাঙ্গ।

তাজুদ্দিন তখন দোকানে ছিল। তক্ষুণি দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিল। সূর্যকে নিভিয়ে দেবার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে ফুঁ দিল তাজুদ্দিন, বিশ্বচরাচরে এক্ষুনি সর্বাত্মক হরতাল হয়ে যাওয়া উচিত।

তাজুদ্দিন ওর ঘরের ভিতরে গিয়ে হাসুনারাকে চিৎ করে শুইয়ে ফেলল, ওর পেটের উপর চেপে ধরল নিজের কান। চিৎকার করে বলল—ধুকপুকি আছে তো? লড়েচড়ে তো?

হাসুনারা এসবের মানে বোঝে না কিছু। সে বলে—হ্যাতো, লড়চড়া ভালই ঠাহর হয়।

তাজুদ্দিন বাইরে আসে। শরতের রোদ জরির চাদরের মতো বিছিয়ে রয়েছে। আকাশ যেখানে মাটিতে মিশেছে, সে পর্যন্ত সবুজ হয়ে আছে। পশ্চিমে আবছা গাছ-গাছালির রেখা, আরো পশ্চিমে রেললাইন, আরো পশ্চিমে যশোর রোড, কতটা পশ্চিমে গেলে চেরনোবিল?

তাজুদ্দিন ঠিক বুঝতে পারে না কিসের কারণে এই সব চেরনোবিল হয়? কেন জলের

মধ্যে ঘাসের মধ্যে দুধের মধ্যে রেডিও-বিষ? মানুষের মনের মধ্যে রেডিও-বিষ? ফেরেশতা কীসের কারণে তার সোনালি ডানা ছিঁড়ে ফেলে হীরে-জহরতের মুকুট খুলে ফেলে নীলবর্ণ হয়ে শকুনের পিঠে চড়ে এসে কোন ভয়ংকর বিষ-বাতাস ফুঁকে দিচ্ছে আসছে-দিনের মানুষের আত্মায়-শরীরে?

তাজুদ্দিনের মনে পড়ে আজ শনিবার। আজ চাঁদপাড়া বাজারের বারোয়ারি শনিপুজোর পাঁচসিকে দিয়ে আসতে হবে। তাজুদ্দিন ভাবে আর যাবে না, এই ভয়ের দেবতাকে ঘুষ দিতে যাবে না ও, কিন্তু ভয় ওকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। বাজারে শনির বাক্সে পয়সাটা ফেলে দিয়ে বলে, বিস্‌মিল্লারহমানেরহিম।

চাঁদপাড়া হাইস্কুলের বিজ্ঞান-শিক্ষক সৈয়দ সামসুদ্দিন জামাল। তাজুদ্দিনের সঙ্গে একটু চিন-পরিচয় ছিল। নামকরা শিক্ষক। আন্ত্রিক মহামারির সময় ক্যাম্প করে গুড়-নুনের দাবাই দিয়ে অনেকটা আসান করেছিলেন। সামসুদ্দিন সাহেব নিচেই ছিলেন। ছালাম করল তাজুদ্দিন। ভণিতা না করেই বলল—আমার মুশকিল আসান করেন, সামসুদ্দিন সাহেব। বিবিকে রেডিও-বিষের দুধ খাইয়েছি, প্রতিকার কী? ব্যাপারটা বুঝতে সামসুদ্দিনের অনেকটা সময় লাগল। যখন বুঝল, তখন বলল—দুধে রেডিও-অ্যাকটিভিটি ছিল, তা আপনি কেন ভাবছেন যে আপনার সন্তানও বিকলাঙ্গ হবে?

সামসুদ্দিনের থুতনিতে নুর নেই, চোখে চশমা, সব কপাল কুঁচ্‌কোনো।

—বিপ্রদাসবাবুর মেয়ের ঘরে যে বিকলাঙ্গ বাচ্চা হল অথচ উনি তো ডাক্তার...।

—তাতে কী হয়েছে? হাজার কারণেই তো বিকলাঙ্গ হয়। তাছাড়া বিপ্রদাসবাবুর জামাইতো একটা চীজ। আপনি খামোকা চিন্তা করছেন।

—কিন্তু চেন্নোবিলের বিষ...।

—চেরনোবিল কি একটা? এরকম কত আছে, ভারতবর্ষেও আছে। জাপানে অ্যাটম বোম পড়ার তিরিশ বছর পরেও কিছু কিছু বিকলাঙ্গ শিশু জন্মাচ্ছে।

অ্যাটম থেকে অস্ত্র তৈরি বলুন, শক্তি তৈরি বলুন, বিপদ আছে। তা বলে আপনার সন্তানও যে বিকলাঙ্গ হবেই তার কোন মানে নেই। তাজুদ্দিনকে আশ্বস্ত করার জন্য কাঁধে মৃদু চাপ দিল সামসুদ্দিন।

কিন্তু ভয় ওর কাছ ছাড়ে না, চেরনোবিল কত হাজার মাইল দূরে তাজুদ্দিন জানে না, কিন্তু এতদূর থেকেও ছুটে আসে ইব্‌লিশ। ওকে তাড়া করে। ও ছুটতে ছুটতে চাঁদপাড়া বাজারের কাছে আবদুল ওহাব সাহেবের দরজায় এসে থামে। জোহরার তাবিজ দিয়েছিল ওহাব সাহেব। ছালাম করতেই ভুলে যায় তাজুদ্দিন। নিশ্বাস না ফেলেই বলে—সন্তান যেন ভাল হয় সে-ব্যবস্থা করে দিন পীরসাহেব।

পীরসাহেব জোহরার তাবিজে কাজ হাসেল হয়েছে বলে প্যাচাল গাইলেন। তারপর তাগদ্‌ওয়ালা লেড়কার জন্য সাতঙা-দেওকে খেদমত করতে হবে বলে একটা তাবিজ দিলেন। সাতঙা-দেও দোজখের শয়তান, ওকে ঠাণ্ডা রাখতে হবে। এই শয়তানের কেরদানিতেই সন্তান বিকলাঙ্গ হয়। বললেন, কালো সুতোয় বেঁধে কোমরে ঝোলাবি আর একটা বয়ান লিখে দেব, সাতঙা-দেওকে পুছবার বয়ান। তাবিজ ঝোলাবার সময় এই বয়ানটা পড়তে হবে।

শাহা সোলেমান নবী   বুঝিবা কাজের খুবি
পুছে সাতঙা দেয়ের সমাচার
কহ কিবা নাম ধর   কোথায় বসতি কর
কার পরে আছর তোমার
আর তুমি কহ মোকে   কি ছুরতে এই লোকে
বাঁচে তেরা নজর থাকিয়া
দেও বলে শুন নবী   কহিয়া জানাই খুবি
নাম মেরা লইছ বলিয়া
তিন মাথা দেও আমি   শোন পাক নবী তুমি
কহি মেরা মাথার তাছির
একমাথা মানুষের   দোসরা গরুর ছের
তেসরা জানিবে বাঘিনীর
থাকি আমি তিন ঠাঁই   তাহা ভি কহিয়া যাই
পানি, গোরস্থান, ময়দানেতে...।

তাজুদ্দিন বয়ান পড়তে পড়তে হাসুনারার কোমরের কষি খোলে। বয়ান পড়তে পড়তে কালো সুতোয় তাবিজ বাঁধে আর হাসুনারা হাত জোড় করে বলে—দহায় সাতঙা-দেও কিরপা কর—দহায় জোহল সেতারা কিরপা কর, কিরপা করগো। শনিঠাকুর হে, শকুনচড়া নীল বন্নের ফেরেশ্‌তা, কিরপা কর। রাশিয়া দেশ, বিলাত দেশ, কিরপা কর, কিরপা কর সাতঙা-দেও, কিরপা কর চেন্নোবিল। হাসুনারার দু-চোখে জলের ধারা।

—কাঁদিস না, কাঁদিস না ; বিশ্বাস রাখ। আমাদের আছে।

কে আছে, কাকে বিশ্বাস? তাজুদ্দিন সামনে তাকায়। সামনে হাসুনারার জোড় করা হাত। হাতে শুধু তাবিজ মাদুলি।

কে আছে। কাকে বিশ্বাস? তাজুদ্দিন বাইরে তাকায়। পিচ রাস্তা। রাস্তার ওপারে মাঠ। মাঠের ওপারে জয়ধ্বজার মতো স্থির বিপ্রদাসবাবুর সাদা বাড়ি।

কে আছে? কাকে বিশ্বাস?—তাজুদ্দিন উপরের দিকে তাকায়।

বাতাস। বাতাসে রেডিও-বিষ। মেঘ, মেঘে রেডিও-বিষ। মেঘের ওপারে আল্লাতালা? কেমন জানি না।

হাসুনারার দিকে এগিয়ে যায় তাজুদ্দিন। পেটের উপর চেপে রাখে কান। ধুকপুকি শোনে। তবে কে আছে? কাকে বিশ্বাস? ধুকপুকি শোনে। তুই তবে আয়।

সমস্ত চেন্নোবিল, সমস্ত শনি সাতঙা-দেওদের কেরদানিকে নাথি মারতি মারতি, নাথি মারতি আয়রে আমার আহ্লাদ। তুই কেমন জানি না।

অনুষ্টুপ, ১৯৮৭

পতাকার কাপড়

তেল ধোঁয়াচ্ছে।

রসময় গরম তেলে পেঁয়াজি ছাড়তে যাবে এমন সময় কড়াইতে ঠং ঠং। খাকি পোশাকের বেঙ্গল পুলিশের কনস্টেবল ডাণ্ডা হাতে। বলে, আগে তো দেখিনি, ক'দিন লাগিয়েছিস?

চাইর দিন।

কার পারমিশনে?

রসময় বেসন মাখানো দাঁত মাজার আঙুলটা দিয়ে সামনের দোতলা বাড়িটা দেখায়। ওটা পার্টি অফিস।

হুঃ।

পুলিশ দু'পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে।

বলে, ওরাই যদি পারমিশন দেবে তাহলে আর পুলিশের দরকার কী?

রসময় কী বলবে? কিছু বলে না। গরম তেলে পেঁয়াজ বড়াগুলোর ছুটোছুটি দেখে, লালচে হয়ে যাওয়া দেখে, কড়া হয়ে যাওয়া দেখে।

দুটো গরম গরম দে, দেখি কেমন। রসময় শালপাতাটা লুঙ্গিতে মুছে কড়া দেখে চারটে পেঁয়াজি বিটনুন ছড়িয়ে দেয়।

খুব পেঁয়াজি করছিস, অ্যাঁ?

এককথার দুটো মানে। রসিকতার উপর হুমকির বিটনুন মাখানো। মুখের গরম পেঁয়াজি পুলিশি লালায় জড়ায়। ঠানায় আসিস, কঠা আছে, আজই আসিস। রসময় ভালই বোঝে কি কথা থাকতে পারে। পয়সা ও দেবে না। হার্গিস না। পার্টি অফিসে রিপোর্ট করবে রসময়।

উপরের বারান্দা থেকে অলোকদা হেঁকে বলল, রাসুদা, গন্ধ পাচ্ছি, গরম গরম গোটা দশেক নিয়ে এস।

ও নেবেই বা কী করে? একা লোক, কাকের উৎপাত তবু বেসনের গামলা খবর কাগজে ঢাকে, তার উপর ঢিল চাপা দিতে গিয়ে দেখে—'স্বরাজ টেকসটাইল কি খুলবে? ছয় মাসের উপর বন্ধ স্বরাজ টেকসটাইলের শ্রমিকরা অসহনীয় কষ্টের মধ্যে আছেন। সরকার অবশ্য হাত গুটিয়ে বসে নেই। মালিক পক্ষের সঙ্গে গতকাল চল্লিশ মিনিট দীর্ঘ আলোচনা হয়। মালিক পক্ষের বক্তব্য...পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমে। পঞ্চম পৃষ্ঠা রসময়ের কাছে ছিল না। খবর কাগজ রাখার প্রশ্নই নেই রসময়ের। ক'টা কাগজ পার্টি অফিস থেকেই চেয়ে রেখেছিল, কাজের সুবিধার জন্য পার্টির ছেলেরা ওকে অনেক রকম ভাবেই সাহায্য করেছে। স্বরাজ টেকসটাইলের খবরটার উপর ঢিল চাপা দিয়ে পেঁয়াজির ঠোঙা হাতে ছুটে যায়।

এখন ছোকরা কমরেডদের ভিড়। সন্ধ্যার পর বয়স্করা আসতে থাকবে। মেঝেতে বড় বড় মাদুর পাতা। দেয়ালের কোণে চায়ের বাসি ভাঁড়। পোড়া সিগারেট। রসময়কে দেখে অলোকদা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। দু'হাত বাড়িয়ে বলল দাও—দাও। এক্কেবারে কর্মসূচী অনুয়ায়ী কাজ। দামটা কিন্তু সন্ধ্যের পর দেব। এবার চায়ের নেতৃত্বটা কমরেড অবন্তিকা ঘোষ দেবে। অবন্তিকা দিদিকে রসময় চেনে। মেয়েদের কলেজের। যখন স্বরাজ মিল লক আউট হল, এনাকে দেখেছে রসময়। বক্তব্য রেখেছিলেন। শ্লোগান উঠেছিল শ্রমিক তুমি লড়াই কর আমরা তোমার পাশে আছি। রসময় বলল, আপনাদের চোদ্দ তারিখের কাগজের পঞ্চম পৃষ্ঠাটা কি আছে?

কি হবে?

আমাদের মিলের কথা লিখা আছে।

ঘরের কোণার কাগজের স্তূপের দিকে আঙুল দেখিয়ে একজন বলল—দ্যাখো, ওখানে আছে কি না। রসময়ের এখন সময় কোথায়? দোকান ফাঁকা না? থাক, পরে দেখে নেবে খনে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসবার সময় রসময় শুনল অলোকদার গলা—চিত্তর দোকানে একটু চা বলে দিও রাসুদা, দু'টাকার চা, দশটা ভাঁড়।

দুটো কাক ঠোঁট দিয়ে চাপা দেয়া খবর কাগজটা বাঁধানো করছিল, ও ব্যাটাদের হুসহুস করেই চিত্তর দোকানে চা বলতে গেল রসময়। এইটুকু তো করতেই হবে। ওরা কি কম উপকার করেছে।

কড়াই উনুনে চাপানো, এবার বেগুনি ছাড়া হবে। মেয়েটা আলুর চপের লেচি নিয়ে গিয়ে এখনো এল না। চপে বড় হাঙ্গামা। সেদ্ধ আলু মেখে, মশলা দিয়ে কষিয়ে, হাতের চাপে চ্যাপটা চ্যাপটা লেচি বানাতে হয়। সেটা মায়ে-মেয়েতে বানায়। এখন বেগুনি ছাড়ে রসময়। গরম তেলে পড়লে শালা বেগুনির বাচ্চারা কিরকম হুটোপাটি লাগিয়ে দেয়, কিরকম যে হয়ে যায়, যেন এইমাত্র বোনাস ডিক্লেয়ার হয়েছে, খুশি, হুড়োহুড়ি, ইনকেলাব জিন্দাবাদ।

এমন সময় রসময়ের সামনে একটা কৌটো ঝাঁকানি। শির ফোলা হাত। ঢালাই কারখানা? রসময় জিজ্ঞাসা করে। ঠিকই ধরেছে। তিন মাস? হুঁ। ঝাঁকুনির শব্দে রসময় বুঝতে পারে দেড় টাকা থেকে দু'টাকার মধ্যে আছে। কৌটোর মধ্যেকার শব্দের চরিত্র রসময় বোঝে। তিনমাস ঝাঁকিয়েছে রসময়। ৭/৮ বছর আগেও কৌটো ঝাঁকিয়ে কিছু হত। আজকাল কিছু হয় না।

রসময়ের একবার ইচ্ছা হয়েছিল পয়সা না দিয়ে একটা গরম বেগুনি দেয়। তক্ষুনি মনে হল, ছিঃ এটা ভিক্ষা না, সংগ্রামী তহবিল।

আজ বিকেল থেকেই এইরকম। ঐজন্যই বলে বউনির আগে ফিরি দিতে নেই, ধার দিতে নেই। শালার পুলিশটাকে বউনির আগেই ফিরি দিয়েছে। এবার পরের পর গচ্চা।

উলঙ্গ করিয়া গরম তেলে ডুবানো হইতেছে। হিংসা করিবার শাস্তি। বাড়িতে নরক যন্ত্রণার টানাটানি ছবিটা আছে, বাবা কিনেছিলেন তারকেশ্বরে। মর! মর শালা রসময় এই গরম তেলে ডুবে মর। ছি, ছি, গচ্চা। অলোকদা কি পয়সা দেবে না? রোজই তো দিয়ে দেয়। আর ঢালাই কারখানার শ্রমিকের জন্য একটা কুড়ি নয়ার জনও গচ্চা

কথাটা মনে এল ওর?

রসময় রুমালটা খোলে। রেজগি কিছু এনেছিল ঘর থেকে। আঙুলের ডগাটা একটা সিকি স্পর্শ করে আঙুল উঠে যায়। তারপর একটা দশ নয়া তুলে নিয়ে টুপ করে কৌটোয় ফেলে দিয়ে ওদিকে আর তাকায় না রসময়। বাবার মৃত্যুর পর চিতায় শেষ কলসির জল ঢালার পর পুরুত বলেছিল ওদিকে আর তাকিও না, তাকাতে নেই।

আজ বিকেল থেকেই এইরকম। ঐজন্যই বলে বউনির আগে ফিরি দিতে নেই, ধার দিতে নেই। শালার পুলিশটকে বৌনির আগেই ফিরি দিয়েছে। এবার পরের পর গচ্চা।

বেগুনি শেষ। বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আজ পয়া দিন। ট্রেনের গণ্ডগোল। পাবলিক হেঁটে হেঁটে বাস রাস্তায় গিয়ে বাস ধরছে। পথে তেলেভাজা কিনে নিচ্ছে অনেকে। খেতে খেতে যাবে। তাছাড়া আজ একটু মেঘলা। বিক্রি খারাপ হবে না মনে হচ্ছে। এই জায়গাটা সত্যিই ভাল। কাছেই সিনেমা হল। সিনেমা ভাঙার টাইমে রোজ ৮/১০ টাকা বিক্রি বাঁধা। অলোকদা ব্যবস্থা না করে দিলে এই জায়গাটা পেত না। আলোকদা বয়সে রসময়ের চেয়ে অনেক ছোট, তবু অলোকদাই বলে রসময়। গ্রাজুয়েট ছেলে, খুব ভাল ছেলে, পাড়ার সব ভাল কাজেই ও আছে। রসময়দের কলোনিতেই থাকে, দুটো প্লট সামনে। রসময়ের টালির ঘর, দর্মার বেড়া। আলোকদাদের পাকা বাড়ি, ওদের একটা সম্মান তো আছেই। মিল বন্ধ হবার পর অলোকদারা ওদের সংগঠনের পক্ষ থেকে ভালই কালেকশন করে দিয়েছিল।

কিন্তু তাতে কিছু হয়? পাঁচটা পেট। ক'দিন? প্রায় একমাস খবরাখবর নেবার জন্য ফ্যাক্টরির গেটে যেত রসময়, ইউনিয়ন অফিসে যেত, মিছিল করত। শুনে আসতো মালিকের সঙ্গে আলোচনা হবে, বৈঠক হবে, বৈঠক হলেই মিল খুলবে। বৈঠক হল। আগামী এক বছর কোনরকম মাইনে বাড়ানোর দাবি করা চলবে না মালিকের এই শর্ত মেনে নিতে ইউনিয়ন রাজীও ছিল, কিন্তু মালিক চেয়েছিল কুড়িজনকে ছাঁটাই করতে। কয়েকজন নেতা বোঝাতে চেয়েছিল বৃহত্তর স্বার্থে...না, ইউনিয়ন এটা মানেনি। বৈঠক শেষ। পরে লেবার কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকের দিন মালিক পক্ষ এলই না। একদিন সুভাষ ময়দানে বড় মিটিং হল, ট্রেড ইউনিয়নের বড় নেতা এলেন, সেদিন টিপটিপ বৃষ্টি। উনি বললেন, মনের জোর হারাবেন না কমরেড, মালিককে বাধ্য করব বৈঠকে বসতে। শ্রমমন্ত্রীও ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন,...বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ঝাণ্ডাটা মাথায় দিয়েছিল রসময়, পিছন থেকে কে যেন হেঁকে উঠেছিল—লাল ঝাণ্ডাকো পাগড়ি মত বানাও কমরেড...তখন চকিত লজ্জায় ঝাণ্ডা খাড়া রেখে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রসময় মাইকে শুনেছিল কেন্দ্রে যদি লাল ঝাণ্ডা কায়েম না হয় তবে এই সংকট ঘুচবে না।

'কেন্দ্র দখল তো এখন হচ্ছে না, দেরি করতে হবে, তাই না অলোকদা?'— পরদিন রসময় অলোককে জিজ্ঞাসা করেছিল।—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? অলোকের চোখে মুখে এরকম জিজ্ঞাসা। অলোক কথার জবাব দেয় না ঠিক, সামান্য ঘাড় নাড়ায়। 'আমরা তবে কী করব?' হঠাৎ গলার স্বর চড়ে যায় রসময়ের, একটা আমগাছ থেকে ঝুলতে থাকা স্বর্ণলতা পাঁচ আঙুলে খামচে ধরে রসময়। গলার স্বর বিকৃত হয়ে যায়, প্রায়

কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'তবে আমরা কী করব, কী করব অলোকদা?'

অলোক বলে, কিস্‌সু করার নেই, বলেই এধার-ওধার চেয়ে নিল, যেন অন্যায় করেছে কিছু। একটা স্বর্ণলতা ছিঁড়ে আঙুলে প্যাঁচাতে লাগল। বলল, সরকার থেকে তো চেষ্টা চলছে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে...এক কাজ কর রাসুদা, স্টেশনে তেলেভাজা নিয়ে বস তো, স্টেশন মাস্টারকে আমরা বলে দেব।

বসেছিল রসময়, একটা ছোট তোলা উনুন, কড়াই, এইসব মিলে ৮০ টাকার ক্যাপিটাল। স্টেশনে পিছনে একটা চুল্লুর ঠেক আছে, সুতরাং মন্দ বিক্রি হবার কথা নয়, কিন্তু আরও দুটো তেলেভাজাওলা অলরেডি আছে। তারা ঝামেলা করতে লাগল। একদিন একটু পেচ্ছাপ করতে গেছে, ফিরে দেখে বেসনের গামলায় একদলা গোবর।

অলোকদাকে বলেছিল রসময়। অলোকদা বলেছিল, তাহলে বরং পার্টি অফিসের সামনেই বসে যাও, দেখি ওখান থেকে কোন শালা ওঠাতে পারে।

পার্টি অফিসে এম এল এ ঢুকছেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন। বারান্দায় ছুটোছুটি। ইনিই কিন্তু ঐ মিল ইউনিয়নের সেক্রেটারী। জিজ্ঞাসা করলেই হত লেটেস্‌ খবর। পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমটা তাহলে না খুঁজলেও চলে।

অলোকদার এসব খেয়াল পাক্কা। এইজন্যই অলোকদাকে এত ভাল লাগে রসময়ের। দোতলার বারান্দা থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকল অলোকদা। রসময় কড়াটা নামিয়ে সাত তাড়াতাড়ি উপরে গেল। অলোকদা বলল—এই যে আমাদের রসময়দা, স্বরাজ মিলের খবর জানতে এসেছে।

খবর আর কি? বেশ হাসি হাসি মুখেই বলছেন উনি, মিনিস্টারের সঙ্গে মিটিং হয়েছিল, মালিকের বছরে দশলাখ টাকা লস হচ্ছে, নতুন মেশিনপত্র বসাতে হবে, এক কোটি টাকা চাইছে। এরকম রুগ্ন শিল্প তো আরো আছে, আমাদের এম পি-রা, পার্লামেন্টে তুলবে ব্যাপারটা, যদি কেন্দ্রীয় সরকার...

রসময় বলল, লস্‌টস্‌ সব বাজে কথা স্যার। মালিক মানিকতলায় ছয়তলা বাড়ি করিয়া বিক্রি করছে, ভুবনেশ্বরে কাঁচের কারখানা বসাইছে...

তা আমরা কী করতে পারি বলুন, কাগজপত্রে তো ওরা লস্‌-ই দ্যাখাচ্ছে।

চলে আসে রসময়, নেমে আসে। বেসনে জল ঢেলে দেয় আর দ্রুত ফেটাতে থাকে, ভীষণ ফেটাতে থাকে, বেসনে ফেনা হয়, ঠাস ঠাস শব্দ হয়, হাতের শিরা ফুলে ওঠে, শিরার সঞ্চারণ, তেল তেতে যায়, তবু কিছুই ছাড়ে না, বেসন ফেটায় ঠাস—ঠাস—ঠাস।

মেয়েটা এসেছে। হাতে থালা, থালায় আলুর চপের লেচি। দুবার ডাকল বাবাকে। রসময় মেয়েকে দেখল। ছোট্ট ছোট্ট দুটো বিনুনি মাথার দুপাশে। টেপ জামাটা হলুদ ছিল, এখন সাদা। রসময় বলে, বড় দেরি করলি আজ। থালাটা নেয়। একী? কী দিয়ে চপ ঢেকেছিস? সপাটে থাপ্পড় মারে মেয়েটার কান বরাবর। ওর হাত থেকে থালাটা পড়ে যায়, আলুর চপের লেচি ধুলোয় পড়ে, ঝাণ্ডার কাপড়টা ধুলোয়, আলু সেদ্ধয় মাখামাখি হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে, দুহাতে পতাকাটা তুলে নেয় রসময়, ঝেড়ে নেয়, টানটান করে, কাস্তে-হাতুড়িটার দিকে তাকায়, ভাঁজ করে রেখে দেয়। 'ঝাণ্ডার কাপড়ে চপ ঢাকিস, এত বড় হারামি তুই, গামছা কি হল, গামছা? মেয়েটা এমনিতেই কানে কম শোনে, একটা কান পেকেছিল ছোটবেলায়, চিকিৎসা হয়নি। মেয়েটা ভীষণ কাঁদতে

থাকে। ওর বেসন লেপটানো মুখে জলের ধারা। দু'-একজন লোক জড়ো হয়, অলোকদাও নেমে আসে, সঙ্গে আরও দু-একজন।

অলোক বলে মেয়েটাকে মারলে কেন? অলোক রুমাল দিয়ে মেয়েটার মুখ মুছিয়ে দেয়, তখন স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে কচি গালের উপর আঙুলের দাগ। মেয়েটা দুহাতে কান চেপে বসে যায়, বলে, ব্যথা, কানে ব্যথা। অলোক ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। রসময় বলে মেজাজটা ঠিক রাখতে পারিনি অলোকদা, মেয়েটা বড় অন্যায় কাজ করে ফেলেছিল, ঝাণ্ডার কাপড়ে চপ ঢেকে এনেছিল।

বাতাস খামচে ধরল অলোক। রসময়ের ঐ অতি সাধারণ বিবৃতিতে কি ছিল কে জানে, অলোক মাথা নিচু করে, সঙ্গের দুজনও, যেন শোকসভা।

এই কান নিয়ে কম ভোগান্তি হল না রসময়ের। আর জি কর হাসপাতালে গিয়ে রসময় জানল ওর মেয়ের কানের পর্দা ফেটে গেছে। অপারেশন করলে ভাল হবে কিনা ডাক্তারবাবুও জানেন না। অন্য একজন রুগির নাকের গর্তে আলো ফেলে নাক দেখতে দেখতে ডাক্তারবাবু বললেন—মাস তিনেক পর আসুন, দেখি কি করা যায়। রসময় একদিন জিজ্ঞাসা করল অলোককে, আইচ্ছা, বোবা না শুধু কালা, কালারা কি প্রতিবন্ধী?

কেন?

মঞ্জু, আমার মেয়েডা, একডা কান তো আগেই গেছিল, সেদিনের পর আর তো শোনে না। প্রতিবন্ধীরা তো শুনি কতরকম সাহায্য পায়,...দেখবেন একটু যদি...।

অলোক কিছু বলে না।

রসময় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, কিচ্ছু শোনে না। তারপর নীরবতা। নীরবতা ভেঙে আবার রসময় বলতে থাকে—কিচ্ছু শোনে না, এত যে চেঁচালাম, কিচ্ছু শুনল না। না মালিক, না সরকার। গলাটা চড়ে যায়। অলোক কিছু বলে না।

মিল খোলার কোন লক্ষণ নাই, তাই না অলোকদা? পার্লামেন্টের কোন খবর আছে? শুনছিলাম কেন্দ্রীয় সরকার নাকি মিল নিয়া নিবে?

হুঃ। কেন্দ্রীয় সরকার নেবে, এরা এখন খুব বাজে অবস্থায়, সংকটে রয়েছে।

তাইলে রাজ্য-সরকার?

ওরা কোথায় টাকা পাবে? আর কটা মিল অধিগ্রহণ করবে বল?

খুবই সংক—অট। সংকট কথাটা এতটা টেনে উচ্চারণ করল রসময় যে অলোকের মনে হল যেন সংকটে ব্যঙ্গ। অলোক তাই জোর দিয়ে বলে, হ্যাঁ। সত্যিই সংকট। পুঁজিবাদের সংকট। ওরকম অবস্থায় এরকম হয়। সংকট তীব্রতর হচ্ছে।

মদন অধিকারী রেল লাইনে গলা দিয়েছে। আজ শ্রাদ্ধ। ধনা, মনা, ঘনা নেড়া হয়ে কোরা কাপড় পরে গঙ্গার ধারে ব্রাহ্মণকে গো দান করছে। অপমৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত। কোরা কাপড় ভাড়া পাওয়া গেছে, গো-শাবকও ভাড়ায়। ঠাকুরমশাই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বড়ছেলে ধনার ১৪ বছর। আতপচালের পিণ্ডি। থান কাপড় পরা মদনের বৌ পাথর। কোলের মেয়েটা শুয়ে মুতে একসা। ঠাকুরমশাই মন্ত্র পড়াচ্ছেন—বল ওঁ শাণ্ডিল্য গোত্রায় প্রেতঃ মদনমোহন দেবশর্মনঃ এতক্তে সতিল উদকেন তৃপ্যাস্য....। জয়দেব, রামবচন ওরা কালেকশন করে এল, কাঁধে ঝাণ্ডা, হাতে কৌটো, কৌটোর গায়ে সাঁটা বন্ধ স্বরাজ

মিলের মৃত শ্রমিকের অসহায় পরিবারকে সাহায্য করুন। জয়দেব ঝাণ্ডাটা নদীর কাদায় পুঁতে দিয়ে কৌটোর সব পয়সা ঠাকুর মশাইয়ের গামছায় ঢেলে দিল। বলল শুনতে হবে না ঠাকুর মশাই, যা আছে, এতেই আপনার ম্যানেজ করতে হবে, এর বেশি হবে না। ঝাণ্ডার কাপড় হাওয়ায় উড়ছে।

সেদিন গামছার অসুবিধা ছিল। দুপুরে মায়ে মেয়েতে নালায় গামছা দিয়ে কুঁচোচিংড়ি ধরেছিল, তাই গামছা ভিজা ছিল। মাছের আঁশটে গন্ধ ছিল। কী দিয়ে ঢাকবে আলুর চপ? ঐ লাল কাপড়টা দিয়ে ঢেকেছিল, ঝাণ্ডার কাপড়টা। ওটার তো ব্যবহার হচ্ছিল না, এমনি এমনি পড়েছিল।

পার্টি অফিসের পাশেই ছিল একটা জমি। জমিটা মোহিত ঘোষের। জমিটা এমনি এমনি পড়েছিল, ব্যবহার হচ্ছিল না। মোহিত ঘোষও শ্রমিক, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর। ওয়েল্ডার। ওর স্কুটার আছে। ওর সময় কম। ইউনিয়নের কাজ, ওভারটাইম। অলোকদাই দেখাশুনো করে খাটাখাটনি করে খুব তাড়াতাড়ি ঘর তুলে দিল। তিনটে ঘর।

একটা ঘরে পাশের বাড়ি থেকে ইলেকট্রিকের কানেকশন টেনে নিয়েছে অলোক। চুনকাম হল, একটা শো-কেস এল।

দোকান লাগাইতাছেন অলোকদা? রসময় জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ, রাসুদা। চাকরি-বাকরি তো আর হল না।

কিসের দোকান?

দেখতেই পাবে।

তা অন্য কিছু পারলেন না অলোকদা, জীবন দত্ত তো কন্ট্রাকটারিতে লাল হইয়া গেছে।

আমি ওসব পারব না। তাছাড়া নিজের জন্য পার্টিকে ব্যবহার করতে পারব না আমি।

বি এচ ছি পাশ কইরাও দোকান লাগাইতাছেন অলোকদা?

কি করব রাসুদা। খুব খারাপ অবস্থা।

এবার সাইনবোর্ড এল। 'মুখবদল'। অভিজাত তেলেভাজার দোকান।

কি করব রাসুদা বল, নিজের কিছু তো একটা করতে হবে। বাগবাজারের একজন ভাল কারিগর পেয়ে গেলাম, তাই ভাবলাম...মানে আমারও তো একটা জীবন আছে...। অলোক রসময়ের কাছেও মাথা চুলকোয়।

এখন অলোকের দোকানেই ভিড়। ডবল দামেও লোকে কিনছে। অলোকের কাঁচের শোকেস। শোকেসের ভিতরে বাল্ব জ্বলে। চপে বিস্কুটের গুঁড়ো, কচুরিতে হিং। এইমাত্র ট্রেতে করে পার্টি অফিসে কচুরি গেল, এম.এল.এ. এসেছেন...

এখানে আর নয়। তোলা উনুন আর কড়াই নিয়ে অন্য কোথায় যেতে হবে আবার। যেখানে শোকেস নেই।

—কোথায় যাবে?

মেয়েটা ঘুমুচ্ছে। ওর শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে রসময়। ওর কানের কাছে মুখ নেয়। বলার ছিল, সবকিছু বলার ছিল। কিছুই বলতে পারে না। ঠোঁট কেঁপে কেঁপে ওঠে। কান্নায় ভেসে যায় রসময়। দড়িতে ঝুলছিল কাপড়টা। পতাকার কাপড়। ওটা খামচে ধরে রসময়। তারপর ওর মধ্যে মুখ লুকোয়, চোখ লুকোয়। আর ন্যাকড়াটা শুষে নেয় জল।

শারদীয় বর্তমান, ১৯৯০

লাপিস্ লাজুলি

আমি বললুম ল্যাপিস্ লাজুলি।

আমার সামনে রয়েছে গরম পরটা বেগুন ভাজা। 'সানন্দা' অনুসরণে লাউয়ের কাবাব ফেইলিওর হওয়াতে ওটাই সেদ্ধ করে একবাটি, মন্দ লাগছে না। বারান্দার পদ্ম লাগানো কংক্রীটের গ্রীলের ছায়া-কারুকার্য করা রোদ্দুর বারান্দায় বিছানো। মা রয়েছেন, বৌ-ও। রোববার। প্রেশার কুকারে শোঁ-শোঁ-শোঁ।

লাপিস্ লাজুলি মানেটা কী? বৌ যেন শিক্ষার্থিনীর মতো জিজ্ঞাসা করে। আমি কত কিছু জানি এই কায়দায় ছেড়ে দি—'এটা একটা ইটালিয়ান ফুল, এই অ্যাত্তো বড় বড়।' এর মধ্যে আমার কোনই ইঙ্গিত ছিল না, তবু আমার বৌ ভ্রূভঙ্গি করে কাপড় টানল। মা বললেন, ইটালিতে হয় তো আমাদের কী? এই নাম কেউ বুঝবে? আমি বললুম সল্টলেকে ঝাউ গাছ সাজানো একটা বাড়িতে দেখেছি এই নামটা রেখেছে। রাখুক গে সল্ট লেকে। মায়ের গলায় ঝাঁঝ। বৌ বলল অত কঠিন নাম রাখতে হবে না। 'নিরালা' রাখতে পার, কিম্বা ধর 'মহাদিগন্ত'। আমাদের মামার বাড়ির উল্টো দিকের বাড়িটার নাম 'মহাদিগন্ত'। কি সুন্দর বাড়ি। দোতলার জানালায় না,—কাচ। আমি বলি এসব খুব কমন নাম। আমি চাইছি...

মা বললেন—বাড়িটা তো ওনার আশীর্বাদেই হচ্ছে, ওনার নামেই বাড়িটার নাম রাখা উচিত। মানে মা চাইছেন ঁব্রজেশ্বর ধাম বা ঁব্রজেশ্বর স্মৃতি ভবন জাতীয় কিছু। ভাল ডিজাইনের বাড়ি হচ্ছে, মোসেম্ রং দোবো, তার মধ্যে মানায় ওরকম নাম? মাকে কিছু বলাও যায় না। তা ছাড়া বাবাকে এই বাড়িতে জড়বার আগে অন্য একটা টেকনিকাল দিকও ভাবতে হচ্ছে। বাড়িটায় পুরো আমার টাকা ঢুকছে। ঁবাবা সাকুল্যে দশ হাজার টাকা রেখে গেছলেন, সেটা ছুঁইনি আমি। মায়ের নামে ফিক্স্ড্। ছোট ভাইটা হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করেই আর্মিতে ঢুকে গেছে। আমার এই বাড়িতে বাবার নামটা জুড়ে দিলে ও ভাবতেই পারে যে এতে বাবার টাকা লাগিয়ে দিয়েছি। আমি বারান্দা উঁচিয়ে আকাশের দিকে চোখ রাখি। বলি বাবার স্মৃতি তো অন্তরেই আছে, পাথরের গায়ে খুদে কী এমন লাভ? কুকার ফোঁস্ করল। মাংস গন্ধ।

বাড়িওলা এলেন। বৌ চলে গেল রান্না ঘরে। মোটামুটি ইয়ং বাড়িওলা। পাঞ্জাবিতেও বেশ ভালই বোঝা যাচ্ছে ভুঁড়িটা। ওর চোখের তলাটা কিসের কারণে এমন ফুলকো হয়েছে আমি জানি। বললাম, বসুন।

উনি আজকের খবরের কাগজটা টেনে নিয়েই বললেন, পবনকুমার নাকি চন্দ্রালোক অপেরায় জয়েন করেছে? আমি বললুম, নাইরোবিতে গ্যাস লিক্, মানুষ পালাচ্ছে। উনি বললেন, বাড়ি কদ্দূর? আমি বললুম, এইবার ঢালাই করব। উনি বললেন, গত ছ মাস ধরেই তো একই কথা বলে আসছেন। আমি বললুম, চা খাবেন? উনি বললেন, হুঃ। হাল্কা গন্ধ পেলাম। বউনি হয়ে গেছে, নাকি গত রাত্তিরের? আমি বললুম, আজ ফ্রি

বুঝি? উনি বললেন, রাত্রে মহাজাতি সদনে আছে। কী পালা? সিঁথির সিঁদুর, সরি—সরি, ওটা কাল মগরায়। আজ হল সতী হল কলঙ্কিনী। আপনি তো ভিলেন। হ্যাঁ, সে তো যাত্রায়, প্র্যাক্‌টিকালে যেন ভিলেন না হতে হয়, দেখবেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ। কবে আপনি উঠতে পারবেন ফ্র্যাংকলি বলুন তো, ঘরটা আমার দরকার, ফ্র্যাংকলি বলছি, আমি একটা গ্রুপ খুলব। বাবার নামে নাম দেব ঠিক করেছি অনঙ্গ অপেরা। একতলাটা আমার খুব দরকার।

ভাড়া দিই একশো দশ। দুবার বাড়িয়েই এটা দাঁড়িয়েছে। হোক না ইট ক্যালানো, পুরোনো বাড়ি, ছেড়ে দিলে ছশোর কমে এ জিনিস হবে না। ছেড়ে দিতে বললেই সুড়সুড় করে ছেড়ে দেব, এত চোদু আমি নই। আমি হেসে বলি, দেখুন মটরবাবু, আমার বাবা এই একতলাটা ভাড়া নিয়েছিল আপনার বাবার কাছে। আমরা ভায়ের মতো আছি আপনি ভিলেন হতে যাবেন কেন? আপনি বাড়ি ছাড়তে বলেছেন আর আমিও ধার দেনা করে বাড়ি করতে শুরু করে দিয়েছি। তবে বোঝেনই তো, এমন চাকরি করি, বাঁধা মাইনে, একস্ট্রা কিছু নেই। স্রেফ টাকার জন্যে আটকে গেছি। হাতে টাকা থাকলে...

মটরবাবু সিগারেট ধরালেন। মুখ ছুঁচোল করে দীর্ঘ সময় ধরে ধোঁয়াটা ছাড়লেন। মাথায় চিন্তা ঘুরলে ধোঁয়া ছাড়ার কায়দাটা এরকম হয়ে যায় বটে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে মটরবাবু শুধু বললেন, হুঁ। তারপর বললেন, আরও দু মাস টাইম নিন। আর না।

দু মাসের মধ্যে এত টাকা জোগাড় করতে পারব না। এবার আমি ঝেড়েই কেশে দি। আপনি কিছু টাকা দিন মটরবাবু। আরে বুঝিচি, বুঝিচি। ম শুনলেই মাল বুঝি। হাজার পাঁচ দেব। তবে উঠে গেলে। আগে নয়। ব্যস। লাইনে এসেছে। পাঁচ এবার পঁচিশে উঠবে। আজ আর না।

দাঁতে লেগে থাকা সোহাগী মাংসকুচি কাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছিলাম। বৌ ঝপাং করে আলমারি খুলল, দমকা নেপথলিনের গন্ধের মধ্যে বলল—জানো, বেড়ালটার না বাচ্চা হয়েছে চারটে। কুতকুত করছে সিঁড়ির ঘরে। ওর চোখে এখন সুখ না দুঃখ জানি না। তাকাতে সাহস পাই না। বিয়ের একমাসের মধ্যেই প্রেগন্যান্ট হয়েছিল আরাধনা। অ্যাবরেট করিয়েছিলাম। বলেছিলাম এখনি নয়, একটু ঘুরেটুরে আসি, বাড়িটাড়ি হোক...। বৌ বলল, কিগো, সিনথেটিক পরব, না সিল্ক? আরাধনা বাড়ি দেখতে যাবে। ওর খুব উৎসাহ। ওর বাবার রেলের চাকরি। ওরা চার বোন। ওদের নিজেদের বাড়ি নেই।

শোভাবাজার থেকে শ্যামবাজার, শ্যামবাজার থেকে দমদম, তারপর মিনিট বারো হাঁটা পথ। আমি বললাম, ঝুপড়িগুলো ভাঙছেও না আর চক্ররেলটাও দমদম অব্দি আসছে না। তাহলে আর এত হাঙ্গামা হয় না। কোথায় ঝুপড়ি? আরাধনা জিজ্ঞাসা করে। ঐ তো, উল্টোডাঙার পরেই। শ'য়ে শ'য়ে লোক ঘরবাড়ি তৈরি করে বসে গেছে। ঐ ওদের জন্যই তো...

নর্দমার ধারে দেখি কচুপাতায় দু ফোঁটা আটকে গিয়ে মুক্তো হয়ে আছে। এ সময় আরাধনা চিৎকার করে ওঠে, দ্যাখো—দ্যাখো। আমি ভাবলুম কি না কি, ও দ্যাখালে একটা কাঠবাদাম গাছ।

ঠিক এরকম একটা গাছ আমাদের রামপুরহাটের কোয়ার্টারে ছিল। আমরাও একটা লাগাব, অ্যাঁ?

ও যে কত কী লাগাবে! পৌনে দু কাঠা জমিতে শকুন্তলার আশ্রম বানাবে...এগোই।

খুব বাড়ি উঠছে। জায়গাটা ছিল নিচু জমি। মাটি টাটি ফেলে একটু উঁচু করে বিক্রি করা হয়েছিল। বাবা সস্তায় কিনে রেখেছিলেন সাড়ে তিন কাঠা। তার হাফ আমি ভায়ের জন্যে রেখে দিয়েছি।

হাওয়ার সঙ্গে আরাধনার শাড়ি খেলছে ভাল। এই হাল্কা পতপত শব্দ, বেসামাল চুল, ঘেঁস ফেলা রাস্তা মাড়ানো কড়কড় আওয়াজ, জংলাকচুর হলুদ ফুলের গন্ধ আর তারে দোল খাওয়া একটা ফিঙে পাখি মিলে বেশ মনোরম মোমেন্ট তৈরি হচ্ছিল, তখন আরাধনা বলল, আমাদের পানাগড়ের কোয়ার্টারের সামনে একটা মস্ত বড় কাঁঠাল গাছ ছিল। ওখানে দোলনা করে ঝুলতাম। আমাদের বাড়িটা হলে একটা দোলনা করব, অ্যাঁ? আরাধনা ওর বাবার যাবতীয় পোস্টিং-এর সুখস্মৃতি, যেমন গুসকরার বটগাছের ঝুরি, শিকড়বাকড়, সাঁইথিয়ার রাইস মিলের চিমনি সমেত অজয় টজয় নদীর বালুচর ঐ বারশো স্কোয়ার ফুটে ঢুকিয়ে ফেলতে চায়।

এই শোন...

কী?

যদি লাগে, আমার এই বালাজোড়া নিতে পার।

ধুস্। বলেছি না, তোমার গয়নায় হাত দিব না।

এটা তো তোমারই। এটা তো তুমিই দিয়েছিলে মায়ের হাত দিয়ে।

ও থাক। কাজে হাত দিয়েছি কি তোমার গয়নার ওপর ভরসা করে নাকি? দেখ না, বাড়িওলার থেকে কেমন আদায় করি। এছাড়া দুর্গানগরের জমিটা তো গোকূলে বাড়ছে।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় আরাধনা। পরবর্তী চারটে স্টেপিং-এ আমি বুঝিয়ে দিই একেবারে অ্যানাতেনার সঙ্গে বিয়ে হয়নি তোমার। সিগ্রেট ধরাই।

ভাগ্যিস ঐ দশ হাজার টাকা সোনায় আর মাটিতে খাটিয়ে দিয়েছিলাম। চার হাজার টাকার একজোড়া বালা আর ছ হাজার টাকার জমি। জমিটা দুর্গানগরে। তিন হাজার করে কাঠা কিনেছিলাম। দু কাঠা। এখন বিক্রি করলে ত্রিশ বত্রিশ তো হবেই। যত দিন যাবে বাড়বে। ঠিক ঢালাইয়ের আগে আগে ওটাকে ঝেড়ে দেব। ওতে ঢালাই খরচ হয়ে যাবে। বাড়িওলার পয়সায় দরজা জানলা।

বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। লিন্টন পর্যন্ত উঠে থম্‌কে আছে। সামনের কচুরি পানার ফুলের উপর দিয়ে তীক্ষ্ণ আঙুল চালিয়ে আরাধনা বলে, ঐ-যে তোমার লাপিস্ লাজুলি। ও যেন জাহাজের কাপ্তেন, বন্দর দেখাচ্ছে।

সে সব কথা তো জানে না আরাধনা, বাবার মৃত্যুর পরের তিনবছরের কথা। মাড়োয়াড়ি কোম্পানীতে চাকরির সামান্য বেতনে চারজনের সংসার এবং গ্যাস্ট্রিক আলসার সামলে বাবা যখন মারা গেলেন, আমি তখন বি কম পাশ শিক্ষিত বেকার। মহিম রায় আর সুবল গুছাইতকে নেতা মেনে জাতীয়তাবাদী পার্টি করতাম। সুবলদা আমার দুঃখ বুঝে ওর সিমেন্টের ব্যবসায়ে নিয়ে নিলেন। অর্ডার ধরে দিলে ফাসক্লাস কমিশন। চিৎপুরের খালধার থেকে এঁটেল মাটি ব্যোম-কালীতলার নেপাল বাবুর মিল থেকে গুঁড়িয়ে আনতাম। ঐ মশলাটা সিমেন্টে মিশত। মহিমদার সঙ্গে সুবলদার কনফ্লিক্ট শুরু হল ইলেকশনের সময়। ১৫ই আগস্ট সকালে হেভি কিচাইন। হাওয়া খারাপ বুঝে আমি ফুটে গিয়ে নুন শোয়ে সেক্স থান্ডার মেরে আসি। সুবলদা রেগে গিয়ে ব্যবসা

থেকে ছাড়িয়ে দেন। ভাগ্যিস ছাড়িয়েছিলেন, নইলে আমি খুব হুজ্জোতে পড়ে যেতাম। মহিমদা চুকলিবাজি করে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিল। সিমেন্ট গোডাইন রেড্ হয়। কয়েকজন লেবারের কি হুজ্জোত। সুবল গুছাইত অবশ্য এখনো গুছিয়েই বিজনেস করে যাচ্ছেন, এখন সব মিউচুয়াল বরাবর হয়ে গেছে। কিছুদিন পর অবশ্য মহিমদার থ্রুতে গনিখানের দয়ায় আর মাকালীর আশীর্বাদে মেট্রো রেলে একটা ছোটোখাটো চাকরি পেয়ে গেছি। সেই টাইমে সুবলদার টাকায় যদি মাল খেয়ে মাগীবাজী করে ফুড়ুক করে দিতাম, তবে আজকের এই ল্যাপিস্ লাজুলি হাপিস হয়ে যেত।

বাড়িটার ভিতের উপর বসলাম। আরাধনা খরখরে ইটের উপর বোলাচ্ছে ওর নরম হাত। আমি একটা পিলারের গায়ে একটু মাইনাস করতে যাই। আরাধনা হৈ হৈ করে ওঠে। এ কী করছ এখানে, বাইরে যাও। পেছনের দিকে, যেখানে সেফ্‌টি ট্যাংক, ওখানে যেতেই দেখি একটা লোক উপুড় হয়ে কী যেন করছে।

আমি বললাম—এই যে দাদা, কী হচ্ছে? মাপছি। চোদ্দ, পনের, ষোল। ষোল হাত মানে চব্বিশ ফুট। আর লেংথ্ হল ত্রিশ ফুট। টুয়েন্টি ফোর ইন্টু থার্টি হল গিয়া সেভেন টুয়েন্টি। পুরা এক কাঠা। প্ল্যানটা ভালই। এইটা আপনেরই বাড়ি?

হ্যাঁ, আমার। আপনি কে?

আমি ডি.সি.পাল! আর্কিটেক্ট, এসটিমেটার অ্যান্ড ইনজিনীয়ার অ্যান্ড কনট্রাকটর।...

ওঃ বুঝে গেছি। ছিটেল। বেল্‌বটম প্যান্ট, সব বোতাম নেই, তারই মধ্যে একটা শার্ট গোঁজা। হাওয়াই চটি। বলে লিন্টনে ঝামা দিয়ে ভুল করিছেন ব্রাদার, স্টোন চিপস দেয়া উচিত ছিল।

ওর কোনো কথার উত্তর না দিয়ে আরাধনার কাছে আসি। ও হঠাৎ বল্ল—আচ্ছা, এখানে সাইকেল ঘোরানো যাবে?

এখানে মানে? এটা তো ডাইনিং স্পেস্।

তাই তো বলছি, বাচ্চাদের যে তিন চাকার সাইকেল হয় না, সেটা কি এইটুকু জায়গায় ঘুরতে পারবে?

আমি এখন ওর চোখের দিকে তাকাতে পারছি না।

ওঃ, ম্যাডামও আইস্যা গেছেন, বাঃ লিন্টনটা করার সময় একটু খেয়াল রাখলেন না, ভিতরের দিকে একটু বাড়াইয়া দিলেই বক্‌স মতো কইরা জিনিস টিনিস রাখতে পারতেন। ম্যাডামের কত উপকার হইত—

মন্দ বলেনি তো লোকটা, ডাইনিং স্পেস্-এর লিন্টন এক ফুট বাড়াতে কীই বা এমন খরচ হত?

আর এই পাশটায় দ্যাখেন। দক্ষিণে লিন্টন থিকা একটু ক্যানটিলিভার বাইর করতে পারতেন, ঐটা ব্যালকনির মতন হইত, দক্ষিণের থিকা বাতাস আইস্যা একেবারে...

দিগিন বাবু নমো—স্‌স্—কার। একটা ছোকরা মতো ছেলে হেঁটে যেতে যেতে ফাজলামি করল।

আরে, শুন, শুন, তোমারেই তো খুঁজতে ছিলাম...লোকটা ঐ ছেলেটিকে ডাকল।

প্লাস্টারে জল দাও নাই ক্যান? ইস্। ক্র্যাক্ করবো না? এক্কেবারে কাণ্ডজ্ঞান নাই তোমাদের। আমি কাল দুই ঘণ্টা জল দিলাম। তোমার বাবা আসে নাই?

ঐ ছেলেটাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করি—লোকটা কে? আগে তো দেখিনি।

ছেলেটা মাথায় একবার টোকা দিয়ে আঙুলে স্ক্রুয়ের প্যাঁচ লুজ করা দেখাল। বলল, দিন পনের যাবৎ এ পাড়ায় আসছে। নতুন বাড়ি উঠছে দেখলেই— ফোপর দালালি করে। সল্টলেকে ঝাড় খেয়েছিল।

আমি বললাম লোকটার বেশ আইডিয়া আছে মনে হয়।

দিগিনবাবু আমার কাঁধে খোঁচা দিলেন। ঢালাইয়ের সময় ভেরী কেয়ারফুল থাকবেন। মিস্ত্রিরা হইল রাম ফাঁকিবাজ।

ঢালটা যেন ভাল হয়, দেখবেন। ঢালটাই হল আসল। বলেন তো আমি থাকব, খালি চা খাইয়ে দিবেন। আমি বলি, এমনি এমনি সারাদিন থাকবেন আপনি?

দিগিনবাবু বলেন আমার কোনো অসুবিধা নাই। মিক্সিং মেশিনের ঘটর-ঘটর কী যে ভাল লাগে আমার, আমার জামায় সিমেন্টের ধূলা, মাথার চুলে বালির কিচকিচ, প্যান্টের উপর শুকনো সিমেন্ট-বালির দাগে কী যে আনন্দ আমার।

ওর পোশাক আর কথাবার্তায় আরাধনা খুব আশ্চর্য। বলে আপনার বাড়ি কোথায়?

বাড়ি? কত বাড়ির ব্লু প্ল্যান ছাপাইছি আমি, কত শ, তার ঠিক নাই। এক কনট্রাকটারের কম্পানীতে কাজ করতাম। চাকরি গেছে গিয়া, নিজের প্ল্যানটা অ্যামোনিয়া দিয়া ছাপতে পারি নাই। কেবল অন্তরের মধ্যে ছাপাইছি। এই বুকের মধ্যে আমার মোজাইক করা বাড়িখান শামুকের মতো বইয়া নিয়া বেড়াই।

ছেলেটেলে নেই বুঝি আপনার? আরাধনা জিজ্ঞাসা করে।

দুইখান আছে। একটা উল্টাডাঙা, আরেকটা রানাঘাট। উল্টাডাঙা খেদাইয়া দিলে রানাঘাট যাই, রানাঘাট খেদাইলে উল্টাডাঙা। অখন উল্টাডাঙায় আছি। সেখানে বড় খেচামিচি। খেচামিচি তো আমার কী?—আমি এইখানে চইল্যা আসি। একখান শরীরের ডি.সি. পাল হাজার হাজার শরীরের হইয়া যায়। যে মানুষটা তার শিশু বাচ্চাডারে দোলনায় দোলায় তার বারান্দায়, সেও আমি, দোতালার ব্যালকনির রেলিঙে যার চোখে মুখে লাগে আদরের বউটার শাড়ির আঁচল, সেও আমি, মার্বেল বসানো বাথরুমে শাওয়ারের জলে ছ্যান করে ডি.সি.পাল, বাগান করে ডি.সি.পাল, বাড়ি রং করে ডি.সি.পাল, টাকার অভাবে ভিতটুকু কইরা ফালাইয়া রাখছে অন্য আর একজন ডি.সি.পাল। বোঝলা না?

কিছুই বুঝলাম না। সূর্য ডুবল।

আরাধনা বলল, বাড়ি চল। পাখিরাও ফিরছে।

সিমেন্টের দর বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। লোহারও। অনেকেই বলছে এই বেলা ঢালাইটা করে ফ্যালো। দুর্গানগরের জমিটা ঝেড়ে দেব ঠিক করলাম। 'বর্তমান' কাগজে ছোট করে বিজ্ঞাপন দিলাম, উত্তম পরিবেশে দুইকাঠা জমি বিক্রয়। বিজ্ঞাপন করলেই তো জমি বিক্রি হয় না, দরাদরি আছে, বায়না করা আছে, সার্চিং আছে, বাড়িওলার কাছ থেকে কিছু টাকা এর মধ্যে বাগিয়ে নিতে পারলে লিন্টনের উপরের পোরশনটুকু সেরে ফেলতে পারি। ইতিমধ্যে একদিন খবর কাগজে সুসংবাদ—শিগ্‌গিরি ঝুপড়ি উচ্ছেদ হচ্ছে। চক্ররেল দমদম পর্যন্ত যাবে।

মটরবাবুকে বলি। উনি বললেন—হাজার পাঁচেক টাকা আগাম দিতে পারেন, তবে স্ট্যাম্প পেপারের উপর লিখে দিতে হবে দু মাসের মধ্যে ছেড়ে দেব।

আমি বলি ওটা ছ'মাস করুন। চার মাসে রফা হয়। বলি ফাইনাল ছেড়ে দেবার

সময় আরও বিশ চাই। উনি পাঁচ থেকে শুরু করে বারোয় উঠলেন। মটরবাবু একদিন মহিমদা, ছাত্র ফেডারেশনের স্থানীয় নেতা তপোব্রতকে সাক্ষী রেখে একেবারে পাকা কাজ করে ফেললেন। মহিমদা আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে বললেন—দ্যাখ, তোরা দুজনেই আমার ভালবাসার লোক। তোকে চাকরি দিয়েছি আমি। চাকরি পেয়ে তুই আর আমার ধার মাড়াস না। কিছু বলি না, কারণ এটা তোর গণতান্ত্রিক অধিকার, কিন্তু মটরের ঘরটা ঠিকমতো না ছাড়লে কিন্তু চুপ করে থাকব না, খেয়াল রাখিস।

কাজ শুরু করে দি। ইট উঠছে।

এদিকে ডি. সি. পালও তার কাজ ঠিকঠাক করে যাচ্ছেন। একদিন দেখি ও ভাঙা কাচের টুকরো দিয়ে ইটের গায়ের শেওলা পরিষ্কার করছে।

চোখের সামনে এসব দেখলে অস্বস্তি হয়। বলি, থাক। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। ও বলে, কষ্ট কী, এতক্ষণ তো ও বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের জমানো জলে খেলা করছিলাম।

বিজ্ঞাপনের উত্তরে বেশ কিছু চিঠিপত্র এসেছিল। কয়েকজনকে জমি দেখালাম। দেখুন জমির কী পজিশন! সাইড দিয়ে রাস্তা যাচ্ছে যশোর রোড টু বি. টি. রোড।

ছত্রিশ হাজার টাকা পেলাম হাইয়েস্ট দর। তিন হাজারে বায়না হ'ল। পার্টি বল্ল, জমি সার্চ করাব। দলিলের কপি দিন।

যে বস্তিগুলোর জন্য চক্ররেল উল্টোডাঙার পরে আটকে ছিল, ওগুলো সাফ হয়ে গেল। বুলডেজার নামিয়ে দিয়েছে। খবর কাগজের ছবিগুলো দেখে বেশ আনন্দ হল। এবার রাস্তা পরিষ্কার। বরকতদার স্বপ্ন একদিনে সাকসেসফুল হবে। খেয়েদেয়ে একটা সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে দমদম স্টেশনে যাব, ট্রেনে চাপব, আর হুপুস করে পৌঁছে যাব ডালহৌসী।

লিন্টনের উপরের পোরশন কমপ্লিট। জমিটা ঝাড়া হলেই ঢালাই। বৃষ্টি হচ্ছে কদিন। দিগিন পাগলা বলেছে একটু জলে ভিজলে গাঁথনি পোক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফ্রীতে গাছ দিচ্ছিল। ক'টা নিয়ে যাই পুতব বলে। দেখি, প্লাস্টিকের চাদর টাদর খাটিয়ে আমার ঐ বাড়ির এক কোণে ঝুপড়ি বানিয়ে বসে বসে বিড়ি ফুঁকছে ডি, সি, পাল।

ব্যাপারটা কী?

উল্টাডিঙির বাড়ি ভাইঙ্গা দিছে। তাই আমার এই বাড়িতে আইয়া পড়লাম।

অ্যাইসা খচে যাই না আমি, ইচ্ছে করছিল তক্ষুনি এক থাবড়া মারি লোকটার গালে। আমার এই বাড়িতে আইয়া পড়লাম! অডাসিটি! জবর দখল!

আমি বল্লাম, কদিন ধরে আছ?

ও বলে, তিন দিন।

এক ঘণ্টা সময় দিলাম। সব সরিয়ে ফেল।

ও চুপ করে থাকে। প্লাস্টিকের আচ্ছাদনের উপর শুধু বৃষ্টির মৃদু ঝির ঝির।

আমি বলি, আমায় চেনো না তুমি। রেগে গেলে কিন্তু একদম হাত ফাত চালিয়ে দেব। ফোটো।

ও বলে, আজকের দিনটা এইখানেই থাকি, কাল পছন্দমত অন্য একটা বাড়ি দেইখ্যা নেবানে।

শালা, শেয়ানা পাগলা। একটা টান মেরে খুলে দি ওর প্লাস্টিকের চাদর। ওর মাথার

উপরের ছাদ।

পরদিন আবার গেছলাম। না, ওকে দেখিনি। কিন্তু বাড়ি ফিরেই দেখি আমার দুর্গানগরের জমির পার্টি মুখ প্যাঁচা করে বসে আছে। আমাকে দেখেই বলে—আমাদের সঙ্গে চিটিংবাজী করতে গিয়েছিলেন? এই দেখুন সার্চ রিপোর্ট, জমিটা তো ভেস্ট।

মানে?

ন্যাকামো করছেন? জানেন না, জমিটার উপর দিয়ে রাস্তা যাচ্ছে?

কী বলছেনটা কী? আমার শরীরের উপর দিয়ে বুলডেজার চলে যায়।

এই নিন সার্চ রিপোর্টের জেরকস। বায়নার টাকাটা ফেরৎ দিন।

আমি কিছু জানি না, মা কালীর দিব্বি জানি না। আগে ব্যাপারটা বুঝতে দিন।

সাতদিন পর আবার আসব, টাকা রেডি রাখবেন। সুভাষদা আমার জামাইবাবুর বন্ধু।

জমিটা যখন কিনেছিলাম তখন জানতাম এর পাশ দিয়ে রাস্তা হবে। গনুদা তাই তো বলেছিল আমাকে। রাস্তাটা জমির উপর দিয়ে হয়ে গেল, অথচ আমাকে কিচ্ছু জানাল না গভরমেন্ট?

ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের দপ্তরে ক'দিন ঘোরাঘুরি করে জানলাম জমিটা আগেই অ্যাকোয়ার করেছিল গভরমেন্ট, আমি জমিটা কেনার আগেই মালিক কমপেনসেশনও পেয়ে গেছে। আমি ভুল জমি কিনেছি।

গনুদা ঠকাল আমাকে? গনুদা তখন আমাদের সঙ্গেই সুবলদার পার্টি করত। গনুদার কথায় বিশ্বাস করে জমিটার সার্চ-ফার্চ করাইনি। গনুদা বলেছিল এটা ওর মামার জমি।

ছিঃ গনুদা, আমার সঙ্গে এভাবে চিটিংবাজী করলেন?

গনুদা এখন সাট্টার পেনসিলার। বাঁ হাতের কব্জি নেই।

সব বললাম গনুদাকে।

গনুদা বললেন, আমি কী জানি, তুই জমি দেখেশুনে নিসনি কেন?

আপনাকে শ্রদ্ধা করতাম গনুদা, আপনার কথায় পুরো বিশ্বাস করেছিলাম।

তোর শ্রদ্ধার পুটকি মারি। বাতেলা দিচ্ছিস। মহিমের সঙ্গে খিচাইনের সময় তুই শালা ফুটে গেলি। আমার হাত উড়ে গেল। একদিন খোঁজও নিলি না। আমি শালা ভুলে গেছি? তোর ঐ জমির ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। যা পারিস করে লিস।

আমি শালা এবার কোথায় যাব? আমার সমস্ত আশ্রয়ের উপর দিয়ে ঘসটে গেছে বুলডেজার।

আমি বালিশে মুখ দিয়ে উপুড় হয়ে ছিলাম। আরাধনা ওর দুহাত দিয়ে টানে। বলে, ভেঙে পড়লে চলবে? বলে, তোমার চোখে জল? কাঁদছিলে? বলে, তোমার মুখে গন্ধ? মদ খেয়েছিলে? বলে, তোমার ঠোঁটে রক্ত?

বলি গনুকে মারতে গিয়েছিলাম। মার খেয়েছি।

ভেজা গামছা দিয়ে ঠোঁট মুছিয়ে দেয় আরাধনা।

বলি, কাল সাতদিন হয়ে যাবে। বায়নার টাকা নিতে আসবে। টাকাটা ইট হয়ে আছে লাপিস লাজুলির গায়ে।

আমার বালাটা তো আছে।

আর মাত্র পনের দিন আয়ু, চারমাস হয়ে যাবে। এই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। লিখে

দিয়েছি।

সে আমি বুঝিয়ে বলব বাড়িওলাকে।

কতদিন রুখতে পারবে তুমি, কতদিন? উল্টোডাঙার বস্তি ভেঙে রেললাইন বসছে। ওরা রুখতে পারেনি। দিগিনবাবুও রুখতে পারেনি ওর মাথার উপরের প্লাস্টিকের চাদর। যে বাচ্চাটা আশ্রয় চেয়েছিল তোমার শরীরে,...

আর বোলো না।

শোনো আরু, আমাদের ঐ লাপিস লাজুলিটা এই অবস্থায় বেচে দিয়ে বস্তিতে চলে যাই যদি?

তবে যাব। ডি, সি, পালের মতই তখন আমরা অনেক শরীরের লোক হয়ে যাব। আমাদের কিছু শরীর পড়ে থাকবে ঐ লাপিস লাজুলিতে।

না, বরং আমাদের কিছু শরীর ঐ লাপিস লাজুলিকে ভেঙে ফেলে দেবে। ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেবে। থাবড়া মেরে দাঁত ভেঙে দেবে গনুদার।—মহিম রায় আর সুবল গুছাইতের হাতমুচড়ে দিল, সেও আমরা, উল্টোডাঙার ঝুপড়িগুলোর সামনে চক্ররেলকে থামিয়ে দিল—

এগুলো সব মিছিমিছি। সব মিথ্যে। এখনো রক্ত তোমার ঠোঁটে, মুছে দি।

জানি আরু, সব মিথ্যে। সব মিছিমিছি। শোন, একটা কথা বলি, লাপিস্ লাজুলি কথাটার মানেটা আমি জানি না, আমি জানি না, মাইরি বলছি।

প্রমা, ১৯৯০

বেহেশ্‌তের কুঞ্জি

১

ট্রেন থেকে গুমা স্টেশনে নেমে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সক্‌রিবাসা মহিম হালদার স্মৃতি উচ্চবিদ্যালয় কত দূর?'

'চার মাইল।'

চার মাইল? মানে শ্যামবাজার টু ধর্মতলা? নাকি রবীন্দ্র সদন? ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। রিক্সা ভাড়া যা বলল তা ট্রেন ভাড়ার ডবল। কী করা যাবে।

ইন্টারভিউতে আমি ছাড়া আর মাত্র তিনজন ক্যানডিডেট। সেক্রেটারী এম-এ আর বি-এড সার্টিফিকেট দেখলেন।

'অনার্স নেই?'

'উঁহু।'

'এম-এ প্রাইভেট?'

'আজ্ঞে।'

'সাহিত্যসেবা করেন লিখিছেন, আনিছেন কিছু?'

আমি ব্যাগ থেকে বের করলাম পাঞ্চজন্য পদাবলী, মুকুর, চৈতন্য,...

'থাক! থাক! আর দরকার নেই—'

আমার স্বরচিত কাব্যগ্রন্থও আছে একটা। ব্যাগ থেকে বের করি।

'বাব্‌বুস। বইও প্রকাশিত হয়েছে? প্রকাশক কে দেখি, আমারও একটু...'

বইয়ের নাম হৃদয় গভীরে মুক্তা।

উৎসর্গ—বেলগাছিয়া আশ্রমের আশ্রমমাতা শ্রীশ্রীজয়মাকে।

'আধ্যাত্মিক লাইনে আছেন নিকি?'

'তা একটু আছি।'

'বাঃ খুশী হলাম। উদাহরণস্বরূপ একটু পাঠ করুন দিনি, শুনি—'

প্রথম কবিতাটাই পড়তে লাগলাম।

জিজ্ঞাসা।

জীবনের খাঁজে খাঁজে যে অন্ধকারগুলো
জমাট বেঁধে আছে হাজার বছর ধরে
অসহিষ্ণু, কাম ক্রোধ লোভ মোহের আবরণে,
সেখানে তোমার কৃপার আলো
    পড়বে কি!
আমার এই দেহভাণ্ডকে রঙে রঙে রাঙিয়ে
ভাবছি ভালই তো আছি।
কিন্তু মহাকালের বারিধারায় উঠে যাবে

এই রঙ
সংশয় খিন্ন ক্লেদ ঘাম রক্তে
কত মলিনতা...

'থাক! থাক! হাই থট! হাই থট! কি বলেন হেডমাস্টারমশাই?'

হেডমাস্টার মশাই একটু চিন্তায় পড়েছেন, জিভ দিয়ে টাকরায় চাপ দিলে মুখ থেকে বাঁধানো দাঁত ঈষৎ বেরিয়ে আসে। মুখটা বন্ধ করে আবার দাঁতটা ঢুকিয়ে নেন। তারপর বললেন, 'কলকাতা থেকে এখানে যাতায়াত সম্ভব নয়। এখানে থাকতে হবে কিন্তু। পারবেন?'

২

রোজ রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের বাণী পড়ি, তারপর ডাইরি লিখি। শ্রীশ্রীজয়মা বলেছেন— তোর পাপের কথা তোকেই বলবি, তোর পাপের জন্য তুই নিজেই নিজেকে বকবি...। আমি ডাইরিতে পাপের কথাও লিখি, তারপর আত্মসংশোধনের জন্য অনুশোচনা করি। আজ লিখলাম—

আজও আমার চোখ গেল। জানলা বন্ধ করতে গিয়েও পারলাম না। গোপনে মেয়েদের শরীর দেখা পাপ। পাপ করিয়াছি। ফ্রকপরা মেয়েটা একতলার দেওয়ালে প্রায়ই ঘুঁটে দিতে আসে। গোবর নিতে নিচু হয়, হতের তালুতে গোবরের দলা নিয়ে উঁচু করে ছুঁড়ে দিচ্ছে। মৃদু কম্পন। আজও একবার চোখাচোখি হল। অন্যায় হয়েছে।

তারপর চিঠিটা লিখে ফেললাম—

পরম পূজনীয়া বৌদি,

ভালই আছি। একতলায় সায়েন্সের টিচার ফেমিলি নিয়ে থাকেন। আমি দোতলায় আছি। দোতলা হতে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখি। খাওয়ার কষ্ট নেই। সেক্রেটারী হালদার মশায়ের ভাইপো কেরোসিনের ডীলার। তিনি প্রতি সপ্তাহে দুই লিটার কেঃ তৈল পাঠিয়ে দেন। খাঁটি ঘি আছে, ভাতে-ভাতে ঘি দিয়ে খাই।

একটা মজার কথা শুনবে? ইস্কুলের সেক্রেটারী তাঁর এক শালীর জন্য আমাকে খুব করে ধরেছে। আমার রাশিচক্রের সঙ্গে নাকি খুব মিল। আমি যত বলি, আমি দীক্ষিত, পেঁয়াজ-রসুন খাই না, উনি বলেন, আমাদের স্বজাতি। শেষকালে ঠিকানা দিতে বাধ্য হয়েছি। যদি উনি চিঠি দেন, তোমরা বলে দিও আমি বিবাহ করব না।

বৌদি এখানে কবে আসতে পারবে! এলে এক আশ্চর্য সুন্দর জিনিস দেখাব। রজনীগন্ধার ক্ষেত। হাজার হাজার রজনীগন্ধার স্টিক। গতকাল রাত্রে জ্যোৎস্নার আলোয় ঐ রজনীগন্ধা বনে বসন্তের ঐ আকুল সমীরণে আমি একা একা বসেছিলাম। কী অপূর্ব মদিরতা। সৃষ্টিকর্তার কী মহান লীলা...

৩

সেক্রেটারীমশাই নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। কত বড় মাছের পিস্। বললেন, একটা এঁদো পুকুর আছে। হাত তেলতেলে হল। জানালেন কম তেলে খাওয়া অভ্যেস নেই। সরষের তেলের দাম যতই হোক, রেপসীড ঘরে ঢোকান না। নেমন্তন্নের কথা হেডমাস্টার বা অন্য কাউকে জানাতে নিষেধ করলেন। বললেন ওরা বড় কচক্রী। এইসব

ভালবাসার ওরা কদর্থ করবে। 'রান্না কেমন?' সেক্রেটারীর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললুম 'অপূর্ব।' সেক্রেটারী মশাই বললেন—'এদের বোনেরা রাঁধে ভাল ছোটটিও। এর যেমন রং দেখিচেন, ছোট বোনটি আরও ফর্সা। মুখে বড় লক্ষ্মীশ্রী।' সেক্রেটারীর স্ত্রী সত্যিই কালো। কালো বলে আমার কোন ইয়ে নেই। তবে আমি কিছু না বলে চুপ করেই রইলাম। গুরুজনদের সঙ্গে নারীরূপ সম্পর্কে কথাবার্তা আলোচনা করার শিক্ষা পাইনি আমি।

খাবার পর একটু বিশ্রাম। হালদার মশাই বললেন—একটা খেদ আছে। গাঁয়ে সবই আছে, শুধু কালচার নেই। আমি 'জিজ্ঞাসা' কবিতাটা ইন্টারভিউর দিন পুরোটা শোনাতে পারিনি, আজ শোনালাম। উনি দীর্ঘশ্বাস সমেত বললেন উচ্চমার্গের চিন্তাধারা। এবার গ্রামের কালচারের জন্য কিছু করুন। আমিও ছোট দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। উনি তারপর বললেন—চলুন, রজনীগন্ধার চাষ দেখিয়ে আনি। আপনার ভাল লাগবে।

একটু আগে হাল্কা বৃষ্টি হয়েছিল বলে বাতাসে সোঁদা গন্ধ। মাটিতে রবার জুতোর ছাপ পড়ছে। কচুপাতার গায়ে দু এক ফোঁটা টলটলে জল লেগে রয়েছে। রজনীগন্ধা ক্ষেতের কাছে এলাম। উনি হাঁক দিলেন—এরশাদ...আর দু হাতে ফুল সরাতে সরাতে রজনীগন্ধা বনের গভীর থেকে বের হয়ে এল একজন খালি গা মানুষ, ওর দাড়ির রং রজনীগন্ধার মতই, মানুষটা বলল—জে...।

—কাল ক' কিলো মাল গেছে?

—বলেন ফুল। ফুলকে মাল বলতি হয় না।

মালিকের যথাযোগ্য সমাদরটা যে হচ্ছে না, তা যেন আমি বুঝে ফেলেছি। তাই ইঙ্গিতময় ঘাড় নেড়ে সেক্রেটারীমশাই আমায় বললেন—'অ্যায়। শুরু হল পাগলামী। বুঝলেন, ইশ্‌কুরু একটু ঢিলে আছে।'

ক্ষেতের ঠিক মধ্যিখানে মনে হল যেন ছোট্ট চালাঘরের মত কি একটা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওটা কী?'—

এরশাদ বললে, 'মেফতাহুল জান্নাত। মানে বেহেশ্‌তের কুঞ্জি, মানে স্বর্গের...

সেক্রেটারী আবার বললেন, 'অ্যায়'।

আমি দু হাতে রজনীগন্ধার শরীর সরিয়ে সরিয়ে এগুতে থাকি। একটা সরু পথ মত আছে, তার দু পাশের রজনীগন্ধা যেন সার সার সাদা শাড়িপরা শাঁখ বাজানো মেয়েরা, কী সুবাস বাতাসে, ঠিকই বলেছিল এরশাদ। এটাই স্বর্গ। আমি অপূর্ব উচ্ছ্বাসে এগুতে থাকি, পিছন পিছন সেক্রেটারী মশাই। ক্ষেতের ঠিক মাঝখানে চারটে খুঁটির উপর রোদ আড়াল হবার মত একটা খড়ের ছাউনি। ওখানে একটা চাটাই, টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস। ঐখানে দাঁড়িয়ে একবার গোল হয়ে ঘুরি। এক আশ্চর্য পরিবেশ। কবিগুরু...কবিগুরু...একটাও জুতসই কবিতা মনে এল না।

—কী ময়য়? কেমন লাগতিচে?

—অপূর্ব!

—এ অঞ্চলে আমি একাই ফুলের চাষ করি।

—এরশাদই চাষ করে না?

—ও তো লেবার। ক্ষেতটা তো আমার। যেমন আমার স্কুলে....

আচমকা কথাটা থামানোর ফলে সামান্য কাশলেন সেক্রেটারীমশাই। তারপর

বললেন, এ আমার বেয়াই-এর বুদ্ধি। বড়মেয়ের বোচ্চেন, বে দিছি কোলাঘাটে। ও দিকি খুব ফুলের চাষ হয়। বেয়াই দু বিঘে করত। ইটভাটায় পড়তা বেশি বলে ঐ জমিতে বেয়াই ইটভাটা দিল। এরশাদ মালি তখন নাকি খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করে বসি থাকত। সে সময় আমি নাতি দেখতে কোলাঘাট গিছিলাম। বেয়াই আমায় মতলোব দিল ফুল কর। এরশাদ কাজ জানে ভাল। তিন কুলে কেউ নেই, ফুলের মধ্যি পড়ি রয়েচে।

এক দঙ্গল প্রজাপতি হৈ-হৈ করতে করতে বাইরের মাঠ থেকে ফুলের বাগানে ঢুকল।

৪

স্কুল আজ স্ট্রাইক। এস. ডি. ও. অফিস ঘেরাও। যশোর রোড পর্যন্ত পাকা রাস্তা চাই। হ্যান্ডবিলের লেখা থেকে জানলাম এ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের দাবি একটা পাকা রাস্তা। প্রতি বছর ভোটের আগে কথা দেওয়া হয় শীঘ্র রাস্তা হবে কিন্তু হয় না। বাসরাস্তা হয়ে গেলে মাত্র সোয়া এক ঘণ্টায় কলকাতা যাওয়া যাবে।

বাসরাস্তা হয়ে গেলে বেশ হয়। কলকাতা থেকেই যাতায়াত করা যাবে। কলকাতা না থাকলে সাহিত্য হয় না।

আজকের ছুটিতে কয়েকটা কবিতা লিখতেই হবে। গতকাল একটা কবিতার লাইন মাথায় এসেছিল—রজনীগন্ধা বনে দিল মিঠে হাওয়া সেই সুগন্ধে তোমাকেই কাছে পাওয়া।

কবিতা লেখাও আজকাল মহা ঝকমারি হয়েছে। দাড়িওলা আঁতেল সম্পাদকরা মিল দেখলে বা কবিতা বোঝা গেলেই খচে যান। পরের লাইনগুলো ভাবছি লিখব। জিব্রাইল পরী মাঝরাতে নামে মাঠে/এরশাদ আলী আসমানে পথ হাঁটে।

এই লাইনদুটো কিছুটা আধুনিক আধুনিক মনে হচ্ছে। নবাংকুরে পাঠাব। জিব্রাইলের পর পরী না লিখে জিন লিখলে বোধ হয় ভাল শোনায়। রেলিঙ-এ দাঁড়াই। কত দূর মাঠ। হাওয়ায় সবুজের রং উঠে আসে। মেয়েটা আসছে, হাতে গোবরের বালতি। কাঁপছে।

৫

'ধন্যবাদার্হ' কথাটা কি ঠিক? কেমন যেন লাগছে। ধন্যবাদের যোগ্য কথাটা বসালে রিস্ক নেই। 'আপৃক্ত' লিখব নাকি 'সম্পৃক্ত'ই থাকবে—ঝামেলা! একটা মানপত্র লিখতে হচ্ছে স্থানীয় এম এল এ-র জন্য। এত খাটছি আমি, তলায় লেখা থাকবে সক্রিবাসা গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ। আগামীকাল সংবর্ধনা। এম এল এ-র। অক্লান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টায় যশোহর রোড পর্যন্ত পাকা রাস্তা স্যাংশন হয়েছে। এম এল এ খুব বুদ্ধি করে একজন প্রভাবশালী ভি আই পি-কে দিয়ে এই অঞ্চলে একটা বাগানবাড়ি কিনিয়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি নাকি রাস্তার কাজ শুরু হয়ে যাবে। সংবর্ধনা হবে স্কুলে। তাই ফাংশন। কত আবৃত্তি শেখাতে হচ্ছে। এসেছে শরৎ আছে, আজি এ প্রভাতে রবির কর আছে। ক্লাস টেনের প্রবীরের গলাটা ভাল। ও করবে আঠার বছর বয়স। পদঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা—করার সময় হাতটা এম এল এ-র দিকে যাবে। বলা আছে।

৬

রাস্তাটা যাচ্ছে একেবারে হালদারবাবুর রজনীগন্ধা ক্ষেতের পাশ দিয়ে। মাপবাবুরা টেবিল বসিয়ে কি সব যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে মাপজোক করতে শুরু করেছেন, ছেলে-বুড়োরা গোল হয়ে রগড় দেখে...জমির দাম বেড়ে গেল। দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ...হালদার মশাই বললেন, ফুলচাষে লাভ কি? রজনীগন্ধা ক্ষেতটা প্লট করে বেচে দেব। খদ্দের পেলে বলবেন।

শ্রীশ্রীজয়মার আশ্রমে একটা চিঠি লেখা দরকার। জরুরী চিঠি।

৭

শ্রীশ্রীজয়মা সঞ্জীবন দাদা আর মৃত্যুঞ্জয় দাদাকে পাঠালেন জমি দেখতে। শ্রীশ্রীমার বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে হবে, ভরিয়ে দিতে হবে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে উনিশটা আশ্রম আছে। উঃ ২৪ পরগনায় আর একটা আশ্রমের জন্য জমি খোঁজা হচ্ছিল। সঞ্জীবনদা আর মিতুনদা খুব পছন্দ করলেন জমিটা। দরদাম নিয়ে মায়ের কৃপায় বিশেষ অসুবিধা হল না। টাকা পয়সার ব্যাপারটা সেট্‌ল হলে হালদার মশাই খুশি।

হালদার মশাই বারবার বলেছিলেন এরশাদ ফেরশাদকে এখন কিছু বলতে হবে না। ব্যাটা বাগড়া দিতে পারে। এমনিতে হাবাগোবা, তলে তলে পঞ্চায়েতে ভাব। পঞ্চায়েতের মাতব্বর এসে বলতেই পারে জমি বেচে দিলে এরশাদ খাবে কি? ফুল ছাড়া সে অন্য চাষ করে না।

সঞ্জুদা মিতুনদা নিয়ে বেশ কাটল। ঝিঙে পোস্ত আর টকডাল রাঁধলাম। অনেকদিন পর মায়ের কথা আলোচনা হ'ল। সঞ্জুদা পিঠ চাপড়ে বললেন— বেশ আছো হে সিম্পল লিভিং হাই থিংকিং। এখানকার আশ্রমের ভারটা তোমাকেই নিতে হবে হে...মায়ের হুকুম পাবে, বলে রাখলুম।

সঞ্জুদা আর মিতুনদাকে বাসে তুলে দিই। ফিরে আসবার সময় আমার অগোচরেই আমি রজনীগন্ধা ক্ষেতের দিকে চলে যাই। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি অনেক সময় কে যেন কোন কোন কাজ আমাকে দিয়ে করিয়ে নেয়।

বেশ দূর থেকেই হাওয়ায় হাল্কা সুবাস। এক দঙ্গল প্রজাপতি ওদিক থেকে এল। সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন। মৃদু হাওয়া। ফুলের গোছাগুলি ঢলে ঢলে পড়ছে। এখান দিয়েই রাস্তাটা চলে যাবে সোজা যশোর রোডে। আর এখানেই বোধ হয় হবে আশ্রমের প্রধান ফটক। বেশ বড় গেট হবে। মাধবীলতা বাইবে। এখান থেকে মোরাম ফেলা রাস্তাটা চলে যাবে ঠিক মধ্যিখানে, এখন যেখানে এরশাদের বেহেশ্‌তের কুঞ্জ, ওটাই মায়ের ছবি রাখবার উপযুক্ত জায়গা। মাতৃমন্দির ঘিরে তৈরি হবে আশ্রম। গৃহাশ্রম। গার্হস্থ্য ধর্মেই সব ধর্মের পরীক্ষা। হাতে কাম মুখে নাম। কেবল ঋতুরক্ষার জন্যই স্ত্রী সহবাস। মাতৃবাণীতে মা নিজেই বলেছেন এ বড় কঠিন কাজ। সকলে পারে না। নারী শরীর আগুনের মত। পুরুষ পতঙ্গ সেদিকে ধায়।

সেক্রেটারীর শালীটা বেশ সেক্সি।

রজনীগন্ধা বনে কিছুটা এগিয়ে যাই। আমার সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি ফুলের রঙে মিশে যাচ্ছে। চাঁদও উঠলো। একটু ফাঁকা মত জায়গা। বসে পড়ি। ফুরফুরে হাওয়া। আমার মাথা ছাড়িয়ে উঠছে ফুলের শীষ। খুব ইচ্ছে করছে ফুলের বিছানায় শুয়ে পড়ি,

গড়াগড়ি যাই, এই কোমল শুভ্রতার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মিশে যাই...

এমন সময় এরশাদের গলা শোনা যায়। হবা...এই হবা...

হবা কি? অ্যাঁ? পাগলে কত কি বকে, কত কি করে। একদিন দেখি কি, আঁজলা ভরা ঝরা রজনীগন্ধ নিয়ে হাঁটুগেড়ে বসে বিড়বিড় করছে। আমি বললাম কি করছ? ও বলল আল্লার দ্রব্য আল্লাকে দেলম। মুসলমানরা কি আমাদের মত ফুল দেয়? আমি তো জানি না। তারপরই আপন মনে হাঁক পেড়েছিল...সরবৎ দাও এদিকে। আমি অবাক চোখে ওর দিকে তাকালে ও বলেছিল— বেহেশ্‌তের সাকীরা ঘোরে, জানেন না, ওরা কোন পাত্রে আঙুর রস, কোন পাত্রে মধুর মত মিষ্টি পানি নিয়ে ঘোরে...এই বলে তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে মাটির ঘড়া থেকে জল নিয়ে বলেছিল পান করেন।

হবা, হবারে...এরশাদের গলা। একটু যেন ভেজা। আর্দ্র। চাপা। একটা নারীকণ্ঠও ভেসে এল যেন...

উঠে দাঁড়াই। ঘোরলাগা ফ্যাকাসে আলোয় দূরে দুটো অস্পষ্ট অবয়ব।

দেখবি হবা, দেখবি, একটু পরেই কত ফিরেশ্‌তা নামবে এখানে...

এরশাদ বসে আছে ওর বেহেশতের কুঞ্জে, ঐ করবী গাছটার তলায়। সঙ্গে একটি মেয়ে, ফ্রক পরা। এরশাদের সাদা দাড়িতে চন্দ্রালোক। সন্ধ্যারতির চামর ব্যাজনের মত এরশাদের সাদা দাড়ি মেয়েটার মুখের সামনে দোলে, মেয়েটার মুখের উপর ; শরীরের উপর পালকের মত ঘুরছে সাদা দাড়ি।

....আমি আর এগোই না, নিচু হই। বসে পড়ি। ফুল ডাটির ফাঁকা দিয়ে দেখতে পাই, বেশ দেখতে পাই এরশাদ একমুঠি রজনীগন্ধা ছড়িয়ে দিল মেয়েটার গায়ে,তারপর হাঁটুগেড়ে বসল মেয়েটার সামনে, আকাশে তাকাল। মেয়েটার কোমরে হাত রাখল। চাঁদের মায়াবী আলো ক্রমে চোখসহা হয়ে গেলে মেয়েটাকে চেনা লাগে, মেয়েটাকে চিনে ফেলি আমি।

মেয়েটার আশ্চর্য শরীরের ভাঁজে ভাঁজে আলো খেলা করে, ভাঁজে ভাঁজে ছায়া খেলা করে। আমি আমার ঘন নিশ্বাসের শব্দ নীরবে শুনি। মায়া সম্মোহন। আমি নির্বাক। এরপর মেয়েটা মৃদু পায়ে পিছন দিকে হেঁটে গেলে রজনীগন্ধা বন ওকে ঢেকে নেয়। আমার পাপচক্ষু—ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু স্থির দেখে যায়।

আমি পাপ করিয়াছি। ডাইরিতে লিখি। পাপ? কেন পাপ? মেয়েটাকে এভাবে দেখেছি আমি, তাই পাপ? নাকি পাপ আমি নীরবে দেখেছি, তাই পাপ? এরশাদ ওকে ইভ ভেবেছিল, পৃথিবীর আদিম নারী। আমি ঝোপের আড়াল থেকে শয়তানের মত...নাকি তাই পাপ?

৮

ঘুঁটে দিতে ক'দিন ধরে মেয়েটা আসছে না। কে জানে কেন। কে জানে কেন ক'দিন ধরে মনটা বড় উচাটন লাগছে। কি একটা ভার মনে ঢুকে আছে। ভার না ভয়? হালদারবাবুকে বলব বলব করেও বলা হল না। একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ঘুঁটে দিতে এসে যে মেয়েটা দেয়ালগুলো নষ্ট করে যায়, সে কে?

হালদার মশাই বলেছিলেন—'ও তো সোনা বোষ্টমীর মেয়ে, ওরা সব লুজ ক্যারেকটার।' তারপর আমার চোখের দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'রেজিস্টিরিটা ভালয়

ভাল চুকি যাক্, শালীর ফটো সঙ্গে নিয়ি আপনার দাদার সঙ্গে কথা কয়ি আসব। আপনার নিষেধ শুনব না।' এরপর আমার চোখের দিকে তাকালেন। 'পরশু রেজিস্টিরি খেয়াল আছে তো, সকাল সকাল তৈরি হয়ি নেবে না, আর আপনার প্লটটা রাস্তার ধারেই রাখিচি।

একটা প্লট আমার নিজস্ব। আস্তে ধীরে যখন পারবো, শোধ দেবখনে।

হালদারবাবু বলে দিয়েছেন। বলেছেন—দালাল লাগলেও তো ওকে কিছু দিতে হত।

হালদারমশাই এরপর বললেন—আজ সক্কালবেলা একটু ঝামেলা মতন হয়ি গেল। এরশাদ এসিছিল, বোয়েচেন, মাপজোক হচ্ছে তো, ব্যাটা, বুজতি পেরেচে জমি বেচে দিচ্ছি, ও ব্যাটা বলে কি...

আমি তক্ষুণি বলে ফেলি—এরশাদটা সুবিধের নয়, বুঝলেন, আমি নিজে দেখেছি, ঐ ঘুঁটে দিতে আসে যে মেয়েটা তার সঙ্গে...

—অ্যাঁ, বলেন কি, ডিটেল বলেন দিনি, শুনি, হালদার মশাই চেয়ারটা আমার আরো কাছে টেনে নিয়ে দ্রুত সিগারেট ধরালেন।

আমার কাছে সব শুনলেন হালদারমশাই। সিগারেটে শেষ টান মেরে বললেন—মোক্ষম পয়েন্ট পেয়েছি। যদি কিছু বলতে আসে, বলে দেব ফুলবাগানে নষ্টামি চলছিল, বন্ধ করেছি। সাক্ষী দেবেন।

৯

মানব শরীর সপ্ত ধাতুতে নির্মিত। রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র। এই সপ্ত ধাতুর মধ্যে শুক্রই সকল ধাতুর সার, সুতরাং সর্বোৎকৃষ্ট। শুক্রই বীর্যবত্তার কারণ স্বরূপ। কায়মনোবাক্যে এই বীর্যকে বিচলিত হইতে না দেওয়া, পরন্তু সংযম ও সাধনা দ্বারা...

মন খারাপ থাকলেই মায়ের বাণী। এখন তাও ইচ্ছে করছে না। হাল্কা হবার জন্য হালদার মশাইকে ঐ সব বলতে গিয়ে উল্টে আরও ভার হয়ে আছে মনটা। কেন এই ভার? কেন বারবার সেই মায়া আলোয় দেখা সেই শরীরটা ভেসে ওঠে, কেন ঐ বুড়ো, এরশাদের কথা মনে হ'লে দাঁতে দাঁত চাপি, কেন বারবার পাঁচিলের দিকে তাকাই, যেখানে দাগগুলো পড়ে আছে...ঘুঁটের দাগ।

আজ রাত্রেই সঞ্জীবনদা আর মৃত্যুঞ্জয়দা আসবে, থাকবে খাবে। সকাল বেলা রেজিস্ট্রি আপিস যাওয়া আছে। কিছু রান্না করা দরকার।

হালদারমশাইয়ের চাকর এসে খবর দিল—বাবু ডাকছেন। সাক্ষী দিতে হবে।

বড় মুশকিলে পড়া গেল। ঝুট ঝামেলা এক্কেবারে ভাল লাগে না আমার। না যাওয়াটা খারাপ দেখায়। তাছাড়া আমার নামেও একটা দলিল হচ্ছে। বলে ফেললাম পুজোয় বসেছি, সেরেই আসছি।

একটু পরেই বের হলাম। রেডিওতে খবর হচ্ছে। এরশাদ কি এখনো ও বাড়িতে আছে? হালদার বাড়ি যেতে হলে রজনীগন্ধা ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে যাওয়া যায়, তবে একটু দেরি হয়। হোক। রজনীগন্ধা বনে ঢুকে যাই। চাঁদ উঠছে একটু দেরিতে। পরিপূর্ণ গোল নয়, একটু ক্ষয়েছে। রজনীগন্ধা গুলোর আশেপাশে সব কচি কচি চারা উঠছে। ওরা জানে না এখানেই ওদের কবর।

সামনে কে যেন বসে আছে। ফ্রকপরা। সেই মেয়েটা? আমি আর একটু সামনে

গেলে ও উঠে দাঁড়ায়। আমি ওকে স্থির দেখতে থাকি। ও মাথা নিচু করে।

এবার ও পেছন ফেরে। পা বাড়ায়। আমি এগিয়ে যাই। ওর সামনে দাঁড়াই। ওর হাত ধরি। 'এরশাদের জন্য অপেক্ষা করছিলে তুমি?'

ও কথা বলে না। আমি বলি, 'বুড়োটার কাছে কি পাও তুমি?'

ও কথা বলে না। নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ওর বুকের ওঠানামা।

আমি ওর কানের কাছে আমার মুখ নিয়ে যাই। ওর মাথায় রেপসীডের গন্ধ। বলি—আমি সব জানি। দেখেছি। ওর কাছে কি পাও।

ও বলে—'ওর টাকা পোঁতা আছে।'

কে বলেছে?

আমি জানি। ও এখানে পড়ে থাকে।

বেহেশ্‌তের কুঞ্জে জোনাকি জ্বলে, ঝিঁঝি ডাকে। আমি ওর দু কাঁধ ধরি। কাছে টেনে নিই, বুকের মধ্যে দামামা... জোনাকি, ঝিঁ ঝিঁ, হাওয়া, রজনীগন্ধার ঘ্রাণ, চাঁদের আলো, আমার বুকে প্রবল দামামা...

পায়ের শব্দ শুনি, পায়ের শব্দ এগিয়ে আসে। হবা, হ..বা...হবা রে...

আমি ছিটকে যাই, বাঁহাতে চেটোয় মুছি কপালের ঘাম।

এরশাদ এক মুহূর্ত স্থির, তারপর ওর নিজের চুল মুঠি করে ধরে ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে ভয়ানক আর্তনাদ করে। তারপর রজনীগন্ধা বন তছনছ করে আলোছায়ায় হারিয়ে যায়।

১০

হালদার মশাইকে বললাম পুজোয় দেরি হয়ে গেল একটু।

হালদার বললেন সব ঠিক আছে। এরশাদ ব্যাটা কিচ্ছু অস্বীকার যায়নি। ও বলে কিনা এসব বেহেশ্‌তী ব্যাপার, আপনি এসব বুঝবেন না। হালদার স্পষ্ট বলে দিয়েছেন—কাল থেকে পথ দেখ। জমি বেচে দেওয়া হবে।

ঘরে ফিরে ডাইরি নিয়ে বসলাম। পাপ। পাপ করিয়াছি। আর কিছু লিখতে পারছি না। ভয়।

হৈ-হৈ করে সঞ্জুদা মিতুনদা এসে পড়ল। 'পাপ' কেটে দিলাম।

১১

ভোর। কাঁচা রাস্তার গায়ে সাইকেল টায়ারের আলপনা শিশিরে ভিজেছে। সূর্য বন্দনা করি। গতরাত চিল হয়ে সূর্যমন্ত্রে ছোঁ মারে। গতরাত ভুলে যেতে চাই। প্রার্থনা শেষে চিঁড়েভেজা খেয়ে হালদার বাড়ির দিকে যাই।

আটটার মধ্যে আমরা রেডি। হালদারবাবুর বাড়ির সামনে জটলা। পাটভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি পরা হালদারবাবুর কপালে ঘাম।

—কি সব বলছে শুনছেন, এরশাদ নাকি মরে পড়ে আছে।

হালদারবাবুর সঙ্গে আমরাও যাই। রজনীগন্ধা বনের ঠিক মাঝখানে এরশাদের বেহেশ্‌তের কুঞ্জি। ওখানে শুয়ে আছে ও। ঠোঁটের কোণায় ফেনা, রক্ত। কালো পিঁপড়ের সারি। সামনে একটা গর্ত খোঁড়া। কোদালটা পড়ে আছে।

গুপ্তধন ছিল নাকি? ওর টাকা পোঁতা আছে, মেয়েটা বলেছিল।

এরশাদ শুয়ে। সকালের রোদ্দুর পড়েছে। ঠোঁটের কোণায় ফেনা।

কাছেই ভেজা মাটির গায়ে কি যেন লেখা।

আমার এইখানে কবর হইবে। ইতি এরশাদ।

হালদারমশাই অক্ষরগুলোর উপর দাঁড়ালেন। ওঁর জুতো একটা অক্ষর থেকে অন্য অক্ষরের দিকে গেল। ক ব র এর উপর ফুটে উঠল মোকাসিন জুতোর ভাঁজ ভাঁজ নক্‌শা।

আমায় হাতের ঝাপটে ডাকলেন হালদারবাবু। আমি 'ইতি'র সামনে দাঁড়াই। উনি আমার হাত ধরে টানলেন। আমার পা ছেঁচড়ে গেল 'এ'র উপর দিয়ে 'র'-এর উপর দিয়ে, তালব্যশ আকারের উপর দিয়ে...

'দেখুন দিকি?'

এরশাদের সাদা চুলে আর দাড়িতে তবু বাতাস খেলা করে যায়। রজনীগন্ধা বনে তবু বাতাস খেলা করে যায়। রজনীগন্ধা বন। আমার এইখানে কবর হইবে। এরশাদের হাত মুঠো করা। মাটিমাখা হাত।

ব্যাগ থেকে দলিলের গোছাটা বের করলেন হালদারমশাই। বললেন, আপনারা যান, চোখ বুলিয়ে দেখবেন একটু—দোষটোষ আছে কি না। আমি আসছি।

কস্য সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় স্থাবর সম্পত্তি সাফ কবলা মিদং কার্য্যঞ্চাগে জিলা উঃ ২৪ পরগনা মৌজা...

দোষের আমি কিই বা বুঝি?

দেশ, ১৯৯০

বিমলাসুন্দরীর উপখ্যান

রেল লাইনের ধার দিয়ে বিমলাসুন্দরী হাঁটে। কালো লোহার দু'ধারে কালো পাথর। কালো পাথরের ফাঁকে ফাঁকে অনামা জংলাফুল অনন্তকাল ফুটে আছে। বিমলা চোখকে বলে দ্যাখ, কানকে বলে শোন। লাইনের লোহার পাশে পাশে ওর দৃষ্টি চামরের মতো নড়ে। চকচকে লোহার কোথাও কি লেগে আছে কোনো রক্ত দাগ? সেলুনওলা আদিনাথ বলেছিল দু-নম্বর সিগনালের কাছে ডেডবডি আছে ও নিজে দেখেছে। বিমলা শেষ সিগনালের লাল রং ছাড়িয়ে যায়। কোনো কিছুই চোখে পড়ে না। ছেঁড়া কোনো বস্তার টুকরো-টাকরাও না। সেলুনওলা আদিনাথ বলেছিল তোমার সাবিত্রীকে বস্তাবন্দি করে মহিম ঘোষের মেজছেলে ওইদিকে নিয়ে গিয়ে ওইখানে, লাইনের ওপরে ফেলে রেখে গেছে। ও নিজে দেখেছে। একটু পরেই চলে গেছে রাত দশটা ছাপ্পান্নর ট্রেন। বিমলাসুন্দরী দুই রেল লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ে সাবি...সাবি...সাবিততিরে...।

অফিসের বাবুরা সব রেক্‌সিনের ব্যাগ হাতে আটটা ছত্রিশ ধরবে বলে পাথরের ওপর দিয়ে ছুটছে। লাইনের ধারে ধারে ঝুপড়িতে থাকা ঠিকে ঝিরা বাসনমাজা সারা করে ঘরে ফিরবে বলে পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটছে। পাথরের ধারে ধারে অজানা আনামা সব ফুল অনন্তকাল ধরে ফুটে আছে।

লাইন বরাবর একটা রাস্তা। রাস্তার ওপর মা মনসা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। মহিম ঘোষের দোকান। সাবিত্রী ওখানে ঢুকেছিল। সেলুনওলা আদিনাথ বলেছে মহিম ঘোষের মেজছেলে বস্তায় ভরে...।

অফিসমুখো এক বাবু খবর কাগজের ঝাপেট মেরে বলল ও মাসী, মরবে নাকি। ট্রেন আসছে যে। বিমলা তখন ঝমরঝম ঝমরঝম শব্দ শোনে। লাইনের পাশে সরে যায়। তীব্র কঠিন ঝমরঝমকে বলে আমার সাবিত্তিরকে দেকিচিস ভাই, দেকিচিস? ট্রেনের রং দু-ধারে ঝুপড়ির ধূসরে আর আগাছার সবুজে মিশে গেলে বিমলা দূরে দেখে পাখি। বড় ডানার পাখি কিছু উড়াল দিয়ে বসল ফের লাইনের পাশে পাশে, দূরে। মা মনসা মেঠাই দোকানের মা মরা বয় আকাশে তাকিয়ে দেখছে একটা লাল ঘুড়ি। বিমলা শুধোল, হ্যারে আমার সাবিত্তিরি...। হাতের চেটোয় নাক মুছে ছেলেটা বলল, ওই কালো বেড়ালটা খুড়ি? ওটা কিন্তু হেব্‌বি খচ্চর। রোজদিন ছ্যানা খেতে দোকানে আসে। কাল রাতে মেজদা ওটাকে কায়দা করে বস্তায় পুরে...।

—কই কোথায়?

—হুই যি। ছেলেটা দূর দেখায়। বিমলা দেখে পাখি। বোঝে, শকুন।

বিমলার এবার সামনে যেতে হবে। পা এগোয় না। জল এগোয় না, তৃষ্ণা এগোয়। দুটি টান টান লোহার মাঝখান দিয়ে বিমলা এগোয়। ক্রমশ মেল ট্রেন হয়ে যায় বিমলাসুন্দরী। ক-টা শকুন উড়ে যায়। ক-টা শকুন ডেকে ওঠে। লাইনের ধারে ছেঁড়া বস্তায় রক্তদাগ। আলতা দাগ। ওই তো সাবিত্তিরি। সাবিত্রী মা আমার। কালো শরীরটা

খুবলে খুবলে খাওয়া। লেজের কাছে সাদা দাগ। এ রূপ আর দেখব না।

মাথা নিচু করে ফিরে আসে বিমলা। পায়ের তলায় কালো রঙের পাথর। গর্তে কালো রঙের জল। আর হেরিব না কালো রূপ।

মহিম ঘোষ যেন ওলাওঠায় মরে। আজই মরে, এক্ষুণি মরে। আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে স্টেশনে আসে বিমলা। স্টেশনের সিমেন্টে বাঁধানো লাল বেঞ্চিতে এসে বসে। একটা আপের ট্রেন দু-নম্বরে দাঁড়িয়ে আছে, লাইন কিলিয়ার নেই বোধ হয়। সমস্ত ট্রেন বন্ধ হয়ে যাক। সমস্ত দোকানের ঝাঁপ নেমে যাক। হরতাল হয়ে যাক। বট-অশত্থের ছায়া হয়ে যাক বাজার রাস্তা রেল ইস্টিশন।

তবু কোলাহল থাকে। মুসাম্বিলেবু সল্টেড-বাদামের হাঁক থাকে। তাজা খবর...মন্ত্রীসভার পরিবর্তন থাকে। পৃথিবীর কলশব্দ ঠিকই থাকে, এবং থাকে রেলগাড়িটার একটানা হিসহিস। সেই শব্দ ভিড়ের মধ্যে বিমলা শোনে। কি গো, চিনতে পারছ? বিমলা দেখে সিমেন্টের কালো বেঞ্চিটার গায়ে এইমাত্র একটা আঙুল চুন মুছল। হাতে পানের বোঁটা, ঠোঁট লাল। লাল ঠোঁটে থেমে থাকা হাসি। অ্যাসবেস্টাস শিট ভেদ করে আসা রোদ্দুরের ফালিটাও এখানে থেমেছে, ওই মুখে।

—হ্যাঁ গো, কেমন আছ গো!

ওই 'গো' শব্দটা সেই মুহূর্তে বিমলাকে রাইকিশোরী করে দেয়। মানুষটার চোখের দিকে দৃষ্টি ফেলে বিমলা। পতি হইল রমণীর আদরের ধন। বিমালা চেয়েই রইল। আস্তে আস্তে বিমলা নদীর মতন হয়ে যায়। কুলুকুলু অনেক কথা থাকে। বলা হয় না। বিমলা চেয়েই থাকে। শরীর শুকিয়েছে তাঁর, চুল সাদা সাদা।

—ভালো আছো? কি গো?

বিমলা কথা বলল না।

—কোথায় থাকো? থাকা হয়....।

—এখানে।

—এখানে কোথায়?

—আচার কারখানার রাস্তায়। ভুবন রায়ের বাড়ি।

ট্রেন ভোঁ দিল। তুমুল। পলিথিনের পাম্পশু চঞ্চল হল, ট্রেনের কামরাটার কাছে ধেয়ে গেল। 'মেয়েকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি শ্বশুরঘর।' হাতটা চেপে ধরল ট্রেনের হ্যান্ডেল। 'আমি পরে দেখা করব বিমলা....।' ট্রেন ছেড়ে দিল। 'কেমন আছো বললে না...'। তুমুল শব্দের মধ্যে বিমলা চিৎকার করে বলল, ভালো আছি, খুব ভালো আছি। তারপর ঝপ করে জলটা মুছে নিল চোখ থেকে।

চোখের জলে সব দুঃখ ধুয়ে যায়। কিন্তু লাউশাকের বালি আর অন্তরের কালি শত ধুলেও কি যায়? মনটা তো পুড়তে পুড়তে ছাই হয়েই গিয়েছিল। আবার কেন দেখা হল আজ? খুব জোরে নিশ্বাস ছাড়ে বিমলা। ওর দুঃখ মিশিয়ে দেয় চা-লিকারের ধোঁয়ার মধ্যে, হকারের শব্দে, স্টেশনের হাওয়ার হাহাকারে।

তবু ফিরে ফিরে আসে ওই মুখ। খুলিলে মনের দ্বার লাগে না কপাট।

কত বছর পর দেখল ওই মুখ? এর আগেও মাঝে মাঝে ওই মুখ দেখেছে বিমলা চিমনির ধোঁয়ায়, মেঘের কুণ্ডলীতে। বিছানায় মিথ্যা স্বপ্নে দেখেছে সে মুখ।

সেই মুখ বলেছিল বাঁজা মাগী।

খড় পচে, খড়কে পচে, কথা পচে না।

বিমলা তো বাঁজাই। বিয়ের পর ছ-বছরেও হল না কিছু। তাবিজ-মাদুলি, পীরের দরগায় ঢিল, বাবা তারকনাথ, জলপড়া, হাসপাতালের ডাক্তার। সেই মুখ বলেছিল তোমার নাড়িতে গেঁড়ো আছে, ডাক্তার বলেছে। বলেছিল 'আবার বিবাহ হব।' হয়েছিল। কত বছর হবে? তখন ইস্টিশনের ওই বিরাট বুকল গাছটা ছিল ছোট্ট দু-হাত। ডবল লাইন হয় নি। সিনেমা হলটার জায়গায় ছিল বাঁশঝাড়। কালীবাড়ির রাস্তাটা ছিল মোরামের। কালীবাড়ির পিছনে এখন যেখানে বসন্তবিহার নামে তিনতলা বাড়ি, ওখানে ছিল একটা ডোবা। ডোবার ধারে দোচালা ঘর। ওখানে থাকত বিমলার দিদি কমলাসুন্দরী। পতিঘর ছেড়ে দিদির কাছে উঠেছিল বিমলা। দিদির মুদি দোকান। পিছনের ডোবায় হাঁস চরত। আয় আয় আয় চৈ-চৈ। কত সময় বহে গেল। কত কথা বহে গেল। কত স্মৃতি। আয় আয় আয় চৈ-চৈ। তোমার অম্বলের বেদনাটা আর আছে গো? তোমার পিঠের দাগটা আর বড় হয় নি তো? জর্দাটা বড্ড খাও। দাঁতগুলো আরো কালো হয়ে গেছে কিনা ভালো করে দেখাই হয় নি। পুরোনো ভালোবাসা টুপটাপ বৃষ্টি হয়ে নামে।

সেই বিয়েতেও ছিল বিমলা। উলু দিয়েছিল, কুলোয় প্রদীপ ধরেছিল। ফুলশয্যার রাতের দোর বন্ধ হবার শব্দ পর্যন্ত দাঁত চেপে ছিল বিমলা। তারপর দরজায় ছিটকিনির আওয়াজের গোঙানি বিমলার বুকের মধ্যে। পালিয়ে এসেছিল বিমলা, এক কাপড়ে লাস্ট ট্রেন ধরে। পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে ওর দিদির বাড়ি।

দিদি বলেছিল, সতীনের পুত হোক, পড়শির ভাত হোক। কিন্তু সতীন কাঁটা কঠিন কাঁটারে বুন। এসেচিস ভালোই করিচিস। দুখের ভাত সুখ করে খাব।

দিদি তখন তিন বছরের বেধবা। জামাইবাবুর মুদি দোকান দিদি চালায়। ছেলে মিলিটেরি।

আর তো কেউ ছিল না বিমলার। বিমলার মা মরেছিল ছোটবেলায়, বিয়ে হবার দু-বছরের মধ্যে বাপ। দিদির দোচালাই বিমলার নতুন ঘর। পিছনে ডোবা। শুষনী-কলমী ল-ল করে। হাঁস চরে। আয় আয় আয় চৈ-চৈ।

মানুষটা খোঁজখবর করেছিল। সন্ধান নিয়েছিল। একদিন খুঁজে খুঁজে এসেছিল দুপুরবেলা। দোকান ঘরের সামনে কমলা দিদিকে শুধিয়েছিল ও এখেনে এয়েচে কি?

বিমলার শরীরে গুঁড়ি গুঁড়ি ঘামবিন্দু। ঘামবিন্দু অভিমান হয়ে ঝরে পড়ছে।

এয়েচে।

ঝাক। নিশ্চিন্তি হলাম। কোথায় আছে, একবার দেখতুম। বিমলার পায়ের গোড়ালিতে অদৃশ্য ঘুঙুরের অভিমান নিঃশব্দে বেজে ওঠে। ঝামর ঝামর পায়ে দ্রুত বের হয় ঘর থেকে। কালীমন্দিরের অন্ধকারে যায়। অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে একটা নারীজন্ম। লাল সিঁড়িতে ঘুঘু ডাকে একা।

একটু পরেই রোদ্দুরে পিঠে নিয়ে মানুষটাকে চলে যেতে দেখে। ঘাড়টা একটু নিচু। চলে যায়। নরম মাটিতে হাওয়াই চটির দুখী আল্পনা রেখে যায়।

কতকাল হবে? তখন স্টেশনের বকুল গাছটা মাত্র দু-হাত। আয় আয় আয় চৈ-চৈ...।

এরপর কত রাত ফরসা হল। কত আশ্বিন-কার্তিকে ধানেরা গর্ভ পেল। কতবার

কুল ঝরল প্লাটফর্মের সানে। কত টিভি সিরিয়াল শেষ হয়ে গেল। বিমলার বয়স বাড়তে লাগল।

বিমলার দিদি মরল। মিলিটারি ছেলে পশ্চিম থেকে এল। বিমলা ভেবেছিল ওর বোনপো ওকে ওর কাছে নিয়ে যাবে। ওর বউয়ের হাতের পানসাজা খাবে। ওর ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াবে। যার যেমন কামনা, তেমনি ঢাকী বাজায় না। বোনপো বলল, এবার মাসী অন্য ব্যবস্থা দেখ। জমিটা বেচব। দেরাদুনে সেটল করব ভাবছি। বরং তোমায় মাসে কিছু পাঠাবখন।

তারপর কতবার বাড়ি বদলেছে বিমলা। গরুহাটার রসময় হালদারের বাড়িতে রাঁধুনি হয়ে থেকেছে। বিপিন চক্কোত্তির বাড়িতে থেকেছে ওর বুড়ো বাবার সেবা করার জন্য। রেশন দোকানের পিছনে খুপরি ঘরটায় থেকেছে ক-দিন...এখন আচার কারখানার পিছনে। বাড়িওলা ভুপেন রায়।

দু-টো ক্রিম বিস্কুট কিনল বিমলা। কাগজে জাড়িয়ে নিল। বাবলু খাবে। কুকুরটা। বড় সরাটা ভেঙে গেছে, ছোট সরাটা আছে। সাবিত্রী নেই, বাবলু রইল। ও পথ চেয়ে আছে। বিমলা ওর কাছে যাবে। টিপির টিপির বৃষ্টি পড়ছে। মটরদানা কেনার ছিল। এখন থাক। আজ টিফিনবেলায় ইস্কুলে বসবে না বিমলা। মন ভালো নেই। নিতাই পাগলা এই পথ যদি না শেষ হয় থামিয়ে বলল, মাসী নমস্কার। হারু রিকশাওলা হাঁকল কী গো মাসী—তোমার ছেলেমেয়ে কেমন আছে? বিমলা কিছু বলল না। মন ভালো নেই। তোমার নাতি নাতনি? বিমলা আস্তে আস্তে হাঁটে।

এই হারুর রিকশা চেপে পুজোর সময় একদিন বিমলা ঘুরেছিল এই মফস্বল। লাল সিটে বিমলার পাশে বসেছিল সাবিত্রী। বিমলার কোলে আঁটুল-বাঁটুল পায়ের কাছটাতে লাল জিভ নাড়ছিল বাবলু। বিমলা বলেছিল দ্যাক-দ্যাক লাইটের খেলা। ওরে দ্যাক দ্যাক নাগরদোলা। তোরা কুকুর বেড়াল না হয়ে যদি মানুষ হতিস, তোদের ওরা চড়তে দিত। তোদের আইসকিরিম খাওয়াতাম।

ঘরে ফিরল বিমলা। ঘরের সামনাটাতে জল জমেছে একটু। এই জলে সামনের বাড়ির বাগানের কলাবতী ফুলের হলুদ ছায়া। ওই ছায়ার মধ্যে ছোট্ট একটা ব্যাঙ লাফাচ্ছে একা একা। পৃথিবীর এখানে ওখানে এখনো অনেক টুকরো-টাকরা সুখ পড়ে আছে। বাবলু বাঁধা আছে পাটের দড়িতে। ঘেউ করল। মানে এতক্ষণ? এবার অন্যরকমের আওয়াজ। গন্ধ পেয়ে গেছি মা গো। শিগ্‌গির দাও। ল্যাজ নাড়তে লাগল। আঁটুল-বাঁটুলরাও বিমলার পায়ের কাছে ঘুরঘুর। এবং মিউ মিউ। আমাদের জন্য কি এনেছো। বিমলা বলল, থাম মুখপোড়ারা। মা খাগী। বাবলুর সামনে বিস্কুট দিল ভেঙে।

পাশের বাড়িতে বি. এ পাশ বউ কলাবতী ফুলের আড়াল থেকে দেখল আড়চোখে। আমার পয়সায় আমি খাওয়াচ্ছি—তোর কী লো? বিমলা বিড়বিড় করে বলে।

অন্য কোনোদিন হলে এতক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ত বিমলা। হামানদিস্তার ঢক ঢক আওয়াজ হতো। ধনেভাজা জিরেভাজার গন্ধ ছড়াত। উনুনে ফুটত মটরদানা। ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়ে টিফিন বেলায় বসে সে। ঘুগনি বেচে, আলুকাবলি বেচে। আচার কারখানায় কাজ পেতে পারতো বিমলা। সকাল আটটা থেকে সন্ধে ছ-টা ডিউটি দিতে হতো। এত সময় কি ওর আছে? সংসার কে সামলাবে। আজ শুয়ে রইল। একটু পরে দুটো ফুটিয়ে নেবেখনে। ভগবানের জীবগুলোনের মুখে তো কিছু দিতে হবে। টিনের

চালায় টিপির টিপির মন খারাপের বাজনা।

বিমলা-বিমলা করে কে হাঁকে?

বাবলু চেঁচায় ঘেউ-ঘেউ। ও বাবলু চেঁচাস নি বাবুরে, চেঁচাস নি সোনামানিক আমার। বাড়িওলার ছোটছেলে ডাকছে। তুই ঘেউ করলে ওদের অপমান হবে নে? বিমলা হুড়মুড়িয়ে ওঠে। কি হল বাপধন?

বাবা ডাকছে। এক্ষুনি এস।

যাই। এক্ষুনি যাই।

বিমলা কথা কইবার আগেই ছেলেটা পিছু ঘুরেছে। বাড়িওলা ডাকছে কেন? বাড়িভাড়া বাকি ছিল। পরশু দিনই তো কিলিয়ার করে দিয়েছে। কুকুরটাকেও তা বেঁধে রেখেছে ক-দিন ধরে। সাবিও মরেছে। তবে! কাপড় ঠিক ঠাক করে বিমলা।

বাংলাদেশ থেকে এসে ভুবনবাবুরা এখানেই ছিল। এই দোচালা ঘরে। তারপর ভূবনবাবু বাজারে গমকল দিল। পাশের জমিটা কিনল। মনিহারী দোকান দিল, কোঠাবাড়ি হল। বাড়ি দোতলা হল। কাচের জানালা হল, জানালায় পর্দা ঝুলল। ওবাড়ি থেকে ঘিয়ের গন্ধ আসে, গানের শব্দ ভাসে। বিমলা এখন ওদের ফেলে আসা দোচালায় থাকে। তিনটে ঘর। একটায় বিমলা, অন্য দুই ঘরে বাবুদের বাতিল চেয়ার, বাতিল টেবিল, বাতিল আলমারী...। ভুবনবাবুর ছেলেরা আগে মাসী বলত। বিমলা মাসী। আজ ছোট ছেলেটাও নাম ধরে হেঁকে গেল। এখন ওদের কাছে যেতে হবে তাকে। ঘর ছাড়ার জন্য বলবে আবার? ক্ষমা তো চেয়েই নিয়েছে ও। তিনমাস সময়ও চেয়েছে। ভুবনবাবু বলেছিল হ। ঠিক আছে। তিন মাস, চাইর মাস কইরো না কিন্তু।

ভূবনবাবুর ছোট ছেলেটাকে হারামজাদা গাল দিয়েছিল বিমলা। রাগ হলে কি মাথা ঠিক থাকে? রাগ হল নেকড়ার আগুন। নেভানো কষ্ট। ওই ছেলেটা যে এত খচ্চর, বাবলুর ওখানে খুন ছিটিয়ে দিল, সেটা কেউ দেখল না। হারামজাদাটাই শুনল শুধু।

বাবলুটার নতুন যৌবন। তার ওপর ভাদ্দর মাস। ভুবনবাবুর বাড়ির সামনে একটা মাদী কুকুরের সঙ্গে আটকে গেছে ও, খচ্চর ছেলেটা তখন ওখানে নুন ছিটিয়ে দিলে। চিৎকার শুনে বিমলা ছুটে গেল। দেখল ওই ছেলেটা আর আরো দু-জন দাঁত কেলিয়ে হাসছে আর বেচারা জীব দুটো চিৎকার করছে। বিমলা বলেছিল অসভ্য ইতর হারামজাদা।

তারপর তো হুলস্থূল মহাভারত। ছেলেটা কোঁত পেড়ে চিল্লাল, মা শুনে যাও, আমাকে কী যা তা খিস্তি দিল। আমাকে হারামজাদা বলল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে লোহার গেট খুলে বেরিয়ে এল সব। বিমলা বলেছিল ভগবানের জীব দুটো একটু লীলা করছিল তখন এ নুন দিয়েছে।

হারামজাদা বলেছ কিনা বল। এত বড় আস্পর্ধা। কালই ছেড়ে দাও ঘর। মাথা নিচু করে ঘরে ফিরছিল বিমলা। পিছন থেকে বেবুশ্যে-টেবুশ্যে অনেক কিছুই শুনল সে। সামনের বাড়ির বি. এ পাশ বউ ম্যাক্সি পরে রগড় দেখতে এল। বিমলার মাথা নিচু। ঘরে ঢুকে যায়। একটু পরেই কুকুরটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছিল বিমলার কাছে। বিমলা ওর গায়ে হাত বুলিয়েছিল। জল দিয়ে নুনলাগা জায়গাটা ধুয়ে দিয়েছিল। তারপর একটু দুধের সর লাগিয়ে দিচ্ছিল ওখানে। সরে ঠাণ্ডা করে। তক্ষুনি হাসি শুনেছিল বিমলা। বি.এ পাশ বউ দেখছে। পাশে ওর বর। আপিস যায় নি বুঝি। বউ কনুয়ের

গুঁতো মারল বরকে। ভাতার সোহাগী। বর কি একটা ইংরিজি কথা বলল, বউকে।

সেইদিনই সন্ধেবেলা ভূবনবাবু ডেকে পাঠালেন বিমলাকে।

—কী সব শুনতাছি, অ্যাঁ?

বিমলার মুখ নিচু।

—ভগবানের জীব।

—ভগবানের জীব দেখাও। খাও ভাত, উগরাও নাটমন্দির? ঘরের সামনে এইসব করবে? আমার মেয়ে বড় হচ্ছে।

—ভাদ্দর মাস।

—ভাদ্দর মাস তো বাইন্ধ্যা রাখতে পার না?

—এবার থেকে বেঁধেই রাখব।

—আরও কি সব শুনতাছি?

বিমলার মুখে কথা নেই। চোখে জিজ্ঞাসা।

—তুমি নাকি তোমার কুকুরের সঙ্গে নষ্ট? রিপোর্ট আছে।

বিমলা কিছুই বুঝতে পারে না।

—তিনদিনের মধ্যে ঘর ছাড়বা তুমি। কী আরম্ভ করছ কি, অ্যাঁ? বিড়াল কুকুর নিয়ে অত্যাচার। তোমার বিলাই দুধ চুরি কইরা খায়, আমার মাছ খাইয়া পালায়। ঘরে হাগে। শেষকালে এইসব কদাচার। এই ভদ্রপাড়া। তার ওপর এতবড় দুঃসাহস। আমার ছেলেকে বলো হারামজাদা? পোঙায় এত রস? কবে ঘর ছাড়বা?

ক্ষমা চেয়েছিল বিমলা। তিনমাস টাইম চেয়েছিল সেদিন, এক মাসও তো হয় নি এখনো।

বিমলা তো ঘর খুঁজছে। নতুন নতুন কত ঘরবাড়ি উঠছে, দোচালা, চারচালা ভেঙে তিনতলা-চারতলা উঠছে। ওসব তো বিমলাদের জন্য নয়। টিনের ঘর, টালির ঘর কমে আসছে ক্রমশ। একদিন গোরুহাটা গিয়েছিল। রসময় হালদার এখন বুড়ো হয়ে গেছে। দেখেই চিনতে পেরেছিল। বলেছিল, কী গো কেমন আছ? ও বাড়িতে তিন বছর রাঁধুনি ছিল বিমলা। রসময় তখন রসে জড়িয়েছিল। বলেছিল, তোমায় যদি ইয়ে করি, থাকবা? অন্য বাসা ঠিক করে দেব। বিমলা বলেছিল মরণ? রসময় বলেছিল—এভাবে উড়িয়ে দিওনে, ফাইনাল বলো, বিমলা বলেছিল আমি যে বাঁজা। রসময় বলেছিল সেই জন্যই তো আছি। রিক্স নেই। বিমলার কপাল কুঁচকে উঠেছিল। রসময়ের চিটে চোখ তখন বিমলার ভ্রূ-কুঞ্চনের দিকে ছিল না। রসময় বলেছিল, বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি বলেই তো জায়গার জিনিসপত্র জায়গা মতন আছে। হে-হে-হে। বাসনপত্র ভালো থাকলে ভোজনে যায়। হে-হে-হে। বিমলা সেদিনই ওর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছিল। পিছন থেকে বিমলা শুনতে পেয়েছিল যদি কখনো দরকার পড়ে, এসো...

বিমলা এখন বাবুবাড়ি যাবে। কেন ডাকছে ভূপতি রায়। মাধবীলতার সামনে মাথা নিচু করে লোহার দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজা খোলার ক্যাঁচোর শব্দ বিমলার বুকের মধ্যেই ছিল। ফুল-নক্সাকাটা বারান্দায় পা দিতেই প্রেসারকুকার ফস্ করল। চেয়ারে বসে আছে ভূপতি রায়। বিমলাকে দেখেই বলে উঠল, ঘর ছাড়ার কি করলা?

—তিন মাস টাইম...

—ওসব জানি না। সাতদিনের মধ্যে ছাড়বা। তোমার কালো বিড়ালটা আবার দুধ খেয়ে গেছে।

—আমার বিড়াল তো কাল রাত্রেই...।

—কী করছে রাত্রে?

—মরে গেছে।

—গুল মারবা না। সব্বাই দেখছে, ওই বিড়ালটারে। সব্বাই চিনে। যাও অখন।

বিমলা আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে ফিরে আসে। ঘরে ঢুকেই দেখে, একি, সাবিত্রী, গর্ভিণী বিড়ালটা ল্যাজ উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিমলাকে দেখে মৃদুস্বরে বলে, মিউ।

হেলে দুলে কাছে আসে। বিমলা কোলে তুলে নেয় তাড়াতাড়ি। ওর গরম বিমলার বুকে লাগে। বিমলা স্টোভ ধরায়।

বিমলা হাঁটছে। রাইকিশোরীর মতো পা এগুচ্ছে। লালপেড়ে শাড়ি, কপালে সিঁদুর। আজ আলতাও পরেছে। বিমলার লালপাড় পা এগুচ্ছে। পিছনে পায়ে পায়ে তিনটে বেড়াল একটা কুকুর। সাবিত্রী বেড়াল সবার পিছনে। গর্ভভার। হেলে-দুলে হাঁটছে। আঁটুল-বাঁটুল হল সাবিত্রীর আগের গর্ভের। সাঁটুলও ছিল। ওটাকে হুলোয় মেরেছে। এখন শেষ বিকেলের রোদের হলুদ ওদের গায়ে। স্টেশনে এসেছে বিমলা ও তার সংসার। সাবিত্রীর আবার চায়ের নেশা আছে। ভাঁড়ে চা নিয়ে টুকরো পাঁউরুটি তাতে ডুবিয়ে সাবিত্রীকে দিচ্ছে বিমলা। শাদা টুকরোগুলি ছুঁড়ছে আঁটুল-বাঁটুলের দিকে। পাঁউরুটিটার মাথার পোড়া দিকটা বাবলুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বিমলা বলল, নে কেক খা। কুকুরটা একটু শুঁকে বিমলার দিকে তাকাল—ইয়ারকি মেরো না বলছি। বিমলা তখন একটা সত্যিকারের কেক নিল। কিশমিশটা খুঁটে সাবিত্রীকে দিল। পোয়াতী মেয়ে। কেকটা বাবলুকে দিল বিমলা।

একটা আপ ট্রেন এসে থেমেছে। মানুষটা যদি আসে, এখানে দাঁড়ায়, বিমলা কথা কইবে না। কথা পাথর হয়েই থাকবে। লোকটা যদি হাসে, জলের মতোই হাসে, কথা তবু পাথর হয়েই থাকবে। জলে পাথর নরম হয় না। পাথর নড়ে। আপ ট্রেন চলে যায়। আসবে লোকটা ঠিকই একদিন। আসবে এ রকম একটা ট্রেনে। বিমলা এগোয়। একটা বাচ্চা মেয়ে বিমলাকে বলে মাসী, ও বেড়াল মাসী, কাল একটু বেশি ঝালনুন এনো তো, ফাউ দিও। বিমলা মৃদু হাসে। ওর আলতা-পাড় পা এগোয়। আর পায়ে পায়ে এগোয় তিনটে বেড়াল, একটা কুকুর। পায়ে পায়ে এগোয় বিমলার দিন।

সক্কালবেলা। কাক ডাকছে। বুঁচির মা পাঁচির মা-রা সুখের কথা বলাবলি করতে করতে কাজে যাচ্ছে। বিমলা পাশ হাতড়ে টের পায় সাবিত্রী নেই। বিমলা না উঠলে সাবিত্রী ওঠে না। ও বড় সোহাগী মেয়ে। গা লেপটে শুয়ে থাকে। বিমলা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে যায়। দরজা বন্ধ জানলা খোলা। এদিক ওদিক বাইরে চায়। করবী ফুটছে। শিউলি ঝরছে। ইলেকট্রিকের তারের গায়ে একসারি জলের ফোঁটা। সামনের বাড়ির বি.এ. পাশ বউ হেলেদুলে বাথরুম যাচ্ছে। মুখে টুথপেস্টের ফেনা। সাবিত্রী আছে কোথাও। কাছে-পিঠেই আছে। বিমলা এদিক চায়, ওদিক চায়। মাদার ডেয়ারির লাইন দিতে যাচ্ছে ওবাড়ির বুড়ো কর্তা। পাগলা নিতাই বেরিয়ে পড়েছে। তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর, হাসি আর গানে ভরে তুলব। পরনে হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি।

সারাদিন গান গাইবে। ওবাড়ির বিয়ে পাশ বউ বাথরুম থেকে এল। সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ার। ওখানে বসবে। বসতে গিয়েই কেমন চিৎকার করে উঠল। চিৎকার শুনে পাজামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওর স্বামী। চেয়ারের দিকে তাকাল। বউটা চিৎকার করল বিমলা, বিমলা, দেখে যাও, তোমার বেড়াল আমাদের চেয়ারের কুশনে হেগে গেছে।

বিমলা আস্তে আস্তে ও বাড়ির দিকে যায়। যেতেই হয়। বারান্দায় ওঠে। বউটা আর ওর স্বামী বলেই চলেছে, বলেই চলেছে। একদিন পিটিয়ে মারবে বলছে। আক্কেল নেই বলছে। বিমলা কলাবতী গাছেদের পাশ দিয়ে বারান্দায়। লাল কুশনে চুপচাপ শুয়ে আছে ছোট একটু গু। যেন কিচ্ছু জানে না। চেনা রং। চেনা গন্ধ। ও তবে আছে কোথাও। বিমলা তবু বলে, এটা যে আমার বেড়ালের বুঝলে কি করে? কি পোমান? পিরথিবীতে আর বেড়াল নেই?

একদম দেব ইয়ে করে।—বউটার স্বামী বলে। আর কোনো বেড়াল অসে না এখানে।—বউটা বলে। যাএ এক্ষুনি ওটা পরিষ্কার করো।—স্বামী বলে। কুশনসুদ্ধু নিয়ে যাও। বউটা বলে।

বিমলা নিয়ে গেল। কুশন সমেত। ওটা লাল কুশনে কেমন চুপচাপ শুয়ে আছে, যেন কিচ্ছু জানে না।

বউটা বলল শোনো, কুশনটা থাক। শুধু কভারটা খুলে নিয়ে যাও।

বিমলা তাই করল। বলল, সাবান-কাচা করে ধুয়ে পাঠিয়ে দেব। খুব যত্ন করে জড়িয়ে নিয়ে যায়। ও তাহলে আছে। কাছেই কোথাও আছে।

বুঁচির মা, পাঁচির মা-রা দুঃখের কথা বলাবলি করতে করতে ফিরে আসে। নিতাই পাগলা 'যে দীপ জ্বালাতে নাহি পারো সমাধি পরে তা জ্বেলে দিও' গাইতে গাইতে ফিরে আসে। সাবিত্রী ফেরে নি। ছায়ারা ছোট হয়ে এল। সাবিত্রী ফেরে নি। আজ কি একটা ছুটি। ইস্কুল বন্ধ। ইস্কুল বন্ধ থাকলে বিকেল বিকেল স্টেশনে বসে বিমলা, বিককির হয়ে যায়। সাবিত্রীকে কেউ মারল না তো। পোয়াতি মেয়েটা। কত মার খায় বেচারি। নাকে রক্ত মেখে, কানে রক্ত মেখে ফিরে এসেছিল একবার। কে জানে কোনো আঁটকুড়োর ব্যাটা কাটারির ঘা মেরেছিল।

বিকেলে ওর বাবলু কুকুরটাকে নিয়ে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিল বিমলা। আসলে খুঁজতে। পুকুরের পাশে একটা দোতলা বাড়ি আছে। ও বাড়ির একটা বড় লোমওয়ালা মাদি কুকুর বোধহয় বাবলুকে ভালোবাসে। লোমওয়ালাটা এখন বাগানে ঘুরছে। বাবলু থমকে দাঁড়াল। লোমওয়ালাটাও লোহার গ্রিল বেড়ার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়াল। বাবলু ওর মুখে মুখ লাগাচ্ছে। লোমওয়ালাটা বিলিতি না? পিরিতির রাজ্যে জেতের বিচার নেই। চ বাবলু এখন চ। কে আবার দেখে ফেলবে। ওকে ছেড়ে দে। হবে নে। রুটি দেখিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে আসবখন ঘরে। ঘর বন্ধ করে দেব। করিস।

কচুরিপানার নীল ফুল ছিঁড়ে কতকগুলি মেয়ে রান্নাবাটি খেলছে।

বিমলা শুধোল—হ্যাঁরে, আমার বেড়ালটাকে দেখেছিস তোরা কেউ?

একটি মেয়ে বলল, কালো বেড়ালটা তো, ল্যাজটায় সাদা।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেকিচিস?

মেয়েটি ঠোঁট উলটোল।

পরদিন নবনগরের দিকে গেল বিমলা। ওটা গয়লাপাড়া। ওদিকে যায় বিমলা। কোথাও কোনো কানাঘুসো শুনতে পায় না।

বাসার কাছে ফিরেই দেখে একটু দূরে জটলা। নতুন দাড়ি রাখা ক্লাবের ছেলেটা তেড়ে এসে বলল, বল বুড়ি কবে তুমি পাড়া ছাড়বে। বাবলু হঠাৎ ঘেউ করে ওঠে। ছেলেটা বলে, মারব পেটে লাথি। বিমলা বলে, কি হয়েছে। ছেলেটা বলে, যাও, কাকলিদের বাড়ি গিয়ে দেখ তোমার বেড়াল কি করেছে।

বিমলার ঘর থেকে চারটে বাড়ি পরেই কাকলিদের বাড়ি। বামুনবাড়ি। নিত্যি পুজোর ঘণ্টা ঘরে বসে শুনতে পায় বিমলা। হাত জোড় করে তখন। ওদের বাড়ির সামনেই লোকজন। সাবিত্রী তাহলে ওখানেই দুষ্টুমি করেছে। কি করতে পারে? পুজোর ভোগ খেয়েছে? নাকি বমি-টমি করল, নাকি ওদের ঠাকুরঘরেই বাচ্চা দিয়েছে। দুগগা-দুগগা।

বিমলাকে দেখেই কাকলির মা খিঁচিয়ে উঠল। তোমার বেড়াল আমাদের পাতকো নষ্ট করে দিল। বলো তার কী হবে। দেখগে পাতকোর জলে মরে ভেসে রয়েছে তোমার বিড়াল। বিমলার বুকে বাজ পড়ল। হাওয়ায় দু-হাত আঁচল লুটোচ্ছে। ছুটে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল কুয়ো পাড়ে। দেখল কালো জলে কালো শরীর। চোখ বোজে। ও রূপ আর হেরিব না। কুয়ো পাড়ে নিমগাছে কাকরা ডাকছে। বিমলা মাথা নিচু করে স্থির।

—কুয়োটা যে নষ্ট হল কে খেসারত দেবে?

—বিমলার চোখের জল বসুমতীর গায়ে পড়ে।

—ক কেজি ব্লিচিং পাউডার ফেলে দিতে হবে।

—ব্লিচিং পাউডার নয়, গ্যামাক্সিন।

—না-না, গ্যামাক্সিন পয়জন। ব্লিচিং।

আরে তার আগে তো ওটা ওঠাতে হবে, ট্রাই করছি তো, বালতিতে তো উঠছে না, ফস্কে যাচ্ছে। বালতি তোলার কাঁটা নেই? কুয়োর কাঁটা? কে একজন দড়ি জড়ানো কুয়োকাঁটা নিলে এল। 'যদি তুলে দি, চা খাওয়াবেন বউদি।' কাঁটা নেমে যায়। উঠছে উঠছে। মানুষের উল্লাস শব্দ। কাকের চিৎকার শব্দ। উৎসব। ছেলেটার হাতের পেশী ফুলে ফুলে উঠছে।

মাটিতে নামাল। ওর গা থেকে জল ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা। ওর সারা গা কাঁদছে। ওর গায়ের মধ্যে আটকে আছে কাঁটা। পেট ফুলে আছে। হায় রে গভ্য।

ও কেন ঝাঁপ দিতে যাবে কুয়োর জলে? ওর তো কোনো দুঃখ রাখে নি বিমলা? কেউ কি ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছে ওকে?

—এবার এটা কি হবে, এটা?

—পুকুরপাড়ে ফেলে দে।

—তোর যেমন বুদ্ধি। পচে গন্ধ হবে না!

—তবে লাইনের ধারে।

সঙ্গে সঙ্গেই দড়ি জোগাড় হয়ে যায়। গলায় বাধা হয়ে যায়। টানতে টানতে নিয়ে চল। বলহরি হরিবোল। কাকেরাও চলল। রাস্তায় পড়ে রইল জলের দাগ। একটু পরেই শুকিয়ে যাবে।

বিমলা আঁচলে জড়িয়ে নিল সমস্ত কালো। ধীর পায়ে ঘরের শূন্যতার মধ্যে নিজেকে মেশাল। চারিপাশে সবকিছু ঠিকঠাক। সবকিছু নিষ্ঠুর ঠিকঠাক। চারিপাশে 'আই অ্যাম

এ কমপ্লান বয়।' কাকেরা বাসায় ফিরছে।

লক্ষ্মীর শাঁখ। বামুনবাড়ির পুজোর ঘণ্টাও বাজল। সাইকেলরিকশার হর্ন, ট্রেনের ভোঁ। নিতাই পাগলা গাইছে এক পলকে একটু দেখা আর একটু বেশি হলে ক্ষতি কি। চাঁদও উঠল ঠিকঠাক। সন্ধ্যামালতি ফুটল। দু-একটা জোনাকি উড়তে থাকল এদিক ওদিক। পরটা ভাজার ডালডা ঘি-এর গন্ধ ভেসে এল কোনো বাড়ি থেকে। মাধবীলতার গন্ধ এল। দূরের রাস্তার আলো আর দূরের চাঁদ মিলেমিশে গাছটার ঝিরিঝিরি ছায়া ফেলেছে ঘরের সামনেটায়। সেই আলো—আঁধারির মধ্যে এসে দাঁড়াল কে?

—মিয়াও।

ল্যাজটা উঁচিয়ে রয়েছে।

বিমলা তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নেয়। ওর গরম বিমলার বুকে লাগে। বিমলা স্টোভ ধরায়।

আমি এলাম।

মানুষটাকে দেখে অবাক হয়ে যায় বিমলা। করবী গাছের আলো-আঁধারির ছায়া-মায়া বিমলার মুখে খেলা করে।

—আসব বলেছিলাম না? এলাম।

—এসো।

—অনেক খুঁজেছি, বুঝলে, এক ঘণ্টা খুঁজে তবে পেলাম।

—বোসো।

—ভুবন রায়ের নামটা মনে ছিল। একজন ভুবন রায় পাঠানপুরের দিকে থাকে ওদিকে দেখিয়ে দিয়েছিল। পরে আচার কারখানা মনে পড়ল। খুশি হও নি?

—খুব।

—এসব কী? এত কুকুর বেড়াল?

—আমার কামনা-বাসনা।

হারিকেনের আলোটা উশ্‌কে দিল বিমলা। বড় করে সিঁদুর টিপ পরল। মানুষটাকে প্রণাম করল।

—চা দেব?

—না। শুধু জল। আর শোনো, স্টেশনের সামনেটার দোকান থেকে রুটি মাংস এনিচি। ধরো।

বিমলা হ্যারিকেনের কোরোসিন শিখার দিকে চেয়ে বলল, রাখ। জল দিল। আঙুলে আঙুল লাগল। কতদিন কতকাল পরে। আঙুল মুঠো করে এনে সাবিত্রীবালা বেড়ালটার গায়ে বুলিয়ে দেয় বিমলা। আর তখন সাবিত্রীর গর্ভযন্ত্রণা শুরু হয়।

—বলো বিমলা, কেমন আছ?

—ভালো আছি। এখন সাবির প্রসব হবে।

—সাবি আবার কে?

বেড়ালটার গায়েই হাত রাখা ছিল বিমলার। লণ্ঠনটায় উশ্‌কে রাখাই ছিল। বিমলার চোখ এবং ভ্রূ-যুগল তখন অদ্ভুত এক মায়া খেলা করে।

—ও বুঝিচি। তোমার কামনা-বাসনা। হে হে। বাড়ি ফিরছিলাম। বাড়িতে অবশ্য

জানে আজও মেয়ের বাড়িতেই আছি। তোমার এখানে চলে এলাম। হে হে।

হারিকেনের আলোটা একটু কমিয়ে দেয় বিমলা। জলের ঘটি সামনে রাখে। এক আঁচল জল নিয়ে হাত ধোয়। কেরোসিনের শিখার দিকে চেয়ে বিমলা মৃদুস্বরে বলল, প্রসব হচ্ছে প্রসব।

ছায়ারা কাঁপে।

একটা জোনাকি এল ঘরে। এক ঝলকা বাতাস এল। মাধবীগন্ধ এল।

—তোমায় নিয়ে যাব, বুঝলে, যদি অবশ্য তুমি রাজি থাক। ও, মানে ও বলছিল যে...।

—এখন কোনো কথা কয়ো না। দোহাই। চুপ থাক। শুনছ না, টিভিরাও থেমে গেছে।

ও মেয়ে, মেয়ে আমার, কাঁদিস নারে। কাঁদিস না। এটা তোর নারীজন্ম। এটা কিচ্ছু কষ্ট না। আর একটু ধৈর্য ধর, ও মেয়ে, এটা তোর আনন্দ। এটা তোর নিতাই পাগল।

বিমলা বেড়ালটাকে কোলে তুলে নেয়। ওর গরম বিমলার বুকে লাগে। বিমলা স্টোভ ধরায়।

শারদীয় আজকাল, ১৯৯২

ঝড়ে কাক মরে

ফটোকপিয়ার মেশিনের এই প্লেটটা কিন্তু খুব ইমপর্টেন্ট। এই যে কালো প্লেটটা দেখছেন, এর মধ্যে আছে সেলেনিয়াম কম্পাউন্ডের একটা ফিল্ম। সেলেনিয়ামে একটা অদ্ভুত প্রপারটি আছে, এর মধ্যে লাইট পড়লে সেলিনিয়াম অ্যাটম থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে, ফলে সেলিনিয়াম চার্জড্ হয়ে যায়। এটাকে বলে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট। বুঝতে পারছেন?

কিছুই বুঝতে পারছি না। তবু আলতো ঘাড় নাড়ি। পাশের ছেলেটির কানের কাছে সসম্ভ্রমে ফিসফিস করি, আপনি তো বেশ বুঝছেন দাদা, আপনি তো বি এস-সি। বুঝিয়ে দেবেন কিন্তু। ছেলেটি পরে বলেছিল, ধুৎ মশাই, ফটোফিজিক্স চ্যাপ্টারটা পড়েছি নাকি, আমাদের বেলা ওটা সাজেশনে ছিল না, আগের বারে এসে গিয়েছিল। তাছাড়া ওসব থিয়োরি ফিয়োরি বুঝে কী করবেন, প্র্যাকটিসটাই আসল।

খুব প্র্যাকটিস করলাম। দু-মিনিটেই একটা করে প্রিন্ট বার করে দিচ্ছি। ট্রেনার বলল, ভেরি গুড। আপনার হবে। কালি লাগানো ব্রিড্স্গুলো প্লেটের গায়ে লেগে কী সুন্দর শিরশির শব্দ করে। হাতে কালো কালি লাগে, লাগুক। জামায় কালির গুঁড়ো পড়ে, পড়ুক। এই জামা নিয়ে আমি চন্দনার কাছে যাব। দ্যাখো, জেরকস মেশিন। হাত মুছতে হয় বলে রুমালে ফিক্শার নামক কেমিক্যালটির মৃদু গন্ধ। আঃ। ওই কেমিক্যালটা কী যেন? অ্যাসিটালডিহাইড, নাকি কার্বন টেট্রাক্লোরাইড? যা খুশি হোক। যখন বিজনেস শুরু করব, ক্যানিং স্ট্রিটে ফিক্শার বললেই মাল পেয়ে যাব।

ট্রেনিং চলছে। যে কোম্পানির মেশিনটা কেনা হচ্ছে সেই কোম্পানির পাঁচ দিনের টেনিং। ব্যাঙ্ক লোন ম্যানেজ হয়েছে। জেরক্স-এর বিজনেস করব। ট্রেনিং-এর লাস্ট দিনে মা পকেটে ব্যোমকালীতলার ফুল গুঁজে দিল। দুগ্‌গা-দুগ্‌গা। দিন দশ-বারোর মধ্যে ডেলিভারি হয়ে যাবে মেশিনটা।

বাড়িওয়ালার টাকাটা পুরো ক্লিয়ার না হলে চাবি পাওয়া যাবে না, তার পরেও অনেক কাজ। ওয়ারিং করানো, সাইনবোর্ড, রং, তা ছাড়া একটা হ্যান্ডবিল ছড়াতে হবে। সুসংবাদ! সুসংবাদ! আর শহরে ছুটিতে হইবে না। হেলা বটতলার মোড়ে নূতন জেরক্স মেশিন। গ্র্যাজুয়েট বেকার ছেলেকে মদত করুন। না। আমি এটা নিজে লিখব না। আমার বড় বানান ভুল হয়। আমি লক্ষ্মণের কাছে যাই।

লক্ষ্মণ আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত। বাংলায় অনার্স। এখন লক্ষ্মণ স্যার। এব্‌লা ওব্‌লা চল্লিশটা ছাত্র পড়ে। লক্ষ্মণ রচনা লেখাচ্ছে। 'বিজ্ঞানের জয়যাত্রা'। মানুষের আগুন আবিষ্কার বাস্তবিক পক্ষে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইহা মানুষের জীবনযাত্রায় এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করিল...আরে, এ যে সুধীরবাবু স্যারের দেয়া সেই নোট। আমি ঝাড়া মুখস্থ করেছিলাম। আমাদের বেলা ভেরি ভেরি ইমপর্টেন্ট ছিল। সেবার কোশ্চেন আউট হবার গুজবে পরীক্ষার ঠিক আগে আগে অন্য ইস্কুলের ছেলেরা রাত জেগে আমার খাতা থেকে টুকে নিয়ে গেছিল কিন্তু পরীক্ষায় এসেছিল 'বিজ্ঞান আশীর্বাদ

না অভিশাপ'। আমি ঝাড় খেয়ে গেলাম, কিন্তু লক্ষ্মণ তো ভালো ছেলে, সে ঠিক ঘুরিয়ে নাক দেখিয়ে দিল।

লক্ষ্মণকে একটু বাইরে ডাকি। ওকে জানাই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে দোকান ওপেন হচ্ছে, সেদিন ওকে থাকতেই হবে। হ্যান্ড বিলটাও লিখে দিতে বলি, আর পাঁচশোটা টাকা চাই। ধার।

টাকা দিতে পারবে না লক্ষ্মণ। ওর টিভি-র পিকচার টিউবটা কেটে গেছে। তাছাড়া দু-তিন মাসের মধ্যেই ওর জমিটা রেজিস্ট্রি করে ফেলতে হবে।

তাহলে বরং আশুর কাছে যাই...

এইভাবে লক্ষ্মণ, আশু, কানাই, ট্যারাবাচ্চু, অ্যাটম, চপলাপিসী, ছোটমামা, এঁদের কাছে ঘুরঘুর করে টাকা পয়সা জোগাড় করি। মায়ের গয়নায় হাত দিতে আমি চাই না, কিন্তু উপায় ছিল না। পুঁটুলিটা নেবার সময় মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারি নি। পুঁটুলি মুঠো করে মাথা নিচু করে বসাক জুয়েলার্সে যাবার সময় মা বললেন, দুগ্‌গা-দুগ্‌গা। আমি আট হাজার পাই। বাঁ হাতের চেটোয় চোখ মুছে পরান ঘোষকে বাকি টাকা দিয়ে আসি। উনি চাবি দেন। সেদিন সন্ধ্যায় চন্দনার সঙ্গে সিনেমায় গেলাম।

থালায় বড্ড বেশি ঠকাস্ শব্দ হল, বউদি যখন ভাত দিল রাত্তিরে। মা বোধহয় বুঝলেন। বউদি যেন না শোনে ততটা আস্তে এবং অস্ফুটে বললেন, গয়না তো তোমাকেও দিয়েছি বউমা—

অথচ সবাই বলেছিল আমাকে, বসে না থেকে ব্যবসা-ট্যাবসার চেষ্টা করতে। বউদিও তো বলেছিল চাকরি আজকাল খুব ব্রিলিয়ান্ট ছেলেরাও পাচ্ছে না। চায়ের দোকান করলেও অনেক ইনকাম। কোনো কাজই তো খারাপ নয়। আমার দাদারও হেভি টাইপের স্পিড। ডায়মণ্ড জুটমিলের টাইপিস্ট। বাবা বেঁচে থাকতেই ঢুকিয়ে গিয়েছিলেন। দাদা চুপিচুপি দু-হাজার দিয়ে বলেছিল, কাউকে বলিস না। 'কাউকে' কথাটার ঠিক ঠিক মানেটা আমি জানি। বউদিকে কিচ্ছু বলি নি। মা জানেন। দাদার জুটমিল প্রায় বন্ধ থাকে। হেলা বটতলার মোড়ে তাপস স্টুডিওর বারান্দায় টাইপ মেশিন নিয়ে বসে। বেকার ছেলেরা পাশপোর্ট ছবি তুলিয়ে অ্যাপ্লিকেশন টাইপ করায়। কিছু হয়ে যায় দাদার। কত রকম সমস্যা আছে মানুষের, কত রকমের দরখাস্ত।

জেরকস বসাব শুনেই দাদা 'জেরকস, শব্দটা এমন ভাবে উচ্চারণ করেছিল যে ওটা অনেকটা আর্তনাদের মতো লেগেছিল। জেরকস, অ্যাঁ? আমি বলেছিলাম সবাই বলছে এ অঞ্চলে জেরক্স নেই, ভালো চলবে।

অবনীর দাদা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, উনিও বললেন লোনের ব্যবস্থা করে দেবেন। দাদা একটুক্ষণ চুপ ছিল তারপর বলেছিল, আমার টাইপটা গেল। আমি বলেছিলাম, তা হলে? দাদা বলেছিল, তাহলে আর কি, কর্, সায়েন্স এগুচ্ছে, কিছুই থেমে থাকে না। আমার পাটকলও বন্ধ হয়ে আসছে, নাইলন, পলিথিন—পলিথিনকে কি থামানো যাবে? কর্, জেরকসই কর্।

দেড়কাঠার ছোট প্লটে টালির চালের বাড়িটা মায়ের নামে ছিল। ওটার এগেনস্টে ব্যাঙ্ক লোন। মা গ্যারেন্টার। জেরক্স মেশিন আসছে।

বিজনেস শুরু, দোকান ওপেন, দেয়ালে মাকালী, তাকে গণেশ। একটা রবীন্দ্রনাথের ছবিও রাখলাম। দাদার মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। মাকে প্রণাম করি, মা আমার

কড়ে আঙুল কামড়ালেন। একটা ঝাঁটার কাঠি মেশিনে লাগিয়ে রাখতে বললেন, তাহলে নজর লাগবে না। ব্যোমকালীতলায় পুজো দেয়া জবার মালা দিলেন, মেশিনে পরালাম। দুগ্‌গা-দুগ্‌গা।

চন্দনা একবার এল। বেশ সেজেছে। ও অ্যাতো সেজেছে কেন?

মাকে লেখা মায়ের গুরুদেবের একখানা চিঠি পরম স্নেহস্পদা কুলবালা বিমলা সুন্দরী দেব্যা দীর্ঘজীবেষু...চারকপি আমার প্রথম জেবকস প্রিন্ট। মা টাকা দিলেন। মা আমার চোখে চেয়ে হাসলেন। বাড়িওলা পরান ঘোষকে মা মিষ্টি খাওয়ালেন। ব্যাঙ্ক থেকেও এসেছিলেন একজন। ট্যারাবাচ্চু এই খুশির দিনে একটা পাঁইটের দাম চাইতে এল। গুরুদেবের চিঠির দশ মিনিট পরে আসে একটা পঞ্চায়েতের রসিদ, তারপর একটা ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন, তারপর একটা দলিলের কপি। তারপর একটা প্রেমপত্র। স্টার্টিং—আমার প্রাণের শুকতারা। লাস্টে ছিল এবার ৮০, ET শেফালি। লোকটির মুখে দাড়ি, হাতে সিগারেট। চিত্ত স্থিত। বলে—'দশ কপি। সার্কুলেট করে দেব শালা।' দুগ্‌গা-দুগ্‌গা।

কে জানত এই মফস্বলে এতসব সমস্যা আছে, জেরক্স মেশিনের এত দরকার ছিল। নে-রে বাচ্চু, তোর পাঁইটের দাম। দোকানটা দেখিস। মাসের শেষে মায়ের হাতে তিনশো দিলাম। মা দুহাত বাড়িয়ে টাকা এমনভাবে নিলেন যেন নির্মাল্য। একটা দশ টাকার নোট গুরুদেবের ছবিতে ছুঁইয়ে কোথায় যেন রাখলেন। বাবার ছবিকে প্রণাম করতে বললেন, এত খুশি হয়েছিলেন যে মা লুচি করেছিলেন রাত্রে, আর শোবার আগে কি যেন ভাবতে ভাবতে একটা বালিশের গায়ে হাত বুলোচ্ছিলেন, সেই স্পর্শ আমার চামড়ায় স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি চোখ মুছে ফেললেন মা, বললেন, হ্যাঁরে, ধারের কিস্তিগুলো শুধেছিস তো? বলি ব্যাঙ্ক আর বাড়িওলাকে দিয়েছি। অন্যদের দুমাস পর থেকে দেব। মা বললেন, তোর পিসি আর মামারটা ঠিকঠিক দিয়ে দিস যেন।

একটা শাড়িও কিনেছিলাম চন্দনার জন্য। ওটা দোকানেই রাখা ছিল। চন্দনা এলেই কাগজের প্যাকেটের তলা থেকে শাড়ির প্যাকেটটা টেনে বের করে বললাম, এটা মাইরি তোমার।

চন্দনা প্যাকেটটা নিয়েই বলল, 'উরি বাব্বা।' তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল, প্যাকেটটার গন্ধ শুঁকল, গালে বোলাল। কালচে হয়ে যাওয়া শুকনো ব্রণর সঙ্গে ব্রাউন পেপার ঘষার মৃদু খরখর।

চন্দনা বলল, তোমার বউদির জন্য কিনেছ? আমি বলি, না তো। ও একটুক্ষণ পরে বলে, তাহলে এটা বউদিকেই দাও। আমি বলি, সে কি, এটা তো তোমার জন্য কেনা। বউদিকে না হয় পরে...

চন্দনা বলল, তুমি কিচ্ছু বোঝ না। শাড়িটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে কী বলব? কে দিয়েছে বলব? তুমি তো জানো, ওরা তোমাকে...

—সে তো আমি বেকার ছেলে বলে। এখন তো আর বেকার না...

—তবু। মা বকবে। ইন্টারকাস্ট। এইজন্যই তো রেজিস্ট্রিটার কথা বলি।

—দাঁড়াও, আর ছটামাস সময় দাও আমাকে, আমি মোটরসাইকেলে চড়ে তোমার বাড়ি যাব। ডাইরেক্ট বলব—ভালবাসি। কাস্ট-ফাস্ট সব ফুটে যাবে টাকার কাছে। দাঁড়াও, রেজিস্ট্রিটা শিগ্‌গির করে নিচ্ছি।

বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি এই তিন চার মাসে। কত নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। যে

জনার্দনের মাঠে নাকি জনার্দন ঠাকুরের ভূত ঘুরে বেড়াত, সেই মাঠ ঘর বাড়িতে ভরে গেল। আমার দোকানটার ঠিক উলটোদিকে অঘোর হালদারের লম্বা ফালি জমি। হালদার মশাইয়ের ছেলে পার্টির থেকে টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে কয়েকটা দোকানঘর তুলছে। আমি কত রকম বায়নানামা, দলিলপত্রের জেরক্স করছি।

দেখতে দেখতে অঘোরবাবুর ফালি জমিটা দোকানঘর হয়ে বিলি বন্দোবস্ত হয়ে গেল। একটা দোকানের নাম স্ন্যাক্স। কেক, পেস্ট্রি, রোল এই সব পাওয়া যায়। একটা দোকানের নাম একুশ শতক। টিভি, টেপরেকর্ডার, ভিসিআর ইত্যাদি ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাদি বিক্রয় ও মেরামত করা হয়। প্রিয়দর্শিনী নামে ব্লাউজের দোকান হল একটা, শুধু ব্লাউজ নয়, শোকেসে সব লাল-নীল ইয়ে টানটান করে রাখা, খুব লজ্জা করে দেখতে। স্টাডি সেন্টার নামে বইখাতা পেন্সিল, সুগন্ধি রবার কমিক্স আর রং তুলির দোকান, তার পাশেই এল স্পিড কপি সেন্টার। ওখানে অটোমেটিক পদ্ধতিতে মিনিটে ২০টি জেরক্স করা হয়।

অটোমেটিক ক্যানন মেশিনটি বসিয়েছেন মুকুল শিকদার। সবাই মাকলুদা ডাকে। জমির দালালিতে দু পয়সা হয়েছে। বেশ কিছু লোককে টুপি পরিয়েছেন উনি। ব্যাঙ্ক-ফ্যাঙ্কের তোয়াক্কা করেন না। বলে গেলেন—জমির লাইন বড় নুংরা লাইন। ট্যাকনিকাল লাইনে শুরু করলাম। আইসো মাঝেমধ্যে।

কাচের ঘরের মধ্যে ঐ মেশিনটা। ছোটোখাটো বডি। খালি সুইচ টেপো। ফ্রেম ধরে নাড়ানাড়ির ব্যাপার নেই, ফিক্সিং চেম্বার নেই, বীড্‌স্‌ নেই, কালির গুঁড়ো নেই, তিন সেকেন্ডে একটা করে কপি।

দামটা কিরকম পড়ল দাদা?

দামের কথায় কাম কী? বহুত দাম।

নিজেই অপারেট করবেন, নাকি লোকটোক রাখবেন?

দেখা যাক সেল কেমুন হয়। তেমন হইলে একটা লোকটোক তো রাখব অনে। জানাশুনা বিশ্বাসী আছে নিকি? সত্যকথা কইতে কি, এইসব টেপাটিপির কাম আমার পুষায় না। সময় পাইলে আইসো মাঝেমাঝে।

কে জানতো এত বেশি সময় পেতে থাকব। ক্রমশ আমার সেল কমছে। খুব সময় পেতে থাকি। প্রায়ই চুপচাপ বাইরে তাকিয়ে থাকি। হেলাবটতলার মোড়ের রিকশাওলাদের আমার আত্মীয় মনে হয়। ওরাও আমার মতো চুপচাপ বসে আছে। ধাই করে চলে যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার বোঝাই অটোরিকশা। আমার সামনে স্পিড জেরক্স। আমার ভাতে টান দিয়েছে বদমাশটা।

কে বদমাশ? স্পিড না জেরকস। নাকি লক্ষ টাকার মূলধন যা দিয়ে স্পিড কেনা যায়। জানি না। আমি সামনের দোকানটার দিকে তাকাতে পারি না। ভয় হয়। মুকুল শিকদারের 'স্পিড জেরকস-এ' এখন সবসময় কাজ। একদিন দেখতে পাই মুকুল শিকদারের স্পিড জেরক্সের গায়ে বড় বড় করে লেখা প্রতি কপি ৬০ পয়সা মাত্র। এতদিন ৭০ পয়সা ছিল। আমার রেটও কমাতে হয়। আমিও লিখে দি ৬০ পয়সা। তার মাত্র দুদিন পরে, সবে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে, আকাশে ঝিলিক মেরেছে রোদ্দুর, মাকলুদা ভাঁড়ে রং নিয়ে ৬০-এর উপর ক্রমশ চিহ্ন দিল। লাল কালিতে লিখল মাত্র ৫০ পয়সা। মাকলুদার পাতলা টেরিকট হাওয়াই শার্টের ভিতর দেখা যাচ্ছে জালি জালি

গেঞ্জি। আমি দুহাতে আমার মাথার চুল চেপে ধরি। মুকুল শিকদারের কাছে ছুটে যাই। টেরিকট জামা, জালি জালি গেঞ্জি, ঘামাচিময় চামড়া ভেদ করে আমার নখর হাত ওর হৃদপিণ্ড চেপে ধরে। ভাবলাম বলি দালালির কাঁচা পয়সায় অটোমেটিক মেশিন বসিয়ে খুব পাঁয়তারা হচ্ছে? কিন্তু আসলে বলি, মুকুলদা, এরকম করছেন কেন দাদা, আমাকেও বাঁচতে দিন।

—কেন? কী হয়েছে? মুকুলদা সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন।

—পঞ্চাশ পয়সায় আমার পড়তা হয় না মুকুলদা, আমার সেল কম। প্লেটের দাম বাড়ছে, কালি, কেমিক্যাল দিনকে দিন বাড়ছে, আমার পোষাচ্ছে না।

—কিন্তু আমার তো পোষায় ভাই...

—আপনার তো পোষাবেই, আপনি মিনিটে কুড়িটা করতে পারেন। আপনার অনেক সেল। এমনিতেই আমার কাজ নেই, রেট বেশি থাকলে কেউ আসবে না অথচ আমার চারিদিকে ধার মুকুলদা, অনেক ধার করে মেশিনটা বসিয়েছি।...আমার গলার স্বর এমন বিকৃত হয়ে যায় যে অচেনা লাগে।

মুকুলদা আমার গালে দু-আঙুলের টোকা মারলে এককোঁটা জল ছিত্তিছান হয়। বলে—শালা ইয়ং ছেলে, কাঁদিস? ঘাবড়াস না, আমি তরে মাঝে মাঝে কাজ পাঠামু। আমি সামলাইতে পারছি না। দাঁড়া, চা আনাই। মুকুলদা লোক রেখেছে। সে খুব ব্যস্ত। 'নিজে বাঁচে পরকে রাখে ধর্ম বলে জানবি তাকে' ১০ কপি করে ও চা আনতে যায়। আমি খাব না চা।

চন্দনা বলল, কী গো বিজেনেসম্যান, কী খবর? আমার রাগ ধরে। চন্দনা বলল, আমায় দেখতে আসবে। আমি নিশ্চুপ। বলো না, আমি কী করব। চন্দনা আমার জামার হাতা খামচে ধরে।

যা খুশি করো, বলে আমি অন্যদিকে মুখ ফেরাই। চন্দনা, কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায়।

লক্ষ্মণ আসে। লক্ষ্মণস্যার। সঙ্গে গুচ্ছের ছাত্র। কাল বাংলা পরীক্ষা। গুজব রটেছে রচনা আউট হয়ে গেছে। লক্ষ্মণ বলল, শিগ্‌গির চল্লিশ কপি। রচনার হেডিং মানব কল্যাণে বিজ্ঞান। ছিল বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। ওটা কেটে এটা করা হয়েছে। ভূমিকার উপর কাগজের তাপ্পি। জয়যাত্রার জায়গায় মানব কল্যাণ, তাই ভূমিকায় একটু চেঞ্জ। মাঝখানে একটু এবং উপসংহারেও তাপ্পি মারা আছে। আমার ছাপতে একটু দেরি হচ্ছে দেখে লক্ষ্মণ—ধুস্, এসব আর চলে না, বলে স্পিড জেরক্স-এ চলে গেল—আমার জন্য চক্ষুলজ্জার মাত্র দশকপি রেখে।

পরদিন স্পিড জেরকস আরো দশ পয়সা কমাল। মুকুলদার কাছে ছুটে যাই আমি। আমি কিছু বলার আগেই উনি বলেন, তোমর জন্য রেট কমাই নাই আমি। ইউ আর নট মাই কমিপিটিটার। বাসস্ট্যান্ডে আরেকটা অটোমেটিক হয়েছে। ওরা এই রেটই রাখছে। কমিপিটিশন মার্কেট, বুঝলা না?

অ্যাটম তাগাদা দিয়েছে তিনবার। ট্যারাবাচ্চু বলল, দেখে নেবে। চপলাপিসি এসেছিল আমরা কেমন আছি দেখতে। বলে গেছে—আত্মীয়-স্বজনকে বিশ্বাস করা খুব মুশকিল। ব্যাঙ্কে গত মাসেও দিই নি, এ মাসেও পারব না। সারাদিন-ছ-টাকার কাজ হয়েছে আজ। রাত্তিরে চাবি বন্ধ করি। এ চাবি যেন আর খুলতে না হয়। যেন মরে যাই, আজ

রাত্তিরেই যেন মরে যাই। বাড়ি গিয়ে বিছনায় উপুড় হয়ে পড়ি। বিকৃত গলায় বলি, মা, মেশিন বেচে দেব। আমি তোমার সব নষ্ট করেছি মা, গয়না, টাকা...

চন্দনারও চোখের তলায় যেন হঠাৎ কালি। বলে, মেশিনটা বেচে দিয়ে তারপর কী করবে তুমি? আমি বিড়বিড় করে বলি, মুকুলদার দোকানে কাজ নেব। ও বলল, এমন ভেবো না। কানের কাছে মুখ আনে চন্দনা। বলে, তুমিও অটোমেটিক মেশিন কেনো। এটা বেচে দিয়ে...আমার তো হার আছে, বালা আছে...

ওতে কিছু হবে না চন্দনা, অটোমেটিক মেশিন অনেক দামি, দামের সঙ্গে পারবে যুদ্ধ করে? কদিন পরে আরো ভালো আর আরো দামি কিছু বেরিয়ে যাবে। জানো, ঝড় বইছে, টেকনোলজির ঝড়।

এখন বড় আস্তে হাঁটি আমি। আমার সারা গায়ে হালকা বাতাসে ওড়া এঁটো শালপাতার দুঃখ। বাড়ি গিয়ে দেখি মায়ের গুরুদেবের ছবিটা ভাঙা। মায়ের বিছানায় ভাঙা কাচের টুকরো পড়ে আছে। মা তবে ভেঙেছে ছবিটা, অবিশ্বাসে, রাগে, অভিমানে। মা এলেন ঘরে। মায়ের কপালে দেখি রক্ত। উঃ, রক্ত। এবার বুঝে যাই। ছবিতে মাথা ঠুকেছিল মা, ভীষণ। কী হবে মা?

অ্যাটম, টেরুয়া, চপলাপিসি, চিন্তা কোরো না। সবাইকে শোধ করে দেব। বাড়িওলা অঘোরবাবুকে ছেড়ে দেব। তোমার ঘর ছেড়ে দেব আমি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম নতুন অবস্থায় একটি জেরক্স মেশিন বিক্রয়। কয়েকজন দেখে গেল। বাড়িওলা বলল, সেই ভালো। অল্প কেপিটালে এইসব হয় না। এখন কি করবেন, চায়ের দোকান-টোকান? নাকি দোকানটা ছাড়বেন। দোকানটা ছাড়লে আপনার সঙ্গে কথা আছে। ভালো পার্টি আছে একটা। ফ্যান্সি সেলুন করতে চায়। মেয়েছেলের চুলও নাকি কাটাই করবে। আপনি সেলামি বাবদ আমাকে যা দিয়েছেন, তার চেয়ে দু-এক হাজার বেশি ফেরত পাবেন।

ছেলেটার নাম ভুজঙ্গ সরদার। বরো ক্লাস অবধি পড়েছিল। থাকে এখান থেকে ষোলো কিলোমিটার ভিতরে। নারায়ণপুরে। নারায়ণপুরে সবে ইলেকট্রিক এসেছে। জেরক্স বসাচ্ছে ভুজঙ্গ। দশ কাঠা জমি বিক্রি করেছে। গরুর গাড়ি নিয়ে এসেছে। গরুর গাড়িতে উঠবে জেরক্স মেশিন। ভুজঙ্গর কপালে সিঁদুরের টিপ। ভুজঙ্গ ভীষণ মমতায় মেশিনের গায়ে হাত বুলোচ্ছিল।

গাড়িতে উঠছে মেশিনটা। সাবধান ভাই! খুব সাবধান। মেশিনটা খুব ভালো ভুজঙ্গ বাবু, কক্ষনো ট্রাবল দেয় নি। চার্জারের সুইচটা একটু জোরে টিপবেন, কেমন। পিছনে সামান্য রং চটে গেছে, যেন জল না পড়ে, অ্যাঁ? সব সময় ধুলো মুছে দেবেন, একটু নরম কাপড়ে।

প্লেটটাই আসল, যত্নে রাখবেন, অ্যাঁ, যত্নে। নখ লাগাবেন না, মেশিনটা বড় ভালো ছিল জানেন, ওর কোনো দোষ নেই...ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দ করে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রটা নিয়ে গরুর গাড়ি ছাড়ল দুগ্‌গা—দুগ্‌গা।

বিসর্জনের পর শূন্যবেদিতে বসানো একাকী প্রদীপের মতো ওই ঘরে বসে থাকি নিশ্চুপ। শূন্য প্লাগ পয়েন্ট। তার। টুকরো কাগজ। কালির দাগ।

মুকলদা এল। বলল, একবার আইসো আমার কাছে। একটা দরকারি কথা আছে।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ১৯৮৯

ক্যারাক্কাস্

আমার কিছু ভাল লাগছিল না! টারজান আমাকে মেরেছে। টারজানকে আমি শ্রদ্ধাভক্তি করি, সাধ্যমতো সেবাযত্নও করি। গা-হাত-পা মুছিয়ে দি, তেল ঘষি, পাউডার লাগাই, সব করি। ঘড়ির কাঁটা ধরে ব্যাটারি পাল্টাই, কার্বন পাল্টাই। অথচ মারল। ওর নাভির 'অয়েল হোল'—এ মবিল দিচ্ছিলাম, সাবধানেই, লাগবার কথা নয়, হঠাৎ মারল। কেন মারল? রোবট তো আর জবাব দেয় না। আমার সময়টাই খারাপ যাচ্ছে। ছুটি হলে একা একা হাঁটি। মন খারাপের পা নালাটার দিকে চলে যায়। নালার পাড় ধরে হাঁটি। নালায় কালো জল ছরছর বইছে। আহা। জল তো নয়, অ্যাসিড। শুধু কি অ্যাসিড? অ্যালডিহাইড-কিটোন-আর্সেনিক-সোডা...আমি কি আর অত শত নাম জা টারজানকে সেবা করাই আমার ডিউটি। কারখানার জলে কী আছে না আছে জেনে কি দরকার? কারখানার জল মানে কারখানার জল। জল থেকে বের হচ্ছে ধোঁয়া। কী সুন্দর। কত রঙের ধোঁয়া। সবুজ রঙের ধোঁয়া, হলুদ... গোলাপি। এই মাত্র এক গাব্বা ধোঁয়া সবুজ রং হয়ে জল থেকে উঠল, হয়ে গেল হলদু। কোথাও আবার ধোঁয়াটা কুয়াশার মতো ঝাপসা হয়ে গেল। কি সুন্দর ঝাঁঝালো গন্ধ। কেমন কাশি আসে। কোত্থেকে উড়ে এল একটা ঝরাপাতা। জলের ভিতরে পড়েই সাদা হয়ে গেল। নালার পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে নালার শোভা দেখতে দেখতে পুকুরের পাড়ে পৌঁছাই।

এই পুকুরের পাশে একটা গাছ আছে। গাছের মতন বহু আগে গাছ ছিল। মরে গেছে। পাতাগুলো সব সেই কবে ঝরে গেছে, আর ওঠেনি। কাঠ আছে। মরা কাঠ, কাঠের শরীর। ওই শরীরটা তবু পড়ে যায় না। মাটিতে শিকড়। গাছের ঝুরি মিছিমিছি নেমেছে মাটিতে। এখানে মাটিতে কোন ঘাস নেই। পুকুরের কাদার রং ভারী অদ্ভুত। কোথাও সাদা, কোথাও কালো। কোথাও শেওলার মতো সবুজ। কোথাও হলুদ রেখা, কোথাও মাটির গায়ে রামধনুর ছাপ। পুকুরের জলে তেল ভাসে। তাতে রোদ্দুরে পড়ে রামধনু হয়। আমি বিষপুকুরের শোভা দেখি।

হঠাৎ দেখলাম পুকুরের জলে বুটবুটি। মনোহর বুটবুটি। বুটবুটি নড়ছে, সামনে এগিয়ে আসছে, পিছনে যাচ্ছে। এ বুটবুটি অন্য বুটবুটি। ভোসকা গ্যাসের বটুর বটুর নয়, প্রাণের বুটবুট। আমি এগিয়ে যাই। সাবধানে যাই। পিছলে পড়লেই মরণ। অবাক তাকাই। বুটবুটি নড়ছে। বুটবুটির তলায় একজোড়া চোখ। মাছ? কী করে হবে? এ তো বিষপুকুর। কারখানার জল নালা দিয়ে এসে এই পুকুরে পড়েছে। এই পুকুরের সামনে কঙ্কালের মুখ আঁকা বোর্ড আছে। সাবধান। জল ছুঁইবেন না। এই পুকুরে কীভাবে বুটবুটি তুলে ঘুরে বেড়াবে মাছ?

আমি চোখ কচলে দেখি।

মাছই তো। হাঁ করে জল খাচ্ছে। জল তো নয়, অ্যাসিড-ট্যাসিড। আমায় দেখেই পালায়। হি-হি। ওই তো ওপাশে আবার মুখ নড়ছে। ওদিকে যাই। আবার পালাল। মাছই তো। বিষ জলেও প্রাণ জন্ম নেয়? আমার মন ভাল হয়ে গেল।

ঘরে ফিরব। বউকে বলব। বউকে খুব ভালবাসি। বউও আমায়। আমরা কতদিন হ্যালোজেনের আলোয় বসে গল্প করিনি। আজ করব। বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্যার। হাফ প্যান্ট। কুকুর হাগাতে বেরুবেন। স্যার খুব জ্ঞানী। স্যারের ঘরে কত বই, ক্যাসেট, স্যারের ঘরে কত কাঁচ, কত নল, স্যারকে দেখেই বলি, স্যার মাছ। স্যার কপাল কুঁচকে আমার দিকে তাকান। ভাবি কী দরকার ছিল বলার। বউকে এনে মাঝে মাঝে দেখাতাম বেশ, মাছ আমাকে ভয় পেয়ে পালাত বেশ, তখন আমার বেশ, ইয়ে ইয়ে লাগত বেশ, তখন আমার হাসতাম বেশ। কিন্তু আমি পেটে কথা রাখতে পারি না। বলি, স্যার বিষপুকুরে।

ননসেন্স।

ঠিক আছে বাবা, ননসেন্স। আমি চলে যাই।

শোনো!

স্যার।

বিষপুকুর মানে?

ওই যে স্যার, নালাটার জল যেখানে পড়েছে। ওখানে স্যার, মাছ সাঁতার কাটছে

গাঁজা ধরেছ?

না স্যার।

তবে!

সত্যি বলছি স্যার। নিজের চোখে দেখে এলাম।

ওয়েট এ বিট।

স্যার ঘরে ঢুকলেন। ছিপ বঁড়শি নিয়ে এলেন, আর ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা চিংড়ি। বললেন, চলো তো দেখি।

চললাম। স্যারের দু'পা পিছন পিছন। ওই বিষপুকুরে গিয়ে বললাম, ওই যে স্যার, দেখুন কেমন ঘাই মারছে। স্যার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্যারের কপালে কুঁচকানো রেখার ছবি হচ্ছে। স্যার আমার হাতে একটা ছোট পলিথিন ব্যাগ দিয়ে বললেন, ধরো। আমি ধরে রইলাম। স্যার এক টুকরো চিংড়ি বঁড়শিতে গেঁথে ছিপ ফেললেন। ফাতনা স্থির। ফাতনার এপাশে ওপাশে ঘাই মারছে মাছ। আমি বললাম, এই মাছ বোধহয় চিংড়ি ভালবাসে না। স্যার ছিপ ওঠালেন। বঁড়শির মাথায় লেগে রয়েছে কালো খড়খড়ে ছোট্ট একটা কুণ্ডলী পুঁটলি। চিংড়ির টুকরোটা কীরকম কালো হয়ে গেছে ওই জলে। স্যার আবার চিংড়ির টোপ গাঁথলেন, আবার কালো। জলের কিনারে মাটির কাছে এসে গেছে ওই মাছ। একটা নয়, দুটো নয় তিনটে। আরও আছে? স্যারকী যেন ভাবছেন। তারপর বললেন, এখানে বসে থাকো, আমি এক্ষুনি আসছি। স্যার গেলেন। আমি দেখতে থাকি কাদার গায়ে সবুজ হলুদ রেখা। জলের গ্যাস গন্ধ, গ্যাসের বুটবুটির সঙ্গে খেলা করছে মাছ। গ্যাসের বুটবুটি হারিয়ে দিয়ে জিতে যাচ্ছে প্রাণের বুটবুটি। কী আশ্চর্য। কী আশ্চর্য মাইরি...

স্যার আসেন। ব্যাগ থেকে বের করেন দু'তিন রকম পাউডার। মেশালেন। তার মধ্যে ঢেলে দিলেন কী তেল। দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। ধোঁয়া হল। ধোঁয়া শেষ হলে পড়ে রইল কীরকম যেন একটা আঠালো আঠালো জিনিস।

স্যারের এত মাছ ধরার শখ। আগে জানতাম না। স্যারের কত গুণ। আগে জানতাম

না। স্যার বললেন, নতুন মাছের টোপ। আঠালো জিনিসটা গোল পাকিয়ে বঁড়শিতে গাঁথলেন স্যার। ফেললেন। একটু পরেই নড়ে উঠল ফাতনা। ছিপে লাগালেন টান। উঠেছে উঠেছে। উঠেছে। সুতোর তলায় ফড়ফড় মাছ নড়ছে। স্যার লাফিয়ে উঠলেন। মাছটা ঝুলছে চোখের সামনে। ভীষণ আনন্দ আমার। ঝুঁকে দেখতে থাকি মাছটাকে। হাত খানিক লম্বা। ড্যাবা-ড্যাবা চোখ। সারা গায়ে আঁশ নেই একটুও। খরখরে গা। গিরগিটির মতন।

স্যার কীরকম গম্ভীর হয়ে গেলেন। চোখ স্থির। দেহস্থির। আস্তে আস্তে মন্ত্র পড়ার মতন বলতে থাকলেন—ইউরেকা, ইউরেকা। মিউটেশন। নিউ গেস্ট। নিউ স্পেসিস। নতুন প্রজাতি। নাম দিলাম ক্যারাক্কাস্। আবিষ্কার করেছি আমি। আমিই দেখেছি এটা পৃথিবীতে প্রথম।

আমি বললাম, স্যার আমি তো ফাস্ট দেকিচি। আপনাকে তো আমিই দ্যাকালাম।

স্যার কোনও কথা না বলে হঠাৎই ধাক্কা দিলেন আমাকে। আমি পড়ে যাচ্ছি ওই বিষপুকুরে। বউ-এর মুখ ভেসে উঠল। বিধবা হয়ে যাবে। আমি জলে পড়ে গেলাম। এবার কুঁকড়ে পুড়ে কালো হয়ে মরে যাব। আমি হাবুডুবু খেয়ে সাঁতার কেটে কোনওরকমে পাড়ে দাঁড়াই। দেখি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্যার। স্যার কেন রাগ করলেন আমার উপরে? কেন? স্যারকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাব, এমন সময় দেখি স্যার কোমর থেকে ডান হাতটা তুলে একটা আঙুল ঠোঁটে লাগিয়ে রেখেছেন। তার মানে চুপ। মানে চোপ! চো-ও-প। আমি চুপ হয়ে যাই। আমার জামার কাপড় পুড়ে গেছে। ঝুরঝুর করে ঝরে যাচ্ছে। আমার গায়ের চামড়াটা কী রকম খড়খড়ে হয়ে গেছে। গিরগিটির চামড়ার মতো। আমি মাথা নিচু করে বাড়ি যাই। আমায় দেখেই আমার বউ চোখে হাত দিয়ে চিৎকার করে উঠল। আমি বললুম, ভয় পেয়ো না, আমি গো আমি। বউ বোধহয় আমার গলার স্বর চিনতে পারল। চোখ থেকে হাত সরাল, পরক্ষণেই আবার চোখ ঢাকল হাতে। বলল, না, তুমি না। আমি বললুম, হ্যাঁগো, আমি, তোমার আমি, শুধু একটু পাল্টে গেছি। কিন্তু আমি আমিই। আজ দুপুরে পুঁইশাক হয়েছিল, নুন বেশি ছিল, তাই না? তুমি কাল সন্ধেবেলা রেডিমেড ব্লাউজ কিনেছ, লাল, পরে দেখলে টাইট-টাইট। তখন আমি বললুম...

বউ চোখ থেকে হাত সরাল। তারপর কিছুক্ষণ অপলক আমায় দেখল। তারপর কেঁদে উঠল। বলো বলো তোমার এমন দশা কে করেছে? কী বলব আমি? স্যারের আঙুল ছিল ঠোঁটে। আমি মাথা নিচু করে মিন মিন করে বলি, পা পিছলে বিষপুকুরে পড়ে গিয়েছিলুম। ওখানে পড়ে গেলে এরকম হয়। বউ আবার দু'চোখে হাত চাপা দিল।

আয়নায় দেখলাম, কালো চামড়া, কুঁচকানো, খরখরে। চুল সাদা, ভ্রূ সাদা, চোখ বের হয়ে এসেছে। আমি চোখ বুজি।

রাত্রে বউ মাদুর পাতল নীচে। আমার ভালবাসার বউ, আমার নতুন বিয়ে করা বউ আলাদা শুলো। বলল, কিছু মনে করো না লক্ষ্মীটি, তোমায় বড্ড ভয় করছে। বড় দুঃখ হল।

আমার দুঃখের কথা কাকেই বা বলব? টারজানকেই বলি। ওকে তেল মাখাতে মাখাতে ওর গা মোছাতে মোছাতে আমার দুঃখের কথা বলি। ও শুধু শোনে। তবু তো শোনে। কারখানার সবাই প্রথম প্রথম আমার দিকে অবাক চোখে তাকাত, ভয়

পেত, এখন আর ভয় পায় না। এখন আমোদ পায়। আমাকে টিটকিরি দেয়। আমার খড়খড়ে গায়ে অপমান লাগে না।

একদিন স্যার আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি স্যারের সুন্দর ঘরে যাই। জীবনে প্রথম। দেয়ালের রঙে বাচ্চা খোকার গালের আভা। ঠাণ্ডা মেশিনের ঝিরিঝিরি। ফুল ফুল গন্ধ।

স্যার বললেন, তোমায় দেখে অফিসের লোকেরা সব মজা করছে?

হ্যাঁ বলি নাকি না বলি আমি?

আমি চুপ করে থাকি।

স্যার বললেন, এতে কাজের ক্ষতি হচ্ছে কোম্পানির। অ্যাটেনশন নষ্ট হচ্ছে। তোমার জন্যে একটা মুখোশ এনেছি। স্যার নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন ওই মুখোশ। বললেন, আয়নায় দেখো। অ্যাটাচড বাথরুমের দরজার দিকে আঙুল দেখান। আমি মুখোশের ঘুলঘুলি চোখ দিয়ে আমাকে দেখি। কী সুন্দর। একদম সত্যিকারের একটা সুন্দর মুখ। মুখে হাসি। পুরো সিনেমার হিরো। স্যার বললেন, কী এবার খুশি? আমি ঘাড় নাড়াই। স্যার বললেন, রোজ এটা পরে অফিসে আসবে। এটা তোমার ইউনিফর্ম। নতুন ইউনিফর্ম পরে বাড়ি যাই। বউ দরজা খুলেই অবাক। বলি, আমি গো, আমি। তোমার আমি। বউ বলল, আবার কোন্ পুকুরে ডুব দিলে? আমি বউ-এর কাছে যাই। আমি বলি, আমার নতুন ইউনিফর্ম। আমি বউ-এর কাছে ঘন হতে যাই। বউ বলে, না গো, এ তো তুমি না। যেন অন্য কেউ। আমি তখন মুখোশ খুলে ফেলি। বউ তখন বলে, এও তো আগের তুমি না। আগের মতোই মাদুরে শোয় বউ, আমি চৌকিতে। খবরের কাগজে স্যারের ছবি উঠল বলে আমার খুব গর্ব হল। আমাদের কারখানার ছবি উঠছে। ওই বিষপুকুরের ছবি উঠেছে। আজব মাছের কথা লিখেছে কাগজগুলো। কত সাহেব সুবো আসছে, দেশবিদেশ থেকে। ওই পুকুরে বেড়া দেওয়া হয়েছে। কাঁটা তারের ফেনসিং। একটা গুমটিঘর করা হয়েছে। ওখানে চৌকিদার। আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছি আর যেন আমার মতো কেউ না পড়ে যায় সে জন্য এরকম ব্যবস্থা নয়, আসলে ওই আজব মাছের জন্যই এই পাহারা। কাউকে বলিনি।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে ওই বিষপুকুরে যাই। দেখি মাছ কিলবিল করছে। কিলবিল নয়, খলবল করছে। বহুত বাচ্চা হয়েছে ওদের। সারা পুকুর জুড়ে মাইরি কী আহ্লাদ। আমার খুব ভাল লাগছিল। একে আর বিষপুকুর বলব না। কী বলব তাহলে?

কারখানার ক্যান্টিনে, চায়ের দোকানে, দেশি মালের ঠেকে কত কথাবার্তা, কত আলোচনা। এই পুকুরের জল কিনতে চাইছে, আমেরিকা, জার্মানি। আমাদের কোম্পানি দিচ্ছে না। আমি দেখি কত গাড়ি আসে, কত গাড়ি যায়, কত সাহেব আসে, কত সাহেব যায়। সাহেবরা চলে গেলে কত খালি বোতল পড়ে থাকে, কত চিবোনো হাড়...।

তারপর একদিন হল কি, আমাদের ফোরম্যান একদিন একটা গ্লাভস পরে এলেন। উনি সবাইকে দেখালেন ওই আজব মাছের চামড়া দিয়ে তৈরি ওই গ্লাভস, উনি বললেন, অ্যাসিড প্রুফ, অ্যালকালি প্রুফ, রেডিও অ্যাকটিভিটি প্রুফ। আমি দেখলাম। উনি বললেন, দারুণ জিনিস। বললেন, কোম্পানি এখন ওই মাছের চামড়া দিয়ে গ্লাভস বানাবে, এপ্রন বানাবে, মুখোশ বানাবে। বললেন, আমাদের কারখানা ছুটি হয়ে যাবে।

আমরা সবাই ছুটির ভয়ে থাকি। কে জানে কবে ছুটির খবর আসবে। কাউকে

কিছু বলি না। আমার মুখোশ পরা মুখে হাসি লেগেই থাকে।

আমাদের একজন চালাক বন্ধু আছে। ও বলল, ধুস ভড়কি দেখাচ্ছে। এই কারাখানা উঠে যাবার জো আছে? এই কারখানাটা আছে বলেই না বিষজল তৈরি হচ্ছে, আর তাতেই না ওই আজব মাছ।

অন্য একজন বলল, ওটা বিষজল নয়, সারজল। আমাদের ওই চালাক বন্ধুর কথাটাই ঠিক। কানাঘুসোয় শুনলাম আমাদের কোম্পানি এরকম অনেক বিষপুকুর, ভুল বললাম, সার পুকুর বানাবে, যেখানে এরকম মাছের চাষ হবে, সেই মাছের চামড়া বেচবে কোম্পানি। সুতরাং আরও সার পুকুর বানাতে হলে চাই আরও সারজল। আরও সারজলের জন্য আরও কারখানা।

আমার তা হলে ছুটি হবে না। বড় আনন্দ হল।

একদিন আমাদের ফোরম্যান একটা মুখোশ পরে অফিসে এলেন। খুব গম্ভীর গম্ভীর মুখের মুখোশ। খড়খড়ে চামড়ার। প্রচুর ব্যক্তিত্ব। সব সময় ব্যক্তিত্ব। ওই ক্যারাক্কাস মাছের চামড়ায় তৈরি। এরকম একটা মুখোশের হেভি দাম। অ্যাসিড-অ্যালকালি প্রুফ। ফায়ার-রেডিও অ্যাকটিভিটি প্রুফ। উনি বললেন, আমাদের এই কোম্পানির একটা নতুন ইউনিট খোলা হয়েছে। ওখানে ক্যারাক্কাসের চামড়া থেকে অ্যাপ্রন-ট্যাপ্রন হচ্ছে, মাস্ক হচ্ছে। আমাদের অফিসারদের একটা করে দেওয়া হয়েছে। তিনি আসলে এখন হাসছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না, কারণ গম্ভীর ব্যক্তিত্বের মুখোশ পোশাকে আছেন তিনি।

আমার যে কত সুন্দর মুখখানা, বউ তাতে খুশি নয়। মুখোশ খুললেও ভয়। এখনও ভয় গেল না ওর। বড্ড ভয় কাতুরে। কী যে করি। হাসি মুখের ভিতরে আমার তেঁতুলবিচির মতো দুঃখ শক্ত হয়ে থাকে। বউ কি আমার দুঃখ টের পায়? একদিন রাত্তিবেলা আমার ঘুম ভেঙে গেলে নিচের মাদুরে শুয়ে থাকা বউ-এর কান্না শুনি। আমি খাট থেকে নেমে যাই। বউ-এর গা ধরে বলি, কেঁদো না। বউ আরও কেঁদে ওঠে। আমি ওর চোখের জল মুছিয়ে দি। ওর গায়ে আমার খড়খড়ে হাত বুলোই। চামড়ায় কষ্ট হলেও ও কিছু বলে না। ওর মুখের দিকে মুখ চলে যায়, ও ছিটকে গিয়ে আবার কেঁদে ওঠে।

ভোরবেলা বউ বলল, ওগো, এভাবে আর পারা যায় না। আমি বরং তোমাদের ওই বিষপুকুরে নেয়ে আসি গে। আমি আঁতকে উঠি। বলি, এত সুন্দর তুমি যে...ও বলে বরং হই বিচ্ছিরি, সুখে থাকব। কাল দেখেছি গাছতলায় দুটো গিরগিটি কত সুখ করছে। আমিও বরং তোমার মতো হই, তাহলে আমরাও সুখী হব। আমি বলি, যদি তুমি মরে যাও? জানো, চিংড়ি মাছের টোপ কুঁকড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল? ও বলল, মরলে মরব। এভাবে বাঁচার চেয়ে মরা ভাল। আমি বলি, কী করে নাইবে? ওখানে লোহার বেড়া, ওখানে দারোয়ান। তোমাকে কাছে ঘেঁসতেই দেবে না। বউ বলল, ওগো, দারোয়ানকে কয়ে বলে একটা ব্যবস্থা কি হয় না?

একদিন আমার বউ কীভাবে কে জানে দারোয়ানকে হাত করে না কি জাদু করে ভোর রাতে ওই পুকুরে নেয়ে এল। হাসতে হাসতে বাড়ি এসে আমার ঘুম ভাঙাল। সাদা ভ্রূর তলায় বেরিয়ে আসা চোখে আনন্দ আলো ফোকাস মারছে। সারা গায়ে গুঁড়ি গুঁড়ি কাটা—কালচে, খরখরে। ঝোলা চামড়ার মুখে জুঁই ফুল হাসি। আমি কিছু বলবার আগেই আমাকে জড়িয়ে ধরল ও। অনেকদিন পর আমাদের সুখ এল।

কোম্পানির সাহেবসুবোদের মনে মোটে সুখনেই। বড় দুশ্চিন্তা। স্যারের মাথায় হাত। খবরের কাগজে বের হয়ে গেছে ম্যানেজমেন্টের লোভ এবং অদূরদর্শিতার জন্য একটি নতুন প্রজাতি সম্পূর্ণ নিঃশেষ। আমাদের স্যার চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে পুকুর পাড়ে বসে থাকেন যদি কোনও নতুন বুটবুটি চোখে পড়ে। এরই মধ্যে আবার কারখানার অ্যাসিড ট্যাংকি লিক। পিচকিরির মতো অ্যাসিড ছিটকোচ্ছে চারিদিকে। অ্যাসিডের ফোয়ারা। কত লোক মারা গেল, কতজন অন্ধ হয়ে গেল, কতজনের চামড়া কুঁচকে গেল। আমার গায়েও অ্যাসিড পড়েছিল, আমার কিচ্ছু হল না। আমি দিব্যি হাত দিয়ে গায়ের অ্যাসিড মুছে নিলাম। যাদের চোখ-টোখ নষ্ট হয়েছিল, কোম্পানি ওদের পয়সা কড়ি দিল, কিন্তু আমার কিচ্ছু হয়নি বলে আমার কিচ্ছু জুটল না। তারপর কোম্পানি সারকুলার ইস্যু করল—সবাই যেন ওই সার পুকুরে স্নান করে আমার মতো হয়ে যায়। কেউ রাজি হল না। বলল, বরং চাকরি যাক, না খেয়ে মরব, তবু গিরগিটি হব না। তখন কোম্পানি জানাল—ফারদার এরকম কিছু হলে কোম্পানি আর কোনও টাকা পয়সা দেবে না। এরই মধ্যে আর এক কাণ্ড। আমার বউ-এর প্রসব ব্যথা। হাসপাতালে নিতে হবে। প্রতিবেশীরা বলল, এই মেয়েছেলেকে হাসপাতালে রাখবে না। একে দেখেই তো পোয়াতিরা ভিরমি খাবে। তা হলে উপায়? ধাই ঠিক করো। ধাই নিয়ে এলাম। বউকে দেখে ধাই বলল, এটা মানুষ নয়, পেত্নি। ডবল চার্জ লাগবে বাপু। বললাম, দোবো। বউ কাতরাচ্ছে। আমি বাপ হচ্ছি। একটু পরেই কান্না শুনলাম, শিশুর কান্না। আমার বুকের মধ্যে কারখানা ছুটির ভোঁ বাজল। ধাই বের হল। বললাম, ছেলে না মেয়ে? ধাই বললে, জেবনে এই পরথম ভূতের জন্ম করালুম। পেত্নির গভ্‌তে ভূতের জন্ম। ট্যাকা দাও।

ছেলেটার চামড়া ঝোলা ঝোলা। সারা চামড়ায় গুঁড়ি গুঁড়ি কাটা। মাথা থেকে বেরিয়ে এসেছে ড্যাবা ড্যাবা চোখ। আমার মুখে স্থির হাসি লেগেই থাকে। পাড়া প্রতিবেশীরা ভূত দেখতে আসছে। ভূতের জন্মকথা ছড়িয়ে গেছে দূর দূরান্তে। ভূত দেখতে আসছে সব। একদিন সকালবেলায় আমার স্যারের গাড়িও থামল আমার ঘরের সামনে। স্যার আসছেন, স্যার। আমি দাঁত মাজা বন্ধ করে হাসি মুখোশটা পরে নিই তাড়াতাড়ি। বউ ঘোমটা তুলে দেয় মাথায়।

তোমার ছেলেটাকে দেখব হে...। স্যার বললেন। আমি কাঁথা মুড়িয়ে ছেলেটাকে নিয়ে আসি। স্যার কাঁথা সরিয়ে দিলেন। স্যার মন দিয়ে দেখছেন। স্যার চামড়া টিপে টিপে দেখছেন, শিশুর চামড়া। স্যার স্যাম্পল দেখছেন, স্যাম্পল। স্যারের চোখ চকচক। নিঃশ্বাস ঘন ঘন। স্যার আমার ছেলের চামড়া টিপছেন, কাপড়ের জমিন দেখার মতো শিশুর ঝুলে থাকা চামড়ার দুপাশে আঙুল লাগিয়ে ঘষছেন। স্যার হাসলেন। বললেন, বাঃ। তারপর স্থির হলেন। চোখ স্থির, দেহ স্থির। মন্ত্র পড়ার মতো বলতে থাকলেন—ইউরেকা...ইউরেকা...নতুন প্রজাতি। নিউ স্পেসিস। ক্যারাক্কাস...নিউ ক্যারাক্কাস...

আমার শরীরের ভিতরে বুটবুটি কাটা তীব্র গোঙানি। তবু আমার হাসি-হাসি মুখ।

আমার হাসি মুখ।

আমার হাসি।

শারদীয় বর্তমান, ১৯৯২

হনুমান

হনুমানটা বেশ লম্বা। নাকের খোদলটা লাল লাল। গায়ের লোম গাওয়া ঘিয়ের মতো। ফর্সা মুখ, গৌরাঙ্গ যেমন হয়। ছ ফুট দু ইঞ্চি লম্বা গাট্টাগোট্টা হনুমানটিকে দেখছিল পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি হাইটের রোগা রোগা হনুমান। ল্যাজটা পিছনে ফিট করা, তার ও খড়ের। সর্বদাই খণ্ডত হয়ে থাকে। কালো কুচকুচে মুখ। মুখে আপাতত বিড়ি।

কোন পুরাণে, কোন শাস্তরে লেখা আছে হনু হ'ল গৌরবর্ণ? মানুষ হনুমানটি কপাল কুঁচকে নিজে নিজে বলে। ও তবু দেখে। অবাক হয়ে মানুষের তৈরি সুন্দর হনুমানটিকে দেখে। হনুমানটি হাতদুটো দিয়ে বুকের মধ্যে একটা গর্ত বানিয়েছে। গর্তটা বেশ বড়। এক ডজন কলা সেঁটে যাবে। গর্তটার তলাটা প্লেন। সেখানে নোট, কয়েন,...। সবুজ সবুজ পাঁচ টাকার নোটও দেখা যাচ্ছে কয়েকটা। কিছুক্ষণ আগেও ওই খোঁদলটার ভিতরে বাংলায় লেখা জয় শ্রীরাম পড়া যাচ্ছিল। এখন লেখার উপরে টাকা পয়সা। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হনুমান সাজা কদম্ব গুছাইত। ওর দশ টাকাও হয়নি আজ এই গঙ্গাসাগরের মেলায়। আজ প্রথম দিন। শুনেছিল হনুমানের বাজার এবার ভাল। জয় শ্রীরাম বলে লাফিয়েছে ডুবফেরত মানুষের কাছে, কপিলমুনির আশ্রমে, আশ্রমে তেমন হয়নি। কদম্ব ভাবে ও কি হনুমান পাল্টে কালী হবে? বাঙালিরা কালীকে দেয়থোয়। কিন্তু এই মেলায় হিন্দুস্তানী বেশি। তাই হনুমান। হনুমান যে ভালই খাচ্ছে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে কদম্ব। মেলায় অনেক হনুমান, প্রত্যেকেই পয়সা পাচ্ছে। এরকম মাটির হনুমান তিনটে দেখেছে, মেশিনের হনুমান দুটো।

মেশিনের হনুমানের পেটে একটা গর্ত আছে। গর্তের মধ্যে একটাকার একটা কয়েন ফেলে দিলেই হনুমানের শরীরে ঘট-ঘটাং শব্দ হয়। ওর মুখটা একটু উপরের দিকে ওঠে দু পাশের দুই হাত বুকের মাঝখানে আসে।

এতেক বলিয়া তবে পবন কুমার
নখে চিরি বক্ষঃস্থল করিল বিদার
সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ
অস্থিময় রাম নাম লেখা লক্ষ লক্ষ।

চামড়া সরে গেলে বুকের ভিতরে কাচ বাঁধানো রামসীতার ছবি। ছবির তলায় ছোট ছোট লেখা শ্রীমা আর্ট প্রেস। তারপরই হনুমানের মেশিন হতে নেমে যায়, চামড়াটা সাট্ করে বন্ধ হয়ে যায়। ঘটাঘট থেমে গেলে হনুমান স্থির হয়ে যায় ফের। পেটের গর্তে একটা টাকা ফেলে দিলে মোটর চালু হয়, লিভার পুলি চালু হয়, চালু হয় হনুমান মাহাত্ম্য। বুক চিরে রামসীতা দেখায়, সামনে দাঁড়ানো লোকজন চেঁচায়—জয় রাম জী কী। খুচরো পয়সা হনুমানের গায়ে লাগে। হনুমানের পিছনে একটা চাবির গর্ত। একটা লোক একঘণ্টা পর পর আসে। চাবি মেরে দিলে পেছনটা খুলে যায়। ওখানে একটা পাত্র থেকে একটাকার চাকতিগুলি শব্দসমেত ব্যাগে ভরে নেয়। মানুষ হনুমান কদম্ব

গুছাইত মেশিন হনুমানের এইসব সৌভাগ্য দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। যে লোকটা ব্যাগ ভরে টাকা নিয়ে কোনও মিষ্টির দোকানের দিকে গেল পঞ্চাশ বা একশ টাকার কাগজ করে নেবে বলে, যাবার সময় হুকুমের মতো কথা ছুঁড়ে দিয়ে গেল—আই, সব লাইন লাগাইয়ে, লাইন....

লাইন এগোচ্ছে কারসাজির দিকে। কদম্ব লাইনের সামনে দাঁড়ায়। হঠাৎ লম্ফ দিয়ে ওঠে, দুই হাতে তালি দেয় জোরে। চিৎকার করে বলতে থাকে—

পবননন্দন হাম বীর হনুমান হ্যয়
ইয়ে হাত নেহি ফাঁসীকা ফান্দা হ্যয়
রাবণশালা সীতা মাঈ কো হরণ করিল
লম্ফ দিয়া হনুমান সাগর লঙ্ঘিল
রামের অভিজ্ঞান দিল অশোক কাননে
বাতচিত সব কিয়া সীতাদেবী সনে
রাবণজীকা আদমী যব উসকো পাকড় লিয়া
হনুমানজী নে স্বর্ণলঙ্কা পুরা জ্বলা দিয়া
হায়রে স্বর্ণলঙ্কা দাউ দাউ গেল রে ভাই জ্বলে
ওলে ওলে ওলে....ওলে ওলে॥

কদম্ব ওর হনুমানে হিন্দি মেশায়, সিনেমা মেশায়, লম্ফ-ঝম্ফও মেশায়—ও যতটা পারে এ বয়সে। পয়সা পায় কিছু কিন্তু মেশিন হনুমান পায় আরও অনেক বেশি। মানুষ কি আজকাল মেশিনকেই বেশি ভালবাসে?

রানাঘাটের মতি সাহার ঝুলনে গোবর্ধন ধারণ, বকাসুর বধ, বস্ত্রহরণ, খাণ্ডবদাহন, রামলীলা—এইসব পুতুলে দেখানো হ'ত। গত ক'বছর ধরে এসব পুতুলগুলো মেশিন হয়েছে। কাগজের পাহাড়টাকে ধরে শ্রীকৃষ্ণ ওঠান আর নামিয়ে দেন। তলায় লেখা গোবর্ধন ধারণ। গোপিনীরা একবার দু'হাতে বুকচাপা দেয়, একবার দু'হাত শ্রীকৃষ্ণের দিকে উঁচিয়ে ধরে। গোপিনীদের হাতে দড়ি বাঁধা, তলায় মোটর। এখন মতি সা'র ঝুলনের নাম নড়া পুতুলের ঝুলন। জ্যান্ত মানুষরা ভিড় করে দেখতে আসে।

কদম্ব সাগরসঙ্গমে ঝাউগাছের তলায় বসে আছে। সাদা সাদা বালি। ওর ল্যাজে ফড়িং বসেছে। ও গালে হাত দিয়ে ভাবে। ওর হাতের উপর একটা ফড়িং বসল। কদম্ব হাতটা নাড়াল না, স্থির রেখে দিল, মূর্তির মতো। ফড়িংটা অনেকক্ষণ বসে রইল।

মূর্তি হলে কেমন হয়? কদম্ব ভাবল। দেবতার মূর্তি হয় যদি? দেবতা নড়ে না। ওর দুটো হাত রাখা আছে প্রভাত মিশ্রের মেঠাই দোকানে। দড়ি দিয়ে বুকের সঙ্গে বেঁধে নেওয়া যায়। আসল হাতদুটোর সঙ্গে জুড়লে চারটে হাত হয়ে গেল। চারহাতে নারায়ণ। মুখে কালো রঙ আর জিভ লাগালে কালী। ও কালী হবে নাকি নারায়ণ হবে ভাবছিল, এমন সময় দেখল চারজন লোক ধরাধরি করে রামসীতা নিয়ে যাচ্ছে।

কদম্ব ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। লেজ নড়ছে। লেজটা খড়ের, কদম্ব নাড়াতে পারে না, নড়া বন্ধও করতে পারে না। কদম্ব চলছে, সামনে রামসীতা। চারজন লোক, যারা রামসীতাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে তাদের সামনে আরও দু'জন। একজন ধুতি-শার্ট অন্যজন ফুলপ্যান্ট। ফুলপ্যান্টটা বলল, দেখো দেখো, রেডিমেড হনুমানও পেয়ে গেলে। ধুতি পরা লোকটার ঘড়ি লাগানো কব্জি আর পাথর লাগানো আঙুলের ইশারায়

কদম্ব রামসীতার পিছন পিছন যেতে লাগল। কদম্ব ওর দু'হাত জোড় করে নিল। শিরদাঁড়া আর একটু বেঁকিয়ে নিল। অনুগত হনুমান হাঁটছে বাবুদের পিছন পিছন। একজন চামড়ার জ্যাকেট পরা, মুখে দাড়ি, কিলিক্ কিলিক্ করে ছবি তুলে নিল। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সামনে কিছুটা জায়গা দরমা দিয়ে ঘেরা হয়েছে আগেই, ওখানে একটা আমগাছ। আমগাছ তলায় ওরা মূর্তিটা বসাল। ধুতি পরা লোকটা ওর সাইডব্যাগ থেকে বের করে নিল একটা খবর কাগজের মোড়ক। 'মহাকাশে আরও উপগ্রহ ছাড়বে ভারত' লেখা কাগজটা মাটিতে ফেলে দিতেই রাংতা আর পুঁতি বসানো মুকুট বেরিয়ে আসে। রামসীতাকে পরানোর পরও আরও একটা থেকে যায়।

একটা কালো বাক্সে ব্যাটারি রাখা হয়। রামসীতার পিছন থেকে বের হয়ে এসেছে রাঙা দুটি তার। ব্যাটারি লাগে তারে, আরে আরে, অমনি রামের হাসি-হাসি মুখ নড়ে ওঠে, সীতার হাসি-হাসি মুখ, চিরহাসি মুখ নড়ে ওঠে। রামসীতার ভাব জমে ওঠে। রামের মুখ সীতার দিকে ঘোরে, সীতার মুখ রামের দিকে ঘোরে। রাম সীতার হাত ধরে। মিলন হ'ল, আহা মি-ল-ন হোলো...। হরিবোল। ঘটাংঘট। রামের মুখ ঘুরে যায়। সীতার মুখ ঘুরে যায়। হনুমান হাততালি দিয়ে ওঠে।

লক্ষ্মণ বলেন শুন বীর হনুমান
শ্রীরামের ভক্ত নাহি তোমার সমান
তোমারে জানেন রাম, রামে জান তুমি
তব মহিমার সীমা কি জানিব আমি
হনুমান বলে আমি বনের বানর
রামের দাসানুদাস তোমার নফর
শুনিয়া হনুর কথা শ্রীরামের হাস
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

ফুলপ্যান্টপরা জন বলল গজা, আমরা অলরেডি লেট। মাইক ফিট কর জলদি। দরমার বাইরে একটি টেবিল। ওখানে হলুদ টিকিট পাথর চাপা। একটি লোকের হাতে মাইক। মাইকের তারে ব্যাটারি যুক্ত হয়ে গেল। ক্যাসেটে বেজে উঠল কালি কালি আঁখে— তুরুরু তুরুরু...আসুন, দর্শন করুন রামের অভিষেক। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত শিল্পী দ্বারা তৈরি রামসীতার পেটের ভিতরে অদ্ভুত, বিস্ময়কর জাপানি মেশিন। দর্শন করুন রাম হাস্য করিতেছেন, সীতামায়ের হাত ধরিতেছেন। দর্শন করুন—শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের আশ্চর্য মহিমা। এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে পুণ্য লাভ করুন...টিকিট মাত্র একটাকা। দিদি তেরা দেবর দিওয়ানা...হায় রাম...

দরমার বেড়ার ও-পাশে ভিড়, এ-পাশে ব্যস্ততা। রামসীতার সামনে একটা অ্যালুমিনিয়ামের থালা রাখা হ'ল। বাবুরা খুব হুকুম টুকুম করছে। কদম্ব ধুতি পরা জন আর ফুলপ্যান্ট পরা জনের দিকে তাকিয়ে ওদের সম্পর্ক বোঝবার চেষ্টা করে। মামা ভাগ্নে? কাকা ভাইপো? শ্বশুর জামাই? ওই দু'জনের মধ্যে ধুতি পরাকেই আসল ভেবে কদম্ব ওর দিকে চেয়ে বলল, আজ্ঞে আমি এখানে রামসীতার কাছে হনুমান হয়েই থাকি? হাতটা জোড়াই ছিল। ধুতিপরা জন হাতটা তুলে সামান্য নাড়াল। যেন তথাস্তু। লোকটা কি নিজেকে বাল্মীকি ভাবল? ফুলপ্যান্ট পরা জন তুড়ি দিয়ে ধুতিশার্টকে ডাকল। একটু যেন শলাপরামর্শ করল। তারপর ফুলপ্যান্ট পরা জন কদম্বকে ইশারায় ডাকল যেন

'এই হনুমান কলা খাবি।' হনুমান দাঁড়াল। জোড় করা হাত। সদা সেবাদাস।

নাম কী?

কদম্ব গুছাইত।

থাকবে সারাদিন?

হনুমান ঘাড় নাড়ল।

কী নেবে?

আট আনা।

আট আনা মানে? ঘণ্টায়?

মানে হাফ হাফ।

ধুতি পরা জন দাঁতের ফাঁক দিয়ে চিড়িক করে পানের পিক ফেলল। এঃ ফিফটি পার্সেন্ট। হাতের আঙুলে মাছি তাড়াবার মতন বলল—লাগবেনে, লাগবেনে। হনুমান ছাড়াই শো হবে। ফুলপ্যান্ট পরা জন কপালটা একটু কুঁচকে ধুতিপরা জনের দিকে তাকাল। বলল, তুমি থামো তো। তারপর কদম্বকে বলল, শোনো স্ট্যাচু পার?

পারি।

কী বল তো?

ওই তো, লড়নচড়ন বন্ধ। মূর্তি। মানুষ হয়ি ভুলি থাকতি হবে আমি মানুষ, মনে করতি হবে আমি পাথর। আমি মাটি। আকাশে এলোপ্লেনের শব্দে উপরে দিখব না। বোমা পল্লি চমক পাব না। বোঁদে সিঙ্গাড়ার গন্ধ পাব, নেলো হব না। গায়ে মাছিটাছি ঝদি বসে, বসুক বসুক ভেবে সহ্যি করি নিতে হবে।

—বাঃ। আগে আগে স্ট্যাচু-কাজ করেছিলে?

—আজ্ঞে, চাকদার ঝুলনে করেছি। জ্যান্তঝুলন হয়নি? ওখেনে। নারদ হয়েছিলাম। তা বাদে বিয়ে বাড়িতে কাজ করেছি। পাগড়ি পরে, গোঁপ লাগিয়ে, আলখাল্লা গায়ে দিয়ে আলখাল্লার ভিতরে কাপড়ের পুটলি ঢুকিয়ে ভুঁড়ি বানিয়ে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বিয়ে বাড়ির গেটে দাঁড়িয়েছি। ওটার নাম মহারাজা পোজ। একেদ্দম লড়াচড়া করিনি। কতজন টিপে দেখেছিল আমি মাটির না মাংসের।

—এখানে একটু অন্যরকম কোরো বুঝলে, একেবারে স্ট্যাচু না থেকে নড়াস্ট্যাচুর মতো কোরো। রামসীতার দরবারে হনুমান যে পোজ নিয়ে বসে, ওইভাবেই বসে থাকবে তুমি, আর যেই না আমাদের রামসীতা হাত ধরবে, ওমনি তুমি তোমার দুহাত উপরে তুলে চেঁচিয়ে উঠবে—জয় সীরাম।

—পেমেন?

—পেমেন্ট...মনে কর...সারা দিনের জন্য পঞ্চাশ টাকা, আর তুমি যদি আলাদা প্রণামী কিছু পাও...পাবেই, তার ফিফ্‌টি মানে আটআনা।

—পঞ্চাশ না, একশো করেন। মেলার ক'টা দিনই তো যা রোজগার। এমনি হনুমান হয়ি ঘুরে বেড়ালিই পঞ্চাশ-ষাট হয়ি ঝায়, কাদার হনুমান হয়ি তবে কী লাভ? জ্যান্ত ঝুলনেই পঞ্চাশ পাতাম, এত খরচ-খরচা করি এখেনে এসে ঝদি একশো না হ'ল...

—একশোর উপর হয়ে যাচ্ছে। প্রণামী আছে না। আচ্ছা, সত্তর দোব, আর প্রণামী।

আর পাঁচটা টাকা...

আচ্ছা, দেখা যাবে।

কদম্ব রামসীতার সামনে বসল কিছুটা নিল-ডাউনের ভঙ্গিতে। ওর মাথায় পরিয়ে দেয়া হ'ল রাংতার মুকুট। কদম্ব বলে উঠল—জয় সীরাম। তুরুরু তুরুরু। ভিড় শুরু হয়ে গেছে। বাইরে মাইকের পাবলিসিটি—আইয়ে আইয়ে জনাব...দর্শন কিজিয়ে। রামসীতা কি যুগলমূর্তি দেখিয়ে। দেখিয়ে রামজী নে ক্যাইসে সীতা মাঈকো হাথ পাকড়লেতা হায়।...

...হনুমান বলল, যাই, পেসসাব করে আসি।

হনুমান গাছের আড়ালে যায়। মাথায় মুকুট।

শো শুরু হয়ে গেছে। লোকজন আসতে শুরু করে দিয়েছে। কপালে তিলক। দাদুর কাঁধে নাতি। মায়ের কোলে ছেলে। কদম্ব তো হনুমান, ও শুধু রামের দিকে, সীতার দিকে চেয়ে আছে। রামসীতার শরীর থেকে হাল্কা গোঁ গোঁ শব্দ আসছে। মোটরের। রামের মুখ আস্তে আস্তে সীতার দিকে ঘুরে যায়। সীতার মুখ আস্তে আস্তে রামের দিকে ঘুরে যায়। রামের হাত সীতার দিকে, সীতার হাত রামের দিকে। হাত হাতে স্পর্শ। অমনি কদম্ব দু'হাত তুলে 'জয় শ্রীরাম' বলে চেঁচিয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে টিকিট কেটে দেখতে আসা লোকজনও জয় শ্রীরাম বলে আপ্লুত আওয়াজ করে। আর ঠং ঠং ঠং। থালায় পয়সা। হনুমানের দিকেও পয়সা পড়ছে। হনুমান আড়চোখে দেখে। কিছু পয়সা ওর সামনে, কিছু রামের সামনে। হনুমান আর রামের মাঝামাঝিও কিছু পয়সা পড়েছে। রামের অধিকারের সীমানা কতদূর? আর ওর সীমানা? কতদূর পর্যন্ত ওর? সীমানা নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। অধিকার ভাববার অবসর নেই। রামসীতার হাতের স্পর্শ হলেই ঘটাংঘট, আর হনুমানের দু'হাত উপর আকাশের দিকে।

একজন বউ, কোলের বাচ্চা মাই খাচ্ছে, ওর স্বামীকে বলল—এই হনুমানটাও কি কলকব্জার হনুমান? ওর স্বামী একটু দেখে বলল, না, মানুষ মনে হচ্ছে। একজন ভিনদেশী বুড়ি অনেকক্ষণ ধরে হনুমানকে দেখল। তারপর বলল, আদমী মালুম হোতা হায়। বুড়িটা রামের দিকেই শুধু ছুঁড়ল। হনুমানের দিকে কি আদমী বলে ছুঁড়ল না? মানুষ বলে? রামের দিকে ছুঁড়ল ভগবান বলে? নাকি মেশিন বলে? কদম্ব যখন কালী হয়, কিংবা নারায়ণ হয় বা হনুমান হয় তখন ওকে তো ভগবান ভেবেই দেয়। এই যে মানুষজন সব দর্শন করতে আসছে, পয়সাটয়সা দিচ্ছে, কাকে দিচ্ছে? ভগবানকে, নাকি ভগবানের নড়াচড়াকে, কলকব্জার মাহাত্ম্যকে, মাহাত্ম্যর যে কত রকম রূপ!

কদম্ব চোর ছিল। চুরি করতে গিয়ে কদম্ব ওর নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছে মানুষ মানুষকে ভালবাসে। মানুষ মানুষের সঙ্গে থাকতে চায়। কেউ একজন চোর বলে হাঁক দিলে দশজন মানুষ ছুটে আসে। দশজন মিলে প্যাঁদায়, আবার দশজনে মিলেই ঠোঁটের রক্ত মুছিয়ে দেয়, জল খাওয়ায়, হাওয়া করে। কদম্ব কীভাবে যেন জেনেছে বহু লক্ষ বছর ধরে মানুষ শিকার করেছে মানুষে মানুষে মিশে। চাষবাস করেছে একসাথে। মাইকে একটা গান শুনত খুব—মানুষ মানুষের জন্য। কদম্ব যখন হনুমান বা মাকালী হয়ে ঘোরে, লোকে আহা, বেচারা মানুষটা, এই ভেবেই তো পয়সা দেয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের বহুদিনের সংসার। তবে কেন মানুষ-হনুমানের চেয়ে কলকব্জা-ভগবানে বেশি নজর?

কদম্ব এইসব চিন্তা করে, আর চিন্তার মাঝে মাঝেই, ঠিক টাইম মতন, টাইম মতন 'জয় সীরাম' বলে দেয়। ত্রুটি হয় না। এই যে কদম্বর ত্রুটি হচ্ছে না, টাইম মতো হাত উঠে যাচ্ছে, ওকে কি লোকে কারিগর বলবে? নাকি আর্টিস্ট? নাকি যন্তর? ও

যখন সঙ করত শুধু, চাকদার রামলাল সাহাই প্রস্তাব দিয়েছিল ব্যান্ডপার্টির ফল্‌স্ হবি? রামলাল সাহা হ'ল ডেকরেটারের মালিক। চেয়ার টেবিল মাইক ঝাড়লণ্ঠন ভাড়া দেয়। ব্যান্ডপার্টিও ভাড়া দেয়। ড্রাম-ক্লারিওনেট-বিউগল। হয়তো কোনও পার্টির সঙ্গে কথা হচ্ছে—

মিউজিক হবে?

পাবেন। কী চাই?

এক ডজন ড্রাম, হাফ ডজন ক্লারিওনেট, দু'জোড়া বিউগল।

হয়ে যাবে।

কত পড়বে?

দেড় হাজার।

এক হাজারে করে দিন।

তাহলে চারটে ড্রাম, তিনটে ক্লারিওনেট ফল্‌স্ হয়ে যাবে।

ফল্‌স্ মানে হ'ল নাদান লোকের হাতে যন্তর থাকবে, ওরা শুধু হাত নেড়ে যাবে, বাজাবে না, ফুঁ দিয়ে যাবে, বাজাবে না। ওরা বাজাতে জানে না। শুধু বাজাবার ভান করবে। নাদান মানুষের মজুরি কম। কদম্ব ড্রাম বাজাত, ফল্‌স্। হাত নড়ত, শব্দ হ'ত না। অন্য শব্দের সঙ্গে ওর নৈঃশব্দ্য মিশে যেত। কদম্বের কোনো ত্রুটি ছিল না। টাইমে টাইমে হাত নাড়ছিল।

একদিন রামলাল সাহা বলল, জ্যান্তঝুলনের পুতুল হবি? মানুষ পুতুল? চাকদায় জ্যান্তঝুলন দেখেছিল কদম্ব। শ্রীকৃষ্ণ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নটরাজ শিব...। সবাই পাথরের মূর্তির মতো স্থির। ওইগুলো হ'ল জ্যান্তঝুলনের না-নড়া পুতুল। আর বকাসুর বধ, হিরণ্যকশিপু বধ, রামের হরধনু ভঙ্গ, এগুলো হ'ল জ্যান্তঝুলনের নড়া পুতুল। রামলাল সাহা বলেছিল, তোর হবে। চৈতন্য হ। কদম্ব দু'হাত তুলে চৈতন্য হয়েছিল। রামলাল সাহা বলেছিল, ব্যাপারগুলো ভাল করে শিখে নে কদম্ব। হাত দুটো উপর দিকে উঠিয়ে দাঁড়ালে শ্রীচৈতন্য। হাত দুটো দুপাশে ছড়িয়ে দিলে যিশু। এরকম বুকের কাছে হাত দুটো ভাঁজ করে রাখলে বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ এরকম। আর গালে হাত দিয়ে ভাবলে সুকান্ত।

কদম্ব সেবার পেরেছিল। বেশ ভালই চৈতন্য হয়েছিল ও। আঁকা ভ্রূ, চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক, গলায় মালা। শুধু মাথাটা নেড়া করতে হয়েছিল। জ্যান্ত ঝুলনে যারা ভাল পারে, রামালাল সা' ওদের অন্য জায়গায় ভাড়া দেয়। বিয়ে বাড়ির গেটে থাকত কলাগাছ। সাদা পিসবোর্ড...পিসবোর্ড তো নয়, থার্মোকল, ওই থার্মোকল কাটা বডিজ পরা শঙ্খ বাজানো মেয়েছেলে দেখেছে গেটে লাগানো। শাঁখ বাজাচ্ছে মাটির সুন্দরীও দেখেছে। সেদিন দেখল জ্যান্ত-পুতুল। রামলাল সা' ভাড়া দিচ্ছে। কালী-প্যান্ডেলে জ্যান্ত রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা, রামকৃষ্ণ ভাড়া দিচ্ছে রামলাল। পুজোর আগে কাপড় দোকানের কাচের ভিতরে জ্যান্ত-পুতল কাপড় পরে দাঁড়িয়ে থাকে। রামলালভাড়া দিচ্ছে। কদম্বও ভাড়ায় খেটেছিল মহারাজ। মাথায় পাগড়ি, গায়ে লাল আলখাল্লা মুখে ঝুলে পড়া গোঁফ, শরীরটা একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ে, কুঁজো হয়ে হাতটা কপালের কাছে এনে স্থির হয়ে যাওয়া।

এই পোজটা কোন দেশের মহারাজের কদম্ব জানে না। একটা দু' ইঞ্চির কুঁজো হয়ে থাকা, নিচু হয়ে থাকা মাটির পুতুল দেখিয়ে রামলাল সা' বলেছিল, এই হ'ল

মহারাজ। তোকে এরকম হ'তে হবে। দু' ইঞ্চির পুতুল দেখে পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চির পুতুল হ'তে পেরেছিল কদম্ব। অসুবিধে হয়নি।

মানুষকে নকল করে পুতুল হয়েছে। এখন পুতুলকে নকল করছে মানুষ। আবার স্থির পুতুল যখন নড়তে শুরু করল, মানুষ পুতুলও নড়া-পুতুলের মতো নড়ল। নাকি যন্তর বসানো নড়া-পুতুলের কষ্ট নেই বলে পুতুল মালিকের মজা নেই। মানুষ-পুতুল কষ্ট পেতে পেতে কষ্ট ভুলে যায় বলে পুতুল-মালিকের মজা। তাই কি আজকাল মানুষপুতুলের ব্যবহার বেড়ে গেছে?

এখন নড়ল কদম্ব। কারণ রাম পড়ল, সীতা নড়ল। হাসিমুখ নড়ল। জয় সীরাম।

বাঃ রাম, বাঃ বেশ পারে মাইরি। সীতাকে দেখে হাসছে, হাত ধরছ, অভিষেক মারাচ্ছ। কি বলেছিলে তুমি?

সূর্যবংশে জন্ম মোর দশরথ নন্দন
তোমা হেন নারীতে নাহি প্রয়োজন
তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে
যথা ইচ্ছা যাও তুমি থাক অন্য স্থানে
সীতার জীবনে ভাই কিছু নাহি কাজ
অগ্নিতে পুড়ুক সীতা দূরে যাক লাজ
লক্ষ্মণ রামের বাক্যে সাজাইলেন কুণ্ড
বানর কটক বহু আনিল শ্রীখণ্ড
কাষ্ঠ পরি উঠিল জ্বলন্ত অগ্নিরাশি
প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম মহিষী
দেখ ভাই দেখ দেখ কী আশ্চর্য সীন
সীতা পুড়িল না, ত্রেতায় না ছিল কেরোসিন॥

দুহাত তুলে জয় সীরাম ফের

আচ্ছা মাইরি হনুমান, পবননন্দন, তুই বসে বসে দেখলি সীতাকে পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। কিচ্ছু বললি না। অথচ তুই অষ্ট রাক্ষস বধ করিলি, স্বর্ণলঙ্কা দহন করিলি। সীতা পোড়ানোর সময় ইস্পটে ছিলি তুই। কী করিলি তখন? তুই বল। অথচ, সীতা তোকে কী ভালই বাসত, বল! সীতা তোকে বর দিয়েছিল—

দুই হাত তুলি হনু তোমায় দিনু বর
মোর বরে চারিযুগে হইবে অমর
সীতা বলে যতকাল থাকিবে পৃথিবী
রোগশোকহীন তুমি হও চিরজীবী
যাবৎ রামের নাম ঘোষিবে সংসার
ততকাল হও তুমি অক্ষয় অমর
হনুমান তোমারে দিলাম এই বর।

আর সীতার শরীরে যখন আগুন, তখন সভামধ্যে জয় শ্রীরাম। তুইও বলেছিলি? বলেছিলি। কারণ ওই কথাটা তোর অন্তরে ছিল না। শ্লোগানে ছিল। তুই ততদিনে দমের পুতুল হয়ে গিয়েছিলি। নড়া-পুতুল। বশ্যতায়। মানে-না-জানা বশ্যতায়।

ইনক্লাব শুনলেই জিন্দাবাদ বলে কদম্ব। জিন্দাভাত বলতে খুব ইচ্ছা করত আগে

এখন করে না। গ্যাট চুক্তি নিপাত ঝাক বলে, এখন বলল, জয়—সীরাম।

রামসীতার হাতধরা থেকে ছেড়ে দেয়া, আবার হাত ধরা গুনলে মোট ১৮০। এখন ১৮০ না-গুনেও চোখে না-দেখেও বলে দিতে পারে কদম্ব। সারা শরীরে ১৮০-র বোধ চলে আসে ওর। পা ঝিনঝিন করছে কদম্বর। করুক। ও কিছু নয়। খিদে পেয়েছে। সয়ে যাবে। গায়ে মাছি বসছে। সয়ে যাবে। ল্যাজে বসেছে ভিমরুল। কী মজা। ল্যাজের নিজের অনুভূতি নেই। ওটা খড়ের। কামড়ালেও লাগবে না। সারাটা শরীল মাইরি যদি ন্যাজের মতো হয়ে যায়...।

জয় সীরাম। চোখ খুলল। একটু ভুল হয়ে গেছে। রামসীতা তখনও হাত ধরেনি। কয়েক মুহূর্ত আগেই বলে ফেলেছে কদম্ব। কদম্বর চোখে একটু যেন অপরাধবোধ। কদম্ব ফুলপ্যান্টপরা জনের দিকে তাকাল। কদম্ব কি ওকেই এতক্ষণ জয় সীরাম বলছিল?

গঙ্গাসাগরের এই মেলাটা ভেঙে গেলে ওই লোকগুলোর সঙ্গে লেনদেন ভাঙবে না কদম্ব। ওরাও কি হরি সা'র মতো ভাড়া খাটায় নাকি অন্য কোনও হরি সা'র কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে আসে? ওদের পোঁ ধরবে কদম্ব? তাহলে সারা বছর কাজ হবে। পয়সা হবে। পয়সা দিয়ে কদম্ব কী করবে? আবার সংসার করবে? সংসার মানে চালায় লাউ, বালতিভরা জল, দাওয়া, মুড়িমাখা। আবার সংসার মানে কেরোসিনও তো।

সংসার পেতেছিল কদম্ব। বসিরহাট। ও পারেনি। পালিয়েছিল। ওর বউ তখন পোয়াতি। বউয়ের নাম প্রতিমা। কদম্বের মনে হয়েছিল, প্রতিমার গর্ভের সন্তান যখন ছিঁচকে চোরকে বাপ ডাকবে, তখন কি সামলাতে পারবে ও? মনে হয়েছিল, বাবুদের বাড়ি গিয়ে বাসনপত্তরের সঙ্গে ও কি ঝুমঝুমিও চুরি করবে? দু' দিকে টুপি পরানো বোতল? চুরি করবে ডটপেন—সাদা খাতা? চুরি করবে লাল মলাট বিদ্যাসাগরের বই? পালিয়েছিল কদম্ব। ওর সেই বউ আর সন্তানের খবর জানে না ও। এখন মাঝেমধ্যে দেখতে ইচ্ছে হয়। পুরনো সংসারটার গায়ে বিছিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় লাউলতা।

চুরি করার জন্যই সঙের কাজটা শিখেছিল কদম্ব। মুখে কালি মাখতে শিখেছিল ঠিকমতো। হঠাৎ হঠাৎ স্থিরমূর্তি হয়ে যাবার অভ্যাস করেছিল। সব বিদ্যারই গুরু হয়। চুরির সময় ওর গুরু ছিল গুরুপদ। সঙের কোনও গুরু ছিল না। বাগদি বাউড়িদের যারা সঙ সেজে বেড়ায় ওরা ওদের বাপ-পিতামোর কাছ থেকে শিখেছে। কদম্ব শিখেছে সমাজের কাছে। তাই ও শুধু কালী-কৃষ্ণ সাজে না। ব্লক-এর 'যেমন ইচ্ছা সাজো' প্রতিযোগিতায় 'চোর' সেজে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রাইজ পেয়েছে কদম্ব। একবার সেজেছিল রানার। কিছু লোক জানে, কখন কী সঙের বাজার। হরিলাল সা' জানে।

এখন খুব ভিড় বেড়েছে। তা-তা-তা তুরু তুরু। দেখুন দেখুন মানুষের মতো পুতুল আর পুতুলের মত মানুষ। দেখুন মানুষ আর পুতুল সাইড বাই সাইড। তা-তা-তা তুরু তরু কদম্বের সামনে ভিড়। পয়সা পড়ছে ঠং ঠং ঠং। কদম্বের সামনে ভিড়। একটা বাচ্চা মেয়েকে পিছন থেকে বদমায়েসি করছে পিছনের মোটা লোকটা...জয় শ্রীরাম। একটা হার ছিনতাই হ'ল কার। একটা বউয়ের মৃগী হয়েছে। পড়ে যাচ্ছে ভুঁইয়ে। কোলের বাচ্চাটা পড়ে গেল। কেউ মাড়িয়ে দিল ওর হাত। জয় শ্রীরাম। বমি করল একটা লোক। কিচ্ছু না। খিদে পাচ্ছে। কিচ্ছু না। একটু বুড়ি বলল, বেচারা, হনুমানটার বড় দুঃখ...কিছু না। ওটা কে দাঁড়িয়ে সামনে? প্রতিমা না! প্রতিমাই তো। ওই তো থুতনির দাগ। ওই তো ভাসা চোখ, এখন কালির দাগ। সঙ্গে দুটি ছেলে। একই রকম দেখতে। যমজ?

লবকুশ? হাতে মেলার ধনুর্বাণ। আয়রে বুকে আয়। ওরা রাম সীতা দেখল অবাক হয়ে। যন্তরের হাতনাড়া দেখল। হনুমান দেখল। 'মা গো, হনুমানটা মানুষ নাকি রামের মতোই যন্তর?' ওদের মা বলল হবেই একটা। ওই তো সেই গলার আওয়াজ। শরবত খাবা? ওই তো। আদিখ্যেতা! ওই তো। চুলোয় যাক।

একটা ব্যাগ বের করল ওই প্রতিমা। লাল ফোম-এর। ব্যাগের থেকে দুটো কুড়ি পয়সা বের করল। ছেলেদের হাতে দিল। বলল, রাম সীতারে দ্যাও। ওরা দিল। তারপর দশ দশ পয়সা বার করল। ছেলেদের হাতে দিয়ে বলল, হনুরে দ্যাও। ওরা দিল। বলল, পেন্নাম করো। ওরা করল। ওরা চলে গেল।

কে যে কীভাবে কখন মেশিন হয়ে যায় কে জানে? কদম্ব ভাবল।

তারপর রামসীতার আরও বহুবার ঘাড় ঘোরাবার পর রামসীতার ঘাড়ে ক্যাঁচর ক্যাঁচোর শব্দ হবার দরুন রামসীতার ঘাড়ে একটু গ্রীজ মাখাবার জন্য ধুতিপরা জন রামের পেছনে গিয়ে রামের সঙ্গে ব্যাটারির কানেকশন কেটে দিল। রাম স্থির। সীতা স্থির। কদম্বের পিছনের সঙ্গে যদিও ব্যাটারির কোনো সংযোগ ছিল না, তবু দেখা গেল, ঠিক তখনই, তখনই ঠিক, কদম্বর হাত নেতিয়ে পড়ল, ঘাড় ঢিলে হয়ে গেল এবং মাথা থেকে পড়ে গেল রাংতার মুকুট।

শারদ আজকাল, ১৯৯৩

এজীবন লইয়া কী করিব?

বৃষ্টি পড়ে ট্রাটোর ম্যাটোর সাবওয়েতে জল। মেট্রো বন্ধ গাড়ি কাৎ টেলিফোন বিকল। জানালার শার্সিকে খামচাচ্ছে হাওয়া। হাওয়ায় মেশানো জলরেণু। কাচের শরীরে নাচে জলের কত্থক।

লোকটা এসব কিছু দেখেনা। লোকটা বসে আছে বেশ আরাম চেয়ারে। আরাম চেয়ারে এখন বিরাম যদিও নেই, দুখীরাম তবুও বসেছে। একটু আগে শুয়ে ছিল চিৎ। দেখছিল ফ্যানের ঘূর্ণন। আর.পি.এম. কত গুনছিল। এখন বসেছে। দেয়ালে অনেক সুইচ। আলো জ্বলে লাল সাদা নীল। সব আলো বন্ধ করে লোকটা বসেছে। এপাশে গদীর চেয়ার খালি। ও পাশে গদীর চেয়ারে গুঁড়ো গুঁড়ো বালি। বাথরুমে বালতিতে জলের ফোঁটারা পড়ে টুপ টুপ টুপ। এ ছাড়া এখন সবকিছু চুপ। লোকটা উঠে বসে। লাল আলো নীল আলো জ্বালে। বন্ধ করে ফের। একা একা জ্বালায় নেভায়। স্টিরিওতে ভরল ক্যাসেট। কী ক্যাসেট দেখেও দ্যাখেনা। অবশেষে বাজল বেহালা। ফুল স্পীড টিপে দিয়ে বেহালাকে বেসুরো বানায়। বেসুরো বাজনার খেলা। নিজের সঙ্গে বেসুরো-বেসুরো এই বেশ খেলা। এইভাবে বেশ বেলা যায় তার। এইবার টি.ভি.টা চালায়। বিভিন্ন ছবি আসে বিভিন্ন চ্যানেলে। রিমোর্ট কন্ট্রোলে সে অল্প অল্প দেখে। টমেটোর সস্ ও কিচাপ মেখে স্নান করে পাহাড়ি বালিকা। নাট, স্ক্রু ও বল্টুর মালা গায়ে জংলি যুবক গান গায় গ্লুম গ্লুম গ্লুম। রঙিন প্যাকেট ছিঁড়ে দু'হাতে ওড়াচ্ছে সাদা পপকর্ন। স্যানিটারি ন্যাপকিন আর দরকার নেই বিজ্ঞাপিত করে এক রোবট কিশোরী। সাজানো শ্মশানে মৃতদেহ ঢেকে দিচ্চে ভিমলের শাড়ি। এই সব পুরোনো পুরোনো লাগে। একটাও ভাল নয়। লোকটা রিমোট কন্ট্রোলে বলে, তিন চার পাঁচ ছয়...। অবশেষে আটের নম্বরে আসে সাদার মূর্ছনা। সাদার ভিতরে আসে কালো কালো ঢেউ। ঢেউ-এর ভিতরে আসে স্পট। বেশ লাগে। যন্ত্র শব্দ শোঁ-শোঁ-শোঁ...প্রট্ প্রট্ প্রট্। তারপর উঠে যায় ফের। পায়ের পাতার নিচে মৃদু মোলায়েম ঘাস রঙা পি.ভি.সি. কার্পেট ঠিক যেন উইম্বলডন টেনিসের মাঠ। ধীরপায়ে লোকটা বেসিনের সামনে দাঁড়ায়। একটি বেসিন আছে তার, দুধ সাদা রং, প্রিয় স্থান। ওখানে দাঁড়ায় প্রিয় বেসিনের কাছে। একটি আরশোলা আছে। পোষা আরশোলা। বেসিনেই থাকে। কারণ বেসিন থেকে সে বেরুতে পারে না। বেসিনের মসৃণতা বেয়ে চেষ্টা করে উপরে ওঠার। চেষ্টা করে বেসিনের বাইরে যাবার। বারবার পড়ে যায় চামর চিক্কনে। লোকটা এর জীবন দেখে। কবে তার পূর্ব পুরুষ কলোসিয়ামে দেখেছিল খেলা। গ্লাডিয়েটার দেখেছিল। এখন আরশোলা দেখে। মাথার ভিতরে এক আনন্দ পিংপং। কী দেখে আনন্দ তার? বারবার ব্যর্থতা-রগড়? বারবার ফস্কাচ্ছে মাইরি, হি-হি, নাকি তার অবিরাম ওঠার প্রচেষ্টা। নাকি এসব কিছুই নয়, কেবল পারফরমেন্স। লোকটা রোজ রোজ দেখে ঐ প্রিয় আরশোলাটা। এখনো দেখছে।

কিছুক্ষণ আরশোলা দেখা হয়ে গেলে লোকটা আবার নতুন খোঁজে। ঘরের ভিতরে তাঁর নতুনের সংখ্যা বড় কম। বড় তাড়াতাড়ি অ-নতুন হয়ে যায় যে কোন নতুন। ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত শুয়োরের মাংসের মতো পুরোনো নতুন। সুখের জন্য আনা যন্ত্রপাতিগুলি যার যার নিজস্ব দুঃখের কথাও জানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং আবার বিষাদ। তখন প্রাঙ্গণ ভাবে। প্রাঙ্গণের সঙ্গে ভাবে শিশু। প্রাঙ্গণ মানে হল ডাইনিং-এর সামনে স্থান। এক্কাদোক্কা হতে পারে মোজাইক নকশায়। লেমম্যান কিংবা রাজা একটি বালিকা চাইল...। এখানেই খেলা হতে পারে। ক্যাবিনেট থেকে নামে খেলার শিশুরা। খেলা হয়, খেলা জমে। পুরো খেলা নয়, খেলাদের মিনি। শিশুরা খেলেনা, শিশুদের পুতুলেরা খেলে।

শিশুদের খেলা মানে সি.ডি. সেভেন সিক্স। বাক্‌সো যন্ত্রে টিপে দিলে আলোর অক্ষর আসে জোছনা-বিষাদ স্ক্রিনে। চোর চোর...দাড়িয়াবান্ধা, ভলিবল...টেবিল টেনিস...। দাড়িয়াবান্ধা হয়নি বহুকাল। আজ হোক। ফোর ডি টিপে দিলে দাড়িয়াবান্ধা হয়। দাড়িয়াবান্ধার হৈ হৈ হয়। হিপ হিপ হয়। একদিন ভালবাসা টিপে দেবে নাইন নাইন থ্রি। তৃপ্ত সঙ্গম ফোর নাইন টু। অভিমান, বিরহ, দুঃখ, কাছে পাওয়া, সমস্ত নম্বর আছে কোডে ফেলা। পুতুলেরা খেলে।

যে কোনো খেলার শুরু আছে বলে ভেঙে যাওয়া আছে। পুতুল রেফারি ইশারায় বলে খেলা ভেঙে গেল। পুতুলেরা নতুন নম্বর পাবে বলে বসে থাকে। এই পুতুলেরা আলাদা আলাদা। অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বে পৃথক সবাই। এদের আলাদা নাম ছিল একদিন। এমন অনেক নাম জানা আছে, সেই নাম এখনো কোনো পুতুল পায় নি। সুতরাং বলা চলে এখনো অনেক নাম পুতুল প্রজাতির জন্য বাকি রয়ে গেছে। পৃথিবীতে আরও পুতুলের জন্ম হলে আরও আরও নাম দেয়া যেতে পারে। টেলিস্কোপ নাম দেয়া যেতে পারে, ডাকনাম টিলু। এন্টিমনি দেয়া যেতে পারে, ছোট করে মনি, এরকম পোর্সিলেন, আর্সেনিক, হিলিয়াম, কত নাম পড়ে আছে বাকি। কিন্তু অসুবিধে হ'ল ঐ সাদা রং বাক্‌সোমেশিন গ্রহণ করে না কোনো নাম। অক্ষর জানে না সে, শব্দমালা মানে না, ইলেকট্রনস্রোত ভালবেসে সংখ্যার বিদ্যুৎস্পর্শ শুধু জানে। পুতুলেরা তাই সব সংখ্যা হয়েছে। শঙ্খমালা নাম্নী সেই প্রাচীনা পুতুল সংখ্যামালা। নাইন নাইন নাইন।

লোকটা এখন এঘর খোঁজে ওঘর খোঁজে। অন্যরকম কিছু পায় না। এ-দেয়াল দেখে, ও-দেয়াল দেখে। অন্যরকম কিচ্ছু দেখে না। এই কোণা দেখে, ঐ কোণা দেখে, তখন ঘরের কোণায় আটকে গেল চোখ। ঐখানে পড়ে আছে প্রজেক্টার মেশিন। একা একা আদুর গায়ে ধুলো মেখে চুপচাপ।

ইস্‌স্‌।
মানুষটার দুঃখ হ'ল।
মানুষটা মেশিনটাকে বললো
ওঃ স্যাড ভেরী স্যাড ইউ লোনলি এলোন।
মেশিনটা মানুষটাকে বললো
নট লোনলি, আই সি ইউ ওনলি অল ডে লং
মানুষটা মেশিনটাকে বললো
হাউ ফানি নাহি জানি কি করিয়া হয়।

মেশিনটা মানুষটাকে বললো
মাই লেন্স গুড পারফরমেন্স জানিও নিশ্চয়।
মানুষটা মেশিনটাকে বললো
থ্যাংক ইউ মাই ফ্রেন্ড উই উইল সিং অ্যান সং।
মেশিনটা মানুষটাকে বললো
উই উইল বি গুড ফ্রেন্ডস অল লাইফ লং।

লোকটা এবার করল কী, ঘরের ভিতর থেকে তুলো নিয়ে এল। প্রজেক্টারের চোখ মুছল। কাপড় নিয়ে এল। গা মুছল খুব যত্ন করে। তারপর টেবিলে বসাল। উল্টো দিকের দেয়ালের সাদার দিকে মুখ। প্লাগটা লাগাতেই দেয়ালের গায়ে লাগে আলোর চাদর। লেন্সের সামনে মানুষটার আঙুলগুলো নেচে উঠল। ওমনি নাচল ছায়ারা। ছায়া দেখতে বড় ভাল লাগছিল মানুষটার। এখন ছায়ারাও সেভাবে আসে না। টিউবলাইটের আলো ছায়াটায়া দেয় না তেমন। হ্যালোজেনের ছায়ায় কেমন মনমরা মনমরা ভাব। শার্সির ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে পড়ার চাঁদ কখনো গা ছুঁলে যে করুণ ছায়া হয়, তার সাথে একদিন লোকটির কথা হয়েছিল। শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছিল। আবার আসব বলেছিল ছায়াটি। কিন্তু আর আসেনি এখনো। এরাইতো আসল লাইট। এদের দয়া হলে, পারমিশন পেলে চাঁদের চূর্ণক কিছু অ্যাডমিশন পায়।

লোকটা এবার প্রজেক্টারকে কী যেন বললো। সান্ত্বনা দেবার মতো ওর গায়ে বুলিয়ে দিল হাত। বললো, ওল্ডিজ ইজ গোল্ডিজ। তারপর একটা ড্রয়ার টানল। ড্রয়ারের ভিতরের লাল মখমল মোড়া একটি বাক্স। বাক্স খুললেই রঙিন ফিল্মের স্লাইডস। লোকটা প্রজেক্টারে একটা স্লাইড ভরে দিল।

দেয়ালে রং ভরা মেঘ, সূর্য ডুবুডুবু। আর একটা স্লাইড—
দেয়ালে সবুজ ঝিলে কতশত পদ্ম ফুটিয়াছে।
আর একটা—
দেয়ালে কদমতলে ময়ূর ময়ুরী নাচে।
আর একটা—
দেয়ালে আম্রশাখে গাহিছে বুলবুলি।
আর একটা—
দেয়ালে যুবতী নারী পরনে কাঁচুলি।
এবার ঘটল এক মজার ব্যাপার।

দেয়ালের ছবির নারী, ঐ আলোর নারী মূর্তিমতী হল। রক্তবতী, মাংসবতী হল, মানুষের শরীর পেল। দেয়াল থেকে বেরিয়ে এল। আর ওমা! কী কাণ্ড, মেয়েটার চোখ থেকে ঝরে পড়ল দু'ফোঁটা জল। বললো, শাপমুক্ত হলাম। লোকটা ভাবল, এ কী ব্যাপার! মেড ইন হল্যান্ড, এত ভাল, এত দামি প্রজেক্টার, এমন বিগড়লো ; লোকটা স্লাইডটা টেনে বার করল। দেখল সাদা।

মেয়েটা বললো আপনি বাঁচালেন আমায় প্রিয়, প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম। আমার ফিলিম জন্ম শেষ, আবার মানুষ জন্ম পেলাম। খিদে পেয়েছে, খাব।

লোকটার চোখে মুখে কোনো 'একী হল' ভাব নেই। লোকটা মেয়েটার দিকে সোজা চোখে চায়। মেয়েটা আবার বলে, খাব। লোকটা বলে, আছেতো টিনড মাশরুম। বহুক্ষণ

পরে, বহুদিন পরে লোকটা কোনো কোনো প্রকৃত প্রাকৃত কথা বলে। মেয়েটি বলে, মুড়ি-ফুলুরি নেই? লোকটা বলে, এসব হয় না এখন। বাড়ির তলার স্ন্যাকস্ বারে হটডগ পেতে পার। খাবে? মেয়েটা অবাক হয়ে তাকালে লোকটা বলে, জানোনা, হটডগ! নামও শোননি। কী নাম তোমার? মেয়েটা বললো, বাবা নাম রেখেছিল সাবিত্রী। সিনেমায় যখন নামলাম, সবিতারানী কিছুদিন পরে মিস স্যাবি।

তারপর!

তারপর নাচি। সেই নাচ সিনেমায় হয়। সতীবেহুলায় নাচি অমরায়, ইন্দ্রের সভায়, পদ্মাবতী নাচি পুরীর সভায়, জয়দেব সিনেমার নাম, মিস কিটির এক্সট্রা হয়ে নাচি রাতের কলকাতা বইয়ে, সিঁথির সিঁদুরে নাচি ধূপকাঠি হাতে নিয়ে মন্দির চাতালে।

তারপর!

তারপর ভুল হল। প্রেমে পড়লাম।

ধুতির উপর হাফশার্ট। গান গাইত যমুনা কিনারে শাজাহানের স্বপ্নের শতদল। কাঁচি সিগারেট খেতো, মুড়ি-ফুলুরি ভালবাসত, রথের দিনে পাঁপর ভাজা খেত, হাতে থাকত উল্টোরথ বই। মেকাপমন্যান। কিগো, শুনছো তো?

গো অ্যাহেড...

তখন এল যে বরষা সহসা মনে রিমঝিম রিমঝিম গান গেয়ে যাই। সতীনাথ। সতীনাথ গো। তখন নাচে ভুল হয়। ছন্দে ভুল হয়। ছেনালির ভিতরে ঢুকে যায় ফুলতোলা। একদিন ক্যাবারের নাচে ভুল করে আরতির ছন্দ চলে আসে।

হ্যাঁগো, শুনছো তো...

এ্যাহেড...

ঐ বইয়ের যে ডিরেক্টার ছিল, ভারী হিংসুটে। ভারী জাদুকর। আসলে সে একা চাইত আমায়। কিন্তু আমার জীবনে যে আরেকটা বই চলছে তখন ; মেকাপম্যান গো...। একদিন ভীষণ রেগে গিয়ে বললো, প্রেম পাগলিনী তুই ফিল্ম হয়ে যা। সেই থেকে আমি ফিলিম।

ভারী অদ্ভুত তো, শরীরটা সেলুলয়েডে মিশে গেল? মিশে যেতে কতটা সময়? লোকটা বলে। মেয়েটা বললো, কতক্ষণ জানিনা। শুধু মনে আছে জোড়হাতে কী যেন বলতে চেয়েছি। তক্ষুণি শোনা গেল—একহাজার আটবার প্রজেক্শন হলে পরে মনুষ্যজন্ম পাবি ফের। তার মানে এর আগে একহাজার সাতবার দেয়ালে পড়েছি। তুমিই বাঁচালে। কীগো...শুনছো না...।

গো...।

কি গো!

গো অ্যাহেড।

খিদে পেয়েছে। কতবছর খাইনি কিছুই। খিদে? দেখ, ফ্রীজে দেখ, কি রয়েছে দেখ...। মেয়েটা অল্প হাসে। বৌ নেই বুঝি আপনার! এবার এগুল। সামনেই আয়না রয়েছে। এইবার লজ্জা পেল। দু'হাতে ঢাকল দেহ। ছুটে গেল সামনের ঘরে। ওখানেও দর্পণ রয়েছে। দরজায় খিল দিয়ে দর্পণে নিজেকে দেখে। ব্রা ও প্যান্টিতে সেই কবেকার ক্যাবারে কালের। তাড়াতাড়ি বিছানার চাদরে নিজেকে জড়াল। চাদরে পুরুষ গন্ধ। মেয়েটি ঋতুমতী হল বহুকাল পরে।

এই যে মেয়েটি, সাবি মিস স্যাবি, যে কিনা এখন আবার সাবিত্রী হয়েছে গান গায়...। সাত ভাই চম্পা জাগোরে জাগোরে। আঙুলে তুড়ি দেয়। খুশিতে ভরেছে মন। লোকটার কাছে যায়। বলে, মুড়ির টিন কই, মুড়ির টিন?

লোকটার কথা নেই কোনো। অপলক মেয়েটিকে দেখে। মেয়েটির হাসি দেখে। হাসলে যেন মেয়েটির মুখ থেকে রেডিয়াম ঝরে। লোকটা নিয়ে আসে তিনটে প্যাকেট। বলে খাবে যদি খাও...। লাল প্যাকেট হাতে নিয়ে মেয়েটা বলে, কী আছে এতে?

স্পঞ্জ। স্পঞ্জের গুঁড়ো। খিদে মরে যায়। নীল প্যাকেট হাত দিয়ে মেয়েটা বলে, কী এতে? চিনি ও চর্বি। হাই ক্যালোরি। শক্তি। হলুদ প্যাকেট ছুঁয়ে মেয়েটি বলে, আর এই মুখপোড়া প্যাকেটে?

বিস্কুট! বিস্কুট! জিভে টেস্ট লাগে।

বিস্কুট, শুনেই হাত হল থাবা। চিরলো প্যাকেট। বিস্কুট খেয়ে বললো, আঃ। 'আঃ' শব্দের বিসর্গ দুটি কাচের বল হয়ে ঝাড়লণ্ঠনে ঝুলতে লাগল সুখে। মেয়েটি বললো ইচেক দানা বিচেক দানা দানার উপর দানা। বললো ঝুমকা গিরা রে। বললো মন ডোলেরে...মেরা তন...।

লোকটাকে বললো, হ্যাঁগা মানুষ, কর কী?

কিছুই করি না।

মানে! বেকার নাকি? ঘরদোর দেখে তো মনে হয়না। আপিস নেই?

আছে।

আজ যাওনি?

ছুটি।

তবে আমার জন্য শাড়ি কিনে আনো গে যাও। সায়া, ব্লাউজ। ছত্তিরিশ সাইজ। এবেলা রেঁধেবেড়ে খেয়ে খাইয়ে ওবেলা চলে যাব। জ্বালাব না বেশি।

কোথায় যাবে?

বাড়ি। তেঘরিয়া গ্রাম। নিয়ে যাবে? এরোপ্লেন নামার শব্দ শোনা যায়। হাঁস আছে, আয় আয় আয় চৈ চৈ...। এখনো আছে তো? বুলুদির বাড়ি, পাকা ছাদ, বাড়িতে রেডিও। শুক্রবারে নাটকের ভিড় ওদের বারান্দার সামনে। আমাদের বাড়িতেও এল তারপর। জয়দেবে পদ্মাবতী নেচে রেডিও আনলাম মারফি কোম্পানির। এখনো আছে তো, নিয়ে যাবে? বিদ্যেধরী খালে নিয়ে যাবে? সোঁদর বনের ইস্টিমারের ভোঁ, খড়ের নৌকা, শিউলি তলায় যাব খুব ভোরে, একটিও ফুল মাড়াব না পায়ে...যাব। আমি আর প্লাস্টিকের নেই, রক্তের হয়েছি আমি, মাংসের হয়েছি। মেয়েছেলে। তোমরা যাকে বল নারী।

লোকটা হাসে। বলে, ঐ সব কবে চুকেবুকে গেছে। তেঘরিয়া নাম আছে শুধু। ফ্ল্যাটের জঙ্গল। হাঁসটাস, পুকুরটুকুর এইসব চাও যদি দেয়ালে দেখ। প্রজেক্টার আলোকে দেখ, ইউম্যাটিক দেখ...। নারীটা বললো, তোমার ওসব অংবং মানেই বুঝি না। বলগো কী করি উপায়? কী আর করবে তুমি, থাকো। রিল্যাক্সিন পালঙ্কে থাক। রাতের বেলায় সোনার রঙ ছুঁইয়ে দেব, ঘুমবে। ওটা ভাইব্রেটার। সকালে রুপালি অ্যালার্মে জেগে উঠবে ফের। তারপর?

বল তুমি বল তারপর?

না না, তুমিই বল।

আমি আবার কী বলব?

তারপর ভাত রাঁধব।

সে তো মাইক্রোওয়েভ ওভেনে হয়।

বাটনা বাটবো।

মিক্‌সি আছে।

ফুল তুলব।

প্লাস্টিক। পিভিসির ফুল।

তোমার জামা কাচব, গেঞ্জি কাচব।

ওয়াশিং মেশিন।

ঘর ঝাড়ু দেব।

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার।

তোমায় ঘুম পাড়াব।

ভাইব্রেটার।

গান শোনাব। গাবে ভুবন ভরিয়ে দেবে ভেবেছিল একটি পাখি।

স্টিরিও।

কানে কানে কথা কব।

হেডফোন।

মেয়েটা হঠাৎ দু'হাতে আঁকড়ে ধরল ওর মেঘবরণ চুল। ডুকরে উঠল। বলল, এ জীবন লইয়া তবে কী করিব, কী করিতে হয়?

লোকটা বলল, সফটওয়ার শেখো। কোবল, জিপসি সিপিসি...।

মেয়েটা কাঁদতে লাগল। ভাল্লাগে না, ভাল্লাগে না। লোকটা ধীরে ধীরে বেসিনের কাছে গেল। সেই সাদা বেসিন। শ্বেত মসৃণ। মসৃণ দেয়ালে সেই প্রিয় আরশোলা। লোকটা ডাকে। বলে, দুঃখ কোরো না, এদিকে এসো, মজা দেখবে এসো।

এ মজা দেখব না আমি। আমি দেখব আকাশের মজা। বক দেখব, চিল দেখব। ছেলের হাতের লাটাই দেখব। আমি দেখব নারকোল কুচি দেয়া ঝালমুড়ি রূপ। চাল ধোবো। গা ভিজিয়ে স্নান করব শাপলাপুকুরে। নতুন বৃষ্টির গন্ধ নেব, পুরুষের ঘামগন্ধ বুকের ভিতরে। লোকটা তবু হাতছানি দেয়। ডাকে। সাবিত্রীর পা নড়ে। জল এগোয় না, তৃষ্ণা এগোয়। সাবিত্রী মানুষটার পাশেই দাঁড়ায়। লোকটা বলে, দেখ দেখ দেখ। ও পারছে না, হি হি, পড়ে যাচ্ছে কেমন। সাবিত্রী দেখে দুধবরণ সাদা তেল চিকচিক বেসিন দেয়ালে বেচারা আরশোলা বারবার পড়ে যায়, তবু সে তার সরু সরু পায়ে মসৃণতা আঁকড়ে ধরে বেসিন রাজ্যের বাইরে যেতে চায়। সাবিত্রীর আরশোলাটাকে ভাল লেগে যায়। ওরা দুজনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরশোলা দেখে। মুক্তির প্রচেষ্টা দেখে। দেখতে দেখতে সাবিত্রী এক সময় ক্লান্ত হয়। লোকটার আঙুল ধরে। বিছানার চাদর জড়ানো আদি মানবী লোকটার হাত ও বাহুমূল ধরে। হাওয়া বয় শন্‌শন্‌, তারারা কাঁপে। লোকটা হাত ছিটকে চলে যায়। ঝাঁপিয়ে পড়ে পালঙ্ক নরমে। পালঙ্কে ওঠে স্পঞ্জ ঢেউ। লোকটা সোনার কাঠি বের করে। সোনালি রড। বললো, ঘুমোবো। মেয়েটা ছুটে যায়। লোকটার হাত থেকে কেড়ে নেয় ঐ সোনার কাঠি। বলে এখন ঘুমিও না ওগো, আমার

সঙ্গে জেগে থাকো। এখনো তারা আকাশে জ্বলে, মন যে আমার কথাটি বলে। লোকটা কিন্তু রাগে না। সাবিত্রীকে বকে না, মারে না। স্টিরিওতে কী একটা মিউজিক চালিয়ে দিয়ে বেসিনটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

সাবিত্রী পালঙ্কে বসে। দু'হাত হাওয়ায়। গা থেকে খসে যায় চাদর বল্কল। গান গেয়ে ওঠে, আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব, হারিয়ে যাব আমি তোমার কাছে...। লোকটা ওদিকে চায় না, আরশোলার দিকে চায়...।

সাবিত্রী সে সময় আরশোলাটার দিকে ধেয়ে যায়। উথাল পাথাল পা। আরশোলাকে ছুঁইয়ে দেয় ঐ সোনার কাঠি। আরশোলাটা কিন্তু ঘুমোয় না। সাবিত্রী তখন লোকটাকে হঠাৎ আলিঙ্গন করে। লোকটা হ্যাঁ-ও করল না, নাও করল না। আস্তে আস্তে ওয়াশিং মেশিনটার কাছে গেল। সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো, এটা নতুন কিনেছি, নতুন মডেল। মেশিনটাকে বললো, হ্যালো, ভালো? মেশিনটার বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। লোকটা মেশিনটাকে চুমো খেল একটা। তারপর শুয়ে পড়ল সানমাইকা লাগানো রঙিন পালঙ্কে। সাবিত্রীর চোখে তাকিয়ে মৃদু হাতছানি দিল হাতে। সাবিত্রীর মুখে টগর ফুটল, হাস্নুহানা ফুটল। সাবিত্রী পায়ে পায়ে এগুলো। লোকটা বললো, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। সাবিত্রী তখন পদ্মপাতা ডান হাতটা খুলেছে সবে, শুরু করেছে ঘুমপাড়ানি গান। লোকটা তখন ওর বাম হাত থেকে কেড়ে নেয় সোনার কাঠি। নিজেই নিজের মাথায় ছোঁয়ায়, আর লোকটা ঘুমিয়ে পড়ে।

সাবিত্রীর পদ্মপাতা হাত গুটিয়ে যায়। মুঠি হয়। সেই মুঠিটা শক্ত করে ধরে ঐ রড। ওটাকে মুষলের মতো ধরে। ভীষণ জোরে বাড়ি মারে ঐ ওয়াশিং মেশিনে।— ওলাউঠো। তক্ষুণি রডটা ভেঙে যায়। ছোট ছোট স্প্রিং ও ব্যাটারি, ট্রানজিস্টার, এইসব মাটিতে পড়ে থাকে। আপদ ভেঙেছে, এই ভেবে এইবার শ্বেতকমল বেসিনের কাছে যায়। ওখানে দুধ ধবল দেয়ালে ঐ আরশোলা একই কাজ করে যায়। বলে, আরশোলারে আরশোলা, তুই ওকে জাদু করেছিস। শঠের মায়া তালের ছায়া। বলে, তুই থাকিস জলে আর আমি থাকি ডালে, মোর সাথে দেখা হল মরণের কালে। সাবিত্রী তখন আরশোলাটাকে মুঠো করে ধরতে যায়। গা থমথম গা থমথম গা থমথম করে। আরশোলাটার পা ধরে দু'আঙুলে তীব্র টান দেয়। তখন আরশোলাটার গা থেকে স্প্রিং-এর পা, ধাতব পা খুলে আসে, প্লাস্টিকের ডানা খুলে আসে, কাচের চোখ পড়ে যায়, আর সানমাইকার পালঙ্কে শুয়ে থাকা লোকটা তুমুল আর্তনাদ করে ওঠে। ছটফট করে ওঠে। স্পঞ্জ খাট কেঁপে ওঠে। আর আরশোলাটার, স্প্রিং-এর আরশোলাটার বুকের ভিতরে জল থলথল ছোট্ট একটা নরম মটর দানা। ঐ নরম মটর দানাটাও ওর গা থেকে পড়ে যায়। সাবিত্রীর মধ্যমা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে সোহাগে রয়েছে ছোট্ট মটর দানার মতো ছোট্ট নরম একটা প্রাণ পুঁটলি। ওটা টিপে দিলেই লোকটা মরে যাবে। সাবিত্রী ওর আঙুল প্রসারিত করে পদ্মপাতা করে। তার ঠিক মধ্যিখানে শিশির ফোঁটার মতো টলটল করছে প্রাণবিন্দু। ওটা নিয়ে কী করবে ও!

এ জীবন লইয়া কী করিব, কী করিতে হয়?

অনুষ্টুপ, ১৯৯৫

অ্যালুমনিয়ামের ডানা

মন ভালো নেই। অনেক রাত। একা একা ছাদে বসে আছি। সামনের দুটো সাত তলা বাড়ির ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঠেছিল একটু আগে। এখন অন্য একটা বাড়ি ঢেকে নিয়েছে চাঁদ। আকাশের গায়ে তবু চাঁদ চাঁদ আভা। চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে। ফুল ফুটেছে টবে। আমার ছাতের টবে। যুঁই, নন্দদুলাল, নয়নতারা। কদমতলায় কে? কদমতলা কোথায় পাব? ছাতের উপর আমি। একা একা বিড়ি খাচ্ছি বসে। বিড়িই খাচ্ছি। বাজেটে সিগারেটের দাম বেড়েছে। সিগারেটের দাম বেড়ে গেলে আমি বিড়িই খাই। সাতদিন, কিম্বা দশদিন। আবার সিগারেট। প্রতিবার বাজেটের পরই এরকম হয়। দু-একটা ট্রাক এর শব্দ আসছে। নাইটগার্ডদের বাঁশি, কয়েকটা জানালার ভিতর থেকে হাল্কা আলোর আভাস। ওখানে ষ্টার টিভি কিম্বা জি টি ভি অথবা জেড টিভি কিছু একটা। তাই বাতাসে হাল্কা ঝিনচ্যাক। চাঁদটা এবার ডিশ এ্যান্টেনার উপর উঠল। মনে হচ্ছে ডিশ এ্যান্টেনাটাই চাঁদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চাঁদের দিকে আমিও তাকাই আর বিড়ি খাই। আমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শেয়ারের দরদাম ভাবি। আমার বিজনেস ফেল। হায় হায় ভাবি। চাঁদের গা থেকে গ্যালন গ্যালন আলো আসছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। বাতাসে টবের গাছ নড়ছে, ইলেকট্রিকের তার নড়ছে। ব্যালকনিতে ঝোলা ভিমল-বোম্বে ডাইং-কোহিনুর নড়ছে, বাতাসে ঝিন চ্যাক ঝিন। এমন সময় দেখি জোছনা সাঁতার দিতে দিতে পাখা নাড়িয়ে কি যেন আসছে। আমার ছাতেই নামল। ওমা কী আশ্চর্য এতো দেখি পরী। পরীটা হাঁপাচ্ছে। ফুলের টব গুলোর পাশে বসে পড়ল। একীরে বাবা। পরী কি সত্যি সত্যি আছে নাকি? বহু দিন আগে একটা গল্প পড়েছিলাম শ্যামল গাঙ্গুলীর, পরী, ওখানে পরী নামার কথা ছিল। কিন্তু সেতো গল্পরে বাবা। গল্পে কী না হয়। পরীটা বল্ল একটু জল দেবেন? ব্যাটাছেলেদের মত স্বর। কাছে যাই। পরীটার জামা প্যান্ট কিচ্ছু নেই। একদম ন্যাংটোপোদো। চোখ কচলে ভাল করে দেখি। ব্যাটাছেলে পরী। একটু জল...এইবলে পরীটা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। ওর পিঠের উপরে পাখা। পাখাটা কেমন যেন, বইয়ে দেখা পরীর ছবির মত নয়। এলুমিনিয়ামের পাতলা রড দিয়ে গাঁথা মোটা পলিথিনশিটের পাখা। পাখার গায়ে কী সব ঘড়ি টড়ি আছে।

জল নিয়ে আসি আমি, ঢক ঢক করে জল খেল পরী, সম্পূর্ণ বোতল। তারপর বল্ল 'আঃ'। একদম মানুষের মতন। ছোট্ট ঢেকুর তুলল, মুখের সামনেটায় হাত দিয়ে আড়াল করল না। সফিস্টিকেশন একেবারে নেই। গরীব পরী।

পরী বলল, এটা কি কলকাতা?

আমি বললাম হ্যাঁ।

পরী বলল, একটা রুটি হবে বাবু?

একেবারে ভিকিরি ভিকিরি অ্যাপ্রোচ। পরীদের মধ্যেও কি ভিকিরি আছে? চাঁদের আলোয় ভালো করে দেখি। গোঁপ উঠেছে হালকা। দাড়ির পাতলা রেখা। ব্রণ। কোন

দেবশিশু ভাব নেই, এক্কেবারে ন্যাড়া মার্কা চেহারা। আমি জিজ্ঞাসা করি তুমি কে?

ছেলেটি বলে, আমি টি. ডি. না-না, গুয়ে।

—গুয়ে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কেন?

—অদেষ্ট।

—তা এরকম অদেষ্ট হল কী ভাবে?

—বলতেছি। একটা রুটি যদি...

—রুটি নেই, আজ হয়নি, বাইরে খেয়েছি আমরা।

হটডগ আছে, হট অবশ্য আর নেই...। বোসো আমি আসছি।

—একটা পাজামা হবে? কিম্বা গামছা? না হয় তেনা কানি?

দেখছি।

কেক ছিল। দুখণ্ড কেক আর আমার একটা পুরোনো লুঙি নিয়ে ছাতে যাই। দেখি হাটু মুড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। রঁদার থিংকারের মত। রঁদার কথা মনে পড়ে যেতে কেমন যেন কষ্ট কষ্ট লাগল। এই আমি, লাইন দিয়ে রঁদা দেখেছি, জীবনানন্দর বই কিনেছি। নাটক দেখেছি কত, তখন বড়লোক হবার ইচ্ছে ছিলনা, হটডগকে ফ্রীজে রেখে ঠাণ্ডা করতাম না, ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে অপরিমেয় সুখ ছিল। এখন আমার সুখ শেয়ারের ওঠাপড়ায় হারিয়ে হারিয়ে গেছে। আমি ওকে কেক খেতে দিই। ও কেক এর কিশমিশ গুলো খুঁটে খুঁটে আলাদা করল। কেকটা খেয়ে কিশমিশগুলো খেল। এবার জলের বোতলের দিকে তাকালো। জল আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আবার জল দরকার ও কিন্তু আর জলের কথা বল্লনা। ওর কেক খাওয়া দেখেই বুঝে নিয়েছিলাম পরীটা হাঘরে। সুতরাং ফিল্টারের জল দরকার নেই। বোতলটা ওর হাতে দিয়ে ছাতের কোণায় সিনটেকস এর ট্যাংক দেখিয়ে দিলাম। ও বোতল নিয়ে ঐ দিকে গেল, কিন্তু কলের প্যাঁচ খুলতে পারছিল না। আমি গিয়ে কলের প্যাঁচ খুলে দিলাম। তারপর লুঙ্গিটা দিলাম। ও লুঙ্গিটা পরে নিল। পাখাটা গুটিয়ে নিল। এবার একটু হাসল। জিজ্ঞাসা করলাম কোথা থেকে এসেছ? ও বল্ল দুধসাগর।

—বাঃ, পরীরাজ্যর মতই নাম, তা তোমাদের গ্রামে মেয়ে পরী নেই?

—মানে?

না, বলছিলাম তোমার মত আরো পরী নেই?

—আমি পরী না

—পরী নয়? তবে যে ডানা?

—অদেষ্ট।

—কি অদেষ্ট, কেন অদেষ্ট, বল শুনি।

—ছেলেটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর বল্ল আমার নাম গুয়ে। আমার ওপরে দুই ভাই মরে গেইছেল। তাইতে হেলাফেলা করে আমার নাম রাখল গুয়ে। আমার ভাল নাম তারাদাস।

—তারপর?

—বাবা, ভাগল, মা গলায় দড়ি দে মরল।

—তারপর?

—বুড়ি ঠাকমা আমারে হারান বিশ্বাসের কাছে ভাত কাপড়ে দিল।

—তা না হয় হল। কিন্তু ডানা গজালো কি ভাবে?

—সে বেত্তান্তই তো বলছি।

—বল।

—নারান বিশ্বাসের ঘর মুছতাম, পা টিপতাম, পায়রার পালক দে তেনার কানে সুড়সুড়ি দিতাম। মাথা টিপি দেতাম, গায়ে তেল মালিশ করি দিতাম, পিঠ চুলকাতাম তারপর নারান বিশ্বাসের হাটে একটা গুদাম ছিল। পাটের গুদাম। গুদামের এক সাইডে বেঞ্চি লাগিয়ে ভিডিও হল বানাল। সেই সঙ্গে ভিডিও সাপ্লাই। দোকানে খবর দিলে বাড়ি গিয়ে ভিডিও ক্যাসেট সাপ্লাই হত। আমায় একটা সাইকল কিনে দিল আমি সাইকেল চেপে দূরের গাঁয়ে ক্যাসেট পৌঁছে দি, আবার পুরোনো ক্যাসেট ফিরত নি।

—তারপর।

—একদিন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলাম মীরপুর গাঁয়ে। কাঁচা রাস্তা। দুপাশে মাঠ। এমন সময় ভুস করে একটা রকেট নামল। রকেটের ভিতর থেকে মাথায় টুপি লাগানো বুড়ো-পানা সাহেব, সাহেব দেখতে লোক বেরিয়ে এল। বল্ল শোনব্যাটা গুয়ে-তুই সাইকেল চালাস ভুয়ে। তোর বড় কষ্ট ম্যান পাওয়ার নষ্ট। তোকে দেব ফেদার, আর্টিফিসিয়াল লেদার।

—বাঃ, তারপর?

—তারপর বুড়োটা একটা কোলবালিশ বার করল। কোলবালিশে জরির ঝালর। কোলবালিশের উপর একটা বেল্ট দিয়ে পাখাটা আটকে দিল। দুই পাখার মাঝখানে কতগুলি সুইচ আর বোতাম। ব,লল দ্যাখ কোলবালিশটা কেমন উড়বে। এই বলে একশো ফিটের বোতাম টিপে দিয়ে সুইচ টিপে দিল, আর কোলবালিশ একটা ঢাউস প্রজাপতি হয়ে গিয়ে উড়তে থাকল। কিছুটা উপরে গিয়ে আবার নেমে এল। বুড়োটা বলল, দেখলি তো? যদি দুশো ফিট টিপতাম, তা হলে কোলবালিশটা দুশো ফিট উঠতো, আবার নেমে আসতো। হাজার ফিট টিপলে হাজার ফিট। লেফ্ট রাইট ও হবে। এটা টিপলে ডাইনে, ওটা টিপলে বাঁয়ে। কোলবালিশের তো নিজের কোন ইচ্ছে নেই, যেমন সুইচ লাগাবে, তেমন উড়বে। কিন্তু তুই তো কেলাবালিশ না, মানুষ। তুই যেমন ইচ্ছে তেমন উড়বি। এটা টিপলেই পাখা নড়বে, এটা টিপলে উপরে উঠবি, এটা টিপলে নেমে যাবি। নে ওড়। আমার খুব ভয় করতে লাগল। আমি বল্লাম না, আমি উড়তে চাইনা। বুড়োটা জোর করে আমার পিঠে বেল্ট বেঁধে দিল তারপর সুইচ টিপে দিল। পাখা নড়তে লাগল। আমি উড়তে থাকলাম। উড়তে উড়তে গিয়ে দেখি বুড়োটা আমার সাইকেলটা নিয়ে রকেটে ঢোকাল। আমি চীৎকার করে বল্লাম আমার সাইকেল? বুড়োটা বলল, তুমি সাইকেল স্তর পার হয়ে গেছ। তুমি আর গুয়ে নও, তারাদাসও নও। তুমি টি.ডি. বাইবাই। লোকটা রকেট নিয়ে ধাঁ। প্রথম প্রথম উড়তে আমার ভয় করছিল, তারপর ভালই লাগল। উপর থেকে দেখলাম ক্ষেতের আল বোঝা যায়না, এই গ্রামে ঐ গ্রামের তফাৎ বোঝা যায়না, বামুন পাড়া-ডোমপাড়া বোঝা যায়না। অনেকক্ষণ পর যখন আমার গাঁয়ে নামলাম, এক্কেবারে বটতলায়। সেখানে মুরুব্বিরা সব বসেছিল। ওরা তো অবাক। সব বিত্তান্ত বল্লাম। ওরা সব আমাকে নয়, আমার পাখাটা কে দেখতে লাগল। মুরুব্বিরা

মিটিং করল। বলল, গুয়ে যখন এই পাখাটা পেয়েছে, এই পাখাটা সমাজের কাজে লাগাতে হবে। পাঁচজনের উপকারে লাগে, এমন করতে হবে। এই বলে আমায় বল্ল যারে উড়ে গিয়ে কটা ডাব পেড়ে আন। আমি তো মুরুব্বিদের কথা ফেলতে পারিনা, আমি কাটারি নিয়ে উড়ে গিয়ে ডাব পেড়ে আনলাম। এখন বল্ল ভালই হল। গ্রামে বড় বাঁদরের উৎপাত, তুই মুখোশ লাগিয়ে উড়ে উড়ে গাছের ডালে বসে বাঁদর-হনুমানদের ভয় দেখাবি। আমের বোলে পোকা লাগলে উড়ে উড়ে মেটাসিড স্প্রে করবি। আর আমার মালিক সাততাড়াতাড়ি ওর ভিডিও ভাণ্ডারের সাইনবোর্ডে লিখে দিল অর্ডার পাইবা মাত্র উড়ন্ত মানুষ দ্বারা অর্ডার সাপ্লাই করা হয়।

—তোমার মাইনে বাড়ালো না কিছু? ফ্লাইং অ্যালাউন্‌স।

—আজ্ঞে মাইনে নগদা কিছু বেশি বাড়ল না, তবে নতুন পোশাক দিল। ওটার নাম ইউনিফর্ম। নীল প্যান্ট, চকরাবকরা জামা। আর আমার ঠাকমা মরে গেলে নরান বাবুই শ্রাদ্ধশান্তি করল, হরির লুট দিল। আর নরান বিশ্বাস বল্ল তুই এখন আমার।

—গাঁয়ের অন্যরা মেনে নিল?

—এ নিয়ে কম হুজ্জোত? আমায় দেখলেই সব্বাই এটা ওটা ফরমাস করে। কেউ বলে যা দুটো ডাব পেড় দে, কেউ বলে সুপুরি পেড়ে দে। আর এদিকে খগা মণ্ডল একদিন আমার কাছে দুঃখ করে বল্ল গুয়ে, তুই আমার ভাত মারলি। আমি সাতপুরুষের গেছো। গাছে উঠে ডাবনারকোল পাড়ি। দুটো টাকা পাই। তুই কেন এমনধারা করছিস। মহা মুশকিলে পড়লাম। কোনটা যে সমাজের উপকার আর কোনটা যে অপকার সব বুঝতে পারিনা। ক্লাস থিরি পর্যন্ত পড়া মাথায় কি অত বুদ্ধি ধরে? একবার ক'জন বলল, যা গুয়ে উড়ে উড়ে এই হ্যান্ডবিল গুলি ছড়িয়ে দে। আমি দিলাম। তাইতে অন্যকজন আমায় প্যাঁদালো। বল্ল ডানা ছিড়ে নেবে। একবার গাঁয়ে এক ধনীর বাড়ি ডাকাতি হল। ডাকাতরা সব মাঠ ভেঙে পালালো। পুলিশ তো আগেই জানতে পারে ডাকাত কখন আসবে, আবার ডাকাতও জানতে পারে পুলিশ ঠিক কটায় আসবে। তাই ডাকতরা যখন আসার কথা, তার একটু আগেই এসে গেল, তারপর কাজ কারবার সেরে হাত ধুয়ে পালাল। পুলিশের জিপ যখন এল ডাকাতরা তখন মাঠ ভেঙে পালাচ্ছে। তখন থানার দারোগা বলল, গুয়ে, যদি পাখাটা দিত তাহলে উড়ে গিয়ে ডাকাতদের গুলি করা যেত। এরপরেও ডাকাত আসবে, আবার মাঠ ভেঙে পালাবে, তার আগেই বরং দশের উপকারের জন্য পুলিশদের ওড়ার ট্রেনিং হয়ে যাওয়া উচিত। আমি ওড়া শেখালাম। একটা পুলিশ, ওড়া শিখেই প্রথমেই করল কি দিঘির ধারে মেয়েদের স্নানের ঘাটের সামনে কদম গাছের মাথায় বসে রইল, হাতে মোহন বন্দুক। ভোটের ক'দিন আগে সুরেশ্বর ভুঁইয়া আমার ডানাটা চাইল, বলল, তিনদিনের জন্য চাই, অনেক বক্তৃতা দিতে হয়, ডানা থাকলে সুবিধা। আমি বল্লাম আমি তো নিমিত্তি। নারানবাবুকে বলুন। সুরেশ্বরবাবু হলেন লীডর। নারানবাবু তেনাকে খুব ভয় করে। সরাসরি না বলতে পারেনি। কিন্তু সদরের নার্সিংহোমে ভর্ত্তি করিয়ে ডানাটার বেল্ট আমার চামড়ার ভিতরে সেঁধিয়ে সেলাই করে দিল। আমার থেকে আর ডানাটা আলাদা করা যায়না। এখন আমি কিছুনা, ডানাটাই আমি। নারান বাবু বলে দিল, দ্যাখ গুয়ে, তুই কারুর কথা শুনবিনা। কারুর কাছে যাবিনা। তুই আমার। আমার বাড়ির ছাতের চিলে কোঠায় তোর কোয়ার্টার। আমি দিচ্ছি কোয়ার্টার। আমি দিচ্ছি ইউনিফর্ম। তোর নাম আর গুয়ে নয়।

তারাদাসও নয়। টি.ডি. ডানাটা এঁটকে থাকে বলে আমার শোবার কায়দা পাল্টালাম। উপুড় ছাড়া শুতে পারিনা। জামা পরতে হয় পিছন সাঁটা। বন্ধুদের সাতে হাডুডু কিতকিত সাঁতার খেলা বন্ধ। আমি টি.ডি. হয়ে গেলাম।

—তারপর?

নারানবাবু হরেক রকম কাজ করাতো আমাকে দিয়ে, আমার হাতে থাকে একটা কল। মাইক কল। কানে হেড ফোন। আমি দূরে উড়ি গেলে নারানবাবু ছাত থেকে আমায় যা হুকুম করেন আমি শুনতি পাই, আবার আমি যা বলি নারানবাবু শুনতি পান।

—কোথায় তোর হেড ফোন? কোথায় তোর মাইক?

—ফেলি দিইচি

—কোথায়?

—নদীর জলে—

—কেন?

—গতকাল সকালে নারানবাবু বললেন যা টি.ডি., নদীর ওপারে যা। নদীর ওপারে একটা মন্দির, মন্দিরের পিছনে আতাবন, সেখানে একটা পোড়োবাড়ি, বাড়ির ভিতরে দেখবি একটা পদ্মফুল আঁকা বাক্স। সেটা নে আয় গা। নারানবাবুর ঘরে আরও ক' জন লোক। সবাই গন্যিমান্যি।

আমি তো নদী পেরোয়ে ওপাড়ে গেলাম। দেখি প্রচুর আতা পেকিছে। আতা বনে তোতা পাখি। আমার পেটের তলায় বাধা পেলাষ্টিকের ঝুড়িতে ভর্ত্তি করে আতা ভরলাম। আমাদের গাঁয়ে মোটে আতা গাছ নাই। বুঁচি, জনার্দন বিশ্বাসের মেয়ে, আতা বড় ভালবাসে। তারপর শিবমন্দিরের পিছনে ঐ পোড়ো বাড়িতে গেলাম। দেখি চারটে বাক্স রয়েছে বটে, কিন্তু কোন বাকসেই পদ্মফুল আঁকা নেই। আমি মাইক কলে নিকেশ নিলাম-টিডি কলিং টিডি কলিং-কোন বাক্সে পদ্ম আঁকা নেই আজ্ঞে। ওভার। কি করব? হুকুম এল-চারটে বাক্সোই নিয়ে এসো। হনুমান যখন বিশল্যকরণী চিনতে পারেনি আর কি করেছিল? পুরো গন্ধমাদন আনেনি মাথায়? ওভার। আমি বললাম, হা আজ্ঞে। ওভার। তারপর চারটে বাক্সোই নিয়ে উড়তে থাকলাম। খুব ভারি বাক্স। বাক্সে কি আছে আমি হার্গিস জানিনা। নিচে নদী উপরে পাখা। আমি আস্তে আস্তে নদীর দিকে নেবে যাচ্ছি। মনে হল এতবোঝা নিতে পারছিনা। একটু হাল্কা হতে হবে। মাইক কলে বলি টি.ডি কলিং, নদীতে নেবে যাচ্ছি, আমাকে একটু হাল্কা হতে হবে। একটা বাক্স ফেলে দি? ওরা বলে উঠল রাসকেল। ঐ একটা বাক্সেই আসল জিনিসটা থাকতে পারে। তুই বরং পোশাক খুলে ফ্যাল। তাই করলাম। ইউনিফর্ম খসিয়ে দিলাম নদীর জলে। এতে কিছু লাভ হলনা। আবার বল্লাম-টি. ডি. কলিং-পড়ে যাচ্ছি হাল্কা হতে হবে। একটা বাক্সো ফেলে দি? ওরা বলে উঠল ইডিয়ট। সেই বাক্সোটাই হয়ত আসল বাক্সো। পেচ্ছাপ করে হাল্কা হ। তাই করলাম নদীর জলে। লাভ তেমন হলনা। আবার বল্লাম টি. ডি. কলিং। নেমে যাচ্ছি, পড়ে যাচ্ছি নদীর জলে। হাল্কা হতে হবে। একটা বাক্সো যে কোন একটা বাক্সো ফেলে দিতে হবে। ওরা বলল, গাণ্ডু, দাঁত নেই বানচোত, শিরা ছিঁড়ে রক্ত ফেলে দে শরীরের। তখন মনে হল আমি তো শালা মানুষ, কোলবালিশ না। কোলবালিশটার নিজের ইচ্ছে ছিল না। খালি সুইচ মারা কথা শুনতো। আমিতো

মানুষ। আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতি হবে।

আমি তখন চারটে বাক্সোই নদীতে ফেলে দিলাম। দুহাতে দুই আতা ফল। আবার উড়ছি। হাল্কা। শুধু বললাম, বাক্সো গুলান সব ফেলে দিলাম গো। তারপর হেডফোনে শুধু গালাগাল শুনলাম। তোকে মেরে ফেলে দেব শুনলাম। তারপর আমি মাইক কল ফেলে দিলাম। হেডফোন ফেলে দিলাম। দুইহাতে দুই আতা নিয়ে উড়তে থাকলাম। অনেক উপরে। মেঘের সঙ্গে লুটোপুটি খেলা খেললাম। হাডুডু কিতকিত খেলাম। আমার দুধসাগর গ্রামের উপর উঠে আতাফল ভেঙে গেল ক্ষীরজড়ানো আতা বিচি ছড়িয়ে দিলাম। মেঘকে বললাম, বৃষ্টি দিও। গাছ উঠবে। আতা গাছ। আমি থাকবনা, কিন্তু গাছ থাকবে। বুঁচি তোর জন্য। আমি অনেক উপর থেকে দেখলাম নারান বিশ্বাস আর তার লোকজন আমার দিকে মুঠি ছুড়ছে। খিস্তি ছুড়ছে। বন্দুক ও...। আমি তারপর উড়তে উড়তে এখানে এলাম। আমায় রাখবেন?

আমি পরীটিকে....পরী কেন, পরী কেন, টিডি। টিডি কেন, তারাদাস, তারাদাস নয়, গুয়েকে দেখতে থাকি। এলমনিয়াম জড়ানো পি.ভি.সি. পাখা। আমার ব্যবসায় মন্দা চলছে। একটা ক্যুরিয়ার সার্ভিসের ব্যবসা ফাঁদলে কেমন হয়।

আমি গুয়েকে বলি গুয়ে, তুই এবার আমার কাছে থাক। তোকে আমি ফ্যানের হাওয়ায় রাখব। ফ্রিজের জলে রাখব। ম্যাগি খাবি, বাবল গাম খাবি, হিম্যান দেখবি, ময়েশ্চারাইজারওলা সাবান, আরও ভিটামিন সমৃদ্ধ সাবান মাখবি। একটা কোল্ড ড্রিংক্স খাবি? কেক? দাঁড়া নিয়ে আসি। তার আগে এক কাজ কর। লক্ষ্মী মানিক আমার গুয়ে শোনা, তোর পাখাটা ঠিক আছে কিনা দেখি। একবার উড়ে যা। যা-যারেযা-পরী। রাস্তায় দেখ কত ফ্লুরোসেন্ট জ্বলছে। কত হ্যালোজেন জ্বলছে তুই কটা খুলে আন দেখি। দেখি কেমন কোয়ালিফ্যায়েড ক্যানডিডেট তুই। দাঁড়া, একটা কোল্ড ড্রিংক্স নিয়ে আসি, সোনালী স্ট্র। এই বলে নিচে যাই।

ছাতে ফিরে দেখি একী কাণ্ড। হতচ্ছাড়া গুয়ে একটা লোহার রড দিয়ে নিজের ডানাটা ফুটো ফুটো করে ফেলেছে। তারপর হাত ঘুরিয়ে ডানাটা ছিঁড়ছে। নৃসিংহ অবতারের মত যেন নখ। আমাকে দেখে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ও। খামচাচ্ছে যন্ত্রঘড়ি, কিলমারছে। কাঁচভেঙে হাতে ঢুকছে। নখ বেয়ে রক্ত ঝরছে। আমি বলি একী করছিস টিডি ও বলে আমি টিডি না, গুয়ে। শুধু গুয়ে। এই বলেই কাঁদতে থাকে। ভিখারী বালকের মত কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে বলে বুঁচি, তুই রুমালে গুয়ে নাম লিখে ডাক, আমাকে ডেকেনে।

অন্য একটা ডিশ-অ্যান্টেনা ঢেকে নিল চাঁদ।

শারদীয় পরিচয়, ১৯৯৬

লজ্জামুঠি

—এক যে আছে মেয়ে, তার নাম হ'ল গে সুচিত্রা। সুচিত্রা তখনো হয়নিকো, এক শিবরাত্তিরে সুচিত্রার মা গঙ্গামণি রাত জেগে দেখেছিল তিনটে বায়োস্কোপ—সাগরিকা, হারানো সুর আর শিল্পী। উরিস্মা, কী বই, চোখ ছলছল, বুক ঢলঢল। শেষ রাত্তিরে বাড়ি ফিরে, পেসাদ পেয়ে চোখ দুটো একটু বুজেছে কি বোজেনি, এমন সময় বাঘছাল পরা এইয়া বড় ত্রিশূল হাতে স্বয়ং মহাদেব অশোকনগর রিফিউজি কলোনির সূর্য সেন ব্লকের গঙ্গামণির ঐ টিনের বেড়ায় ত্রিশূল ঘষছেন আর খটখটাং শব্দ করছেন। গঙ্গামণি দেখে তো থ। চোখের পলক পড়ে না, মুখের রা কাড়ে না। সাত তাড়াতাড়ি পঞ্চপ্রদীপ আর একটা ধূপকাঠি দিয়ে ভজনা করে। মহাদেব বললেন—গুড়মুড়ি খাব। গঙ্গামণি কলাইকরা বাটিভরা গুড়মুড়ি দেয়। বাবা মহাদেব ভুড়ুক ঢেকুর তুলে বললেন—খুশি হ'লাম রে খুব। কী চাস বল। বর দোবো। গঙ্গামণি ফস করে বলে ফেলল—সুচিত্রা সেন! যেন সুচিত্রা সেনের মতো একটা মেয়ে হয় আমার। মহাদেব মিলিয়ে গেলেন।

দশমাস দশদিন পর কোল আলো করে একটি মেয়ে এল গঙ্গামণির। শাশুড়ি বুড়ি বললে—এঃ, মাইয়া? ধাই বললে—উলু দাও। কেউ দিলে না। দাই বললে—শাঁখ বাজাও, কেউ বাজালে না। গঙ্গামণির স্বামী বিড়িতে লম্বা টান মেরে দূরে আছাড় মেরে ছুঁড়ে ধানকলের কাজে চলে গেল। গঙ্গামণি তো কাউকেই বলেনি যে মহাদেবের বরে এই মেয়ে হয়েছে। বললে কি রক্ষা থাকত? বলতো—বেআক্কইল্যা বউ, পোলা না চাইয়া মাইয়া চাইছ?

গঙ্গামণি ওর মেয়ের নাম রাখে সুচিত্রা। দিন যায়, সুচিত্রা শশীকলার মতো দিনে দিনে বাড়ে। জন্মের সময় চুল ছিল পাতলা পাতলা, চুল আর ঘন হয় না। নাকটা ছিল বোঁচা। দিনের মধ্যে কতবার নাকের গোড়া টিপে দিত, তবু বোঁচাই রয়ে গেল। চোখ দুটো গোল গোল।

গঙ্গামণি মেয়ের খুব যত্ন করে। চুল আঁচড়ায়। উকুন বাছে, শিক্‌নি মোছে। নিজে না খেয়ে মেয়েকে খাওয়ায়। দুপুরে লাল আইস্‌কিরিম কিনে দেয়। মহাদেবের বরের মেয়ে বলে কথা।

কিছুদিন পর সুচিত্রার একটা ভাই হ'ল। ধাই বলল, শাঁখ বাজাও, উলু দাও। পাড়া প্রতিবেশী শাঁখ বাজাল, উলু দিল, হুলুস্থূল কাণ্ড হ'ল। বাপ করল কি, দিনদুপুরে মাল খেল, আর কোত্থেকে টাকা ধার করে মাছ কিনে মাছের মুড়োয় দড়ি সেঁধিয়ে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে বাড়ি এল। বছর ঘুরতেই আর এক ভাই। আনন্দের আর সীমা নাই। শাশুড়িবুড়ির ফোকলা মুখ পদ্মহাসিতে ভরে গেল। বুড়ি যেদিন মরল, সবাই বলল—সুখে মরেছে।

তারপর তো পিঠাপিঠি ভাই দুটো হুটোপাটি করে বড় হয়, প্লাস্টিকের চটি পরে হাঁটি হাঁটি করে। বড় ভাইটা যখন সবে হাঁটতে শিখেছে তখন একদিন হ'ল কি, সকালের খেজুর রস বন্ধুরা মিলে বিকেলে খাবে বলে বারান্দার কোণে ফেনা-ওঠা হাঁড়িটা

রেখেছিল সুচিত্রার বাপ, বড়ছেলেটা শট্ মেরে হাঁড়ি উল্টে দিয়েছিল, তাইতে বাপের বন্ধুরা ওর নাম রাখল চুনী। চুনী গোস্বামীর নাকি হেভি শট্। আর ছোটটা অটোমেটিক হয়ে গেল পান্না।

চুনী পান্না খায় আমের দু সাইড, বোন পায় আঁটিটা। কাঁঠাল কোয়া ভাল ভালটা ভাইরা খায়, বোন পায় দাগিটা। তিনজনকে মা একসঙ্গে খাইয়ে দিলে ডিমসিদ্ধর আধখানা চুনী, আধখানা পান্না, আর সুচিত্রার ভাতের গ্রাস একবার এ আধখানার গায়ে ছোঁয়, একবার ও আধখানার গায়ে ছোঁয়, হাবড়া হাটের লাল জামা গায়ে দু ভাই দিদির দু হাত ধরে স্কুলে যায়, বগলে লাল মলাটের বাল্যশিক্ষা, দিদির তখন কিশলয়।

ধানকল বন্ধ হ'ল, সুচিত্রার বাপ বেকার হ'ল। কত সব নতুন নিয়মের মেশিন বেরুচ্ছে, পুরনো নিয়মের মেশিনে পড়তা কম। দু দিন দ' হয়ে বাড়িতে বসে রইল সুচিত্রার বাপ, তারপর একদিন বলে বাণিজ্যে যাবে।

সুচিত্রার বাপ রোজ রোজ এগারটা দশের ট্রেনে বাণিজ্যে যায়। আড়তদারের থেকে চাল নেয়, চালের বস্তা নিয়ে ট্রেনে ওঠে। পুলিস-পেয়াদাকে ঘুস দিয়ে পাব্লিকের খিস্তি খেয়ে শহরে এনে চাল বেচে। একদিন হ'ল কি, ক'জন জিন্স পরা সওদাগর বনগাঁ বর্ডার থেকে ভিনদেশি কাপড়জামা আনছিল, ওদের সঙ্গে ট্রেনে মাল রাখা নিয়ে সুচিত্রার বাপের ঝগড়া লাগল, ওরা ধাক্কা মেরে ট্রেন থেকে ফেলে দিল সুচিত্রার বাপকে। ও বেচারা নুলো হয়ে ঘরে ফিরে এল।

বাপের ঐ অবস্থা দেখে চুনী পান্না বলল, মা, আমরা চায়ের দোকানে কাজ নেব। আমরা কাপ ধুতে পারি, গেলাস ধুতে পারি, তিরিশ পয়সা করে চার কাপ চায়ের দাম কষতে পারি। পাঁচ টাকার থেকে আশি পয়সা কাটিয়ে ফিরত কত বলতে পারি। ও কথা শুনে গঙ্গামণির চোখে জল এল। বলল, ও কথা বলিস নি। তোরা বই না দেখে ধনধান্যে পুষ্পে ভরা কইতে পারিস, হও ধরমেতে ধীর কইতে পারিস, ম্যাস্টর তোদের কত ভালবাসে, তোরা পড়। ম্যাট্রি পাশ দে। কালোব্যাগ নিয়ে কলকাতা যাবি। তোরা পড়। রোজগার আমিই দেখব। ঠোঙা বেচব।

সুচিত্রার ইস্কুল শেষ হ'ল। ঠোঙায় হাত লাগালে বরং সংসারের লাভ। ইস্কুলের খাতাগুলোর লেখাপাতায় ছটাকি ঠোঙা হ'ল, সাদা পাতা দু ভাই পেল। মায়ে-ঝিয়ে কাগজ কাটে, নুলোবাপে আঠা আঁটে, দু ভাই লিখাপড়ি করে, দু ভাই পরীক্ষা পাস দেয়, গঙ্গামণি ভাবে, আহা রে এট্টু ঘি, মাছের মুড়ো দিতি পারলি ছাওল দুটো ফাস্ হ'ত।

একদিন হাবড়া থেকে ঠোঙা বেচে ফিরছে গঙ্গামণি, ট্রেনের সিটে বসে অফিসার আর অফিসারনী কথা কইছে।

অফিসার। দ্যাখো দ্যাখো তিল ক্ষেত। ওগুলো তিল ফুল।

অফিসারনী। আহা চোখ জুড়িয়ে যায়। কতদিন একটু সবুজ দেখি না। একেবারেই বন্দি। যদি একটা মেয়েটেয়ে পেতাম, আদর করে রাখতাম।

অফিসার। তোমার মাসিকে বলে দেখো। এদিকে যদি একটা মেয়ে পাওয়া যায়...

অফিসারনী। তবে নিজের মেয়ের মতোই আদরে রাখি। মলিটা আর জলিটাকে ওর হাতে দিয়ে আমরা টোনাটুনি তাহলে একটু ঘুরে বেড়াই।

গঙ্গামণি তখন মাথার ঘোমটা টেনে বলে, আমার একটা মেয়ে আছে, বড় লক্ষ্মী,

নিবেন?

অফিসারনী অমনি বলে, হ্যা-হ্যা-হ্যা নেব, নেব...।

—ব্যাতন?

বেতনের জন্য চিন্তা নেই, আমরা দু জনে চাকরি করি। ঠিকানা দাও, ফেরার সময় দেখে যাব।

গঙ্গামণি বাড়ি ফিরে বড়ছেলেকে বলে তোর—তো অঙ্কে মাথা ভাল। ক' দেখি, ডেলি ডেলি আড়াই গুরুস হইলে মাসে কত?

—পচাত্তর।

—চাইর শনিবারের চাইর সিনেমা, উকুন বাছা, হাত-পা-ব্যথা, কাজে মন নাই,—পনের গুরুশ বাদ দে। কত থাকে?

—ষাইট।

—ছয় টাকা গুরুশ হইলে ষাইট গুরুশ কত?

—তিনশ ষাইট।

—গুরুশ প্রতি কাগজ আঠা চাইর টাকা খরচ। ষাইট গুরুশে কত খরচ?

—দুইশ চল্লিশ।

—তিনশ ষাইটের থন দুইশ চল্লিশ বাদ দিলে কত হয়?

—একুশ কুড়ি গ মা।

গঙ্গামণি হিসেব করে পায় সুচিত্রা মাসে একশ কুড়ি টাকার আয় দেয় এই সংসারে। খোরাকি আছে। খোরাকি ধরলে কিছুই থাকে না।

পরদিন বিকেল বেলা অফিসার আর অফিসারনী হাজির। বলে—কৈ গো, মেয়েটা দ্যাখাও।

গঙ্গামণি ঠোঁট কামড়াল। সত্যি সত্যিই চলে এল যে। গঙ্গামণি আসন পেতে বসতে দিল, নেবু নিংড়ে সরবৎ দিল। অফিসারনী সুচিত্রাকে দেখল। শুধোল—নাম কী? 'সুচিত্রা' নাম শুনে অফিসারনী হেসেই অস্থির। বলে সুচিত্রা ডাকতে পারব না বাপু। শুধু চিত্রা। বলল—কাজ কিছুই নেই। সংসার খুব ছোট। টুকটাক ফাইফরমাশ খাটবে, চিত্রমালা-চিত্রহার দেখবে, মেয়ের মতো থাকবে।

বাপ মায়ে চোখাচোখি। মেয়ের মাথা নিচু, মুখে রা নেই। গঙ্গামণি বলে—দেড়শো টাকা দিবেন, মনি অর্ডারে পাঠাবেন।

দেড়শো বড়ো বেশি হয়, একশো তিরিশ।

চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে চিত্রা চলল কলকাতা। দু ভাইকে বলল—ভাল করে পড়িস্, সব অঙ্ক রাইট করিস, সব বানান ঠিক করিস্। ফাস্ হলে চাকরানী দিদিকে চিঠিতে লিখিস্ খাতা লাগলে কাগজ কিনিস্ টিপিন বেলায় নজেন খাস্।

ঝাঁ চকচক ঘরের মেঝে, হাঁটতে গেলে পিছলে যায়। সাঁই সাঁই সাঁই গাড়ি ছুটছে, জানলা দিয়ে দেখা যায়। গ্যাসের উনুন ঠাণ্ডা আলমারি, বাড়িতে কর্তা-গিন্নী আর জলি মলি। জলি হ'ল তোতাটা, মলি হ'ল পুষিটা। কর্তা-গিন্নি অফিস যায়, চিত্রা তোতাকে ছোলা দেয়, কাঁচালঙ্কা খাওয়ায়, খাঁচা পরিষ্কার করে।

তোতা বলে, তুমি আমার সই।

চিত্রা বলে, আচ্ছা।

তোতা বলে, সই তোমার দেশ কোথায় ছিল?

হাবড়া অশোকনগর। তোমার?

আমার? ভুলে গেছি গো, শুধু একটা নীল পাহাড়, সবুজ ঝিল আর লাল বটফলের গাছ মনে পড়ে।

সুচিত্রা বাবুদের বিছানার চাদর টানটান করে, বই আলমারির ধুলো ঝাড়ে, ঠাণ্ডা আলমারি সাফসুফ করে, কুটনোটা কুটে দেয়, বাটনাটা বেটে দেয়। কত্তা গিন্নি দুজনাই খুব ভালবাসে। ফুটপাতের ফ্রক দিল, লাইফবয় সাবান দিল, শোয়ার জন্য শতরঞ্জি দিল। বলল, আমাদের ছেলেমেয়ে হয়নিকো তুই আমাদের ছেলে, তুই আমাদের মেয়ে।

গিন্নিমা একদিন বললেন, মা চিত্রা, তোর তো এখানে কাজ অনেক কম, কাজই নেই, দ্যাক না, পাশের বাড়ির রেবতীর কত কাজ, সংসারে সাতজনের কাজ, বলি কি ঠিকে ঝিটাকে ছাড়িয়ে দি। কটা আর বাসন, কটা আর ঘর। তোর মাইনে বাড়িয়ে দেব।

চিত্রা বলল, বেশ তো।

ঠিকে ঝি পেত পঞ্চাশ। চিত্রার কুড়ি টাকা বাড়ল। বাড়িতে চিঠি লিখল—মাগো, কুড়ি টাকা বেসি দিব চুনী পান্না যেন ফল খায়, বাবা যেন দুধ খায়।

তোতা বলল, কি গো সই, কেমন আছ?

চিত্রা বলল, সুখে আছি। তুমি?

তোতা বলল, সুখে আছি। বড় বড় লাল লাল লঙ্কা খাচ্ছি।

চিত্রা বলল, তোমার খাঁচাটা খুব সুন্দর গো।

তোতা বলল, হিংসে কোরো না সই। তোমারটা বুঝি খারাপ?

সূর্য ডোবে রাত পোহায়। দিন যায় মাস যায়। গিন্নীমা বলেছেন ভাল দেখে বিয়ে দিয়ে দেবে। গিন্নীমা বলেছেন, কী সুন্দর হয়ে গেছিস রে। কলের জলে চান করে তোর রঙ খুলে গেছে।

পুকুরে নায় পাপী তাপী গঙ্গা নায় চোর
কলের জলে চান করে তার বহু পুণ্যের জোর।

দেশে যেবার গেল বাবা বলল, কী সুন্দর হয়েছিস তুই। বাপ তখন খুব ভুগছে।

বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে এল চিত্রা।

তোতা শুধোলো, কীগো সই, মুখ শুকনো যে?

চিত্রা বলল, বাপ মরেছে।

তোতা চুকচুক শব্দ করল—আহা রে! কেমন করে গো?

রক্তবমি। আমার কোলে মাথা রেখে বাপ আমার সগ্‌গে গেলেন।

তোমার মা বুঝি বুড়ো বয়সে সুখে থাকার লোভে সব যত্ন ছেলেদের করেছে, বুড়োটা অযত্নে মরেছে?

ও কথা বোল না সই। শাখা ভেঙে কোরা কাপড়ে মার কী কান্না।

কাঁদবেই তো। সোয়ামি মরলে স্তিরি তো আধখানা।

সে কথাই তো মা কইছিল। মা কাগজ কাটতো বাবা আঠা সাঁটতো। এখন মা আধখানা। কী করে সংসার চলবে? একা একা ঠোঙা হয়? কী করে চুনী-পান্না দেবে ম্যাট্রি পাশ?

তোতা বলল, আহা গো, তোমার ছোট কাঁধে কত বোঝা।

সুচিত্রা একদিন গিন্নিমাকে বলল, মাগো, হারু ধোপা আপনাদের চাদর কাচে, কাপড় কাচে, কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা খরচ হয়। ওসব বরং আমিই কাচি। ঐ পয়সা আমাকে দিন। মা বললেন, বেশ তো, কিন্তু তুই কি অমন পরিষ্কার করে কাচতে পারবি? ও বলল, ঠিক পারব। মা বললেন—দেখি কেমন পারিস। চিত্রা মাকে লিখল—কুরি টাকা আরও বেশি দিব মাগো।

ছেলেটির নাম রতনকুমার। ফোলা ফোলা চুল, চোখে নীল রঙের চশমা, জেল্লামারা লাল গেঞ্জি। মাঝে মাঝে আসে ক'দিন ধরে। বাড়িতে ঢোকার আগে সিগারেটটা ফেলে দেয়। সন্ধেবেলায় বাজারটা করে দেয়, দোকান থেকে ওষুধটা এনে দেয়। কিছুক্ষণ টিভি দেখে। সুচিত্রা চা দেয়। আঙুলে আঙুল লাগে যেন ঝিরঝিরানি, শিরিষ পাতার শিরশিরানি চিত্রার গায়ে।

মা বলেছে রতন খুব ভাল ছেলে। বাবুর অফিসের বেয়ারা। পারমেন হলে সুচিত্রাকে ওর সঙ্গে বিয়ে দেবে।

রতনকুমার রতনকুমার ফুলেল জাদুমণি
অনেক গুণের গুণী
ফণীর মাথার মণি।

রতনকুমার পেরায় পেরায় বাবুকে বলে, স্যার কবে পারমেন হব? বাবু বলেন, দাঁড়া দাঁড়া, সবে তো ছ'দিনের ক্যাজুয়ালে ঢুকলি। এখন দু'চার বছর ডেইলি রেটে কর...।

চিত্রা, মানে সুচিত্রা সন্ধে হলে বারান্দার ধারে ঘুরঘুর করে। রতনকুমার না এলে ফ্যানের ঘোরায় মন খারাপের হাওয়া গুমরে মরে।

হ্যাঁরে তোতা, ও কবে পারমেন হবে?

তোতা খাঁচার ফাঁক দিয়ে আকাশের ফালি দেখল। চোখ পিট পিট করে বলল, জল এগোয় না, তৃষ্ণা এগোয়।

বুঝলাম না তোতা, বুঝিয়ে বল।

রাজহংসের চরণ দেখে বকের নেঙা পেঙা।

একদিন এক গরমের দিনের রোববার। গিন্নিমা মেঝেতে শোবেন। খাটের পিছনটা বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। ওখানে আঁচল বিছাতে গিয়ে গিন্নিমা পেলেন পোড়া সিগারেটের টুকরো। কপাল কুঁচকে উঠল গিন্নিমার। খুঁজতে লাগলেন আরও কিছু পান কিনা। পেলেন কি যেন। চিত্রাকে ডাকলেন। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, দ্যাক ঘরের কোণায় সিগারেট পোড়া। ও তো ছোঁয় না। ওঁর বন্ধুরা এলে বাইরের ঘরে বসে।

সুচিত্রা দু হাতে দরজার পর্দা চেপে ধরে।

এবার গিন্নিমার গলা চড়ে—সিগারেট কি করে এল?

জানি না মা।

সুচিত্রার চোখ ঘরের লাল মেঝের মাঝখানের কালো পদ্মটার দিকে। স্থির।

মা ওর চোখ থেকে পা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলোচ্ছেন। ঐ দৃষ্টির স্পর্শে সর্বাঙ্গ জ্বালা করতে থাকে সুচিত্রার। মার মুখ থেকে একটা আওয়াজ বের হল—হুম্‌!

মা নিয়ে এলেন লাল বাক্স। বাক্স খুললে কৌটোর মতো কি যেন। লম্বা তার জোড়া।

মেশিন। মা বললেন, মিক্‌সি। মশলা বাটা হবে, ঘোল হবে, শরবত হবে, চাটনি হবে। ছ্যাঁত করে উঠল সুচিত্রার অন্তর। ভিতরের কাগজের ইংরিজি কথা পড়ছিলেন মা। সুচিত্রা বলল, মেশিনেই সব করবে? তাহলে, আমি?

তোর কী ক্ষতি? তোর তো আরও ভাল হল। তোর বন্ধু হল, কাজের হেলপ হল।

মেশিনটাকে টেবিলে রাখলেন মা, গর্তের মধ্যে দই দিলেন, জল দিলেন, চিনি দিলেন, সুইচ টিপলেন—ঘড় ঘড় শব্দ। চোখের নিমেষেই ফেনা ফেনা ফেনা। এ-সব আমায় দেখাবি না ঢং-এর মেশিন, ঢং রাখ তুই, ধিঙ্গিপনা দেখাবি না।

মা বললেন, বেশ গুণের মেশিন। তোকেও দেখিয়ে দেব, শিখিয়ে দেব, কিন্তু আমরা না বললে চালাবি না।

মা অন্য কাজে গেলে একা একা মেশিনটাকে দ্যাখে সুচিত্রা। সুচিত্রা জিভ ভ্যাঙালো। মেশিনটাও জিভ ভ্যাঙালো। সুচিত্রা ঝাঁঝ গলায় বলল, ক্যানো এসেছিস? মেশিন বলল, ইঃ! তোর তাতে কী? সুচিত্রা বলল, তুই আমার সই না শত্তুর? মেশিন বলল, যা ভাববি তাই। সুচিত্রা বলল, তুই তবে আমার সই, আমার মিতা। আয় আমরা ফুল পাতাই। পদ্ম হবি, পদ্ম?

বাবু এলে দইয়ের ঘোল খান গরমের দিনে। চামচে নেড়ে সুচিত্রাই করত এতকাল। আজ মা করে দিলেন। মেশিনে। রান্নাঘর থেকে সুচিত্রা বাবুর 'বাঃ' শুনতে পেল। আর 'বাঃ' শব্দটা সুচিত্রার চোখের কোণায় জলের ফোঁটা হয়ে দুলতে লাগল। অমনি মেশিনটা খল্ খল্ হাসতে লাগল। সুচিত্রা বলল—এমন হিংসে ভাল নয় পদ্ম, ঘুঁটের মরণ দেখে গোবরের হাসি ভাল নয়। মেশিনটা ঢঙির মতো হাসল তবু। এমন সময় রতনকুমারের গলা শুনতে পেল সুচিত্রা।

রতন বলছে, ধোপাবাড়ি যেতে হবে নাকি?

মা বললেন, না।

বাজার?

না।

চানাচুর?

না।

ওষুধ?

না।

চিত্রমালা শুরু হয়ে গেছে। সুচিত্রা ও ঘরে যায় না। যেতে পারে না। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেশিনটার ধারালো রুপোলি দাঁত আঙুলে ঘোরায়।

একদিন এক রবিবারে প্রেশার কুকার ফোঁসফোঁসাচ্ছে, ওঘরে কত্তা-গিন্নির কথা হচ্ছে। গিন্নি বলেন, মানুষের চেয়ে মেশিন ভাল।

কত্তা বলেন, ওটা কবে আনব বল।

গিন্নি বলেন, ম্যাচিওর করবে এন. এস. সি.।

কত্তা বলেন, তারপরেতেই নি আসছি।

গিন্নি বলেন, রতন যেন আর না আসে।

কত্তা বলেন, দেখতে পাবে আসছে মাসে।

অমনি হিস্ হিস্ করে তুমুল শব্দে প্রেশার কুকার ধোঁয়া ছাড়ল, আর টপ্-টপ্ করে

দু ফোঁটা জল সুচিত্রার গালে কেন গড়াল সুচিত্রা জানে না।

সকালবেলা সুচিত্রা আবার দেখল মেশিনের কেরামতি। মুহূর্তে হয়ে গেল পুদিনার চাটনি, পোস্তবাটা। কত্তা বললেন, কী মোলায়েম। মেশিনটা খিল-খিল হেসে উঠল। গিন্নি বলেন, তোর তো ভালই হল বল, বাটতে হল না। মেশিনটা আরও জোরে হেসে উঠল। গিন্নিমা অফিস যাবার সময় বললেন, মেশিনটা মুছেটুছে রেখে দিস।

জল দিয়ে ঝাঁকিয়ে জারটা পরিষ্কার করে সুচিত্রা। শুকনো কাপড়ে মোছে খুব সাবধানে, যেন নখের দাগ না লাগে। কী চকচকে শরীরটা ওর। বড়লোকের মেয়ের মতো গা। মোলায়েম করে মমতায় মমতায় মোছে।

তোতা বলে, কীগো মিতে? তোমায় কে বলেছে সোহাগ দিতে?

সুচিত্রা বলে, আমার মন বলেছে।

ভাল ভাবলেই ভাল
কালো ভাবলেই কালো
মনের কাছে সব রয়েছে।

তাই নারে পদ্ম?

মিক্সি মেশিন উত্তর দেয় না।

সুচিত্রা জারের উপরে মুখ নেয়। শ্বাস নেয়। হাল্কা পুদিনাপাতার ঘ্রাণ।

সুচিত্রা বলে, শোন সই, তোরে মনের কথা কই। রতনের কথা বলবে বলবে ভাবে, কিন্তু বলে না। বলে—পদ্ম সই, পদ্ম সই, তুই আমাকে ভালবাসিস? তুই আমার কাজ কমাবি?

মিক্সি মেশিন কিছু বলে না।

আমার চেয়ে তোর কাজ ভাল, আমার নিন্দে, তোর প্রশংসা, তবু আমি তোকে হিংসে করি না। করতে নেই।

একবার একটু ঘোর তো দেখি, ঘোর। দেখি তোর ঢং। সোহাগী। সোহাগ চাঁদবদনী ধনি। সুচিত্রা প্লাগ গুঁজে দেয়। সুইচ অন করে। ঘোরে না। রাগ করলি পদ্ম সই? মেশিন ঘোরে না। আলোর সুইচ টিপে দেখে জ্বলে না। ওঃ তবে লোডশেডিং। সুচিত্রা মেশিনের গায়ে আঙুলের আঁকিবুকি কাটে। আঙুলের লেখা রতন! রতন! ঐ আঙুলটা দিয়েই মেশিনের রুপোলি দাঁতগুলি ঘোরায়। কী ধার।

রতন! রতন!

পদ্মরে পদ্ম পদ্ম সই! কোন সুখে তুই ফুটিসরে পদ্ম, তুই না সত্যের ফুল!

চলকে উঠল রক্ত। রক্তে মাখামাখি। চিৎকার করে উঠল সুচিত্রা। তুমুল চিৎকার করে উঠল। হঠাৎ ঘুরছে। মেশিন ঘুরছে। ভীষণ ঘুরছে। আঙুলের টুকরোটা লাফাচ্ছে, লাফাচ্ছে, ছিন্ন-ভিন্ন। ক্রমশ রক্ত-কাদা। জারের গায়ে লাল চন্দনের মতো লেগে রয়েছে রক্ত-কাদা। আঙুলের ডগাহীন হাতটা ঝাঁকাচ্ছে সুচিত্রা, দেওয়ালে ফুটে উঠছে রক্ত নক্‌শা। সুচিত্রা কাঁদছে, ফোঁপাচ্ছে। বিড়ালটা একটানা ডেকে চলেছে—মিউ-মিউ-মিউ।

ঢাই কুড়কুড় ঢাকের বাদ্যি, মাইকে গান। রদ্দুরে-রদ্দুরে নাচে জরির ঝালর। পুজো এল।

'অন্য বাড়ির হলে সেদিনই বিদেয় করে দিত, আমি বলেই পুজোয় আবার শাড়ি দিলাম।' মা বলেছিলেন। ছাপা শাড়িটার নতুন গন্ধ। ব্যান্ডেজ বাঁধা আঙুলে শাড়ি ঘুরোতে

কষ্ট। ব্যান্ডেজের ওষুধের গন্ধ নতুন শাড়ির গন্ধে মেশে। গিন্নিমার সঙ্গে একদিন বারোয়ারি পুজো দেখতে যায়। কিচ্ছু ভাল লাগে না। এত ভিড়েও মানুষ নাই, এত আলোয় অন্ধকার, এত শব্দেও নিঝুম। রতন আর আসে না।

দশমীর পরদিন হাসপাতালে যাবার তারিখ ছিল। পরতে পরতে খুলল আঙুলের ব্যান্ডেজ। নেই। আঙুলটার নখ নেই। নখের জায়গায় একটা দলামোচড়া এবড়ো-খেবড়ো মাংস-পুঁটুলি ব্যাঙের বাচ্চার মতো বসে আছে।

বিকেলে বাবু আঙুলটা দেখতে চাইলে সুচিত্রা ওর লজ্জামুঠি খোলে না। একা-একা খুলল, তখন ডুকরে ডুকরে কাঁদল। সেই দিনই সন্ধের সময় লোকেরা এসে কি একটা মেশিন দিয়ে গেল। ওরা বোঝাচ্ছিল, বলছিল দু মিনিটেই এক্কেবারে পরিষ্কার, সাফসুফ। সুচিত্রা বুঝল আবার কিছু একটা মেশিন। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। রাত্রে কত্তা গিন্নির কথা হল—মেশিন ভাল না মানুষ ভাল, মানুষ ভাল না মেশিন ভাল, মেশিন-মানুষ, মানুষ-মেশিন। মেশিন মেশিন মেশিন।

ক'দিন পরে রবিবার। মা নিজে হাতে ছোলা দিলেন পাখিকে। বাবু চা খাচ্ছিলেন। মা বললেন, কৈ গো, একবারটি এসো, মলিকে ছেড়ে দিচ্ছি।

তারপর সুচিত্রাকেও বলল—মা, বেড়ালটাকে বিদেয় দেব, তোকেও আর কাজ করতে হবে না এখানে। তোকেও ছেড়ে দেব। আমরা ঝাড়া হাত-পা হব।

ছিরিক ছিরিক রক্ত ছলকায়। সে কী কথা!

সুচিত্রার গা টলমল, চোখ ছলছল।

যারে তোতা উড়ে যা...

খাঁচার গায়ে চুমো দিয়ে দরজা খুলে দিলেন মা। তোতা হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে আবার খাঁচায় ঢুকে যায়।

বাবু তাকান মায়ের দিকে, মা তাকান বাবুর দিকে। তোতাটা কারুর দিকে তাকায় না, খাঁচায় ঢুকে চোখ বুজে বসে থাকে।

সকালের জলখাবারে একটা বড় রসগোল্লা পেল সুচিত্রা। পাওনা টাকা বুঝে পেল। মা বলেছে নিজে গিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে তুলে দিয়ে আসবে।

সুচিত্রা একা-একা এঘর-ওঘর করে। লাল সিমেন্টের কালো আল্পনার গায়ে হাত বুলোয় বাথরুমের কলের চাবি ঘুরায়। ছর ছর জলের শব্দ শোনে। তোতার কাছে যায়।

তোতা তুই বড্ড বোকা। ছাড়া পেলি, গেলি না। তোতা বলে—খাঁচার বাইরে আমার কিচ্ছু নাই। ডানায় আমার শক্তি নাই। কেমন করে ডানা নাড়ে, কেমন করে আকাশে ওড়ে—ভুলে গেছি। আমার অচিন দেশের অশথ ছায়ায় তুই যা।

সুচিত্রার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। রতন। রতন।

রতন এল। কতদিন পর। ঢাই কুড়কুড় বাদ্যি বাজে। রতন বলে, বিজয়ার পোনামটা করতে এলাম। মা প্লেটে করে মিষ্টি দিল। সুচিত্রা এক গ্লাস জল নিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। সুচিত্রার কাটা আঙুলের মাংস পুঁটুলি দেখে আঁতকে উঠল রতন। অন্য দিকে মুখ ফেরাল। ঐ গেলাসে জল খেল না। বোতল গড়িয়ে জল খেল। সুচিত্রার দিকে একটিবারও চাইল না। একটি কথাও কইল না। চলে যাওয়ার চটির শব্দ ঠাস্ ঠাস্ ঠাস্।

বালতি ব্যাগে শাড়িকাপড় গুছিয়ে চোখ মোছা ভেজা রুমালে টাকা কটা বেঁধে সুচিত্রা

তৈরি। বাবুকে প্রণাম করল। মা ঘাড়ে পাউডার ঢালছে।

লাল সিমেন্টের কালো আপ্পনাকে বলল—যাই। বারান্দার রেলিং, জলের কল, বেলুনচাকি, যাই। মিক্‌সি মেশিন, নতুন মেশিন, তোরা সুখে থাক, আমি যাই। যাইরে তোতা পাখি। তুই রইলি ডালে, আমি রইলাম জলে, দুইজনে দ্যাখা হবে মরণের কালে।

সন্ধে হয় হয়। কাকেরা ফিরছে, বকেরা ফিরছে। ধোঁয়ার গন্ধ, শাঁখের শব্দ—এ সময় বাড়ি ঢুকল সুচিত্রা। ঘরে গান হচ্ছে টেপ-রেকর্ডারে। ডিস্কো ড্যান্সার। ঘরে মা আর ছোট ভাই। মা ঠোঙা করছে। কী খুশি। মা বললেন, তোর কথাই ভাবছিলাম। কাল ভাইফোঁটা। গতবারেও আসিসনি। কদিন থাকবি?

ওসব কিছু বলে না সুচিত্রা। মুঠোর মধ্যে ভরে রাখে নষ্ট আঙুল। বলে, ভাইরা লেখাপড়ি করছে তো?

পান্নাটা পড়ছে যা হোক, চুনীটা পড়ে না আর। রোজগার করে। বর্ডারে যায়। এই তো টেপ-রেকট কিনেছে। ঐ যে, বেড়া লাগিয়েছে। পড়ালেখায় কি চাকরি হয়? কত এম.এ.বি.এ. ঘুরছে।

চুনী আসে রাত করে। ঠোঁটের উপর নতুন গোঁফের রেখা। চুল ফোলা ফোলা। গায়ে জেল্লামারা লাল গেঞ্জি।

একসঙ্গে ভায়ে বোনে খেতে দেয় মা। ও খায় না। লজ্জামুঠি খুলতে ওর ভয়। মেয়ে-সন্তানের খুঁত হয়ে থাকার লজ্জা। লজ্জা কতক্ষণ আর গোপনে থাকে? রাত্রে প্রতিপদের চাঁদ ডুবে গেলে নক্ষত্র ছড়ানো আকাশের তলায় পুকুরঘাটের ম্লান আলোয় মায়ে-ঝিয়ে কতক্ষণ কাঁদল। দিঘির জলে শালুক ফুল, শালুক ফুলে অন্ধকার। শালুক রে শালুক, এই নারীজন্ম তুই নে, তোর জন্ম আমায় দে।

পরদিন সকালে দূর্বা তুলে ধান সাজিয়ে চন্দন বেটে রেকাব সাজিয়েছে মা। চুনী পান্না দু ভাই বসেছে আসন পিঁড়ি। ওদের বড় তাড়াহুড়া। গ্যাঁড়া বাবলু স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবে। চুনীর সঙ্গে পান্নাও যাবে আজ কাজ শিখতে। ভায়ের কপালে যম দুয়ারে কাঁটা দিল সুচিত্রা। তারপর এগিয়ে দিল মিষ্টির থালা। চেঁচিয়ে উঠল চুনী—দিদি, তোর আঙুল? সুচিত্রা আঁচল চাপা দেয় মুখে। মুখ নিচু করে। মা তখন অল্প করে বলেছিল আঙুল নষ্ট হবার গল্প।

ক্রমশ কপাল কুঁচকে উঠছিল চুনীর, মুখে ফুটছিল বিরক্তি রেখা। মায়ের সব কথা শেষ হবার আগেই হাতের খাবার দূরে ঠেলে দিল চুনী, কী ফ্যাসাদ বাধালি, অ্যাঁ? কী রকম বেঁকে রয়েছে ঠোঁট।

সুচিত্রারও নিচু মুখটা, ভারি মুখটা, ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে জেগে ওঠে, যেন জলের অতল থেকে মাথা তুলল মনসা-বাহন। তাকাল সোজা। নির্বাক। নিশ্বাসে প্রশ্বাসে কত কী বলে। কোঁচকায় কপাল, আর গোটা নারী জন্মটাকে জ্বলন্ত অঙ্গার করে ছুঁড়ে মারে চোখের দৃষ্টিতে। থপ্‌ থপ্‌ পায়ে ঘর থেকে বার হয়, মেদিনী কেঁপে ওঠে, স্বর্গসভায় বেহুলার পদ-নূপুরের আর্ত-নিক্কন চরাচরে বাজে। পৃথিবী টলোমলো, দিঘির জলে টলোমলো শালুক ফুল। গা গুলিয়ে ওঠে সুচিত্রার। সত্যি সত্যি গা গুলোয়। পুকুর পাড়ে বসে পড়ে। বসে পড়ে একটা ফ্যাসাদ হয়ে যাওয়া গোটা নারী-জন্ম। সারা শরীর থেকে কী যেন দল পাকিয়ে উঠতে চায়। হড়-হড় করে বমি করে ফেলে। ঐ টক জল, ঐ ক্লেদ, শালুক পুকুরের দিকে বহে যায়। ঐ উদ্‌গার কেমন যেন অর্থবহ হয়ে ওঠে।

ঐ উদ্‌গীরণ, ঐ লাভাস্রোত, ধোঁয়া ওঠা ঘৃণাস্রোত পৃথিবীর মাটিতে বহে যায়। মাটি ফেটে যায়, দুভাগ হয়। মা ধরিত্রী বলে, আয়, কোলে আয়, শান্তি নে। সুচিত্রা তার লজ্জামুঠি খুলে ধরে। ময়ূর পাখনার মতো খুলে যায় হাত। বাতাস নাড়িয়ে তার তুমুল নিষেধ—যাব না, যাব না। কালো দিঘির জল বলে আয়, আয়, শান্তি নে। হাতের নিষেধে ওর যাব না যাব না।

লজ্জামুঠি খুলে গেছে। মাটির গায়ে ফুটে উঠছে চারটি নখের কঠিন আঁচড় চিহ্ন। আঁচড়ের সন্ত্রাস। মেয়েলি ভাষার ঐ ক্ষোভ চিত্রলিপি মাটিতেই পড়ে রইল। রতন জানল না, চুনী-পান্না না, জানল না বাপ পিতামহ পূর্বপুরুষ।

ইতিহাস কথা

জন-এর পৈতে হয়ে গেছে। খুব সুন্দর করে সিল্কের ধুতি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাতে ব্রহ্মচারীর দণ্ড, নেড়া মাথা। পুরোহিত বললেন এবার তোমায় 'বেগ' করতে হইবে। ভিক্ষা। প্রথমে তোমার মায়ের নিকট। গো টু মাদার। কও ভবতী ভিক্ষাং দেহি।

ছন্দা তার ছেলের কাছে এগিয়ে এসেছে। জন বলল ভোবটি ভিককাং ডেহি।

আত্মীয়স্বজনরা হই হই করে উঠল। বাচ্চারা তালি লাগাল। ছন্দা হাসল। জন-এর ভিক্ষের ঝোলায় একটা প্যাকেট ফেলে দিল ছন্দা। ওই প্যাকেটে আছে লারসেন টুবরোর শেয়ার। ডলারে কেনা। এবার অন্যান্য আত্মীয়দের পালা। জন-এর ভিক্ষের ঝোলায় পড়তে থাকল সোনার আংটি, সোনার বোতাম, ভি ডি ও গেম, কাজুর প্যাকেট...।

জন আসলে জাগরণ। জাগরণের জন্ম এখানেই হয়েছিল। অন্নপ্রাশনও এখানেই, এই কারবালা ট্যাংক লেন-এ। তখন নাম রাখা হয়েছিল জাগরণ। রাশি মিলিয়ে। কর্কট রাশি, আদ্যাক্ষর বর্গীয় জ। ও ন' মাসের মাথায় আমেরিকা চলে যায়। জাগরণ ওখানে হয়ে গেল জন। কিন্তু সুখবিলাস জনকে জগা বলেই ডাকেন। সুখবিলাস চক্রবর্তীর একমাত্র ছেলে প্রণবেশ, প্রণবেশের একমাত্র ছেলে জাগরণকে জন নয়, জগা বলেই জড়িয়ে ধরেন সুখবিলাস। দাদুনাতির সম্পর্কটা খুব মধুর। খ্রিসমাস নিউ ইয়ার্সে ছবিওলা কার্ড পাঠায় জন, জন্মদিনে, বিবাহবার্ষিকীতেও পাঠিয়েছিল গত বছর, কী পাজি। প্রতি শুক্রবার একটা টেলিফোন। গত মাসে ফোন পেয়ে সুখবিলাস বলেছিলেন এবার যখন কলকাতা আসবে, তোমায় পৈতে দিয়ে দেব জগা, দিন দেখেছি। বি রেডি।

প্রণবেশরা সপরিবারে উড়ে এসেছে শুধু জন-এর পৈতের জন্যই, এমন নয়। ওরা এমনিতেই বছরে দু'বছরে আসে। এবার মে মাসে সিডিউলই ছিল। এই সুযোগে পৈতের দিনটা ঠিক করে ফেলেছেন সুখবিলাস। এবার একটা এসি ও বসিয়ে নিয়েছেন। বৈশাখের গরম। ভেবেছিলেন জগা যদি মাথা মুণ্ডন করে, গরমে খুব কষ্ট হবে ওর, চাঁদি তেতে যাবে। তবে মস্তক মুণ্ডনের ব্যাপারে সুখবিলাস কোনও জোরাজুরি করবেন না ভেবেছিলেন। কিন্তু জগা নিজেই বলল নেড়া হবে। ওরা কেন যে ওকে জন জন করে, ও তো আসলে জগাই। জাগরণ। এসেই সুখবিলাসকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, দাদু, আমি বল্‌ড হব, কানে বোর করব। আসলে প্রণবেশ ওদেশে গিয়েও নিজের দেশকে ভোলেনি। নিজেদের ঐতিহ্যকে ভোলেনি। সেদিনও বাবা লোকনাথের মন্দিরের জন্য দুশো ডলার পাঠাল। কলকাতা এসে দক্ষিণেশ্বর যাবোই। ছন্দা, প্রণবেশের বউ, চুল ছোটই করুক আর ভ্রু প্লাক করুক, সন্তোষী মার ব্রত কিন্তু প্রত্যেক শুক্রবার শুক্রবার করে যাচ্ছে।

জন জল খাবে। প্রভাময়ী এগিয়ে এলেন। হাতে পেপসির বোতল। আজ পৈতের নেমন্তন্নে কোকোকোলা-পেপসি-লিমকার ছড়াছড়ি। জন বলে ওসব নয়, জল। তখন প্রভাময়ী মিনারেল ওয়াটারের বোতল নিয়ে এলেন। কাকে যেন বললেন চাবি নিয়ে

আয়, বোতলের চাবি নিয়ে আয়। বুমবুম বুমার চর্বনরত একটি বছর দশের ছেলে বলল দিদা, এটায় চাবি লাগে না। বলেই প্রভাময়ীর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে একটা মোচড় দিল। কটকট করে শব্দ হল। প্রভা বলল দাঁড়া জগা, গেলাস আনি, জগা বলল নো নিড অফ বলেই বোতলের মুখে ঠোঁট লাগিয়ে তিন-চার ঢোক জল খেল। প্রভাময়ী ঐ জল খাওয়া দেখলেন। ভাবলেন কী ছিরির জল খাওয়া রে, একটু আলগা খেলে হত না? আর কেউ খেতে পারত, চোদ্দো টাকা দাম।

পুরোহিতমশাই বললেন এবারে আহ্নিক করতে হইবে। তোমারে কী ডাকি? জন না জগা? প্রভাময়ী বললেন কেন জাগরণ ডাকুন ঠাকুরমশাই ; ঠাকুরমশাই বললেন, ঠিকই তো। রাইট কথা। জাগরণ। বাবা জাগরণ, এখন মধ্যাহ্নকালীন সন্ধ্যা। সন্ধ্যা ত্রিকাল ব্যাপিনী। এই বইখান লও। সামবেদীয় সন্ধ্যা বিধি। শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণের লেখা। এই শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ ছিলেন তোমার মায়ের পিতামহ। তুমি জানবা কী কইরা। সন্ধ্যা তিনবার। রাত্রির শেষ এক দণ্ড এবং দিনের প্রথম সন্ধিতে প্রাতঃ সন্ধ্যা, পূর্হাহ্ন আর অপরাহ্নের মিলনকালে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, দিনের শেষ এক দণ্ড এবং রাত্রির এক দণ্ডের মধ্যে সায়সংসন্ধ্যা। সব সেপারেট সেপারেট মন্ত্র। এই আমি লিখ্যা দিতাছি বইয়ের উপর। মরনিং মন্ত্র, ডে মন্ত্র, ইভিনিং মন্ত্র।

জাগরণ বুঝতে পারছিল না ও কী বলবে। ওর সামনে বই খুলে পৈতে দিয়েছেন ঠাকুরমশাই। প্রভাময়ী বলেছেন—ইনিই তোমার গুরু। পৈতে গুরু। বই খোলা। হলদে হয়ে যাওয়া বইয়ের পাতায় কালো কালো অক্ষর। ওখানে পৈতেয় পাওয়া পার্কার কলম দিয়ে দাদু কিংবা পৈতে-গুরু লিখে দিয়েছেন Morning এই ইংরিজিটুকুই পড়তে পারছে জাগরণ। জাগরণ বলল দাদু, আমি যে বাংলা পড়তে পারি না।

পুরোহিতমশাই বললেন ও, সিটাও তো সত্য কথা। তুমি তাইলে মুখস্ত কইরা নিও। আসলে বেদ তো শ্রুতি, বংশানুক্রমে শুইন্যা শুইন্যা সব মুখস্থ থাকত। আস জাগরণ, অ্যাচমন কর। এই পাত্রে জল নাও, কও—আপঃ পুনস্তিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণু ঋষির নুষ্টুপ ছন্দঃ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। জাগরণ হা করে চেয়ে থাকল। পুরোহিত মশাই, এবার আস্তে আস্তে বললেন আপঃ পুনস্তিতি মন্ত্রস্য...। জন বলল—অ্যাপো পুনষ্টিম্যান...প্রণবেশের হাতে ভিডিও। ছবি তুলছে। জাগরণ বলল অ্যাপোদেবতা আচমনে ভিগো। ছন্দা বলল ভেরী গুড। পুরোহিত মশাই বললেন নেক্‌সট্ বল—ওঁ আপঃ পুনস্তু পৃথিবী পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম। জাগরণ বলল, ওনলি মাম ইজ ওকে, বাট অল অ্যাদার থিংকস্...প্রণবেশ ভিডিও ক্যামেরাটা থেকে চোখ উঠিয়ে বলল আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ জন, বাট ট্রাই। ইট ইজ আওয়ার হেরিটেজ। আমিও করেছি। জনও করল। আচমনের সময় এই জল মুখে দিতে হয়, সেটা করল না। গঙ্গার জলে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে। ছন্দা বলেছিল এই জল মুখে দিস না। ছন্দা মিনারেল ওয়াটারের বোতলটা এগিয়ে দিল। পুরোহিত একবার কী যেন ভাবলেন, একটু ইতস্তত করলেন, তারপর কেমন একটা লজ্জা-লজ্জা ভাব করে তাম্রপাত্রে বিসলারি ঢেলে ফেললেন, এবং বললেন জল শুদ্ধির মন্ত্র পড়—গঙ্গেচ যমুনেশ্চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেস্মিন সন্নিধিং কুরু। তারপর বললেন, নাও এই পবিত্র জল হাতে নিয়া মন্ত্র পড়...।

জাগরণের ছবি উঠছে। ওর বাবা প্রণবেশের ভি ডি ও ছাড়াও ছবি তুলছে তোতন,

রিচিক, শ্যামলিমা, এ সি চালিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘরটায়, হাল্কা ঘটর ঘটর শব্দ, পাশের ঘরে রেডিওতে এফ এম টক শো চলছে, 'এইচ এমভি এফ এম মোনালিসা' ফোন করে বলল—মাই কাজিন-ব্রাদার জন ইজ গেটিং পইতে টুডে। ডু ইউ গট দি পইতে? দি থ্রেড, হোলি থ্রেড... রেডিওর ও পাশ থেকে ভেসে এল, ইয়া ইয়া, আন্ডারস্টুড, জন, ইওর ব্রাদার ইজ এ ব্রামহিন? ইয়া ইয়া। উইশ হ্যাপি পৈতে, আই মিন উ-প-না-য়া-না... ওকে? থ্যাংকিউ। মোনালিসা থ্রিল্ড। ও ঝাপাং করে এ ঘরে এসে টু ইন ওয়ান চালিয়ে দিল, মোনালিসা পুরো ব্যাপারটা টেপ করে রেখেছিল। তখন গায়ত্রী হচ্ছে। ওঁ ভূঃ ভূর্বস্বঃ...জাগরণ চোখ বুজে আছে। টু ইন ওয়ানের টেপ্ শুনল—ওকে ওকে থ্যাংকিউ। জাগরণ বলল হয়ে গেছে। পুরোহিতমশাইও বললেন উকে উকে থ্যাংকিউ।

মোনালিসা বলল—কী জন, কী রকম সারপ্রাইজ? জন হাসল। ও বুঝতে পারছিল না এরকম অবস্থায় ওর কতটা আনন্দিত হওয়া উচিত? ও বুঝতে পারছিল না—মোনালিসা যখন ওই রেকর্ডিংটা আনল, গায়ত্রীর সময় বাজিয়ে দিল, ডিসটার্ব করল, তখন ওকে কেউ কিছু বলল না কেন? কেউ বকল না কেন। মোনালিসা জাগরণের মাথায় একবার হাত বুলিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। পুরোহিত মশাই ছন্দাকে একটু ইশারায় ডাকলেন। এই অবস্থায় কানের কাছে মুখ নিয়ে এই সমস্যাটি জানানোর কথা, কিন্তু পারফিউম মাখা, চুল ছাঁটা, কানে মুক্তো ঝালর ঝোলা মহিলাটির কানের কাছাকাছি মুখ রাখতে হয়তো ভয় ডর লাগল, নাকি সম্ভ্রম, তাই সবাই শুনতে পেল—বউমা, বয়স্থা মেয়েটেয়েদের স্পর্শ করা বিধেয় নয়, অন্তত এই তিনদিন। কার অশুচি অবস্থা চলতাছে তা তো কওন যায় না...। ছন্দা একটু হাসল, হাসির সময় প্রণবেশের দিকে চাইল, তখন আরও মিষ্টি করে হাসল ছন্দা। এমন সময় শ্যামলিমা এল। ওর হাতে ওডিকোলন মাখানো টিস্যু পেপার। তুমি খুব টায়ার্ড জনদা, মুখটা মুছিয়ে দি। জাগরণ বোধহয় ভাবল এবার ওর কী করা উচিত। ওর মায়ের দিকে তাকাল। ছন্দার মুখে তখনও হাসি লেগে আছে। শ্যামলিমা এসে মুখ মুছিয়ে গেল। পুরোহিত অন্যদিকে চেয়েছিল।

জনের খুব মুশকিল হয়। কে দিদি, কে পিসি, বুঝতে পারে না। ও হয়তো ডাকলো দাদা, কাম হিয়ার। বাবুলদা বলল আমি তোমার দাদা হই না, আমি তোমার আংক্‌ল। বাবু আংক্‌ল। বয়েস জাজ করে রিলেশন বোঝা যায় না। জন একবার ঘরের লোকজনের দিকে তাকাল। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ও কী করে তাই দেখছে। ও যা করে তাতেই ওরা হাতাতলি দিচ্ছে। উচ্চারণে ভুল হলেও হাতাতালি দিচ্ছে, ঠিক হলেও। যেন ও খাঁচায়, চিড়িয়াখানায়। ওই যে মোনালিসা, শ্যামলিমা, বাবু আংকেল ওরা নাকি অনেক দূর সম্পর্কের। ওরাই বেশি কথা বলে জনের সঙ্গে, বেশি ভাব করতে চায়। ওরা সব ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে। ওরা বব ডিলান শোনে, স্টিং শোনে, গানস অ্যান্ড রোজেস শোনে।

নাড়ুমামা ভিক্ষের ঝুলিতে ফেলে দিলেন দুটো কোডাক গোল্ড। বললেন ছবিটবি ওঠাস। এবার নাড়ুমামা একটা ছবি তুলবেন সবাইকে নিয়ে মোনালিসা, শ্যামলিমা, বাবু সবাই এসে গেল। দুই বোন দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝর্ণা আর পর্ণা। ওরা আসছে না। নাড়ু মামা হাতছানি দিল, তখন ওই দুই বোন এই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ওরাই জনের সবচেয়ে কাছের বোন। সুখবিলাসের ছোট ভাই পুষ্পবিলাসের ছেলের ঘরের মেয়ে। ওরা বাংলা মিডিয়ামে পড়ে। জন বলল ওই ঝর্না পর্ণাকেও ডেকে দাও। মোনালিসা বলল ওই মেয়ে দুটো কেবল পালিয়ে পালিয়ে থাকে, লজ্জা, ওরা আসবে না। এই সময়ে প্রভাময়ীও ঢুকে গেলেন। জন-এর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন সব্বাই বল চী-ই-জ। সব্বাই বলল চী-ই-জ। ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল।

ঝর্না আর পর্ণা চীইজ, শব্দটা শুনেছিল। ওরা সকালবেলায় এসেছে। ওরা থাকে বেলঘরিয়ার যতীনদাস নগরে। ওদের মা রান্নাঘরে কাজ করছে এখন। ওদের বাবা বাজার করছে। ওদের দাদুর শরীর খারাপ। বাড়িতেই আছে। ঠাকুমাও বাড়িতে। ওদের ভাল লাগছিল না। ঝর্না আর পর্ণা ছাতে গেল। ছাতের সিঁড়িতে ঝর্না পর্ণাকে বলল বলতো চী-ই-জ। পর্ণা বলল চীইজ। ঝর্না বলল চীজ বললে মুখটা হাসি হাসি হয়। চীজ, চীজ চীজ চীজ চী-ই-ইজ...। ঝর্না আর পর্ণা ছাতে ঘুরতে লাগল। এমন সময় শুনতে পেল কান্নার আওয়াজ। ছাতের মাঝখানে রেলিং। রেলিং থেকে ঝুঁকে ঝর্ণা আর পর্ণা দেখল একতলার চাতালে একটা লোক ওদের বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। ঝর্না আর পর্ণা নীচে নেমে আসে। এসে দেখল লোকটার পরনে জিন্স-এর প্যান্ট, গায়ে খুব ভাল গেঞ্জি, হাতে ক্যালকুলেটার লাগানো ঘড়ি, কাঁচাপাকা চুল, হাউ হাউ করে কাঁদছে আর বলছে মাখন, মাখইন্যারে আমার বুকে তর মাথাখান আর একবার রাখ। ঝর্না পর্ণার বাবার চোখেও জল। ঝর্না পর্ণার বাবাকে 'মাখন' নামে কেউ আর ডাকে না ওদের দাদু-ঠাকুমা ছাড়া। ওই লোকটা মাখন ডাকছে, আর বাবা কাঁদছে। বাবা ঝর্ণাকে বলল কোথায় ছিলি তোরা? এই যে আমার দুই জন। লোকটা হাত বাড়াল। ঝর্না ক্লাস এইটে পড়ে। কোলে তুলে নেয় যদি? এ মা? লোকটা ঝর্নাকে কাছে টেনে নিল। বলল আমি তোর কে জানস? জ্যাঠা হই, জ্যাঠা। আমি তোর নিজের লোক, কিন্তু কোনওদিন দেখি নাই।

ইতিমধ্যে প্রভাময়ী, সুখবিলাস অনেকেই জড়ো হয়ে গেছে। ওই জিন্স পরা লোকটা কীরকম করছে। একবার একে প্রণাম, একবার ওকে প্রণাম, একবার ওকে জড়িয়ে ধরছে, একবার তাকে। সুখবিলাস বলল তুই যে আসবি আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। চল ভিতরে চল। নাতির ঘরে চল। এইসব কান্নাকাটি আর আবেগ বিহ্বলতা এ সি রুমের এয়ারটাইট কাচের দরজার ও পাশে যায়নি এতক্ষণ। সুখবিলাস দরজা ঠেললেন। বললেন জগা, দেখো কে এসেছে। এ তোমার ভেরি ভেরি নিয়ার রিলেটিভ। তোমার জ্যাঠা।

জগা বলল ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

লোকটা জনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। জনের এক হাতে সামবেদীয় ত্রিসন্ধ্যা পদ্ধতি, অন্য হাতে স্টার ডাইজেস্ট, মোনালিসা দিয়েছে, কী করবে জন? লোকটার দু'হাত পাখির ডানার মতো মেলাই রয়েছে।

জন স্টার ডাইজেস্টটা রেখে দিল। দণ্ডটা নিল। ব্রহ্মচারীর দণ্ড। তারপর বলল ভবান ভিককাং ডেহি।

লোকটা এবার জনকে জড়িয়ে ধরল। বলল দিমু, দিমু, তার আগে তোরে জড়াইয়া ধইরা একটু কাইন্দা লই। বলেই জনকে জড়িয়ে ধরল। মাথায় হাত বুলোতে লাগল। জনের নেড়া মাথায় খুব অস্বস্তি হচ্ছিল, জন হাত সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। লোকটা বলছিল আমরা সব এক রক্ত, এক বংশ, কেউ কাউকে চিনি না।

প্রণবেশ, ছন্দা, সবাই এসে গেছে এই ঘরে। ছন্দা খুব অবাক। ভ্রূ কুঁচকে প্রণবেশের দিকে তাকাল। প্রণবেশ বলল আমাদের জ্যাঠতুতো ভাই। বাংলাদেশ থাকে।

লোকটা জনকে ছেড়ে এ ধারে ঘুরে দাঁড়াল। সামনে প্রণবেশ আর ছন্দা। লোকটা বলল আমি মন্টু।

সুখবিলাস বলল আমার দাদা হরবিলাস দেশেই রয়ে গিয়েছিল। জগার পৈতায় আমি আবার সব আত্মীয়স্বজনরে চিঠি দিছিলাম। বাংলা দ্যাশেও দিছিলাম, কিন্তু মন্টু যে আসবে আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। মন্টু হাসল।

সুখবিলাস জিজ্ঞাসা করল কী ভাবে আইলি রে মন্টু?

মন্টু ওর ব্যাগের হাতলের দিকে আঙুলটা দেখিয়ে দিল। ওখানে বাংলাদেশ বিমান লেখা একটা কাগজ আটকানো!

বাড়ি চিনলি ক্যামনে? এই বাড়িতে তো আসস্ নাই কোনও দিন।

রক্তের টানে আইয়া গেছি বড়কাকু, ঠিকানাতো দিছিলেন।

মোনালিসা হাসছে। বাড়িতে বাঙাল ভাষা হয় না আর। মোনালিসা জনকে ইংরিজিতে বোঝাতে যাচ্ছিল এটাও এক ধরনের বাংলা। জন বলল আমি জানি, আমি জানি, আমার বাংলাদেশী ফ্রেন্ডস অনেক আছে। প্রভাময়ী বললেন হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম নাও মন্টু, ধকল গেছে।

মন্টু বলল ধকল কিচ্ছু নাই, অ্যারোপ্লেনে ফর্টি ফাইব মিনিটস, আর ট্যাক্সিতে আধা ঘণ্টা। আমারে তুমি নয়, তুই কইবেন।

প্রভাময়ী বললেন দেশ ছাইড়া যখন আসি, তখন তোর বয়স ছয়, তোরে কোলে নিয়া খুব কাঁদলাম। আর আমার পানু তখন দুই বছরের। তোরে কোলে নিয়া, আদর করতেছি দেইখ্যা পানুর কী চিৎকার।

প্রণবেশ হাসছে।

প্রণবেশ বলল তাহলে আপনাকে মন্টুদা ডাকব, তাই তো!

মন্টু বলল আপনি ক্যান? তুই।

মন্টু প্রণবেশের পাশে বসল।

প্রণবেশ বলল পার্টিশনের পর এই প্রথম?

মন্টু বলল হ্যাঁ।

এবার অনেকক্ষণ কোনও কথা নেই। কেবল এয়ার কন্ডিশনারের গোঁ-গোঁ।

সুখবিলাস বলল ক'দিন থাকবি ঠিক করছস?

মন্টু কোনও কথা না বলে হাসল শুধু।

দাদা হঠাৎ চইল্যা গেল গিয়া...

স্ট্রোক। হাসপাতালে নিতে নিতেই শ্যাষ।

আসছস্ যখন গয়ায় গিয়া পিণ্ড দিয়া দিস্।

মন্টু মাথা নিচু করে রইল।

জমি-জমায় চাষবাস হয়তো ঠিক মতো?

বহুত নষ্ট হইয়া গেছে গিয়া।

এই জমিজমার ব্যাপারটা একটা অপ্রিয় বিষয়। দেশভাগের চার বছর পর একবার, দশ বছর পর একবার সুখবিলাস ওদেশে গিয়েছিলেন ওঁর বংশের জমিজমা কিছু বিক্রি

করার চেষ্টায়। হরবিলাস বাধা দিয়েছেন। এ নিয়ে হরবিলাসের সঙ্গে বাকি দু' ভাইয়ের মন কষাকষিও হয়েছে। হরবিলাসের প্রধান যুক্তি ছিল বাড়িতে গৃহদেবী মাতঙ্গী ঠাকুরানী আছে। মাতঙ্গী পূজার জন্য খরচ আছে। নিত্য ভোগ হয়। সেই খরচা কে দেবে? সুতরাং বিক্রি করা চলবে না। তারপর তো পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের পর—ওইসব জমিজমা শত্রু সম্পত্তি হয়ে গেল। তবুও সুখবিলাস শুনেছিল শত্রু সম্পত্তি হলেও হরবিলাসরা ওই জমির উপর অধিকার রেখেছে। চাষবাস করে।

সুখবিলাস বলল ডিপ টিউকল বসাইছস নি একখান?

বসাইছি।

বাড়িখানা দোতলা করছস নি?

করছি।

তার ছোট ভাই কী করে?

দুবাই থাকে। দুবাই।

ছোট ভাইয়ের বিয়া দিছস নি?

দিছি।

পোলাপান?

দুইটা।

তুই আর বিয়া করলি না?

মন্টুর মাথা নিচু।

প্রণবেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে। 'তুই আর' শব্দটা নিয়ে ভাবছে। ওকি তবে একবার বিয়ে করেছিল? তারপর? কিচ্ছু জানে না প্রণবেশ। প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করল ফার্স্ট ম্যারেজটা কী হল?

মন্টু বলল তিন বছরের মধ্যেই ইন্তেকাল।

ইস্যু?

হয় নাই।

জন বেশ অবাক হয়ে ওদের দেখছে। দেখছে তিনটে আলাদা আলাদা নেশনের লোকজন, ওরা আমেরিকান, দাদু-দিদা ইন্ডিয়ান, জেঠু বাংলাদেশী, ওরা সবাই একসঙ্গে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল।

ছোট ভাইয়ের বউটা যত্ন-টত্ন করে তো? প্রভাময়ী বললেন। মন্টুর মুখ নিচু।

দিদি তো সিঁথির সিঁদুর নিয়ে সঙ্গে গেলেন—দিদির নামে ঢাকেশ্বরীর মন্দিরে পাথর টাথর কিছু বসাইলে ভাল হইত।

মন্টুর মুখ নিচু।

আবার অনেকক্ষণ কেবল ঠাণ্ডা মেশিনের গোঁ-গোঁ।

মন্টু হঠাৎ মুখ তুলল। সবার দিকে তাকাল। বলল সমস্ত কুশলবার্তা নেয়া শেষ!

সুখবিলাস আর প্রভাময়ী মুখ চাওয়া চাওয়ি? করে। ছন্দা আর প্রণবেশও।

নো মোর কেয়েশ্চেন?

কেউ কথা বলে না কিছু।

আপনাদের চোদ্দো পুরুষের ভিটার চোদ্দো পুরুষের গৃহদেবীর কথা মনেও আসল না একবার? একবারও মনে হয় নাই মাতঙ্গী ঠাকুরানী কেমন আছেন? তার পূজা হয়

কি না? তার ভোগ হয় কি না, পূজা করে কে? ওই মাতঙ্গী কি আমার একার? এটা তো সকলের নাকি? মিথ্যা কইলাম? কন? অ্যাম আই রং?

সুখবিলাস বললেন, ক্যান? মাতঙ্গীর নামে তো জমি ছিল। আমরাও শেয়ার পাই নাই মাতঙ্গীর পূজার ইয়েতে...।

সুখবিলাস বোধহয় 'অজুহাত' শব্দটা বলতে চেয়েছিলেন।

মন্টু বলল শুধু কি জমি হইলেই হয়? আর কিছু লাগে না? যাক গিয়া। ছাড়ান দাও। জনের দিকে তাকিয়ে বলল বলো তোমার পৈতা কেমন লাগতাছে? হাউ ডু ইউ ফিল ইট?

জন বলল ফ্যান্টাস্টিক। ভেরি থ্রিলিং। একটা কানে ফুটো করা হয়েছিল, নাপিত নয়, বিউটি পার্লার, সেই কানের ফুটোয় হাত দিয়ে জন বলল এখানে রিং লাগাব।

মোনালিসা বলল পাংক, পাংক হবে। মন্টু বলল ভেরি গুড। তারপর ওর ব্যাগটা খুলল। ব্যাগ থেকে একটা বাক্স বের করল। রঙিন কাগজে মোড়া। জুতোর বাক্সের মতো সাইজ! বাক্সটা দু' হাতে ওঠাল মন্টু। একবার কপালে ঠেকাল। তারপর বলল জাগরণ, নাও, তোমার উপনয়নের প্রেজেন্টেশন। জন ভবান বিককাং ডেহি বলে ওই বাক্সটা নিল।

তারপর ব্যাগের জিপটা টানার দুটো তীব্র শব্দ। ব্যাগটা বন্ধ করল মন্টু। বলল চলি। অপরাধ নিয়েন না। মন্টুর চোখে জল।

সুখবিলাস আর প্রভাময়ী একসঙ্গে বলে উঠলেন, সে কী কথা? কোথায় যাবি? পাগল হলি নাকি?

মন্টু কোনও কথা বলল না ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সুখবিলাস বলল দাদাও ছিল গোঁয়ার। মাতঙ্গীর কথা মন্টুই ওঠাল। আমি জমি-জমার কথা তুলতামই না। জমিজমা-নারকেল বাগান সুপারী বাগানের কথা ভুলে গেছি আমি। ফরগটেন। ট্যাক্সির দরজা বন্ধ হবার শব্দও শুনল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি পাওয়া গেল, নাকি ট্যাক্সি এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল?

জন ভীষণ অবাক। ও এইসব ব্যাপার স্যাপার কিছুই বুঝতে পারছিল না। দাঙ্গা জানে না— দেশ ভাগ জানে না—মহামারী জানে না। ও বুঝতে পারছিল সিরিয়াস কিছু ব্যাপার ঘটে গেল। জন প্রেজেন্টেশনের প্যাকেটটা দেখল। হাতে নিল। কী আছে? কোন গেম্? গেম্ এত ভারী হবে কেন? ভিডিও ক্যামেরা? ও রঙিন কাগজটা খুলে ফেলল। একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স। বাক্সটা খুলে ফেলল। একটা মূর্তি। কিউরিও। আর একটা সাদা খাম।

এ যে আমাদের মাতঙ্গী গো, মাতঙ্গী ঠাকুরাণী.........চেঁচিয়ে উঠলেন সুখবিলাস। দু'হাত জোড়া হয়ে গেল। প্রভাময়ী উপুড় হয়ে পড়লেন, মা, মাগো, মা.......।

সুখবিলাস প্রণবেশ আর ছন্দাকে বললেন প্রণাম কর, প্রণাম কর। আমাদের ফ্যামিলির......।

প্রণবেশ দু'হাত জোড়া করল। ছন্দা প্রভাময়ীর মতোই। জন অবাক হয়ে দেখতে লাগল এ কেমন কিউরিও। মন্টু, মন্টু রে, তুই এ কী সর্বনাশ করে গেলি........প্রভাময়ী বলে ওঠেন।

জন ওই কিউরিওটার দিকে দ্যাখে। ব্রোনজ্? কিন্তু ওরা এরকম করছে কেন? জন

আস্তে আস্তে বলল হোয়াই সর্বনাশ দাদু?

সুখবিলাস বললেন তুই বুঝবি না জগা, এই মাতঙ্গী, আমাদের পূর্বপুরুষ কামাক্ষ্যা থেকে এই বিগ্রহ এনেছিলেন, খুবই জাগ্রত, বলি হত, পুজো হত রোজ। পুজোর এদিক ওদিক হলে অকল্যাণ হত। এখন এটা লইয়া আমি কী করি, কী করমু কী করমু রে.....।

জন কী বলবে, কী বলতে পারে ও। একবার বোধহয় বলল রেখে দাও।

সুখবিলাস বলল বড় পিতলের সিংহাসনে থাকতেন আমাদের মাতঙ্গী। ঠাকুরদালানে। ঠাকুরদালানে ছিল ঝাড়বাতি। আমরা ইস্কুলে যাবার সময় প্রণাম করে যেতাম। কাজে কর্মে যাবার সময় প্রণাম করে যেতাম, নতুন বউ প্রথমে মাতঙ্গী প্রণাম করে ঘরে ঢুকত। ওঁ শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়ানং রত্ন সিংহাসনস্থিতাং...এই তো মনে আছে, মাতঙ্গী মার ধ্যানমন্ত্র, কত দিন পরে, ইশ্, কত দিন পরে....।

জন প্রথমে ভেবেছিল একটা কিউরিও প্রেজেন্ট করে গেছেন জেঠু। পরে বুঝল এটা ফ্যামিলি ডাইটি। সাদা খামও রয়েছে, চেক টেক হতে পারে। খামটা খুলল। দেখল বাংলায় লেখা কাগজ। বাংলা পড়তে পারে না জন। জন ওর বাবাকে কাগজটা দিল।

প্রণবেশ বলল একটা চিঠি। শ্রীচরণেষু বড়কাকু...চিঠিটা পড়ি ?

শ্রীচরণেষু বড়কাকু,

আপনার ইন্ডিয়ায়, আমরা বাংলাদেশে। আপনার বাবা আর আমার ঠাকুর্দা একই লোক। আপনারা জনগণমন, আমরা আমার সোনার বাংলা শুনে উঠে দাঁড়াই। একই লোকের লেখা দুইটা গান। আপনার বাবার ছবি আমার বসার ঘরে আছে, আপনার বি এ পাস করার পর মাথায় টুপি দেয়া ছবিটাও বসার ঘরে আছে। আমার বাবাকে লেখা আপনার চিঠিগুলি যেখানে আপনি সম্পত্তির অংশের জন্য টাকা-পয়সা চেয়েছিলেন তাও আমার কাছে আছে। অর্থাৎ আপনি আমার সঙ্গেই আছেন। ফরাক্কার পানি চুক্তির আগেও ছিলেন, এখনও আছেন। কিন্তু আমি কি আপনাদের সঙ্গে আছি?

আপনারা ইন্ডিয়ায় গেলেন। চোদ্দো পুরুষের ভিটা ছেড়ে আমার বাবা গেল না। চোদ্দো পুরুষের গৃহদেবী মাতঙ্গী ঠাকুরানী ছেড়ে বাবা গেল না ইন্ডিয়ায়। বাবা যে জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমার বাবা নিজে নিত্য পুজা করতেন। আমার বাবার মৃত্যুর কথা আপনারা জানেন। কিন্তু কখনও জানতে চান নাই মাতঙ্গীর পূজা কী করে চলতাছে। বাবার মৃত্যুর পর আমি পুরোহিত ঠিক করি। আট কিলোমিটার দূর, মোল্লাঘাট থেকে সাইকেল চালনা করে পূজা করতে আসতেন। আমার স্ত্রী বিয়োগের কথা সবাই জানেন। আমার পুনর্বিবাহের কথা জানেন না। বছর তিন আগে আমি বিবাহ করেছি। আমার স্ত্রীর নাম আয়েষা। এবার আপনি আরও আশ্চর্য হবেন, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আয়েষাকে বিবাহ করতে আমাকে ইসলাম নিতে হয়েছে। এজন্য আমার দুঃখ নাই। আমি নামাজ পড়ি না। আয়েষাও পড়ে না। কিন্তু পরিচয়ে আমরা মুসলিম। আমাদের একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। দেড় বছর বয়স এখন। তার নাম রেখেছি অভিলাষ। অভিলাষ রহমান। আপনাদের প্রতিষ্ঠা করা পুকুর, আমগাছ, সুপারি বাগান, নারকেল বাগান সেই দেখাশুনা করবে। সন্তানের বড় শখ ছিল আমার, আয়েষা দিয়েছে।

ইতিমধ্যে বড়কাকু আর এক ফ্যাসাদ। আমাদের ওই পুরোহিতের হার্টের দোষ। বুকে বসল পেস মেকার। সাইকেল চালানো নিষেধ। ব্রাহ্মণ যে ক'জন আট-দশ কিলোমিটারের মধ্যে আছে, যজমানী করে না কেউ। চুড়ুইডাঙ্গা গ্রাম বারো কিলোমিটার দূর। সেখানে

এক পুরোহিত আছে, তার একটা মোপেডও আছে। তাকে অনুরোধ করলাম, বললাম মাসে এক হাজার দেব। উনি রাজি হলেন না। মুসলমানের ঘরে পূজা করবেন না।

বড়কাকু, আপনাদের মাতঙ্গী পূজা পায় না আর। আয়েষা সিংহাসনে পানি দিতে যায়, আমি কই ছুঁইও না। আমি সিংহাসনের সামনে ফুল রাখি, রক্ত জবা। আর ধ্যানমন্ত্র পড়ি ওঁ শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্ত সিংহাসন স্থিতাং...খুব চুপে চুপে বড়কাকু, গোপনে। কেউ য্যান না দ্যাখে। আমি না মুসলমান? মুসলমানের মূর্তিপূজা করতে নাই। যে মোসলমান মূর্তিপূজা করে সে মোনাসেফ, সে কাফের...।

এই সময় আপনার চিঠিটা পাইলাম। পইতার নিমন্ত্রণ। নতুন ব্রাহ্মণের দিয়া গেলাম এই মাতঙ্গী ঠাকুরানী। মাতঙ্গী তো তাঁরও।

প্রণাম নিবেন। অপরাধ ক্ষমা করবেন। ইতি মন্টু। আমার ইস্কুলের নাম ছিল মণিময়। আমি এখন মণিরুদ্দিন মন্টু।

প্রণবেশ থামল। কোনও শব্দ নেই। প্রভাময়ী কাঁদছে। প্রভাময়ীর মাথায় কেউ হাত রেখে বলছেন, কেঁদো না।

জন মূর্তিটাকে বাক্স থেকে বার করল। শো-কেসে কৃষ্ণনগরের টমেটো, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গালোরের নটরাজ আর গুসকরার ঢোকরা ঘোড়ার পাশে মাতঙ্গী মূর্তিটা রেখে দিল। সুখবিলাস চীৎকার করে উঠল এ কী সর্বনাশ, ওই বিগ্রহ কোথায় রাখ দাদুভাই?

জন বলল কোথায় রাখব?

কেউ কোনও উত্তর দেয় না।

সুখবিলাস পুরোহিতমশাইকে ডেকে বললেন এই বিগ্রহকে আপনি রাখুন। আমরা না হয় মাসে মাসে...পুরোহিত বললেন যা শুনলাম, এই বিগ্রহের তো কিছুই আর নাই। যবন দোষ। প্রায়শ্চিত্য, সংস্কার ইত্যাদি করা দরকার আগে।

জন বলল দাদু, এটা আমার। আমি নিয়ে যাব।

সুখবিলাস বলল তুমি নিয়ে কী করবে দাদুভাই, তুমি কি পুজো করতে পারবে?

জন বলল হ্যাঁ করব। উইদাউট মন্ত্র।

প্রণবেশ বলল শুধু একটা প্রবলেম। প্লেনে ওঠার সময় মেটাল ডিটেক্টার যখন বিচ্ছিরি সাউন্ড করবে, তক্ষন কী বলব? বলব ইতিহাস নিয়ে যাচ্ছি, একটা ইতিহাস, ওরা কি বুঝবে?

কিন্তু মন্টু কী বলেছিল এয়ারপোর্টে?

শারদীয় বর্তমান, ১৯৯৭

হুলো

রবিবারের সকাল, ইংরাজি কাগজটা ভাঁজ করা, বাংলা কাগজটা খোলা, চা আর বাইপাসে গণধর্ষণ খাচ্ছি, কাজের মেয়েটা ময়দা মাখছে, ছেলে পড়তে বসে গেছে, ছেলের হিস্টরি পরীক্ষা, ও মুখস্থ করে চলেছে ক্ষুদিরাম ওয়াজ হ্যাংগড্‌ অ্যাট মজঃফরপুর জেল অন এলেভেনথ আগস্ট নাইনটিন হানড্রেড এইট, ছেলের মা ওর আদুরে গর্ভবতী বিড়ালটিকে বসিয়ে দুধ খাওয়াচ্চে, সেই সঙ্গে ছেলেকেও একটু পড়াচ্ছে ছেলের মা। এমন সময় চেঁচিয়ে বলল দেখ, টুণ্টুকে সিরিয়াস হতে বল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম নীল বিদ্রোহের রেজাল্ট কি, ও বলল-রেজাল্ট হচ্ছে উজালা। চার বুন্দওয়ালা। সব সময় ইয়ার্কি। এমন সময় ফোনটা এল।

এখানে বাবলুবাবু নামে কেউ আছেন?

এক বৃদ্ধের গলা। আমার ডাকনাম বাবলু। আমাকে বাবলু ডাকার লোকজন এখন আর তেমন কেউ নেই। একজন পিসিমা টিকে আছেন, আর কাকিমা। কিন্তু এটা তো পুরুষকণ্ঠ। তাছাড়া বাবলুর সঙ্গে বাবু জুড়েছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করি কে বলছেন?

আমাকে কি চিনবেন? মনে হয় চিনবেন না। আমার নাম অমৃত পাত্র।

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে লোকটা ইয়ার্কি করছে কিনা। অমৃত পাত্র কারুর নাম হয় নাকি? গতকল রাত্রেই তো অলিম্পিয়া বার-এ একটা কাচের গ্লাস ভেঙে ফেলেছিলাম, পরিমল সাহা বলেছিল, কী স্যার, অমৃতপাত্রটা ভেঙে দিলেন?

পরিমল সাহা আমার ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্ট বলছি কেন? ওর বার-কাম-রেস্টুরেন্টটা আমার জুডিসডিকশনেই পড়ে। আমি ওর ইনস্পেক্টর। সেলস ট্যাক্স-এর। পরিমলবাবু গলা পাল্টে ফোন করছে না তো?

আমি বলি, আপনি কোন অমৃতের পাত্র? ভদকা না জিন?

ওপাশ থেকে গলাখাকারির শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর আর দুটি বাক্য মাত্র শুনলাম। বাবলুবাবু, আপনার দাদু বিধুভূষণ চক্রবর্তী মারা গেছেন, আপনাকে মুখাগ্নি করতে হবে। এবার ঘটাং করে ফোন রাখার শব্দ।

এই নামে আমার একজন দাদু আছেন জানি। উনি আমার বাবার কাকা। শুনেছিলাম, বিপ্লবী ছিলেন। ওই দাদুর সঙ্গে আমাদের তেমন যোগাযোগ নেই। ছোটবেলায় বাবার কাছে ওই দাদুর সম্পর্কে কিছু টুকরো টুকরো কথা শুনেছিলাম। দাদু নাকি ছাত্র বয়সেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। বিয়ে-থা করেননি। আমার বাবার বাবা যিনি, তার থেকে কখনও সম্পত্তির অংশ দাবি করেননি। বিনয় বাদল দীনেশের সঙ্গে আমার ওই দাদুরও নাকি সিম্পসন সাহেবকে মারতে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নিকুঞ্জ সেন দাদুকে শেষ মুহূর্তে অন্য কাজে পাঠালেন। নিকুঞ্জ সেন নাকি বিনয় বাদল দীনেশ আর আমার দাদুকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের অলিন্দযুদ্ধের আগের দিন নিজে রান্না করে খাইয়েছিলেন। যদি

শেষ মুহূর্তে না সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হত, তাহলে বিনয় বাদল দীনেশের সঙ্গে আমার দাদুর নামও যোগ হত। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কতবার গিয়েছি, যেতে হয় আমাকে। কখনও কিন্তু জানতে ইচ্ছে করেনি অলিন্দযুদ্ধ কোথায় হয়েছিল, কোন বারান্দায়। ছেলে যদি জিজ্ঞাসা করে বিনয় বাদল দীনেশের পুরো নাম কী, বলতে পারব না। কত সালে হয়েছিলো ওই অলিন্দযুদ্ধ? দাদুর বয়েসটা বুঝবার জন্য ওটা এখন জানতে ইচ্ছে করছে। উনিশশ কুড়ি-টুড়ি? সে সময় দাদুর বয়েস যদি কুড়িও হয়, তাহলে দাদুর জন্ম ১৯০০ সাল নাগাদ। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা অনেক বছর বাঁচেন হয়ত, তাই বলে একশ বছর? বডির ভেতরে একটা গুলি ঢুকে থাকা সত্ত্বেও? হ্যাঁ, দাদুর বাড়িতে একটা গুলি ঢুকেছিল জানতাম। বাবার কাছে শুনেছি। আমার মা ঘোমটা মাথায় দিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন—খুড়ামশয়, ওই গুলির ব্যথা কি আর হয়?

ওই দাদুকে ছোটবেলায় দেখেছিলাম আমাদের মহিম হালদার লেনের বাসাবাড়িতে। খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবি পরতেন, গলায় ছিল একটা রুদ্রাক্ষের মালা। আর কপালে সিঁদুরের টিপ। আমাদের ওই বাড়িটা থেকে কালীঘাটের কালী মন্দিরটা কাছেই। ওই দাদু বোধহয় কালীভক্ত ছিলেন। কালীমন্দিরে এলে আমাদের বাড়িটা মাঝে মাঝে ঘুরে যেতেন। তখন বিপ্লবীদের গল্প-টল্প বলতেন। অনুশীলন সমিতি, অরবিন্দ ঘোষ বারীন ঘোষ, মানিকতলার বোমা, এইসব। খুব বেশি কথা বলতেন না, আমাদের ওই বাসাবাড়িতে দিদি জিজ্ঞাসা-টিজ্ঞাসা করলে বলতেন। দিদি আমাদের বলত দাদু যা বলছে, ইতিহাস বইতে তার অনেক কিছুই লেখা আছে। দিদি একটা বই প্রাইজ পেয়েছিল। বইটার নাম মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি। দিদি একদিন বলেছিল—দ্যাখ, এই বইটাতে দাদু যাদের কথা বলে, তাদের ছবি আছে। অনেকেরই ছবি ছিল বইটাতে। নেতারা বক্তৃতার সময় ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সূর্য সেন বিনয় বাদল দিনেশ-মাতঙ্গিনী হাজরা এরকম কয়েকটা নাম বলে থাকেন। আমিও এই নামগুলিই জানি। কিন্তু ওই বইটাতে আরও অনেক ছবি ছিল। একশর বেশি। আরও কত শহিদ আছেন কে জানে।

ওই বিধুভূষণ চক্রবর্তী হচ্ছেন আমার নিজের ঠাকুর্দার পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। বাবার ছোট কাকা। আমার দাদু নাকি বলতেন আমার ছোট ভাইটাই ছিল সবচেয়ে ব্রিলিয়াণ্ট, স্বদেশি করে গোল্লায় গেল।

বাবার কাছে শুনেছি স্বাধীনতার পরে কয়েকজন বিপ্লবী খুব ভাবনায় পড়েছিলেন। স্বাধীনতা যখন হয়েই গেল, এবার ওরা কী করবেন? বিয়ে-থা করেননি, ঘর-সংসারও নেই, চাকরি-বাকরি-ব্যবসাও নেই আর আসল কাজটা, স্বাধীনতার জন্য লড়াই, সেটাও তো শেষ। এবার কী হবে। ওদের মধ্যে ছিলেন ভূপেন রক্ষিতরায়, রসময় শূর, নিকুঞ্জ সেন, উজ্জ্বলা রক্ষিত রায়, আরও ক'জন। দাদুও ছিলেন। ওরা সবাই মিলে বিধান রায়ের কাছে গেলেন। বিধান রায়, ওঁদের ভোজেরহাটের কাছে 'বাগু' নামে একটা গ্রামে বাড়ি দিলেন। বাড়িটার নাম রাখা হল পল্লীনিকেতন। ওখানেই বিপ্লবীরা থাকতেন। কিছুদিন পর ওঁরা ভাবলেন এমনি-এমনি থাকা ঠিক নয়। তখন একটা স্কুল খোলা হল। ওঁরা স্কুলে পড়াতেন। তখন নাকি উজ্জ্বলা দেবীর বয়স হয়ে গেছে। ওর কি হবে? তখন নাকি সবাই ভূপেন রক্ষিত রায়কে বললেন, আপনি ওঁকে বিবাহ করুন। ওঁরা বিয়ে করে চলে গেলেন।

বাবা মাঝে মাঝেই বলতেন ওই দাদুর কথা। বাবার মধ্যে বোধহয় একটা প্রচ্ছন্ন

গর্ব ছিল। বাবা মাঝে মধ্যে দেখা করতে বাগু যেতেন। পুজোর সময় ধুতি দিতেন।

আমি যখন কমার্শিয়াল ট্যাক্স ইনস্পেক্টরের চাকরিটা পাই, বাবার কথায় আমি দাদুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম বাগুতে। বাবা বলেছিলেন আমার গুরুজন বলতে আর তো কেউ নেই। যা, আশীর্বাদ নিয়ে আয়। ওই একবারই গিয়েছিলাম বাগু। তখন শীতকাল ছিল। পল্লীনিকেতনের বাগানে অনেক সূর্যমুখী ফুটে ছিল। গাঁদা ফুলে রোদ্দুর পড়ছিল বলে সোনালি আভা ছড়িয়ে পড়ছিল।

ওই সব ফুলের পাশে বেতের চেয়ার, ইজি চেয়ার। বৃদ্ধরা সব রোদ্দুর পোহাচ্ছেন। একজন বাটি থেকে চামচ দিয়ে তুলে দুধ-খই খাচ্ছিলেন। অন্য একজন বৃদ্ধ আতসকাচ দিয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে পাশের বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন—রসময়, কইতে নি পার, দন্তেসয় আকার দিয়া শুরু কইরা উত্তম সুচিত্রার চাইর অক্ষরের কী বায়োস্কোপ আছে? পাশাপাশি আছে কুকুর। চাইর অক্ষরের। সেইডা সারমেয়। এবার উপর-নিচ দরকার। উত্তম সুচিত্রা। পাশের বিপ্লবীটি বললেন—জোরে কও। শুনি না। আবার বললেন। বেশ চেঁচিয়ে। আমি তো পেয়ে গেছি। কিন্তু বলাটা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না। রসময় যাঁর নাম। তিনিই কি রসময় শূর? বুঝতে পারছি না। রসময়বাবু বললেন, ওইটা বাদ দিয়া কর। কঠিন। যিনি খই খাচ্ছিলেন, উনি বললেন—আরে এ তো খুব সোজা গো। সাগরিকা জাননি, সাগরিকা? রসময়বাবু বললেন—সত্য পাত্রমশায়, আপনের জেনারেল নলেজ অগাধ। সাধে কি মেদিনীপুরের ছেলেরা আজকাল বেশি আই সি এস পাস করতাছে?

অন্য একজন বললেন—আই সি এস নয়, আই এ এস।

ওই একই হইল।

আমি দাঁড়িয়েছিলাম ওখানে। দেখছিলাম। কেউ হয়ত জালালাবাদ পাহাড়ের, কেউ বুড়িবালামের। কেউ হয়ত তাম্রলিপ্ত স্বাধীন সরকারের সৈন্য।

ওদেরই একজন জিজ্ঞাসা করলেন—হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?

আমি বলেছিলাম—বিধুভূষণ চক্রবর্তী আমার দাদু, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

গো ইনসাইড। হি ইজ বিজি উইথ রাবিশ। সে আত্মজীবনী লেখতাছে।

একজন পরিচারক আমাকে দাদুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। দাদু একটা টেবিলে ঝুঁকে কী সব লিখছেন। প্রণাম করেছিলাম। চাকরিটার কথা বললাম। দাদুর মুখে কোনও খুশীর ছাপ দেখলাম না। স্বগতোক্তির মত বললেন-ট্যাকস্ ডিপার্টমেন্ট। বললেন—ইউরোপ আমেরিকায় এক কাপ কফি কিনলেও বিল দেয়, তাতে ট্যাকস্ ইনক্লুড থাকে। এখানে সবই ফাঁকি। ফাঁকির চক্কোরে পইড়ো না। বি কসাস।

সেই একবারই গিয়েছিলাম এবং সেটাই শেষ দেখা। তা প্রায় বছর বারো হয়ে গেল। আমার বাবার মৃত্যুর পর চিঠি দিয়েছিলাম, শ্রাদ্ধে আসতে বলেছিলাম। উনি লিখেছিলেন—অশৌচ লইলাম। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের শ্রাদ্ধে কীরূপে আসিব। আমার বিয়ের সময়েও চিঠি দিয়েছিলাম। আসেননি।

দাদুর জন্য একটু দুঃখ হল। নিজের দাদু, এতদিন জীবিত ছিলেন, অথচ কিছুই করলাম না। কিছু তো কর্তব্য ছিল। শীতকালে চ্যবনপ্রাশের কৌটো, গরমে ল্যাংড়া আম-বাবাকে যেমন করতাম আর কী। বাবার জন্য তেমন কিছু করতে পারিনি, বাবা হঠাৎ স্ট্রোকে মারা গেলেন। ফার্স্ট অ্যাটাকেই। কিন্তু এই দাদু অনেকদিন বেঁচেছিলেন। এখন আর

কীই বা করব। খবর কাগজের শোকসংবাদে একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে দেব? প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামীর মৃত্যু। কিন্তু বয়সটা দিতে হবে তো। একটা অ্যাপ্রক্সিমেট বয়স দিলেও দিতে হয়। কিন্তু সেটাই বা কি করে দিই। বিনয় বাদল দীনেশ ওদের কারুর জন্মতারিখ পেলেই হয়। ছেলের একটা এক্সারসাইজ বুক আছে। ওটার লাস্ট পৃষ্ঠায় দেখেছিলাম বিখ্যাত সব মানুষের ছবি আছে, আর জন্মসাল-মৃত্যুসালও দেওয়া আছে। দেখি মহাপুরুষদের ছবির গায়ে স্কেচ পেনে ২,১,১/২ এই সব লেখা। যেমন যিশুর ছবির ওপরে ২, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজি, ১, নজরুল ১/২....। ব্যাপারটা বোঝার জন্য ছেলেকে জিজ্ঞেস করাতে ছেলে বলেছিল, কার জন্মদিনে কীরকম ছুটি লিখে রেখেছি। এখানে বিনয় বাদল দীনেশ প্রমুখের ছবি নেই।

আমার একটা জেনারেল নলেজের বই ছিল। কম্পিটিটিভ পরীক্ষার সময় কিনেছিলাম। ওখানে ছোট করে ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল আছে। ওখানে দেখলাম ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ঘটনাটা ঘটে। দাদু তখন কুড়ি বছরের সদ্যযুবক হলে, এখন বয়েস নব্বুয়ের মত হবে। আমাদের পূর্ববঙ্গের আদি গ্রামের কথা তো আমি জানি। আর বিপ্লবীজীবনের ডিটেলস বইটা থেকে জেনে নেব।

আমাকে যেতে হবে। সোনালিকে সব বলি। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিই। আমি এখন শ্বশুরবাড়িতেই থাকি। বাবার মৃত্যুর পর আগের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। আমার স্ত্রী সোনালি একমাত্র সন্তান। ওর এক দাদা ছিল, কম বয়েসে দুঃখজনকভাবে মারা গেছে। নিমতায় ওদের পুরোনো বাড়ি। বাড়ির সামনে শ্বেতপাথরে লেখা রায়বাহাদুর চন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রায় ঝাপসা হয়ে গেছে। তিন মহলা বাড়ি। আমার শ্বশুরমশাইয়ের অংশে তিনটি ঘর। আমার শাশুড়ি গত হলে শ্বশুরমশাই হরিদ্বারে কাছে কঙ্খলে একটা আশ্রমে থাকেন। মাঝে মাঝে আসেন। ওর জন্য একটা ঘর রাখা আছে। আমাদের একটা বেডরুম আর একটা ড্রইংরুম। ওই ঘরটাকে ডাকাতে ঘর বলে। ওই ঘরে নাকি এককালে একটা সিন্দুক ছিল। ওই ঘরে ডাকাতি হয়েছিল।

আমার ছেলের দশ বছর বয়েস। ও কখনও ফ্রিডম ফাইটার দেখেনি। বইয়ে পড়েছে শুধু। ও বলল, বাবা আমাকে নিয়ে চল না। আমি কখনও সত্যিকারের ফ্রিডম ফাইটার দেখিনি। সোনালি যেতে দিল না। কারণ ওর কালই হিস্টরির টেস্ট। পড়তে হবে। টেস্টে কী আশ্চর্য, হাউ ইন্ডিয়া বিকেম ফ্রি রয়েছে। অনেক বড় চ্যাপ্টার। মুখস্থ করতে হবে।

সোনালি তাড়াতাড়ি লুচি ভেজে দিল। আজ ফিরতে দেরি হবে। আজ বেলা তিনটের সময় বেহালাতে পরিমল সাহার সঙ্গে একটা পুরোনো স্যান্ট্রো গাড়ি দেখতে যাওয়ার কথা ছিল। পরিমলবাবুর বার-কাম-রেস্তোরার সেলস ট্যাক্সে একটা বড় ধরনের গণ্ডগোল ধরা পড়েছে। ওরা এখন আমায় তেলাচ্ছে। ওখানে আজ আর যাওয়া হবে না। পরিমলের মোবাইলে ফোন করে পেলাম না। সুইচ অফ। রোববারের সকালে অনেকক্ষণ ঘুমোয় হয়ত। বাগু-টাগু থেকে হয়ত ফোন করা যাবে না। সোনালিকে মোবাইল নম্বরটা দিয়ে বললাম, পরিমলকে ফোন করে জানিয়ে দিতে আজ গাড়ি দেখতে যাওয়া হচ্ছে না।

নিতান্ত সাধারণ একটা বেডকভারে দাদু শুয়ে আছে। চোখের ওপর নির্জন তুলসীপাতা। বিছানায় ছিটানো শিউলি। বুকের ওপর একটা গীতা। বাড়িটাও নির্জন।

বেলা দুটো হয়ত বাজে এখন। শরৎকাল। কয়েকটা পায়রার বকম-বকম। রান্নার ঠাকুরের চোখে জল। একজন ধুতি ও ফতুয়া-পরা ভদ্রলোক জানালেন, আমার নাম অমৃত পাত্র। আমিই ফোন করেছিলাম। আমি অজয় মুখুজ্যে-সুশীল ধাড়াদের সঙ্গে কাজ করতাম। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারে ছিলাম আমি। খুব লজ্জিত হই। ইনিই সকালবেলায় ফোন করেছিলেন। আমি হাত জোড় করে বললাম—নমস্কার। আমি বুঝতে পারিনি, আমি ভেবেছিলাম আমার কোনও বন্ধু ইয়ার্কি করছে।

অমৃতবাবুর মাথাভর্তি পাকা চুল। চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন—না, তাতে কী। তাৎক্ষণিকভাবে একটু অস্বস্তিতে পড়েছিলাম, তখন ফোনটা রেখে দিয়েছিলাম। আবার ফোন করেছিলাম, ততক্ষণে আপনি বেরিয়ে পড়েছেন। ওনার শেষ ইচ্ছে জ্ঞাতিকে দিয়ে মুখাগ্নি, গয়ায় পিণ্ড। এ সব উনি মানতেন। ঈশ্বর, পরলোক—এ সবে বিশ্বাস ছিল। আসলে উনি আদতে অনুশীলন সমিতির লোক কিনা, পি মিত্তিরির চ্যালা। ওঁদের আবার এই সব হিঁদুয়ানি আছে। পরে অবিশ্যি উনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ারে চলে যান। আমি বাপু এই সব মানি না। আমি এই ভোলানাথকে কয়ে রেখেচি, আমি মরলে তুই মুখে আগুন দিয়ে দিস।

রান্নার ঠাকুরটি চোখ মোছে। ওর নামই বোধহয় ভোলানাথ।

অমৃতবাবু বললেন—নিন, এবার আমরা বেরোই। আপনাকে আবার ফিরতে হবে।

খাটিয়াতে তোলার আগে ভোজেরহাট তরুণ সংঘের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া ও মালা দেওয়া হল। একজন কলারওলা সাদা পাঞ্জাবি পরা লোক একটু বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতা করার আগে আস্তে করে দাদুর নামটা জেনে নিলেন। তারপর ক্ষুদিরামের বাংলা, সূর্য সেনের বাংলা, নেতাজি সুভাষের বাংলা...। সবাই যেমন বলে আর কী...। শেকালে বিধুভূষণ না বলে বিভুভূষণ বললেন। ভোলানাথ ভুলটা ধরাতে যাচ্ছিল, কিন্তু অমৃতবাবু ভোলানাথের গা টিপলেন। বন্দে মাতরম বলে বক্তৃতা শেষ হল। শেষকালে একটা তেরঙ্গা পতাকা দিয়ে মৃতদেহ ঢাকবার উদ্যোগ চলতে লাগল। অমৃতবাবু বললেন—ওই সব পতাকা দেবেন না। বিধুর নির্দেশ ছিল। আমাকে আস্তে করে বললেন—বিধু বলে গিয়েছিল, কেউ ঝাণ্ডাটাণ্ডা লইয়া আইলে খেদাইয়া দিও।

আমি খাটিয়াতে কাঁধ দিলাম। ভোলা ছিল, অমৃতবাবুও কিছু সময় কাঁধ দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্মশান পর্যন্ত গেলেন। অমৃতবাবু ছাড়াও আরও একজন শ্মশান পর্যন্ত গিয়েছিলেন। উনি কোনও কথা বলছিলেন না। শ্মশান মাইল দুয়েক দূর। বিদ্যাধরীর একটা বাঁওড়ের ধারে শ্মশান। কাঠ কেনার জন্য টাকা দিতে গেলাম, অমৃতবাবু নিলেন না। বললেন—ইনি কিছু টাকা আমার কাছে রেখে গেছেন। শ্রাদ্ধের টাকাও রেখে গেছেন। একটা নির্দেশাবলীও লিখে গেছেন। ব্যাঙ্কের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ছিল ভোলানাথের সঙ্গে। আমরা কে কবে মরে যাই ঠিক নেই তো। আজ রবিবার, ব্যাঙ্ক বন্ধ। আপনাকে আর একদিন আসতে হবে।

আমি মুখাগ্নি করলাম। শ্মশান-পুরোহিত মন্ত্র পড়লেন। চিতায় ওঠবার আগে দাদুর পায়ে মাথা ছোঁয়ালাম। তখন কান্না এল। দু-ফোঁটা জল পড়ল পায়ে। অমৃতবাবু বললেন—এই হল সেই পূতপবিত্র বারি। গঙ্গা-গোদাবরী-পুষ্করের জল এর কাছে কিছু নয়। ফ্রিডম ফাইটার পুড়ে চলেছেন এই নির্জনে। শ্মশানে জনাচারেক মাত্র লোক, কয়েকটা কাক। আমরা বসে আছি কচু বনের পাশে। অমৃতবাবু বললেন—কুড়িজন

ছিলাম এই পল্লীনিকেতনে। বিধুদা বলতেন সমিতি। ওঁদের অনুশীলন-সভ্যরাও অনেকে সমিতিতে থাকতেন কিনা। হারাধনের কুড়িজন থেকে কমতে কমতে আমরা পাঁচজন ছিলাম। বিধুদার পর আর চারজনে ঠেকেছি। আমরা যারা বেঁচে আছি, সব ওই বিয়াল্লিশের আন্দোলনের লোকজন। মুরারীপুকুর, আলিপুর, জালালাবাদ—সব আগেই শেষ।

আমরা এইখানে দুইজন। আর দুইজন সমিতিতে বসে আছে। ওরা হাঁটতে পারে না। আমার সঙ্গে যিনি আছেন, তার নাম ব্রজেন মাইতি। ক'দিন আগে গলায় অপারেশন হয়েছে। কথা বলতে পারেন না।

ব্রজেনবাবুকে দেখে মনে হল গোপালবাবুর চেয়ে কিছুটা ছোটই হবে। ব্রজেনবাবু এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। সূর্যদেব ডুবছেন, চিতা জ্বলছে। ব্রজেনবাবুর গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ হতে লাগল। একটা বিকৃত বেসুরো সুর। আমাকে আস্তে করে অমৃতবাবু বললেন—ব্রজেন গান গাইছে। বিধুদার প্রিয় গান। গাও ব্রজেন, গাও। আমিও গলা দিচ্ছি। ব্রজেনবাবুর ওই অদ্ভুত শব্দের মধ্যে অমৃতবাবুর কণ্ঠ মিশল—

মাগো, যায় যেন জীবন চলে—
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাছে বন্দে মাতরম বলে
যখন মুদি নয়ন করব শয়ন শমনের সেই শেষ জালে
তখন সবই আমার হবে আঁধার স্থান দিও মা ওই কোলে॥

চিতা নিভল যখন, তখন অন্ধকার। একটা মালসায় দাদুর নাভি দেওয়া হল। ডোম বলল—নাভির সঙ্গে এক টুকরো লোহা কী করে এল? দেখুন কীরকম লাল হয়ে রয়েছে, রক্তবর্ণ! আমি কাঠি দিয়ে নেড়ে দেখি, একটা ছোট ধাতব টুকরো পোড়া অস্ত্রের সঙ্গে জ্বলজ্বল করছে। অমৃতবাবু বললেন—বুলেট, এটা বুলেট। শরীরে ছিল।

সামনেই বিদ্যাধরীর বাওড়। মালসাটা জলে বিসর্জন দিলেই মালসার সঙ্গে হারিয়ে যাবেন ১৯৩০-জালালাবাদ-বুড়িবালাম-কিশোরগঞ্জ-তাম্রলিপ্ত সমেত আমার পিতামহ। আমি মালসার ভিতর থেকে বুলেটের টুকরোটা ডুমুর পাতায় তুলে রাখি। কী গরম!

বাড়ি ফিরতে রাত হয়েছিল। লোহা আর আগুন ছুঁয়ে ঘরে ঢুকলাম। পরনের জামা প্যান্ট ধুতে হবে। তার আগে বুকপকেট থেকে টুকরোটা বার করে কাগজ মুড়িয়ে ড্রয়ারে রাখলাম। সোনালি বলল—হয়ে গেল? আমি মাথা নাড়লাম। সোনালিকে খুব খুশি দেখাচ্ছিল। ও জানাল, ওর জলি বেড়ালের বাচ্চা হয়েছে। ডাকাতের ঘরের দেরাজের তলায় বাচ্চাগুলো আছে। চারটে। ও খুব উত্তেজিত।

সকালবেলায় বুলেটটার কথা বললাম। দেখালাম। আমার ছেলে টুন্টু খুব উত্তেজিত। ও দুহাত জোড়া করে বুলেটটাকে প্রণাম করল। ওকে আমরা কেউ প্রণাম করতে বলিনি। যে-কোনও মানুষই শৈশবে কত মহান হয়। টুন্টু যখন বুলেটটাকে প্রণাম করল, সেই দৃশ্যটাকে আমার অক্ষয় অমর করে রাখতে ইচ্ছে করছিল। আমার ওই দাদু হচ্ছেন টুন্টুর প্রপিতামহ। ও দাদুর বেশি জানে না। ও আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ওই দাদুটা ব্রিটিশের সঙ্গে ডাইরেক্ট ফাইট করেছিল?

আমি বলি হ্যাঁ।

—কোথায় বাপি? কবে? কোন সালে?

—আমি ঠিক জানি না টুন্টু।

—বুলেটটা এতদিন ধরে দাদুটার বডিতে ছিল? কোথায় ছিল?

—জানি না।

—আচ্ছা বাপি? ব্রিটিশরা তো বিজনেস করতে এসেছিল, তারপর রুলার হয়ে আমাদের এক্সপ্লয়েট করতে থাকে। কত ফাইট করে ব্রিটিশদের তাড়াতে হল। এখন আবার ওদের ইনভাইট করা হচ্ছে কেন?

—জানি না টুন্টু, জানি না।

জয়পুর থেকে আনা একটা সুন্দর কৌটো ছিল টুন্টুর। ওটায় ওর সাধের জিনিস রাখত। ওটা ফাঁকা করে দাদুর বুলেটটা রাখল টুন্টু। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে বলল—আজ ফ্রিডম স্ট্রাগলের পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে একটা ফ্রিডম বুলেট প্রণাম করে যাচ্ছি, দেখ আজ দারুণ পরীক্ষা দেব।

দু'হাত জোড় করে ওই কৌটোটার দিকে তাকাল টুন্টু, আর বলল—বন্দেমাতরম।

কে ওকে এ সব শেখাল কে জানে?

অফিসে একটু দেরি করে বেরুব ঠিক করেছি।

কয়েকদিন ছুটিই নিয়ে নেব ভাবছি। এমন সময় পরিমল সাহার সঙ্গে কোনরকম ডিলএ যেতে ইচ্ছে করছিল না। ওই কৌটোটা ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলেছিল। ওই কৌটোটা কীভাবে যেন রূপকথার কৌটো হয়ে গেছে, যার মধ্যে ভোমরা থাকে। কৌটোটা আমাদের বেডরুমেই রেখেছি, শোকেস-এ। টুন্টু এই ঘরেই পড়ে। এখনও আমাদের সঙ্গেই শোয়। ঘরটা বেশ বড়। আগেকার দিনের ঘর। এই ঘরেই ওর পড়ার টেবিল। প্রাইভেট টিউটর পড়তে এলে ড্রইংরুমে যায়। যেটাকে ডাকাতে ঘর বলে। ভাবলাম, কৌটোটা ওই ঘরে রেখে আসি। সোনালি বলল, এখন ও ঘরে গিয়ে জলিকে ডিসটার্ব কোর না।

অফিস থেকে ফিরে শুনলাম টুন্টু নাকি ওর একগাদা বন্ধুকে স্কুল বাস থেকে নামিয়ে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসেছিল, ওরা বুলেট দেখেছে। সোনালি বলছিল টুন্টু খুব প্রাউড। কৌটোর গায়ে দুটো ফুলও রয়েছে।

রাত্রে একজন সেলস ট্যাক্সের উকিল ফোন করেছিল। একটা পেন্ডিং কেস স্ট্রিমলাইন করে ফেলতে চায়। এই জন্য আমাকে একটা আন্ডার হ্যান্ড পেমেন্ট করবে। আমি খুব ফ্রিলি কথা বলতে পারছিলাম না। ওই কৌটোটার জন্যই বোধহয় অস্বস্তি। রাত্তিরে একটা স্বপ্নও দেখলাম। দেখি বিধুভূষণ চক্রবর্তী এসেছেন, গায়ে খদ্দর, গলায় রুদ্রাক্ষ, বলছেন—দাও, আমার বুলেট আমায় ফেরত দাও। পরদিন সকালেই সোনালিকে বললাম, স্বপ্নটার কথা। আমি বললাম, বুলেটটা গঙ্গায় ফেলে দেব। সোনালি নিমরাজি হল। টুন্টু বলল প্লিজ বাপি, না, ওটা ফেলে দিও না, ওটা থাক। আমি বললাম, দাদু আসছে যে ওটা নিতে। ফাইভে পড়া ছেলেটা বলে কিনা ড্রিম মানে সেল্‌ফ থিংকিং ডিপ স্লিপ। আজকালকার ছেলেরা কত জানে! সোনালিও বলল। ওটা থাক। ছোটদের সামনে একটা আইডল থাকা, ভাল। বরং ওটাকে অন্য ঘরে রেখে দাও।

তাহলে থাক আইডল। পাশের ঘরে গেলাম। একটা পুরনো দেরাজ আছে, কারুকাজ করা। গায়ে কয়েকটা গর্ত আছে, ওগুলো নাকি গুলি লাগার চিহ্ন। অনেক বছর আগে যখন বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল তখনকার চিহ্ন। এই ঘরেই গুলি লেগেছিল সোনালির দাদুর বাবার গায়ে। তাঁর একটা ছবিও রয়েছে দেওয়ালে। কালো হয়ে গেছে। বিশ্বম্ভর

ঘোষাল। বিশ্বম্ভরবাবু নাকি গায়ে গুলি লাগবার কিছুদিন পর মারা গিয়েছিলেন। ওই দেরাজের ড্রয়ারেই কৌটোটা রাখলাম। সোনালি নিচু হয়ে দেরাজের তলায় বেড়ালের বাচ্চাগুলো দেখতে গিয়ে আঁতকে উঠে বলল, এমা, বাচ্চাগুলো কোথায়? সোনালি ডিভানের তলা, সোফার তলা খুঁজতে লাগল। ভয়ার্ত গলায় বলল, সকালে একটা হুলো এসেছিল। বোধহয় বাচ্চাগুলোর বাবা। ও খেয়ে ফেলেনি তো? সোনালি ডাকতে লাগল জলি, জলি....। মিউ ডাক শোনা গেল দেরাজের ওপর থেকে। চেয়ার টেনে দাঁড়িয়ে সোনালি দেখল বাচ্চাগুলো মা সমেত ভালই আছে। সোনালি বলল, মা-বেড়ালরা বাচ্চাদের সরিয়ে সরিয়ে রাখে, হুলোর ভয়ে। ওই দেরাজেরই একটা ড্রয়ার টেনে জয়পুরী কৌটোটা রেখে দিলাম।

রাত্তিরে আবার স্বপ্ন। দেখি আমি একটা মাদুলি তৈরি করেছি। মাদুলির মধ্যে ওই বুলেটটা ভরেছি, তারপর সুতো দিয়ে বেঁধেছি। টুন্টু ওটা আমার হাতে বেঁধে দিল। আমি ওই মাদুলি হাতে বেঁধে আফিস করলাম। সন্ধেবেলায় অলিম্পিয়ায় গেছি, আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে পরিমল সাহা কী যেন বলছে, আর আমি ঠাস করে ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিলাম। স্বপ্নের কথা সোনালিকে বললাম। সোনালি মনে হল ব্যাপারটাকে খুব একটা পাত্তা দিল না, বলল, তোমার তো বেশ উন্নতি হচ্ছে।

তার মানে, কী বলতে চাও? আমি বলি।

ও বলে—কিছু না, বলছিলাম স্বপ্নটা তো ভালই। বলে আঁচল উড়িয়ে বেড়াল দেখতে চলে যায়।

সোনালী কি ভাবে, আমি খুব ঘুষটুষ নিই? খুব একটা নিই না, নিলে অ্যাদ্দিনে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির জন্য কসরত করি? আমার কলিগরা সব কোথায় উঠে গেছে। আমি খুব একটা রিক্স নিই না। একদম টু দি পয়েন্ট কাজ করতাম। হালে একটু ডিলএর দিকে যাচ্ছি। কলিগরা কেউ ছেলেকে আট-দশ লাখ টাকা দিয়ে সিট কিনে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াচ্ছে, কেউ হংকং-ব্যাঙ্কক যাচ্ছে। আমারও তো টুণ্টু আছে। আর যা সিস্টেম, টু দি পয়েন্ট কাজে ঝামেলা বেশি। আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ গেলে স্মুদলি কাজ করা যায়।

অমৃতবাবু ফোন করেছিলেন—কী হল আসুন, চারদিন যে হয়ে গেল। অনেক কাজ আছে।

গেলাম। দাদুর লেখা একটা নির্দেশবাণী দেখালেন।

'আমি দীর্ঘদিন যাবৎ সমাজের বর্জ্যস্বরূপ বাঁচিয়া রহিয়া সরকারপ্রদত্ত মাসোহারা ভোগ করিতেছি। পূর্বে একটি ইস্কুল চালাইতাম, নানাবিধ কারণে তাহা আর সম্ভব হইতেছে না। এমতাবস্থায়, জনগণের টাকায় দিনাতিপাত করিবার কারণে অপরাধবোধ করিতেছি। মরণ আমার পরম কাম্য। শ্যামস্বরূপ মৃত্যুর অপেক্ষায় রহিয়াছি। স্বাধীনতার একজন কর্মী হইবার কারণে সরকার আমাদিগকে বাসস্থান ও মাসোহারা দিতেছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা আমার কাম্য ছিল না। এই স্বাধীনতার জন্য ডাকাইতি, নরহত্যা ইত্যাদি অনেক অন্যায় কর্মে লিপ্ত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। জানি না পরমেশ্বর আমাকে পরলোকে ক্ষমা করিবেন কিনা। আজ এতদিন পরে মনে হয় গীতা স্পর্শ করিয়া কর্মযোগের নামে ডাকাইতি, বোমাক্ষেপণ ইত্যাদি যাহা করিয়াছি তাহা ভুল কর্ম ছিল।

পরবর্তীতে গান্ধীবাদের আকৃষ্ট হই কিন্তু তাহাতেও মন পুরিল না। ঈশ্বরে বিশ্বস্ত হইয়া মার্কসবাদকেই বা কিরূপে অন্তরে গ্রহণ করিব? যাহা হউক বড় শূন্যতার মধ্যে রাখিয়াছি আমার এই মনোভাবের কথা বিস্তারিতরূপে লিখিতভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলাম। একজন পাবলিশার উহা লইয়া গিয়াছে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইল। সে যে ঠিকানা দিয়েছিল সেখানে চিঠি দিয়াও উত্তর মিলে নাই। বর্তমানে সেই পাবলিশারের নাম মনে করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক যদি ওই পাবলিশার বইটি প্রকাশ করে এবং সাধুতাবশত লভ্যাংশ প্রদান করে, সেই লভ্যাংশ পাইবে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মাখনলাল চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বাবলু (পোশাকি নাম মনে নাই) আমার মৃতুর পর আমার অনাড়ম্বর পারলৌকিক শ্রাদ্ধও করিবে শ্রীমান বাবলু। এ জন্য আমি বাবলুকে পাঁচ সহস্র টাকা দিয়া গেলাম। পাচক ভোলানাথ ও আমার একটি জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট রহিয়াছে। আমার অবর্তমানে ভোলানাথ সহি করিয়া টাকা উঠাইতে পারিবে। আমার পারলৌকিক শ্রাদ্ধ হইবে তিল-কাঞ্চন মতে। বাগুর পল্লীনিকেতেনে হইবে। যদি শ্রীমান বাবলু শ্রাদ্ধর দায়িত্ব লইতে অস্বীকার করে, তবে ভ্রাতৃবৎ অমৃত পাত্রই উহা করিবে। দশ সহস্র টাকা শ্রীমান ভোলানাথকে দান করিলাম। বাকি টাকা আমার চিকিৎসার ব্যয়ের জন্য রাখিলাম। যদি চিকিৎসার জন্য ব্যয় করিয়াও কিছু বাঁচে, তবে তাহা বাগু গ্রামের দরিদ্র মানুষদের উপকারার্থে ব্যয় হইলে আমি কৃতার্থ বোধ করিব। আমাদের বাসন মাজে যে মেয়ে তাঁহার নাম বাসন্তী, রাজনৈতিক দলাদলিতে তাঁহার স্বামীর একটি হাত কাটা গিয়াছে। তাঁহাকে একটি সেলাই কল কিনিয়া দিতে ইচ্ছা করি।

এরকম একটা ফিরিস্তির শেষে আছে—আমার সুটকেসে শ্রীমান বাবলুকে লিখা একটি পত্র আছে। আমার মৃতুর পরে অমৃত উহা বাবলুকে দিবে।

অমৃতবাবু আমাকে একটা মুখবন্ধ খাম দিলেন। আমি খামটা খুললাম।

আমার পরম স্নেহের বাবলু।

তোমার শিশুকাল হইতেই আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্খী। পরমপিতার নিকট সর্বদাই তোমার কুশল কামনা করি, ও যেন চিরজীবন সৎ থাকিয়া চাকুরি করিতে পারে, সেই রূপ প্রার্থনা করি। আমাদের বংশে তোমাকেই খুব ব্রিলিয়ান্ট মনে হয়। তোমার ভ্রাতার নিকট হইতে বহু কষ্টে তোমার ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর জোগাড় করিয়াছি। তোমাকে অনেক কথা বলার আছে।

তুমি নিশ্চয়ই জান অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশেও আমাদিগকে ডাকাইতি করিতে হইত। আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে, সাধারণ লোকের কোন ক্ষতি করিব না। আমরা সরকারি ধন বা অসৎ ব্যক্তিদের গৃহেই ডাকাইতির উদ্দেশ্যে হানা দিতাম। আমি নিজে কয়েকটি ডাকাইতির নেতৃত্ব দিয়াছিলাম। ঢাকা জেলার বাকা গ্রামে এক ডাকাতের থৌলৎধার ছিল তিনি খুবই ধনী ছিলেন। নাম বিজয় দাস। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানগণ যে সমস্ত চুরি কিম্বা ডাকাইতি করিত, তদ্-লব্ধ অর্থ ওই ব্যক্তির নিকটই রক্ষিত হইত। তিনি সেই অর্থের অর্ধেক নিজে আত্মসাৎ করিতেন। অপরাধ হইতে মকদ্দমা, জামিন লওয়া, দারোগাদির উৎকোচ প্রভৃতির জন্য যে ব্যয় হইত, তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্বাহ করিয়া চোর ডাকাইতগণকে বিতরণ করিয়া দিত। চোর-ডাকাইতগণ চিরকাল দরিদ্র থাকিয়া যাইত। কিন্তু বিজয় দাস অত্যন্ত ধনশালী হইয়া পড়িয়াছিল। আমি প্রথম ডাকাইতিটি বিজয় দাসের বাড়িতেই করি। অতঃপর মিহিজাম রেলস্টেশনে

একটি ডাকাইতি করি। অধিক লিখিব না। বৃদ্ধ বয়সের দোষ। অনেক কথাই পুস্তকাকারে লিখিবার বাসনা ছিল। জনৈক পাবলিশার এই স্থলে আসিয়া আনুপূর্বিক লিখিবার জন্য অনুরোধ করায়' আমি বিস্তারিত লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার আর সন্ধান পাই নাই। যাহা হউক, এইরূপে কয়েকটি ডাকাইতির মাধ্যমে কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়। ইউরোপ হইতে অস্ত্র ক্রয়ের পরিকল্পনা ছিল। সেইহেতু প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা ছিল ওই চুক্তিতে কিছুই হইবে না। আমরা আমাদের কাজ চালাইতে থাকিলাম। আমাদের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দ্বারা মেদিনীপুরে পেডি সাহেব, ডগলাস সাহেব ও বার্জ সাহেব নিহত হন। আমাদের প্রদ্যোত ভট্টাচার্য, নির্মলজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় প্রমুখ এই মকদ্দমায় গ্রেপ্তার হন। নিমতার বিখ্যাত উকিল বিশ্বম্ভর ঘোষাল ব্রিটিশের পক্ষ লইয়া সেই মামলা সওয়াল করেন। বিশ্বম্ভর ঘোষালের পিতা চন্দ্রনাথ ঘোষালও ইংরাজের অনুগামী ছিলেন। আধুনিক ভাষায় এই অনুগামিতাকে চামচাবাজি কহে। ইংরাজ তাহাকে রায়বাহাদুর উপাধি দিয়াছিল। তাহারই পুত্র বিশ্বম্ভর ঘোষাল ওকালতিতে বহু ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। আমরা নিমতায় তাঁহার গৃহে ডাকাইতি করিতে যাই। বিশ্বম্ভরবাবুও বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমাদের গুলিতে তিনি আহত হন। যখন তোমার বিবাহের মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম, তাহাতে নিমতার ওই বাড়ি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। লজ্জায় তোমার বিবাহে উপস্থিত থাকি নাই।

বাড়ি ফিরলাম। মাথা ঝিম ঝিম। চিঠিটা সোনালিকে দেখাব।

সোনালি বেড়াল বাচ্চা খুঁজছে। হুলোর ভয়ে কোথায় যে সরিয়ে সরিয়ে রাখে। সোনালি বিড়বিড় করছে। আমি চিঠিটা বার করি। বলি পড় এটা।

সোনালি পড়ে। তারপর আমার দিকে বিহ্বল তাকায়। আমি বলি এরপর আর ওই কৌটোটা রাখার কোন মানে হয় না।

আমি দেরাজের ড্রয়ারটা টেনে খুলি। দেখি, কৌটোটা নেই। কোথায় গেল?

সোনালিকে জিজ্ঞাসা করি।

সোনালি জানে না।

টুণ্টু, ওই কৌটোটা কেথায় গেল, তুমি কি জান ওটা কোথায়?

টুণ্টুর মাথা নিচু। মৃদু ঘাড় নেড়ে বলে জানি না তো...

ধমকে উঠি। ডোনট লাই। বল কী করেছ ওটা?

টুণ্টু কাঁদো কাঁদো গলায় বলে আমি ওটা সরিয়ে রেখেছি বাপি, লুকিয়ে রেখেছি। ওটা থাকুক না আমার জন্য। প্লিজ।

শারদীয় বর্তমান, ২০০২

গিরিবালার গল্প

সন্ধ্যা লেগেছে, বৌমা ঠাকুরের আসনে ধূপকাঠির সুইচটা জ্বেলে দিয়েছে, ধোঁয়া নেই, গন্ধ নেই, ইলিকট্রিক ধূপের শুধু লাল আগুনটুকু আছে। এখন আর শাঁখ বাজেনা, বৌমার ফুসফুসে জল জমেছিল, শাঁখ বাজানো নিষেধ। টি.ভি. চলছে, হিন্দি। গিরিবালার চোখ এখনো ভাল। গিরিবালা টি.ভি.র দিকে তাকিয়ে, বেশ বুঝতে পারছেন একটি মেয়ে জল থেকে উঠে এল, এবার মনে হয় নাচবে। গিরিবালার সামনে ছোট প্লেটে একটু চাউ-চাউ। বিকেলের টিফিন। কেঁচোর মত এই সবও খেতে হয়, উপায় কী, আগে ঘোষের পোরা এসে একসের দুধ দিত, তখন দুধমুড়ি টুড়ি পেতেন গিরিবালা। এখন এক প্যাকেট দুধ। চায়েই শেষ। যে ছেলেটি দুধ দিয়ে যায়, কি নাম ওর? নাম জানে না। শুধুই মাদার ডেয়ারী।

মহুয়া এল। ও সালোয়ার কামিজ পরে। সঙ্গে একটা ছেঁড়া আর একটা ছুঁড়ি। গিরিবালা জানেন এখন এইঘর থেকে সরতে হবে। গিরিবালা লাঠিটা হাতে নেন। মেঝেতে ঠোকা দিয়ে দুবার তীব্র ঠক্‌ঠক্ করেন। কারণ গিরিবালা জানেন, এবারই হুকুম আসবে, যাও ঠাকুমা, নিজের ঘরে যাও।

নিজের ঘর মানে রান্নাঘরের পাশের ছোট্ট খুপরিটা, জানালা নেই, একটা তক্তাপোশ কোনক্রমে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। আগে ওটা ছিল হাঁসের ঘর। বাড়িটার পিছনেই ছিল ডোবা, ডোবা থেকে কলমী তুলতো গিরিবালা, শুশনী। হাঁস ডাকতো, আয় আয় চৈ-চৈ।

ঐ ডোবার যায়গায় এখন লালু সাহার ছেলের কারখানা। গ্রীল তৈরী হয়, সব সময় ঝমর ঝমর। গিরিবালা চোখে এখনও মন্দ দেখেন না। একটা জানলার শখ মনে মনে রয়েছে। গিরিবালা বারান্দা বেয়ে ওর ঘরে যাবেন ভেবেও একবার আইন অমান্য করতে ইচ্ছে করল। উনি আবার চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসলেন।

যদি ওরা বলে, ওঘরে যাও, উনি বলবেন, না—যামুনা। কিন্তু কিছু হ'লোনা। ছেলে মেয়ে দুটো বলল আজ আর আড্ডা মারবনা রে, ওরা চলে গেল। ফলে কিছু হ'ল না। ১৪৪ ধারা, কারফিউ, কিছু না এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন গিরিবালাকে ডাকে।

—গিরিবালা সরকার নামে কেউ এ বাড়িতে থাকেন! এই বুড়িকে আবার ডাকবে কে? মহুয়া বাইরে আসে। দেখল, জিন্‌স এর উপর পাঞ্জাবী পরা দাড়িওলা, আঁতেল আঁতেল দেখতে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

—এখানেই কি গিরিবালা সরকার থাকেন, স্বাধীনতা সংগ্রামী!

ঠাকুমা সম্পর্কে স্বাধীনতা 'সংগ্রামী' শব্দটা বহুদিন পরে শুনল মহুয়া। ছোটবেলায় শুনেছে।

মহুয়া ছেলেটিকে গিরিবালার কাছে নিয়ে যায়। ছেলেটি গিরিবালাকে প্রণাম করে।

জিজ্ঞাসা করে, আপনার কি তাম্রপত্র আছে?

গিরিবালা বলেন—আম্রপত্র? গাছে। পেড়ে নাও।

তাম্রপত্রের কথা শুনেই মহুয়ার মা ঘর থেকে চলে আসে। এসেই বলে তাম্রপত্র টাম্রপত্র কিচ্ছু নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামী পেন্‌শনটুকুও পান না।

—কাগজপত্র নেই?

কাগজপত্র মানে জেল থিকা ছাড়ান পাইবার কাগজ। রাখে নাই। থাকলেও দ্যাশে। থাকার মধ্যে আছে শুধু রিফিউজি সার্টিফিকেট। এসব জিগান ক্যান? আপনে ফ্রিডম ফাইটারের ইন্‌সপেক্টার?

মহুয়ার মায়ের এই প্রশ্ন শুনে ছেলেটি মৃদু হাসে। দাড়ি চুলকে বলে, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর চলছে জানেন তো।

মহুয়ার মা বলল, তাই বুঝি!

ছেলেটি বলল, হ্যাঁ। ঐ জন্য কাগজে একটা কভার স্টোরি করব— যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এখনো বেঁচে আছেন, তাঁদের নিয়ে।

মহুয়া বলল—আপনি কি করে জানলেন, আমার ঠাকুর্মার কথা? এ পাড়ার কেউ কিন্তু জানে না। ছেলেটি ব্যাগ থেকে একটি বই বার করল। বইটির নাম স্মৃতিকথা। লালচে হয়ে গেছে পাতা। একটি ছবি বার করে দেখাল ছেলেটি। গান্ধীজী খালিগায়ে বসে রয়েছেন, তার পিছনে কয়েকজন মহিলা। ছেলেটি বলল, দেখুন তলায় লেখা আছে নোয়াখালির রামগঞ্জে গান্ধীজীর সঙ্গে বীণা দাস, গিরিবালা সরকার এবং লেখিকা।

ও-ও-মা, দেখি দেখি...। হৈ-হৈ পড়ে গেল। মহুয়ার মা বলল—একদম, রিফিউজি সার্টিফিকেটের ছবিটার মতই মুখ। গিরিবালার হাতে একটা হাতপাখা, গান্ধীজীকে বাতাস করছেন। সহসা চীৎকার করে উঠল। এই ছবিটা কলেজে নিয়ে গিয়ে সব্বাইকে দেখাব।

কী যে হচ্ছে গিরিবালা ঠিক বুঝতে পারছেন না। মহুয়া বইটা গিরিবালার সামনে ধরে। বলে চিনতে পারছ ঠাক্‌মা? গিরিবালা কয়েক মুহূর্ত ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোথায়, কোথায় পাইলিরে তোরা এই ফডো? এইতো বীণাদি, এইতো কুঞ্জরানী। মহুয়া গিরিবালার ছবিতে আঙুল দেখিয়ে বলল, আর এটা কে? গিরিবালা হেসে উঠলেন। গিরিবালার দাঁতহীন মাড়ির মধ্যখানের ছোট্ট গোলাপী রঙা মাংস পুঁটলিটুকুও আহ্লাদ করে উঠল। তারপর গ্রাম্য কিশোরীর মত লজ্জায় ঢাকলেন মুখ, সম্পূর্ণ নোয়াখালি উচ্চারণে বললেন, ইগা ত আঁঞ্রিয়েনা....।

ছেলেটি বলল—কুঞ্জরানী ভৌমিককে মনে আছে তো? আমি তাঁর নাতি হই।

—হাঁচা নি? হাঁচা?

মহুয়া দোভাষীর মত বলল, ঠাকুমা বলছে—সত্যি? সত্যি নাকি? আসলে ব্যাপক আবেগে পিওর নোয়াখালি বেরিয়ে আসছে।

ছেলেটি বলল, হ্যাঁ ঠাকুর্মা, সত্যি।

—কুঞ্জ এখন আছে কই?

ছেলেটি উপরের দিকে আঙুল তুলল। গিরিবালা বললেন—ঈশ্বর ব্যাবাকেরেই নেয়, আমারেই নেয় না।

—কুঞ্জ ভইনডি কবে গেছে?

—দু'বছর।

—কুঞ্জ ভইনডি তো দ্যাশেই ছিল, দ্যাশভাগের পর এদিকে আসে নাই।

—না না, চৌষট্টিতে চলে এসেছিল।

—থাক কই?

নিউব্যারাকপুর। কিন্তু গত চার বছর ধরে এদিকেই আছি আমরা। শকুন্তলা অ্যাপার্টমেন্ট। গিরিবালা জানেন কাছেই একটা ভাগাড় ছিল, শকুন বসতো, নাম ছিল শকুনতলা। এখন সেখানে বড় বড় দালান কোঠা হয়েছে।

—তোমরা চাইরবচ্চর শকুন্তলায়? কুঞ্জ ভইনডিও!

—ছেলেটি মাথা নাড়ে।

—হায় রে পোড়া কপাল, এখান থিকাই গেল গিয়া, কিন্তু আমার লগে দেখা হইল না। তুমি আগে আইতে পাররলানা আমার কইলজা।

—আগে তো জানতাম না...

—অহন জানলা কেমতে!

—বইটায়। বইতে অনেকের কথা লেখা আছে। সরোজনলিনী, আশালতা সেন, সুশীলা মিত্র, কিরণবালা রুদ্র, রাজিয়া খাতুন, গিরিবালা সরকার ছেলেটি সূচিপত্র দেখে গিরিবালার কথা বের করে। পড়তে থাকে—

মনে পড়ে ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি, মাস্টারদা আর তারকদার ফাঁসী। সেদিন আকাশে সূর্যদেবের দেখা নাই, টিপ টিপ বৃষ্টি, বিশ্বচরাচরও যেন শোকাকুল। আমি সেই দিন মাইজদিয়া গ্রামের ভুবন সরকারের বাড়িতে। চট্টগ্রাম বিপ্লব ব্যর্থ হইলেও বেশ কিছু বন্দুক ও রিভলভার চট্টগ্রামেই ছিল। স্থির হইয়াছিল অস্ত্রশস্ত্রগুলি বিভিন্ন জেলায় বিতরণ করা হইবে। আমি ভুবনদাকে দুইটি পিস্তল দি। ভুবনদা মারফৎ তাহার একটি পাইয়াছিলেন উজ্জ্বলা মজুমদার। উজ্জ্বলা পরবর্তীকালে ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে বিবাহ করিয়াছেন। এই উজ্জ্বলা মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এন্ডারসন সাহেবকে হত্যা করিবার জন্য দার্জিলিং গিয়াছিলেন। আমার ছোট ছেলে পাঁচ সাত বৎসর পূর্বে আমাকে দার্জিলিঙ বেড়াইতে নিয়া গিয়াছিল, আমার কেবলই মনে হইতেছিল কখন দেখিব সেই ঘোড়দৌড়ের মাঠ, যেখানে উজ্জ্বলার কোমল হাতে কঠিন পিস্তল গর্জিয়া উঠিয়াছিল।

গিরিবালার কথা বলিতে গিয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া গেলাম, পাঠক, নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন, ইহা বৃদ্ধ বয়সের দোষ। ভুবনদার গৃহে দ্বিপ্রহরবেলায় পৌঁছিলাম, আমাদের উদ্দেশ্যের কথা ভুবনদা জানিতেন। বৌদিকে অন্নব্যাঞ্জন প্রস্তুত করিতেও বলিয়াছিলেন, কিন্তু বৌদি সেইদিন অরন্ধন পালন করিতেছিলেন। বৌদির বয়স আমার চেয়ে কমই হইবে। শুনিলাম তাঁহার নাম গিরিবালা। কোলে একটি দুই আড়াই বৎসরের সুন্দর শিশু। গিরিবালা চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতেছে। আমাকে বলিল, ভইনডি, তুমি অতিথি, ঘরে চিড়া মুড়ি আছে, খাও। আজ মাষ্টারদার ফাঁসি, রাঁধিবনা, চুলে তেল দিবনা।

আমি বলিলাম, নিশ্চয় নিশ্চয়। রাত্রে গিরিবালার সঙ্গে একত্রে শয়ন করিলাম। হায়! আমি কেন তাঁহাকে সেই রাতে স্বামীসহ শুইতে বলিলাম না। পরদিন প্রভাতে আমি কুমিল্লা অভিমুখে ও ভুবনদা ঢাকার দিকে চলিয়া গেল। ভুবনদা নারায়ণগঞ্জে একটি পিস্তল পরিকল্পনামাফিক হস্তান্তর করিলেন। অপর পিস্তলটি ফরিদপুরে ধীরেন নাগের কাছে পৌছাইবার কথা, কিন্তু চাঁপাখোলা স্টিমার ঘাটে ভুবনদা ধরা পড়িয়া গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই পিস্তলটি নিজের মাথায় ঠেকাইয়া গুলি করিলেন। ভুবনদা গ্রেপ্তার হইলে হয়তো আমিও ধরা পড়িতাম, কিন্তু ভুবনদা আমাদের বাঁচাইবার জন্য আত্মাহুতি দিলেন। সেই দিনটি ছিল ১৫ জানুয়ারী, সেই দিনেই বিহারে প্রবল ভূমিকম্প হয়...

গিরিবালার চোখের দিকে তাকায় ছেলেটি। গিরিবালার চোখের কোণায় কোন জলের চিহ্ন নেই। বহুযুগের ওপার থেকে আসা একটা দৃষ্টির সামনে এসে ছেলেটি থেমে যায়।

মহুয়া বলে—তারপর?

আমি গিরিবালার সঙ্গে তখন দেখা করি নাই, করিতে পারি নাই। যেন মনে হইতেছিল গিরিবালার বৈধব্যের জন্য আমিই দায়ী। ভাবিলাম চিঠি দিই, লেখার ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না।

গিরিবালার সঙ্গে আমার পুনরায় দেখা হইল ১৯৩৫ সালে। তখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট এর জন্য কথাবার্তা চলিতেছে। ব্যবস্থা পরিষদে অংশগ্রহণের জন্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার চেষ্টা চলিতেছে, আমরা ইহার বিরুদ্ধে দেশের ডাক পত্রিকায় প্রচার করিতেছি, দেশের ডাক পত্রিকাটি নোয়াখালি সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। তখন মাইজদিয়া গ্রামে গিরিবালার আর একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, ভুবনদার মৃত্যুর সময় গিরিবালা অন্তঃসত্ত্বা ছিল।

গিরিবালা মহুয়ার মাথায় হাত দিলেন। বললেন—এই হইল তোর বাবা। কুঞ্জ ভইনডি জিগাইছিলেন—নাম রাখছ কিছু? আমি কইলাম নাম কি রাখুম তুমিই কও। কুঞ্জ ভইনডি কইলেন—নাম রাখ স্বদেশ। বড়টার নাম মনোরঞ্জন, ছোটটার নাম রাখা হইল স্বদেশরঞ্জন।

ছেলেটি বলল—ঠাকুর্মা আর বেশি কিছু লেখেন নি। তবে অন্য একটা ঘটনার কথা আছে। পড়ছি। গিরিবালা নিজে বিধবা হইয়াও আমাকে হাঁসের ডিমের ডালনা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। গিরিবালা আমাকে বলিয়াছিলেন আমাকেও তোমাদের কাজে নাও। আমি বলিলাম, তুমি স্বামীহারা। বরং শিশুদের যত্ন নাও। দেশ স্বাধীন হইলে দেশের বহু কাজ থাকিবে, সেই কাজ তোমরা কারও। গিরিবালা তখন অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে একটি খাতায় একটি কবিতা দেখাইল। আমি পড়লাম। কবিতা হিসাবে হয়তো উৎকৃষ্ট নহে, কিন্তু গিরিবালার অন্তরের অভিলাষ খাঁটি সোনার মত বাহির হইয়া আসিয়াছে। আমি উহা দেশের ডাক পত্রিকায় ছাপিবার জন্য চাহিয়া নিলাম। কিন্তু দেশের ডাক-এর প্রেস-এ পুলিসের হামলার জন্য সেই কবিতাটি ছাপিতে পারি নাই। আজ এই সুযোগে এই গ্রন্থটিতে ছাপিয়া দিলাম। কবিতাটি আমি যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম।

স্বাধীনতার স্বপ্ন

বিপ্লবীর পত্নী আমি সাধারণ নারী
বড়ছেলে হাঁটে মোর, ছোট হামাগুড়ি
দোঁহে তারা পিতৃহীন, পিতা লোকান্তরে
দারিদ্র সর্পসম বাস করে ঘরে
তথাপি স্বপ্ন দেখি ফিরিতেছে দিন
আমাদের জন্মভূমি হয়েছে স্বাধীন
ছোট পুত্রের নাম আমি রাখিনু স্বদেশ

সে যেন ভালবাসে তার পুণ্য দেশ
মাঝে মাঝে স্বামী মোর স্বপ্নে দেন দেখা
দৃঢ় হস্তে ধরিয়াছে স্বাধীন পতাকা।

ছেলেটি চুপ করে। বাড়ির সবাই চুপ। চুপ হয়ে আছে ছাতের হুক থেকে ঝোলা আগামী শীতের লেপ। গিরিবালার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে মহুয়া। গিরিবালার কুঁচকে যাওয়া হাতের চামড়ায় হাত রেখে বলে—ঠাকুরমা, আর কবিতা লেখনি? গিরিবালা থান কাপড়ের খুঁটটা মুখের সামনে নিয়ে লজ্জা লজ্জা মুখে বলে মনে মনে লিখি, কইনা।

ছাপা হয়েছিল কিছু? কোনদিন? ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে।

—একবার সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির পত্রিকায় ছাপছিলাম, আটতিরিশে।

আমাদের চিন্তা নাইরে আর—
সুভাষ বসু হইল কর্ণধার।

হরিপুরা কংগ্রেসের পরে লিখছিলাম।

মহুয়ারা মা বলল—জেল খাটার কথা নাই বইটাতে? উনি যে জেল খাটছিলেন একবার।

ছেলেটি বলল—এই ব্যাপারটা এখানেই শেষ—এই চ্যাপটারের হেডিং ছিল। গিরিবালার কথা। তবে উনি গিরিবালা দেবীর জেলে যাবার বৃত্তান্তটা অন্য যায়গায় লিখেছেন। ছোট্ট করে এক জায়গায় আছে, দাঁড়ান, পড়ছি।

...উনিশশো ছত্রিশের ১৬ই নভেম্বর গ্রেপ্তার হইলাম। জেলখানায় খবর পাইলাম চটকল-সুতাকল ধর্মঘট শুরু হইয়া গিয়াছে। মুজাফফর আহেমদ, বঙ্কিমবাবু, শিবনাথ-বাবু প্রমুখ কম্যুনিষ্টগণ নেতৃত্ব দিতেছেন। কম্যুনিষ্ট কাহাদের বলে আগে বুঝিতাম না ; জেলে গিয়া বুঝিলাম। গণেশদা তখন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে গণআন্দোলনের কথা বলিতেছেন, এদিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শ্রমিকদের সমর্থনে এক বিবৃতিতে বলেন এই ধর্মঘট নায্য ও যুক্তিসঙ্গত। শ্রমিকদের দাবী মানবতার দাবী। উনচল্লিশ সালের দশই সেপ্টেম্বর মুক্তি পাইলাম। তখন যুদ্ধ চলিতেছে। বৃটিশ জার্মানীর বিরুদ্ধে রহিয়াছে। এমতাবস্থায় বৃটিশকে বিব্রত করা ঠিক হইবে কিনা এ লইয়া আমাদের মহলে দ্বিমত দেখা দিল। আমরা আন্দোলনের পক্ষে। এ সম্পর্কে হেলেনা দত্ত' অধ্যায়ে বিস্তারিত লিখিয়াছি। আমার স্বামী আমাকে উপদেশ দিলেন যথেষ্ট হইয়াছে, এবার পুত্র বড় হইয়াছে, ঘর সংসার কর। আমি বলিলাম যদি বলি তুমি এবার ডাক্তারি বন্ধ কর, তুমি কি তাহা শুনিবে? কিন্তু মুখে এরূপ কহিলেও মনে মনে ভাবি এবার সংযত হইতে হইবে। কিন্তু তাহা হইয়া উঠিলনা। বেয়াল্লিশের আন্দেলনের ঝড় এদিকেও প্রবেশ করে। অনুকুল চক্রবর্তী, নগেন গুহরায়, গিরিজাবাবু প্রমুখ নোয়াখালি জেলার নেতারা সবাই অন্তরীণ। 'দেশের বাণী' পত্রিকার ভার গ্রহণ করি। ইতিমধ্যে ফেনী থানায় অগ্নি সংযোগের চেষ্টার অভিযোগে কংগ্রেসের গন্ধ আছে এমন যাহাকে পাইল, গ্রেপ্তার করিতে লাগল। আমাকেও গ্রেপ্তার হইতে হইবে অনুমান করিয়া আমি গিরিবালার গৃহে আত্মগোপন করিলাম। কিন্তু সেখানে হইতেও অমি গ্রেপ্তার হইলাম ও বিনাবিচারে একবৎসর কারান্তরালে রহিলাম। কারাকাহিনী অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলিব ইচ্ছা রাখি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাকে আশ্রয় দেবার অপরাধে নিরীহ গিরিবালাকেও জেল

খাটিতে হইল।

মহুয়ার মা তক্ষুনি বলে উঠল—এইতো, এইতো প্রমাণ। এই প্রমাণ দেখাইয়া পেনশন পাওয়া যায় না?

ছেলেটি হঠাৎ চুপ করে যায়।

এই বইটা আমাদের দিয়া যান না—মহুয়ার মা বলল।

—বইটা? মানে একটা কপিইতো আছে, আসলে আটষট্টি সালের ছাপা, আর নেই। তা হলে অন্তত জেরক্স...জানেন, আমার শাশুড়ি পেনশন পান না। কত এলেবেলে লোক একদিনও জেল না খাইট্যা পেনশন পাইতেছে...

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল—কতদিন জেল খেটেছিলেন উনি?

মহুয়ার মা বলল—শুনেছিলাম তো ছয় মাস। তারপর গিরিবালার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করল, কয় মাস গো মা?

গিরিবালা বলে— বেশি না, বেশি না, তিন মাস।

—তিন মাস? আপনে কিন্তু ছয়মাস বলছিলেন।

—না, তিন মাস পরেই বরদা উকিল ছাড়াইয়া নিয়া আসে। মহুয়ার মা বলে—একটু চা করি? অনেক কথা শোনলাম, জানতাম না...মহুয়ার মা চা করতে গেল। গিরিবালা ছেলেটিকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। ছেলেটি গিরিবালার কাছে গেল। গিরিবালা বলল—নাম কও।

—অনির্বাণ

—কুঞ্জ ভইনডি আমার সম্পর্কে আর কি কইছে?

—কত কিছু।

—হাঁচা?

—হ, হাঁচা

—আমি যে এখানে থাকি জানলা কেমনে?

—একজনার কাছে শুনলাম।

—সে কেডা?

—ভবতোষ গুহরায়। উনি এই কলোনীর সেক্রেটারী ছিলেন। কলোনীর স্বাধীনতা উৎসবে তিনি একবার আপনাকে দিয়ে ফ্ল্যাগ তুলিয়েছিলেন।

—হ! কী লজ্জা। বহু বচ্ছর আগে। ভবদাদা এখনও আছেন বাইচ্যা?

—আছেন।

—কোথায় আছেন ভবদাদা? এই কলোনী ছাইড়া চইল্যা গেছেন তো জানি।

—যোধপুরপার্কে। ছেলে বড় ডাক্তার।

ভবতোষ গুহ রায়ের নাতি আমার বন্ধু। উনিই বলেছেন আপনার কথা।

—এরা কেউ এইসব জানে না। এই যে এতডি লোক রাস্তায় যায়, কেউ জানে না। আমার নাতি নাতনিও জানে না। টিভির ভিতরে বইস্যা যারা সাবান মাখে, তারাও না।

অনির্বাণ বলে এই জন্যেই তো লিখব!

গিরিবালা তখন দু'হাতে ঐ বইটিকে নেয়, যেন তুলে নিল আইন অমান্যের নুন। অনির্বানের কাঁধটা খামচে ধরে, যেন খামচে ধরেছে জালালাবাদের পাথর। কানের কাছে

মুখ নিয়ে যায় তারপর যেন গুপ্তমন্ত্র বলছে কোন। বলে—আমার পেনশনের জন্য একটু চ্যাষ্টা কর কইলজা আমার, বড় গঞ্জনা, বড় পরাধীন আমি, পরাধীন...

মহুয়া চা নিয়ে এল। রাত হয়েছে বেশি। অনির্বাণের আরও কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল, আজ আর হ'ল না। একটু দূরে মহুয়ার মা। হাতছানিতে ডাকল অনির্বাণকে। হাতছানিতে ব্যস্ততা, কাতরতাও। মহুয়ার মা বলল, ঐ যে ছবিটা, গান্ধীজীর সঙ্গে, ছবিটা দেবেন? এটাইতো আসল...।

অনির্বাণ মাথা নাড়ে ধীরে, পুরোটা হ্যাঁ এতে বোঝায় না। বলে, ছবিতো আর নেই, আপাতত ছবিটার একটা জেরক্স দিয়ে দিই যদি...

অনির্বাণ দেখল চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অনির্বাণ বলল—যদি অনুমতি করেন, কাল আসব আবার। ছবিও তুলতে হবে একটা।

এমন সময় একটা লোক ঘরে ঢুকল, ঘামগন্ধ, মদেরও। মহুয়া বলল—বাবা এসেছে।

পরদিন সকালবেলায় গিয়েছিল অনির্বাণ। গিরিবালা ইস্ত্রি করা থান পরে বারান্দায় বসে আছেন। ঘরের বিছানার চাদরও টানটান। অনির্বাণ গান্ধীজী সম্পৃক্ত ছবিটা জেরকস করে এনেছে। জেরকস ছবিটি দেখে মহুয়ার মা দুঃখ পেল।

এ-যা, চিনাইতো যায় না। অনির্বাণ বলল, মুল ছবিটাতো নেই, কী আর করা যাবে। অনির্বাণ ক্যামেরা নিয়ে এসেছে। বলল, ঠাকুর্মা ছবি তুলব একটা। গিরিবালা বললেন—ফডো নিবা? যদি নিবাই, আমার বড় পোলাটার সঙ্গেই নাও।

বড়ছেলে? কোথায় উনি?

গিরিবালা উপরের দিকে হাত তুললেন।

মানে?

শহীদ শহীদ—শহীদ

তবে?

শহীদবেদীটা আছে। কতদিন দেখিনাই। সেইখানে যাবা? চল, যামু, অর লগে একসঙ্গে একটা...

মহুয়ার মা বলল—সে তো অনেকটা দূর—গিরিবালা বললেন পারুম, আমি পারুম।

অনির্বাণ ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না...গিরিবালা বলেন—আমার মনের মধ্যে একটা বাসনার ফুল ফুইড্যা আছে। আমার বড় পোলাডার শহীদবেদীর সামনে খাড়াইয়া আছি, সেই একখান ছবি আমার ঘরে থাক, অরা তো জানলনা কিছু...মহুয়ার মাথায় হাত রাখেন গিরিবালা।

অনির্বাণ জিজ্ঞাসা করল, কী ভাবে শহীদ হয়েছিলেন উনি? কীভাবে?

সে তো অনেক কথা? তোমরা কও স্বাধীনতার পঞ্চাশ বচ্ছর, আর আমি কই দ্যাশভাগের পঞ্চাশ বচ্ছর। আমরা চইলা আইলাম, আমার ভাশুর ঠাকুর আইল, আইল আমার মাইজদিয়া গ্রামের বত্রিশ পরিবার একলগে। জীবনে প্রথম কইলকাতা। তারপর জবরদখল। লাঠালাঠি মারামারি। জমির মালিকদের গুণ্ডার লাঠির বাড়িতে আমার মনোরঞ্জন মরল। সেইখানেই শহীদবেদী আছে একটা। আমারে নিয়া চল...।

মহুয়ার মায়ের দিকে তাকাল অনির্বাণ। তুমুল নিষেধ কিছু নেই। রিক্সা ডেকে এনে যত্ন করে গিরিবালাকে বসায় অনির্বাণ। রিক্সা চলে।

অনির্বাণ বলে, আপনার ছোট ছেলেইতো সেই স্বদেশরঞ্জন। কাল যাকে দেখলাম।

হ।

কী করেন?

দোকান গো বাবা!

কিসের দোকান?

শুনছিলাম তো মেয়েলোকের জামাকাপড়ের কারবার।

কোথায়?

গড়িয়াহাটের ফুটপাথে আছিল দোকান। শুনলাম পুলিশে ভাইঙ্গা দিছে। অখন এই বাজারেই বহে, সূর্য্যসেন মার্কেট।

রিক্সা যাচ্ছে সূর্যসেন মার্কেটের দিকে। গিরিবালা কথা বলেনা কোন। সময় বহে যায়। রিক্সা বহে যায় দাম বেড়ে যাওয়া জমির পাশ দিয়ে নতুন পিচপড়া রাস্তায়। গিরিবালা অনির্বাণের হাতটা টেনে নেয়। বলে—কুঞ্জ ভইনডি যা লেখছে, পুরাপুরি লেখে নাই। সইত্য লেখেনাই সব।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আমার ঘরে আত্মগোপন করে নাই কুঞ্জ। আমিই অরে ডাকছিলাম। আমার লাইগ্যাই সে ধরা পড়ছিল।

রিক্সা যাচ্ছে কোচিং সেন্টার—ভিডিও ক্যাসেটের দোকান—মশলা-দোসার গাড়ির পাশদিয়ে।

'অনুকূল কাকা তখন জেলে। অনুকূল চক্রবর্তী। হরপ্রসন্ন দাদা, গিরিজা ঠাব্বাই তখন দ্যাশছাড়া। ঠাব্বাই নি বুঝ? ঠাকুরভাই। সুশীলা দিদি আমারে খবর দিল একখানা কাম করন লাগব। গিরিবালা, তুমি কি পারবা। আমি জিগাইলাম কী কাম! সুশীলাদিদি কইল অনুকূল চক্রবর্তীর বৌ সাইজ্যা জেলে যাও, দ্যাখা কর। আমি বিধবা হইয়াও সিন্দুর পরলাম, কতদিন পরে সিন্দুর...। টাঙাইলের লাল শাড়ি, ইসরে, কী লাল.....। অনুকূল কাকা আমারে কয়েকটা খবর দিলেন, সেই খবর সুশীলা দিদিরে দিমু...। ফিরত্যাছি, এমন সময় এক দারোগা, নাম জানি না, দারোগা কইল তোমারে চিনছি আমি, তুমি কে আমি জানি, আমার লগে চল। একখানা ঘরে সেই দারোগা আর আমি। দারোগার নাম জানি না। সেই ঘরের কপাট বন্ধ হইল। আমার বয়স একুত্তিরিশ। দারোগা কয় আমি যা চাই দ্যাও, ছাইড়া দিমু, তেড়িবেড়ি করলে ব্যাবাক ফাঁস কইরা দিমু। আমি দিলাম। তারপর আমার বিপদ। বিপদের কথা কারে কই। সুশীলা দিদিরে কইলাম কুঞ্জ ভইনডিরে খবর দাও, আমার বড় দরকার। কুঞ্জ ভইনডি তখন বিধবার বেশে বৃন্দাবন যায়, সব ঠিকঠাক, কিন্তু আমার ডাকে আইল। চাঁদপুর নিয়া গেল আমারে। এল. এম. এফ স্বদেশীডাক্তার। ম্যাঘনার কালো জলে ভাইস্যা গেল নষ্ট করা বাচ্চা আমার। কেউ জানল না। কুঞ্জ ভইনডি আবার আইল আমারে সঙ্গে নিয়া ধরা পড়ল।

রিক্সা চলে এসেছে সূর্য্য সেন মার্কেট। এটা ছিল কলোনীর মাঠ। এই মাঠেই উদ্বাস্তু সম্মেলনে নেতারা বক্তৃতা দিতেন। এখন এই মাঠের অনেকটাই বাজার। মার্কেট কমপ্লেক্স। নেতারা এসে উদ্বোধন করে গেছেন। বাজারের সামনেই সূর্য সেনের নতুন আবক্ষ মূর্তি। এই মাঠেরই এক কোণে লাঠির বাড়িতে মরেছিল মনোরঞ্জন। উদ্বাস্তু কমিটি শহীদ বেদী তৈরী করেছিল। 'সিমেন্টের বেদির তলায় সাদা পাথরে লেখা ছিল—উদ্বাস্তুদের বাঁচার লড়াইয়ের বালক শহীদ মনোরঞ্জন সরকার স্মরণে। স্বাধীনতা

দিবসের পতাকা ওঠানো হ'ত ঐ শহীদবেদীর সামনেই। গিরিবালা পনের বছর পর এদিকে এসে শহীদ বেদীটা খুঁজছেন।

রিক্সাওয়ালাকে আঙুল উঁচিয়ে শহীদবেদী দেখাল। গ্রীলে ঘেরা বেশ বড় একটা শহীদ বেদী। গ্রীলের কাস্তে-হাতুড়ি। গিরিবালা বলল—না, না, এরকম না, খুব গরীব, আমারই মত, শহীদবেদীটা...কই,কই সেইটা!

রিক্সাওলা এদিক-সেদিক ঘুরল, পেল না। শেষকালে বলল, এবার নামেন। অনির্বাণ গিরিবালাকে যত্ন করে নামিয়ে দেয়। গিরিবালার ন্যুব্জ দেহ, হাতে লাঠি। প্রখর তাকানো। চারিদিকে দেশের উন্নতি। গিরিবালা দেখেন এস. টি. ডি. বুথ, বোঝেন না, ফাস্টফুডের দোকান, শোকেসে সাজানো বাহারি খাবার, দেখেন কাঁচের ভিতরে পাথরের মেয়ে, তার বুকে ছোট জামা, কোমরে ছোট প্যান্ট। তারপর দেখেন একটা ঘরের উপরে বড়বড় অক্ষরে লেখা 'স্বাধীনতা'। গিরিবালা হেঁকে ওঠেন ঐ যে স্বাধীনতা লেখা। যাব ঐ দিকে যাবা? অনির্বাণের চোখ 'স্বাধীনতার তলায় ছোট লেখাগুলির উপর। 'এলাকার মেয়েদের নিজস্ব বিউটি পার্লার। সূর্য সেন মার্কেট।' অনির্বাণ একটি মাঝবয়সী লোককে জিজ্ঞাসা করল, এখানে কোন শহীদবেদী ছিল?—ছোট্ট ধরনের? মনোরঞ্জন সরকারের নামে?

লোকটি বলল—কার নামে জানিনা, একটা আছে, ঐ স্বাধীনতার পিছনে। অনির্বাণ গিরিবালার হাত ধরে স্বাধীনতার পিছনে গেল। স্বাধীনতার ঠিক পিছনে আনন্দমেলা। ভিডিও গেম খেলার যায়গা। স্বাধীনতা ও আনন্দমেলার ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে ঐ লোকটি গতকাল রাতে ঘাম ও মদের গন্ধ সহ যাকে দেখেছিল। স্বদেশরঞ্জন।

স্বদেশরঞ্জন অনির্বাণকে চীৎকার করে বলল, কী ব্যাপার, আমার মা কে এখানে নিয়ে এসেছেন কেন?

গিরিবালা বলল—আমিই আইছি। বহু দিন মনোরঞ্জনে দেখি নাই। আর বেদীটা কই? খুঁজতাছি, পাইনা...।

স্বদেশ বলল—সেইটাতো এইখানেই আছে। দুটো ম্যাক্সি দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে দ্যাখাল—এইতো আছে।

গিরিবালা ঝুঁকলেন। বিবর্ণ অক্ষরগুলির দিকে ক্রমশ ঝুঁকে যেতে থাকলেন গিরিবালা, যেখানে ওর শহীদ ছেলের নাম লেখা আছে।

শারদীয় নন্দন, ১৯৯৭

দেশের কথা

আমার পিতামহ ছিলেন স্কুল শিক্ষক। নোয়াখালি জেলার দত্তপাড়া ইস্কুলে ভূগোল পড়াতেন। স্বাধীনতা মানে দেশভাগের পর আমার দাদু-ঠাকুর্মাদের এ ধারে চলে আসতে হয়েছিল। আমার জন্ম স্বাধীনতার বেশ কয়েক বছর পর।

ছোটবেলায় দাদুর কাছেই পড়তাম। ভূগোলটা খুব ভাল পড়াতেন। ম্যাপ আঁকার নিয়মটা খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের ম্যাপ আঁকার সময় বলতেন ইংল্যান্ডের ম্যাপ আমেরিকার ম্যাপ আমি এক টানে আঁইক্যা দিতে পারি। বহু বছরের অইভ্যাস। ভারতের ম্যাপও নিমেষের মধ্যেই আঁইক্যা দিতে পারতাম, ব্লাকবোর্ডে কত আঁকছি, ফরটিসেভেনের পর তো সেই অইভ্যাসে কাম হয় না। ইন্ডিয়ার শরীরের থিক্যা যে মাংসগুলি খুবলাইয়া লইল সেই খুবলাইয়া লওয়া মাংস বাদ দিয়া বাকিটা আঁকতে হয়। নখের আঁচড়ের দাগগুলি ঠিকমত আঁকতে পারি না এখনও।

বাংলাদেশ হাইকমিশনের ওয়েটিং রুমের দেওয়ালে বাংলাদেশের ম্যাপটার সামনে দাঁড়িয়ে দাদুর কথা মনে পড়ল। দাদুর কাছ থেকে শোনা হারিয়ে যাওয়া শব্দগুলিকে খুঁজতে লাগলাম। এই তো চাঁদপুর। ওই তো মতলব, মতলবের দই-এর কথা খুব শুনতাম যতবার যত ভাল দই এনেছি, গাঙ্গুরাম, জলযোগ, যেখানে থেকেই হোক, মতলবের দইয়ের কাছে নাকি কিছু নয়। ছোট বেলায় দাদুর হাত ধরে বিয়ে বাড়িটাড়ি নেমন্তন্ন খেতে যেতাম। ওখানে খাঁটি নোয়াখালি ভাষায় কথাবার্তা হত। কোন সবজিতেই দেশের বাড়ির সবজির স্বাদ পেতেন না ওঁরা, কোন মাছেই না, আর শেষ পাতে দই এলে সমবেত আপশোষ শুনতাম মতলব, হায় মতলব। গোয়ালন্দ দেখলাম। ওখান থেকেই স্টিমারে করে চাঁদপুর নামতে হত চাঁদপুর থেকে কীভাবে যেন দত্তপাড়া যেতে হত। আমি দত্তপাড়া গ্রাম নামটা ওখানে খুঁজে পেলাম না। লক্ষ্মীপুর খুঁজে পেলাম। ওটা আমার মামার বাড়ি। দেশ ভাগের পরও আমার মায়ের বাবা-মা ওখানেই থাকতেন। আমার মায়ের বাবা, দাদামশাই মাঝে মাঝে আসতেন। ওঁকে আমরা বলতাম পাকিস্তানি দাদু। একটা পোটলার ভিতর থেকে বার করা একটা রোল করা জিনিসের প্রতি আমার প্রতীক্ষা থাকত। ওটা হল আমসত্ত্ব। আমসত্ত্বের সারা গায়ে ফুটে থাকতো একটা নকশা। যে পাটির উপর আমের রস মাখিয়ে আমসত্ত্ব তৈরী করা হত, সেই শীতল পাটির নকসাটা ফুটে উঠত শুকনো আমসত্ত্বের সারা গায়ে। এই আমসত্ত্ব বয়ে আনত দেশের বাড়ির ছাপ। আমার মা ছাপা পাটিটার গায়ে হাত বুলোত, ফেলে আসা গ্রামটার গায়েই হাত বুলোত বোধহয়।

আমার দাদু আর দাদামশাই গল্প করতেন। ওরা বলত দেশের বাড়ির গল্প আমরা বলতাম ওসব পাকিস্তানের গল্প। ওদের গল্পের মধ্যে জিন্না-গান্ধী থাকত, শরৎ বোস ফজলুল হক থাকত, গোলাম সরওয়ারের নাম করতে গিয়ে ওরা মুখ বিকৃত করত। সেই নাকি নোয়াখালির দাঙ্গার নেতৃত্বে ছিল। ওদের কথার মধ্যে থাকত মতিচুর খই,

'মুলার অম্বল', টাটকিনি মাছ, মতলবের দই। ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে হারিয়ে যাওয়া কথাগুলো খুঁজছিলাম।

বাংলাদেশ হাইকমিশনে যেতে হয়েছিল একটা ভিসার ব্যাপারে। জলের আর্সেনিক নিয়ে একটা সেমিনারে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওই ব্যাপারেই যেতে হয়েছিল হাইকমিশনে। ভিসা সহজেই পেয়ে গেলাম। ট্রেনে বনগাঁ গিয়ে বর্ডার পেরিয়ে বেনাপোল থেকে বাসে খুলনা যাওয়া খুবই সহজ। সেরকমই ঠিক করলাম। আমার দাদু অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন, ঠাকুরমা এখনও আছেন। নব্বই বছর বয়েস, শয্যাশায়ী, ঠাকুমা এক সময়ে খুব সুন্দরী ছিলেন। এখনকার চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। গত দু'মাস ধরে পায়খানা পেচ্ছাপ বিছানাতেই। যখন-তখন অবস্থা। এই অবস্থাতেই আমাকে যেতে হবে। যাওয়াটা মিস করতে চাই না। মালয়েশিয়া এবং ভিয়েতনাম থেকেও লোক আসবে। আর্সেনিক সমস্যা ওরা কীভাবে মোকাবিলা করছে শোনা যাবে। ঠাকুরমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিলাম ঠাকুমা, বাংলাদেশ যাচ্ছি, বক্তৃতা দিতে, দেশের বাড়ি, দেশের বাড়ি। ঠাকুমার মুখটা যেন হাসি হাসি হল। কী যেন বলার চেষ্টা করল। আমার কানটা ঠাকুরমার মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। মনে হল যেন বলছে জব্বর। জব্বর।

জব্বর নামটা একটু চেনা চেনা। জব্বর আলী। দাদু জব্বর আলী নামটা তুলে গালমন্দ করতেন, যতদূর মনে পড়ে, ঠাকুরমা মৃদু প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করলে দাদু রেগে যেতেন। দাদু ঠাকুরমার মধ্যে যখন পিওর নোয়াখালি ভাষায় ঝগড়াঝাটি হত, আমরা ভাইবোনরা বেশ উপভোগ করতাম। দাদু ঠাকুরমার ঝগড়ার মধ্যে জব্বর আলী নামটা প্রায়ই শুনতাম মনে হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরমা কী বলতে চাইছে? জব্বর আলীকে কিছু খবর দিতে চাইছে ঠাকুরমা, নাকি জব্বর আলীর খবর আনতে বলছে, নাকি অন্য কোনও ব্যাপার?

আমার বাবার বয়েস এখন চুয়াত্তর চলছে। বাবার কাছ থেকে ওই বাংলাদেশের গল্প খুব একটা শুনিনি।

আমার বাবা যদিও দত্তপাড়া স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করেছিলেন, আর আই. এস. সি. ঢাকা থেকে। বি. এস. সি পড়তে কলকাতা চলে এসেছিলেন। হোস্টেলে থেকে পড়তে হত। চাকরি জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে। বদলির চাকরি ছিল। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে আমরা থাকতাম, বাবা বাইরে বাইরে ঘুরতেন। বাবার কাছে রূপসা, মধুমতী, মেঘনা ডাকাতিয়া নদীর কথা যত শুনেছি, তারচেয়ে বেশি শুনেছি শতদ্রু ঝিলম, তুঙ্গভদ্রা বেত্রবতীর কথা। মেঘতাবুরু অম্বিকাপুর ছত্তিশগড় বাদাম-পাহাড় যত শুনেছি ঢাকা ময়মনসিংহ তত শুনিনি। তবে বাবার কাছে দত্তপাড়া ইস্কুলের ফুটবল মাঠ, অঙ্কের টিচার গোলাম মুস্তাফা, বহুরূপী আনার আলী, এদের কথা কিছু কিছু শুনেছি। মনে হয়, দেশ ভাগের ব্যথা আমার বাবার বুকে ততটা বাজেনি। কারণ বাবার বোধহয় স্বপ্নই ছিল গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরে চলে আসার, আর শহরেই যদি আসবেন, তো ঢাকা কেন, কলকাতা। যখন দেশভাগ হল, বাবার তখন একুশ বছর বয়েস। রিপন কলেজের হোস্টেলে থাকেন। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাস, বাবা অবাক হয়ে দেখলেন একটু লুঙ্গি আর ফতুয়া পরা অবস্থায় আমার দাদু হোস্টেলের দরজা ধাক্কা দিচ্ছেন, রাত দশটার সময়।

বাবা জানতেন দেশে দাঙ্গা চলছে। গান্ধীজি নোয়াখালি যাবেন, কাগজে পড়েছেন, খুবই চিন্তায় ছিলেন আমার বাবা। কলকাতার অবস্থাও খুব সুবিধের নয়। আগস্ট মাসের কলকাতার দাঙ্গার জের চলছে তখনও। দাদুকে দেখে বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন-আপনে একা আসছেন, মা কোই? দাদু নাকি তখন কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। বলেছিলেন- তর মারে আনতে পারলাম না, আমারে তুই মাইর্‍্যা ফালা। আমার ঠাকুরমা পরে এসেছিলেন। দিন দশেক পরে। এক মসুলমান পরিবারের আশ্রয় পেয়েছিলেন। তবে আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন জানে ঠাকুরমাকে মুসলমানরা কেড়ে রেখে দিয়েছিল, সাতদিন ধরে অত্যাচারিতা হবার পর কোনরকমে পালিয়ে আসতে পেরেছিলেন। আমার ঠাকুরমার বয়স তখন ৩৮ বছর ছিল। খুব বেশি বয়স নয়। আজকাল এই বয়েসে অনেক মেয়ে বিয়ে করে।

আমার বাবা জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বেশ একটা উঁচু পদ পর্যন্ত উঠেছিলেন। রিটায়ার করার সময় ডেপুটি ডাইরেক্টার ছিলেন। দমদম পার্কে আমাদের দোতলা বাড়ি, বাড়িতে যুঁই লতিয়েছে, একটা লোমওলা কুকুরও আছে, প্যাপিলন জাতের। আমার মা যখন বেঁচেছিলেন, কচুরলতি, কচুর শাক, ইলিশ মাছে পাতুরি, থোড়ঘণ্ট, এসব খেতাম। এখন হয় না। আমার স্ত্রী এলাহাবাদের মেয়ে। ওরা প্রবাসী বাঙালী। ও পালক-পনির ভালবাসে। চানা মশালা ভালবাসে। মাঝে মধ্যে শখ করে রান্না করে। এমনিতে আমাদের বাড়িতে রান্নার লোক আছে। ও কচুরলতি টতির ঝামেলায় যায় না।

আমার বাবার ঘরে একটা আলাদা টিভি আছে। একা থাকেন, মা মারা গেছেন বছর তিনেক হয়ে গেল। মা খুব বাংলাদেশ টিভি দেখতেন। বলতেন, মন্ত্রীরা বক্তৃতা দিতে যায়। তখন দেখায়, মন্ত্রীরা কত জায়গায় যায়, লক্ষ্মীপুরে যায় না ক্যান, তাইলে লক্ষ্মীপুরটা একবার দেখতাম। এখন বাবা ওই ঘরে সারা দিন একা থাকেন। বাংলাদেশ টিভি দেখেন কিনা কে জানে যদি দত্তপাড়া স্কুলটা, স্কুলের মাঠটা একবার দেখা যায়...।

আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—জব্বর আলি কে গো বাবা।

বাবা বললেন, জব্বর আলী আমাদের 'বাড়ির কাছাকাছি থাকত। শুনেছি সেই এখন আমাদের ঘরবাড়ি দখল করে আছে। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ঠাকুর্মা তাহলে জব্বরের কথা কেন বলেন। তবে কি বলতে চাইছে ভিটে বাড়িটা জব্বর কতটা দখল করে রেখেছে সেটাই দেখে আসতে?

দাদুর একটা সুটকেস ছিল। দাদু মারা গেছেন, বছর পঁচিশ হয়ে গেল। ওই সুটকেসে কিছু কাগজপত্র ছিল। একটা খাতা, ডায়েরি, টুকরো কাগজ, চিঠিপত্র, সবই একটা পলিথিন পেপারে মুড়ে আমার কাচের আলমারিটার একটা তাকে রেখে দিয়েছিলাম। তখন একটু খুলেছিলাম, ভাল করে পড়িনি, এখন আমার মনে হল বাংলাদেশ যাবার আগে কাগজপত্রগুলো একটু দেখি।

দেখি একটা খাতা। খাতায় লেখা-বাস্তুহারা কাব্য। হে বরণ্যে কবি নবীনচন্দ্র সেন, আপনার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া এই কাব্য শুরু করিতেছি। এই কাব্যে থাকিবে কিরূপে জন্মভূমি হইতে পলাইয়া আসিতে হইল, সেই দুঃখের বিবরণ।

প্রথম সর্গ, সন ১৯৪৬

জিগির তুলেছে জিন্না চাই পাকিস্তান।
এইবার দেশ বুঝি হবে খান খান।
আসিল ক্রিপস সাহেব ভারত মাটিতে।
আলাপ আলোচনা হল স্বাধীনতা দিতে।
জিন্না কহে পাকিস্তান, নচেৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।
তারপরই পাল্টে গেল আমাদের গ্রাম।
দাদুর একটু আধটু কাব্যরোগ ছিল জানতাম।

ক্লাস সিক্সে যখন স্কুল ম্যাগাজিনে আমার একটা কবিতা বেরুল, দাদু খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন উত্তরাধিকার সূত্র এই প্রতিভা আসে। তখন খাতা খুলে বলেছিলেন তবে শোন। কী পড়েছিলেন মনে নেই। এখন মনে হচ্ছে বোধহয় এই অংশটাই শুনিয়েছিলেন সেদিন—উপরে ব্র্যাকেটে লেখা-এই অংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত।

পড়তে থাকি

সন্ধি যবে করে কেহ অন্যায়ের সনে
মনুষ্যত্ব তখনি শেষ। ভাবি দেখ মনে
স্বার্থবুদ্ধি বেতাইল মুসলিম লিগ।
মনে পড়ে ১৯৪৬ অক্টোবর দশে
কোজাগরী লক্ষ্মীপুজা চন্দ্র আকাশে
সহসা প্রকম্পিত দত্তপাড়া গ্রাম
এ সময়ে আমি প্রমাদ গনিলাম
নারায়ে তকদীর ও আল্লাহ আকবর
আওয়াজ করিয়া আসে গোলাম সারওয়ার।
গ্রাম হল অবরুদ্ধ কান্দে হিন্দুগণ
লুণ্ঠন অগ্নিযোগ এবং নারীহরণ
করিল কাহারা? যাহারা ছিল প্রতিবেশী
সামান্য স্বার্থবুদ্ধি হয় সর্বনাশী।
এ সময়ে জব্বার মোর ঘরেতে আসিল
পরিবার তরে মোরে লুঙি খানি দিল।
কহিল এখনি যান, বসেক নৌকায়
দেরি করিলে প্রাণ বাঁচা হবে দায়।
আমার পত্নীকে তারা বোরখা পরাইল
কিন্তু তাহাকে মোর সঙ্গে নাহি দিল।
সঙ্গে লয়ে যাও বলে ক্রন্দিল সে নারী
কিন্তু তারও আগে মোর নৌকা দিল ছাড়ি।

এরকমভাবে অনেকটাই পড়ে বোঝা যাচ্ছে আমার দাদু ঠাকুরমার জন্য নৌকো থেকে লাফ দিয়ে সাঁতরে পাড়ে উঠতে চেয়েছিলেন কিন্তু নৌকোর অন্যরা বলেছিল কর্তা অস্থির হবেন না। এখন গ্রামের অবস্থা খারাপ। আমরা আপনার নুন খেয়েছি, আপনার কাছে আমাদের ছেলেরা পড়াশোনা করেছে, আপনার জান না বাঁচালে আমাদের গুনা হবে।

আফজল কহে 'স্যার, আপনে একটু শুনহ
আপনের জান না বাচাইলে হইবে গুনাহ।

ক্ষতি কিছু করিব না, ইহাই ইমান।
কিন্তু স্যার, এইবার রাজ করিবে মোছলমান।

দাদু কিন্তু বেশি লেখেননি। ধৈর্য শেষে হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। কলকাতায় রিপন হোস্টেলে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত রয়েছে।

দাদুর ঐ খাতায় এরপর নানারকম ঠিকানা, অম্বল অ্যাসিডে-বিসম্যাগ ট্যাবলেট, হার্টের অসুবিধায় অর্জুন মাদার টিংচার, বিধান রায় রুগি দেখেন প্রতি সোম ও বুধবার সকাল দশটা হইতে, ডাক্তার নলিনীরঞ্জন কোনার ও ডাক্তার অমল রায়চৌধুরির ঠিকানা, এইসব, আর নানারকম মন্তব্য। যেমন-দেশ ভাগ না হইলে কি ইলেকট্রিকের আলো দেখিতাম?

গান্ধীজি কি দেশ ভাগ রোধ করিতে আর একবার অনশনে বসিতে পারিতেন না?

পাঞ্জাবে জন বিনিময় হইল, বাংলায় হইল না, নেহেরু কী জবাব দিবেন?

রামচন্দ্র সীতার অগ্নিপরীক্ষা করিয়াছিলেন, আমি কী পরীক্ষা করিব? খোকার মা দশদিন মোছলমান ঘরে ছিল। জব্বার কি ছাড়িয়া দিয়াছে?

এক গোছা চিঠি। এখানেও জব্বার। চিঠিগুলি এরকম।

৬ই বৈশাখ ১৩৫৭

পরম পুজনীয় ঠাকুর ভাই,

আপনে আমার সাতকুটি আদাব মানিবেন। আমার পূর্ব চিঠির জবাব না পাইয়া চিন্তা যুক্ত আছি। এই পত্রপাঠ মাত্র আপনাদের কোশল সংবাদ জানাইয়া সুকি করিবেন। আজ দিন কতেক হয় আমনের বাস্তু ঘর মেরামত করিয়াছি। আটচালা ঘরের পালার গোড়ায় মাটি আছিল না দেখিয়া সমস্ত পালার গোড়ায় মাটি দিয়াছি। এবং আলকেত্রা দিয়াছি। সবাই বলে আলকেত্রা দিলে উলি পোকা উপরে উঠিবে না। এই সব করি দেখিয়া অনেকে বলে তোর কী সাথ্য? কেন করস? কিন্তু চোক্ষের সামনে উলি পোকা ঘর নষ্ট করিবে কি রূপে দেখিব। আপনার গাছের সুপারী পকিয়াছিল। সুপারি বেচিয়া ৩৫ টাকা মসজিদে দিয়াছি। পুকুরে জাল ফেলিয়া সমস্ত মাছ কাদের মিঞা লৈয়া গেছে। আর বোদ হয় আমনের ঘরবাড়ি রাখা যাইবে না অন্যলোকে দখল করিবে কেন, আপনি আমাকেই লিখাপড়ি করিয়া দেন। আমনের ঘর কখান সমেত ভিটা আর দুইকানি জমি আমি কিনিয়া লইব। ইচ্ছা করিলে আমি দখল করিয়া নিতে পারিতাম, কিন্তু পাকিস্তান হইয়াছে বৈলা হিন্দুর সম্পত্তি লুট করিয়া খাওয়া ইমানদারী কাজ নহে। খোদার ফজলে আমি টাকা দিয়াই নিব। আমি সাকুল্যে দশ হাজার দিব। স্বীকার যাইতেছি উহা বাজার দরের কিছু কম। কিন্তু আপনি খোঁজ নিয়া দেখিবেন সুরেন্দ্র চক্রবর্তীর ৩ কানি জমি, পুকুর ও ভিটা বাড়ি দশ হাজারে নুরুল মিঞা কিনিয়াছে। আমনের উপর আমার দাবি আছে। আমি আমনের এবং আমনের পরিবারে জানে বাঁচাইয়াছিলাম আশা করি ইহা মিত্যু পৈয্যন্ত ভুলিবেন না। আর বিশেষ কি, মঙ্গলদানে সুকি করিবেন। ইতি

জব্বার আলী

পুঃ এতদিন হিন্দু যাহা আজ্ঞা দিয়াছে মোছলমানে পালন করিয়াছে। এখন মোছলমানের কথা হিন্দুর শুনিতে হইবে।

আর একটা চিঠি

ম্যন্যবর মাস্টারমহাশয়, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭

বহুকষ্টে আপনার কলিকাতার বাসার ঠিকানা যোগাড় করিয়াছি। আমার এই পত্র পাই নিচ্চই খুব অবাক হইতেছেন। আমনেরা চলিয়া যাইবার পর গ্রাম খাঁ খাঁ করিতেছে। ইস্কুলে নিয়ম মত ঘণ্টা বাজে ঠিকই কিন্তু ক্লাস হয় না। ভাল কথা, লোক মুখে শুনিলাম জব্বর আলী আমনের ভিটাবাড়ি কিনতে চায়। সে নাকি দশ হাজার টাকা দিবে বলিয়াছে। ছ্যার, সুজুগ পাইয়া সে আমনের ঠকাইয়া জমি নিতে চায়। এই জমি হালাল জমি হইবে না। সে কি তাহা বুজে না? আমি ১৫০০০ টাকা দর দিলাম। এই টাকা জব্বার দিতে পারিবে না। আপনি রাজি হইলে পত্রপাঠ জানাইবেন। আমি কলিকাতা গিয়া সিকি টাকা বায়না করিয়া আসিব। দেরী করিলে জানিবেন আপনার জমিতে জব্বার হাল দিবে। আপনার নতুন দেশে কিরূপ আছেন? মঙ্গলদানে সুকি করিবেন। আমার শতকুটি আদাব জানিবেন।

ইতি-
আবদুল মমিম।

পুঃ দুই দেশ যদি আবার এক হয় ইনসাল্লা, আমনে যদি ফিরিয়া আসেন, আমি জমি ফিরত দিব জবান দিলাম।

এরকম গোটা বিশেক চিঠি। সবই ১৩৫৭ থেকে ১৩৬০ এর মধ্যে লেখা। জব্বার বলছে। আবদুলকে দিও না, আমায় দাও, প্রচ্ছন্ন হুমকিও রয়েছে আবার আব্দুল বলেছে জব্বারকে নয়, আমাকে দাও, আমি বেশি দাম দেব। যদিও আব্দুলের অফার করা দামও বাজার দরের তুলনায় বেশ কম। শেষের দিকে চিঠিগুলি পড়লে সম্পত্তি বেহাত হওয়ার ইতিবৃত্ত জানা যায়। জব্বার লিখছে-কর্তা, কয়দিন আগে একটি বুগ পোস্ট করিয়াছি, ইহাতে সরকারি নোটিশ ছিল। আমনের চৌকিদারী টেক্স, খাজনা ব্যাবাক বাকি পড়িয়াছে দেখিয়া সরকার নিলামের নুটিশ দিয়াছে....।

আবদুলের চিঠিতে জানা যায় নিলামে জব্বারই কিনে নিয়েছে।

....ছ্যার, আপনি আমার কথা শুনিলেন না। জব্বর মিঞা নিলামের দিন গুণ্ডা লাগাইয়া কাহাকেও আসিতে দিল না। নিজের লোকই নিলামের সময় ছিল। কেউই জব্বারের চেয়ে বেশি ডাকিল না। সবই শট্‌করা ছিল। আর কী করিব। আমাকে জমি দিলেন না, এই ৮ পসোস মিত্যু পৈর্যন্ত রহিবে। ইতি আব্দুল।

চিঠিগুলো পড়তে গিয়ে আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করি যে সব চিঠিরই হাতের লেখা এক। চিঠি লিখছে জাব্বার কিম্বা আব্দুল, পরস্পরের বিরোধী পক্ষ, ভিন্ন স্বার্থ। কিন্তু হাতের লেখা এক কী করে হয়? খুব ভাল করে লক্ষ্য করলাম, কয়েকটি বিশেষ অক্ষর মেলালাম। একই লোকের লেখা মনে হল। বেশ রহস্য রহস্য ব্যাপার। বাবাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে বিশেষ লাভ হল না। আবদুলকে চিনতে পারল না। তবে জব্বারকে ভালই চেনে। ভাল স্বাস্থ্য। দাদুর চেয়ে বয়সে বেশ ছোটই। জলপড়া দিত। অনেক লোক আসত ওই 'পানিপড়া' নিতে।

দাদুর ওই খাতাতে আরও কিছু মন্তব্য পড়া গেল যেমন—

জব্বর ভাবিয়াছে কি? সে কি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করিতে চায়?

আবদুল বড়লোক হইতে পারে, টাকা বেশি দিতে চায়, কিন্তু এক লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি মাত্র পনের হাজার, ভাবিতেছে খুব বেশি দিতেছে? আবদুলকে দিব

না। দিলে সে আমাদের সব গাছ করিয়া নৌকা বানাইবে। সে নৌকার ব্যাপরি।

জব্বার বারংবার ওই কাহিনী বলিয়া কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দিতে চায়।

যাবার আগে ঐ জব্বার এবং আবুদলের কয়েকটি চিঠি যত্ন করে খামে ভরে ব্যাগে পুরলাম বাবাকে বললাম সময় করতে পারলে আমাদের জন্মভিটেটা একবার দেখে আসব। বাবা বললেন পারিস তো দত্তপাড়া হাইস্কুলের একটা ছবি তুলে আনিস। যাবার আগে ঠাকুরমাকে বললাম, যাচ্ছি। ঠাকুরমা আমার হাতটা চেপে ধরলেন, ঠোঁটটা খুলে গেল, কিছু বলতে চান, মুখের কাছে কান নিলাম, পাউডারের গন্ধের সঙ্গে স্মিত শব্দ জব্ব্‌র। জব্বর।

বাংলাদেশে স্বাগত। বর্ডারের ওপাশে বাংলা লেখা। থ্রিল হল। বরং বাংলাতেই বলি উত্তেজনা। খুলনা থেকে গাড়ি এসেছিল, লোক এসেছিল রিসিভ করতে, মানে স্বাগত জানাতে। গাড়িতে ক্যাসেটে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলের গান, হোটেলে কুচো মাছের চচ্চড়ি খেলাম, যশোরে মধু সুইটস-এ অপূর্ব স্বাদ। রাস্তাগুলি দারুন গাছে ছাওয়া। সত্যিই শ্যামল, খুলনার ভৈরব নদী দেখলাম, নদীতে স্টিমার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোটিও দেখলাম, নদীর পাড়ে যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র থাকতেন। যে গাছের তলায় বঙ্কিমচন্দ্র বসতে ভালবাসতেন সেখানে একটি বেদী, কবিতা লেখা বেশ থ্রিল, মানে উত্তেজনা নয়, হিল্লোল সারা শরীরে হিল্লোল।

সেমিনার শেষ হল। বাংলাদেশের মাটির উপরের জলভাণ্ডার এত বেশি যে, যদি ঠিকমত ব্যবহার করা যায় তবে মাটির তলায় জল কম ব্যবহার করলেই চলে। ও ব্যাপারে এখন আর যাচ্ছি না। ওই সেমিনারে একজন বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ ছিলেন, যার বাড়ি নোয়াখালি জেলার বেগমপুরে। বাংলাদেশীদের আতিথেয়তার তুলনা মেলা ভার। ভদ্রলোকের নাম আব্দুল ফজল। আমার চেয়ে বছর দুয়েক আগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস সি। আমার পূর্বপুরুষের বাসস্থান নোয়াখালি জেলা শুনে উনি জোরাজোরি করলেন—ওঁর সঙ্গে যেতে হবে, বেগমপুরে ওর বাড়িতে দু'বেলা দাওয়াত নিয়ে তারপর শিকড়ের সন্ধানে যাওয়া যাবে। বাবার কাছ থেকে জেনেছিলাম আমাদের গ্রামে যেতে হলে চাঁদপুর থেকে স্টিমারে হরিহরপুরে নেমে পায়ে হেঁটে ৮ মাইল দূরে দত্তপাড়া গ্রাম। হরিহরপুর থেকে নৌকাতেও যাওয়া যেত। দত্তপাড়া গ্রামের পাশ দিয়ে যে নদীটি বয়ে গেছে তার নাম দয়াবতী। ওই নদীতে স্টিমার চলে না। নৌকা যায়। আমার দাদুকে পার করে দিয়েছিল দয়াবতী, আর ফেরত নেয়নি। আর একভাবে যাওয়া যেত—চাঁদপুর থেকে ট্রেনে সোনাইমুড়ি নেমে হাঁটা পথে চার মাইল। আব্দুল ফজল সাহেব বললেন—ওইসব বহুদিন আগেকার কথা। এখন চাঁদপুর থেকে রামগতি পর্যন্ত বাসচলে। দত্তপাড়ার পাশ দিয়েই সে রাস্তা। দত্তপাড়া আর সেই গ্রাম নাই। তাছাড়া দত্তপাড়া এখন আর নোয়াখালি জেলার মধ্যেই নাই। নতুন জেলা। লক্ষ্মীপুর। দত্তপাড়া লক্ষ্মীপুর জেলার মধ্যেই পড়েছে। ইশ্‌। মা বেঁচে থাকলে খুশি হতেন। মায়ের গ্রামের নামে জেলা, মায়ের গ্রামে নিশ্চয়ই এখন ডি এম বসেন, আর মায়ের গ্রামের আন্ডারেই বাবার গ্রাম।

খুলনা থেকে সকালে রওনা দিয়ে বিকেলে আব্দুল ফজলের বাড়ি পৌঁছলাম। বেগমগঞ্জ। আতিথেয়তার কথা এখন থাক। শুধু শুটকি মাছের অপূর্ব ভর্তাটির কথা

আর একবার মনে করি। ওর স্ত্রীর নাম মুক্তা। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের খুব ফ্যান। সৌমিত্রের অভিনয় করা অনেক ছবির ভিডিও ক্যাসেট আছে।

আব্দুল ফজলকে পরদিন সকালেই চলে যেতে হল চট্টগ্রামে। টেলিফোনে খবর এল ওর বড়দা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আব্দুল ফজল বলল—সরি, আপনার শিকড়ের সন্ধানের সাক্ষী থাকতে পারলাম না। উনি ওঁর গাড়িটা আমাকে দিলেন। ড্রাইভারকে বুঝিয়ে দিলেন—দত্তপাড়া হয়ে যেন চাঁদপুর পৌঁছে দেয় আমাকে। চাঁদপুর থেকে আমি ঢাকা যাব। রিকন্ডিশনড করা গাড়ি টয়াটো। টেপে যথারীতি বাংলা গান। রিমেক। ইন্দ্রনীল আর শ্রীকান্ত আচার্যের গান। ড্রাইভারের নাম ভাস্কর। বয়েস বছর পঁচিশ। প্রথমে ভেবেছিলাম হিন্দু। কথায় কথায় যখন বলল—দুর্নীতিটা যদি একটু কমানো যায়, ইনসাল্লা, বাংলাদেশরে রুখন যাইব না। তখন বুঝলাম ছেলেটা মুসলমান।

মসৃণ রাস্তায়, রাস্তায় জঞ্জাল পড়ে নেই, জাতটা বেশ পরিচ্ছন্নতা শিখেছে। গঞ্জের ধারের ভ্যাট নিয়মিত পরিষ্কার হয়। বাসগুলির নাম—দুরন্ত, দুর্বার, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, বজ্রমানিক। পেট্রলপাম্পের নাম তরলসোনা, চায়ের ছোট দোকানের নাম বিনোদন পাটের গুদামের নাম সুবর্ণতন্তু। গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা দেখলাম। সমস্ত সাইনবোর্ড বাংলায়, গাড়ির নম্বর বাংলায়। আমার বেশ থ্রিল, মানে গর্ব হয়।

ড্রাইভারটি বলল, এই রাস্তায় মুনির চৌধুরীর বাড়ি। রাজাকারে মারছিল। আর ওই বাড়িতে গান্ধীজি ছিলেন তিনদিন। ড্রাইভারটিও নাট্যকার মুনির চৌধুরির নাম জানে? ১৯৭১ সালে খুন করা হয়েছিল মুনির চৌধুরিকে। গান্ধীজির কথাও জানে? নোয়াখালির দাঙ্গার পর গান্ধীজি এসেছিলেন ৪৭-এর জানুয়ারি মাসে। একটু পরেই রাস্তার ধারে একটা পোস্ট, লেখা—দয়াবতী সেতু ১ কিলোমিটার।

এবার আমার গায়ে সত্যিই থ্রিল। থ্রিল কাঁটা ফুটে উঠছে। এই সেই নদী, যে নদী বেয়ে নাইয়র আসত। ব্রিজের গোড়ায় এলে ড্রাইভারকে বলি একটু আস্তে ভাই। নদীর ঘোলা জলে বয়ে যাওয়া একটা ছই ঢাকা নৌকা দেখলাম, ভিতরে লাল শাড়ি পরা আবহমান বউ।

ব্রিজটা পেরিয়ে ড্রাইভার দত্তপাড়া গ্রামটির কথা জিজ্ঞেস করে জানে—সামনেই বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। একটু পরেই দেখলাম। বাঁদিকে পিচ রাস্তাটা গত জন্মের দিকে চলে গেছে। একটু পরই দত্তপাড়া হাইস্কুল। স্থাপিত ১৮৯০, মাঠের এক কোণে বাংলা দেশের পতাকা উড়ছে। স্কুলে ঘণ্টা বেজে উঠল যেন তোপধ্বনি। স্কুলের প্রাচীরে নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত, সূর্যসেন, জসিমউদ্দিন, প্রীতিলতা, এবং ঢাকার শহীদ মিনারের ছবি। এই স্কুলেই আমার পিতামহ তারাপদ চক্রবর্তী শিক্ষক ছিলেন। সেটা কি মনে রেখেছে? স্কুলের ছবি নিলাম। বাবা এলে কি একবার স্কুল মাঠে হঁটতেন?

গাড়ি নিয়ে সামনে এগোই। বাড়ির দেওয়ালে রাজনৈতিক লিখন। নবিনুর সাইকেল মেরামতির সামনে কয়েকটা কম বয়েসি ছেলে, পাশেই হেকিমি দাওয়াখানা হেকিম—সৈয়দ ইদ্রিস্ আহাসান। ওখানে বেঞ্চিতে বসে আছেন কয়েকজন বৃদ্ধ, সাদা দাড়ি, সাদা চুল দেখে একজন বুড়ো লোককে দেখলাম। যতই বুড়ো হোক না কেন, আমার দাদুর সমবয়েসী হতেই পারে না। দাদু বেঁচে থাকলে দাদুর বয়েস একশোর বেশি হত।

আমি সমবেত বৃদ্ধদের মধ্যে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিই আপনার কি কেউ তারাপদ চক্রবর্তীকে চিনতেন, কিংবা তার ছেলে ত্রিদিব চক্রবর্তীকে?

তখন একটা রোগা মত বুড়ো, লম্বা চুল, গোফঁ দাড়ি নেই, লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আমনে কোনানতোন আইছেন? কে আঁপনে?' আমিবলি—আমি তারাপদ চক্রবর্তীর নাতি।

হাঁচানি, ও আল্লা, খোয়াব নি দেখি? লাঠি ফেলে দুহাত বাড়িয়ে দিলেন ওই বুড়ো। আমি এগিয়ে যাই ওঁর দু'হাত ধরি।

বুড়োটা বলে ইয়াঁন ক্যাম্বাই আইলেন?

আমি বলি—বাংলাদেশে অন্য কাজে এসেছিলাম, তখন ভাবলাম পূর্বপুরুষের ভিটা.... খোব বালা কইচ্চেন, খোব বালা কইচ্চেন। আমনের ভিটায় অখন জব্বর মিঞার এতিমখানা হইছে। আঁঞি বেবাক দেখামু। ছ্যারের বুঝি ইন্তেকাল হই গেছে গৈ? আঞি হেতেনের ছাত্র। ক্লাস এইট পৈয্যন্ত পইচ্ছিলাম আরি।

—আমি মাথা নাড়ি।

—কবে?

—বছর কুড়ি আগে।

—আহারে। ঠারাইন আছেন নি?

—আমার ঠাকুরমা?

—হু! হু!

খুব উৎসাহে জিজ্ঞাসা করেন ওই বুড়ো। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। কথা বলাবর ধরন মেয়েলি মেয়েলি। গলাটিও সরু। আমি বলি, হ্যা, ঠাকুরমা আছেন।

হাঁচানি?

খুশি হল ওই বুড়ো।

আর একজন বুড়ো মানুষ অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। ওঁর গায়ে লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী। লুঙ্গি। মাথায় টুপি। বলল—আমিও তারাপদ স্যারের ছাত্র। বড় বালা ভুগুল ফড়াইতেন, এক্কোই টানে ম্যাপ আকতে ফাইত্তেন।

ওরা চা খাওয়ালেন আমাকে। গোঁফ-দাড়িহীন বুড়োটি হাফানিতে কষ্ট পাচ্ছেন। উনি ওষুধপত্র নিয়ে আমার সঙ্গে চল্লেন গাড়িতে।

আর একটু সামনে গেলেই গঞ্জ এলাকা শেষ। বাঁশের বেড়ার বাড়ি। টিনের ছাউনি, বাড়ির চারিদিকে সুপুরি গাছের আর নারকোল গাছের সারি। পাকা বাড়িও আছে।

জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওই ভদ্রলোকের নাম ফজল আলি। বাড়িতে নিচু স্কুলের বাচ্চাদের পড়াতেন। আঁঞি ভাইচ্চার সংসারে থাকি। বিয়াশাদি করিনঁ।

একটা লাজুক হাসি দিল ওই বুড়ো, আবার একটা কাল্পনিক আঁচলের খুট দিয়ে হাসিটা ঢাকল।

...ফজল আলি এক জায়গায় গাড়িটা থামাতে বললেন। একটা প্রাচীন বাড়ি। বাড়ির অনেকটা থুবড়ে পড়েছে, দরজা জানালা একটাও নেই অশ্বত্থ গাছ উঠেছে। ফজল বললেন, চৌধুরী বাড়ি। ছয়জন খুন হইছিল। সেই রাত্রেই আমনের ঠাকুরদারে আমরা সেইভ করি। গাড়িগা ইয়ানো থাউক। আঁয়ার লগে আইয়েন। আমনেরে বেবাক দেখাইয়ুম।

চৌধুরি বাড়ির ভাঙ্গা ইট ছোঁয়া হাওয়া আমার জিন্‌স এর শার্ট এ ঢুকছে। চৌধুরিদের

ওই ভাঙা বাড়ির চারিপাশে কয়েকটি টিনের চালের বাড়ি। বোঝাই যাচ্ছে ওদের জমিতেই ওইসব পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে।

পিচ রাস্তা থেকে একটা মাটির রাস্তা চলে গেছে। একটা বিশাল বটগাছ। দাদু যে বট গাছের দোলনা চড়ার কথা বলতেন, এটাই সেই বটবৃক্ষ? একটা বাড়ির কাছে এসে ফজল আলি বললেন, আঁয়ার বাসা। ইয়ানো আঁঞি থাকি। ভাইচ্চার সংসার। একডু পায়ের ধূল দেওয়ন লাগব। বেশি নঁ, হাঁচ মিনিড।

উঠানে মুরগি ঘুরছে। একটা কোঠা বাড়ি আর একটা টিনের। টিনের বাড়িতে ফজল আলি থাকেন।

অল্প একডু বয়েন, আণ্ডাভাজা আর চা খান।

আমি আপত্তি করি না।

ফজল আলি বললেন—আমনেরে কোনদিন পামু ভাবি নাই। আমনেরে যখন পাইছি, একখান জিনিস দিমু, ঠাইরাইনেরই জিনিস, ঠাইরাইনেরে দিয়া দিয়েন...

কী জিনিস?

এমখানা চিডি। পুরো লেখা হয় নাই।

—কাকে লেখা চিঠি?

—জব্বার আলিরে।

—আপনি কী করে পেলেন?

—আমি তো লিখাইয়া জন। অন্যের চিডি লিখি। পাকিস্তান হওনের পরে হিঁদুরা ইন্ডিয়ায় গেলগিয়া, তারপর চিডি লিখনের লোক কইম্যা গেল। আঞি পোসড আপিসে বই, চিডি লিখতাম। ইয়ার আগে অইন্যের চিডি লিখতাম। মাইনষের ঘরেও আঁয়ারে ডাইকত। বিবিরা বোরখাপড়ি বয়ান কইত, বাপের বাড়ি চিডি লিখাইত। আঁয়ার মইধ্যে মাইয়া মাইয়া ভাব আছে দেহি বিবিরা পরানের কথা কইতে পারত। জব্বর আলির অন্দরে ডাক পড়ছিল আমার। জব্বারের দুই বিবি। বাপের বাড়ি ইদের চিডি দিব। একফাঁকে ঠাইরিন আইল বোরখা পিন্ধ্যা। কইল আমি চক্কতি বাড়ির মইধ্যের হিস্যার বড় বউ। ঠাইরিন বড় সুন্দরী আছিল। বোরখার মইধ্যে রই, আঁয়ারে কয় একখান চিডি লিখি দ্যান।

বোরখায় কেন? আমি জিজ্ঞাসা করি। সে আর এক কিস্‌সা। বোরখা না পইল্লে ঠাইরেনের বিপদ হইত। ডায়ার মিঞার ফৌজ আই গেল, ডায়বার মিঞা হইল গৈ গোলাম সারোয়ারের অইন্য নাম। পিছে পিছে কাসেমের ফৌজ। জব্বর, মিঞা ছ্যাররে নৌকাত বসাই ছিল, ঠাইরিনরে রাখল বোরখা পিন্ধাই, অন্দরে।

একটা টিনের সুটকেস খুলে একটা হলুদ হয়ে যাওয়া ভাঁজ করা কাগজ আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, চিডিডা শ্যাষ কইরেতে পারেন নঁ ঠাইরিনে। শ্যাষ হওঅনের আগেই এক বিবি আসি পড়ল।

চিঠিটা খুলেই বিরাট বিস্ময়ে দেখি সেই হাতের লেখা। যে হাতের লেখায় জব্বার চিঠি লিখত আমার দাদুকে। আবদুল চিঠি লিখত, সেই হাতের লেখাতেই লেখা—পরানের জব্বর ভাই,

আমনে মোছলমান। আমি হিন্দুর ঘরের বৌ হইয়া আমনের চিঠি লিখিতেছি ইহা যেন কেহ না জানে। আমনেরে চিঠি না লিখি আর আইমি পারিলাম না। শুধু মিত্যু

পৈয্যন্তই নয়, জন্মে জন্মে আমনেরে আমি মনে রাখিব। আমনে আমারে জীবন দিলেন, আমি আমনেরে কী দিব? ভালবাসা ছাড়া দিবার কিছু নাই।

আমি যখন এই বাড়িতে বধু হইয়া আসিলাম তখন আমার মাত্র চোদ্দ বছর বয়স। আমি আমনেরে দুর হইতে দেখিতাম....

আর নেই।

চিডিখান আঁগ্রিঙ কী করুম। ঠাইরেনের চিঠি ঠাইরেনেরেই দিয়েন।

আমি বললাম আপনি ওটা জব্বারকে দিয়ে দিলেন না কেন?

ক্যামনে দিউম? আঁগ্রিঙ কেবল লিখনেরি মালিক। তাছাড়া চিডি ত শ্যাষ হয় ন। আধা কথায় চিডি হয়নি? আধা খাওয়া খাওয়া নঁ, আধা চিডি চিডি নঁ।

ঠারিনে ত আঁয়ারে কয় নাই চিডিডা দিয়েন। বরং জব্বরের বড় বিবি আইয়া পড়ল, ঠাইরিন চুপ হই গেল। ইয়ার পরে আর লিখনের ফুসরত পাইনঁ। কয়দিন পরে জব্বার ভাই ঠাইরিনরে ইনডিয়া পাঠাই দিলেন, আর চিডিগা আঁয়ার কাছে পড়ি রইল।

আমি জিজ্ঞাসা করি জব্বার আলী কি বেঁচে আছেন এখনও?

ফজল আলি মাথা নাড়লেন। বললেন, আছে।

আমি বলি—আবদুল মমিন নামে কাউকে চিনতেন?

ফজল মাথা নাড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমনে নাম জানলেন কেমবাই। আমি বলি—চিঠি দেখেছি।

ফজল হেসে উঠলেন। একটু যেন হাঁপানির টান উঠেছিল ওর। শ্বাস টেনে বললেন হেই চিডি আমিই লিখতাম। জব্বার যেই চিডি লিখতো হেই চিডিও আয়াঁরই হাতের লিখা। জব্বার আব্দুল কেউ তো লিখন জানে না, আমিই লিখইন্যা। জব্বার কী লেখছে আবদুল জানে না, আব্দুল কী লেখছে জব্বার জানে না। শুধু আমিই জানইন্যা। বেবাক কথা আমার প্যাটে।

আমি এবার বুঝলাম দু'জনের একরকম হাতে লেখার রহস্য।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আবদুল বেঁচে আছে?

—না ইন্তোকাল হইছে গিয়া। আজ আমনেরে একখানা কথা কই। আব্দুলের ইচ্ছা ছিল আমনের জমি কিনে। আব্দুলের আরজ ছিল পাকিস্তান যেন ভাইঙ্গা যায়। পাকিস্তান ভাঙলে তারাপদ স্যার আবার আইবে, তখন পুরা জমিন ছাড়ব। নিজেও থাকবে পড়শি হইয়া ঠাইবিনরে দেখবে, ঠাইরিন বড় সুন্দরী ছিলেন, যেন হুর পরী।

ফজল আলীকে বলি—এবার আমার ভিটে দেখতে নিয়ে চলুন।

সুপুরির সারি। পুকুরে নারকেল গাছ ফেলে ঘাট তৈরি হয়েছে। কলাগাছ ঘন হয়ে আছে হাঁটা দশ মিনিটের পথ। এই পথে কি গান্ধীজি হেঁটেছিলেন, নোয়াখালিতে?

ফজল বলল দ্যাখেন চিতাখোলা, আমনের পরিবারের শ্মশান। দেখলাম ওখানে একটা পাকুড় গাছ। একটা বাঁশঝাড়। কয়েকটা ঘুঘু পাখি। একটা সরু খাল। বাঁশের সাঁকো দিয়ে পার হলে খালের জলে কচুরিপানা ভাসে।

ফজল বলল ওই দ্যাখেন আমনেগো ভিটা।

দেখি একটা টিনের চাল দেওয়া লম্বা বাড়ি। বাড়ির সামনে লেখা এস. ও এস, ব্র্যাকেটে লেখা স্যোসাল ওয়েলফেয়ার সার্ভিস।

কিছু প্রশ্ন করার আগেই ফজল আলি বলল, জব্বর সাহেবের দুই ছেলে। এন.

জি.ও দিছে। এইটা এতিমখানা। আমি দেখি একটা নিম গাছ, আমগাছের গায়ে লেখা সাপোর্টেড বাই ব্ল্যাক। ব্ল্যাক একটা এ.জি-ওর নাম। একটা হালফ্যাশনের টিউবওয়েল, লেখা ডোনেটেড বাই রোটারি ক্লাব অফ বাংলাদেশ। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে দোলনায় দুলছে। একটা প্রাচীন আম গাছ। একটা পুকুর। ঘাট বাঁধানো। দাদু বড়শি ফেলতেন? ঠাকুরমা কলসী কাঁখে যায়....

জিজ্ঞাসা করলাম জব্বার কোথায় থাকে? ফজল একটু দূরে একটা ঘর দেখাল পাকাঘর। ফজল বলল ছ্যারের আমলের ঘর বাড়ি আর নাই, শুধু গাছ আছে।

মাটিওতো আছে। আমি হঠাৎ নিচু হয়ে এক খাবলা মাটি খামচে নিয়ে আমার রুমালে বাঁধি। আর একটা পুরান আমগাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে নি। ফজল বলল জব্বর আছিল খোন্দকর। কত মুরিদ আছিল তাঁর, পানিপড়া, লবণপড়া.....। আমনেগো গাছে জব্বরের পোষা জিনপরী ঝুলত।

পাকিস্তান হওয়নের পর জব্বার মাতব্বর হইল। নীলামে আমনেগো জমি লইয়া কেরদানির আস্তানা বানাইছিল।

জব্বরের নিজের বাড়িটা নেই?

আছে। দুই বিবি। এক সংসার হেইখানে থাকে, এক সংসার এইহানে। পোলায় এন জি ও দিছে।

আমাদের প্রাচীন ভিটার দিকে অসহায় তাকাই। জুবুথুবু হয়ে বসে আছে জব্বার মিঞা। বারান্দায় কাবাশরীফের ছবি। দুলদুল ঘোড়ার ছবি, জব্বারের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফজল আলি বললেন—তারাপদ ঠাউরের নাতি আইছে, ইনডিয়ার থোন, তারাপদ ছ্যারের নাতি। দু'তিনবার বলতে হল। জব্বারের চোখের তারা নড়ে উঠল দ্রুত। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। আমি হাতটা ধরলাম।

অনেকক্ষণ হাতটা ধরেছিলেন। উনি আমাদের জমির দখলদার। কিন্তু ওর হাতের চাপ ও কব্জির স্থাপনের ভাষায় আনন্দ এবং উচ্ছ্বাস আমি বুঝতে পারছি। ওর চামড়া ফুড়ে বের হওয়া নীল শিরাটি মাঠ চিরে যাওয়া নদীটির মতো, যে রাস্তার গল্পকথা শুনেছিলাম আমার পিতামহর কাছে।

আমার হাতটা ছেড়ে একটা মোড়ার দিকে ইঙ্গিত করলেন জব্বর আলি। ওর মুখের মাংস কুঁচকে ঝুলে রয়েছে। থুতনিতে সাদা দাড়ি।

আমনেগর সাত পুরুষের ভিটা......বলতে গিয়ে গলাটা ভেঙে গেল জব্বরের, নাকি ওর গলাটা এরকম ভেঙেই গেছে বৃদ্ধ বয়সে।

ফজল আলিকে বয়স জিজ্ঞেস করি। ফজল বলে সঠিক কইতে পাইলাম না। একশ হয় নাই বোধহয়।

কার যেন নাম ধরে ডাকেন। একটি মেয়ে এল, বেশ স্মার্ট দেখতে।

জব্বার আলি মেয়েটিকে বললেন, তারাপদ ঠাউরের নাতি। আজ আমার মেহমান। মেয়েটি জব্বারের নাতনি। ব্যস্ত হয়ে পড়ল কী হল দাদু, এরকম করেন কেন? আমার দিকে তাকিয়ে বলুন—একটু এরপরই জব্বারের মুখ থেকে কেমন একটা শব্দ হতে লাগল।

মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে গেল। সুরেলা গলায় বলল উঃ, আবার কী হইল নানাভাই এরকম করলে চলে?

আমার দিকে তাকিয়ে বলল—বড্ড সেন্টিমেন্টাল গেছেন আজকাল।

মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হল। ওর বছর কুড়ি বয়েস হবে। ছোট নাতনি। এই এন. জি.ও'র সঙ্গে যুক্ত আছে। নাম সপ্তপর্ণী। ওকে পাতা বলে ডাকে। মেয়েটি ওর দাদুকে ধরে নিয়ে ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিল। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল জব্বার আলি।

আমি ওর বিছানার সামনে দাঁড়ালাম।

—কর্তা?

—উঁহু।

—নাই?

—না।

—কবে?

—বিশ বছর।

—ঠাইরিন

—আছে।

—ভালানি?

—শোয়া।

—কতা কয়?

—পারে না।

চম্পা কলির মত রং আছিল ঠাইরিনের। একটা লাজুক হাসি ফুটে উঠল জব্বারের মুখে। আমি পকেট থেকে ওই চিঠিটা বার করলাম। ঠাকুরমার লেখা চিঠিটা। চিঠিটার বৃত্তান্ত বললাম। তারপর পড়ে শোনালাম।

জব্বার হাত বাড়ালেন।

আমি চিঠিটা দিলাম।

জব্বার চিঠিটা বালিশের তলায় রাখলেন।

আমি বললাম রেখে দিলেন ওটা?

জব্বার বললেন—রাখলাম।

ক'দিন রাখবেন?

মিত্যু পৈর্যন্ত।

দুপুরে খেতে হল। জব্বারের পুত্রবধূর সঙ্গে কথাবার্তা হল। উনি নাকি ওঁর শ্বশুরের কাছে আমার ঠাকুরদাদার কথা শুনেছেন। একজোড়া খড়ম নাকি বহুদিন বাড়িতে ছিল, ওটা আমার দাদুর খড়ম। খোঁজা হল কিন্তু পাওয়া গেল না।

আমার তাড়া ছিল। চাঁদপুর যেতে হবে। চাঁদপুর থেকে ঢাকা। ওরা বলেছিল দু'দিন থেকে যেতে।

ওরা আমাকে একটা আমসত্ব দিল। রোল করা। আমদের বাড়ির গাছের আমের আমসত্ব।

আমসত্বের গায়ে শীতল পাটির ছাপ নেই। পাটিতে শুকোন হয়নি। রেকাবিতে। আমসত্বের গায়ে ফুটে উঠেছে একটা ছোট চাঁদ, তারা, আর কতকগুলি অক্ষর। অক্ষর সাজানো লেখা—সোনার বাংলা।

জব্বারের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম। বেশ স্মার্টলি। ভাবলাম কোনো

সেন্টিমেন্টাল কথাবার্তা বলব না।

বললাম চলি, খুব ভাল লাগাল।

জব্বার হাতের ইশারায় আবার বসতে বললেন। বসলাম।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। ঘুঘু ডাকছে। বেলা একটা। বললেন—ঠাইরিন কদিন আছিল আমার ঘরে। হেই কয়দিন নিরামিষ্য ছালুন হইছিল।

ঠারিন থাকতো বোরখা পরি।

ঠারিনরে আমার ঘরে না রাখলে বিপদ হইত। ডায়মন মিঞার লোকেরা বড় খাইচ্চত।

কত্তারে কইলাম আমনে যান। আমি লুঙি দিলাম। টুপি দিলাম। মাথায় আছিল টিকি। কাডি দিলাম। কর্তা ভাবল মোছলমানের অইত্যাচার। না হইলে জানে বাঁচত না।

লোকে জানে জব্বরের দুই বিবি। তিনি বিবি হয় কেমনে? যদি ডায়মন মিঞার লোক জানে, খারাপ হইব। এক ছোট বিবিরে বাপের বাড়ি পাঠাইলাম।

একদিন এক রাতে আমার ঘরে বড় বিবি আর ঠাইরিন।

ঠাইরিনরে কইলাম বোরখা খুলেন। বড় গরম। ঠাইরিন বোরখা খুলি বসি রইল।

ঘরে লাম্পের আলো। দেখলাম ঠাইরিনের চোখে পানি। গাল বাই পড়ে। আমি চোখের পানি মুছাইতে পাঁরিনঁ।

ফরের দিন বেয়ানে পাশের গ্রামের ভৌমিকরা ইন্ডিয়া গেল। ঠারিনরে ফাডাই দিলম বুইজেননি। আঁঞিও কোন গুনা করিনঁ।

জব্বার চুপ হয়ে গেলেন আবার।

আমি বলি—এবার চলি?

জব্বার বললেন, যাওয়ন নাই। আবার আইয়েন।

আমি উঠি।

জব্বার আবার বললেন, ঠাইরিনরে কইয়েন আরি।

কী কমু?

জব্বর কিছু বলল না আর। ওর চোখের শূন্য দৃষ্টিতে অনেক কথা ছিল।

ফিরলাম। ঠাকুরমাকে বললাম জব্বার আলি কে দেখলাম। বেঁচে আছে। ভালো আছে।

মৃদু হাসলেন ঠাকুরমা।

কিছু বলার চেষ্টা করছেন ঠাকুরমা। মনে হল বলছেন—কী আনলি?

আমি স্থির তাকিয়ে থাকি কনকচাঁপা ঠাইরিনের দিকে। ঠাকুরমাও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি এনেছি। অনেক কথায় রূপালি কুয়াশা এনেছি সারা গায়ে মেখে।

ঠাকুমা, তুমি পড়ে নাও।

পড়তে থাকো, আমার শরীর থেকে পড়। মিত্যু পৈর্য্যন্ত।

শারদীয় বর্তমান, ২০০০

বাতিল রেকর্ড

পরিতোষের মনে হল বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিকে শুনতেও পাচ্ছিলেন না তিনি। দেওয়ালে ঘেঁষা ছয় বাই আড়াই ফুট ডিভানের উপর বসলেন তিনি। এখন ভোর হয়ে গেছে মনে হল। ভোরকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, ভোরকে শুনতেও পাচ্ছিলেন না তিনি, তবু মনে হল এখন ভোর। ডিভানের পাশে রাখা দেড় বাই দুই ফুট টেবিলে জলের জাগ, ট্রনিজিস্টার, টর্চ এবং ঘড়ি।

পরিতোষ টর্চ জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখলেন। পাঁচটা দশ। মানে এখন ভোর। রোজই এর কিছুটা আগে ঘুম ভেঙে যায়। আজ একটু দেরিই হল। অথচ এখনও ভোর-ভোর লাগছে না। এখানে কোন জানালা নেই। ছশো পনের স্কোয়ার ফুটের ঘরে একটা বেড রুম। ওখানে বাপাই ঘুমোচ্ছে। বাপাইরা। বাপাই আর ওর বউ। ওদের ঘরের সঙ্গে লাগানো একটা বারান্দা আছে। আর আছে ইংরিজি 'এল' অক্ষরের মতো দুটো ফালি। ফালি তো নয়, ডাইনিং রুম, লিভিং রুম। লিভিং রুম দুটো ভাগ হয়েছে, কাঠের পার্টিশনে। ওধারে অনুভা আর মনু। মনু তো নয়, মোনালিসা। মা-মেয়ে ঘুমোচ্ছে। ওদের ভাগে একটা জানালা আছে। পার্টিশনের এধারে পরিতোষের শয্যা। পরিতোষের কোন জানালা নেই। পরিতোষ ভোর দেখতে পাচ্ছিলেন না। ভোর দেখা মানে মাদার ডেয়ারির দুধের গাড়ির সাদা, মানে আকাশদীপ অ্যাপার্টমেন্টের সাততলার কাচের জানালাগুলোর প্রথম চকচক, মানে সুপার মার্কেটের গিলে-করা বন্ধ দরজার পাশে শুয়ে থাকা কুকুরের উপর হামলে পড়া হ্যালোজেনের ক্রমশ ফিকে হয়ে যাওয়া। শোনাও এরকম। এরকমই। যেমন সাততলা থেকে নেমে আসা পি.ভি.সি পাইপের মুখ থেকে জল পড়া শুরু হল। নাইটগার্ডটি হাই তুলল, হাইয়ের আরাম—ডিউটি শেষ হবে এবার...। কোলাপসিবল গেট খুলে গেল। ভোরবেলাকার গেট খোলার শব্দে অনেক ঋজুতা। শহুরের অন্য শব্দরা তখনও বাক্সে ভরা। দূরে লোকাল ট্রেনের রুগ্ন শব্দ। এইসব। কাঠের পার্টিশনের ওপাশের জানালা দিয়ে আসা সকাল পার্টিশনের তলার রেখা ফাঁকে চুঁইয়ে পড়ে। আজ কাঠের পার্টিশনের তলায় কোন সকালের রেখা নেই। তা হলে আকাশে মেঘ। বৃষ্টির গন্ধও পাচ্ছেন। কান খাড়া করে বৃষ্টির শব্দ পেতে চাইলেন পরিতোষ। গেট খুলতেই চারদিকে চারটে বন্ধ দরজা এবং সিঁড়ি। পাইপ গড়িয়ে জল পড়ছে নিচে। তিনতলা থেকেও গেট খুলতেই শব্দ পাচ্ছেন পরিতোষ। ট্রানজিস্টারটা সঙ্গে নিয়ে সিঁড়িতে যান, ওঠেন। ছ'তলার উপরে ছাত। ছাতের দরজার কাছে থামলেন তিনি। দরজায় তালা। চাবি থাকে কেয়ারটেকারের কাছে। দরজাটির কাছে তিনি বসে রইলেন। দরজার ওপারে একটা বৃষ্টিভেজা সকাল রয়েছে। তিনি সকালটা দেখতে পাচ্ছেন না। দরজার তলা দিয়ে জলরেণু মাখা হাওয়া আসছে। হাওয়ায় মাল্লার। সিঁড়ির উপরের ধাপের বন্ধ দরজাটার সামনে বসে ট্রানজিস্টারটা খুললেন পরিতোষ। টোন পাচ্ছেন। মানে ট্রান্সমিটার চালু হয়ে গেছে। এইবারে বেজে উঠল সিগনেচার টিউন।

প্রকৃত সকাল বেজে উঠল।

পরিতোষ অন্যান্য দিনে আগেই বেরিয়ে যান। হাতে দুধের ক্যান, কাঁধে ব্যাগ। ব্যাগে ওই কালো ট্রানজিস্টার। স্কুলের মাঠটায় দুবার পাক দিয়ে মাদার ডেয়ারির লাইনে দাঁড়ান। ব্যাগের ভিতর থেকে ভোর বেজে ওঠে। ব্যাগের ভিতর থেকে বন্দেমাতরম। পরিতোষ সিগনেচার টিউনটা রোজই শোনেন। রোজই দারুণ লাগে। আজকাল রেডিয়োতে যে-সব ছেলে-ছোকরারা কাজ করে, তারা কি জানে, এই সিগনেচার টিউন কম্পোজ করেছিলেন একজন সাহেব, জন ফাউলট্ তাঁর নাম। এর মধ্যে আছে চেলো, ভায়োলিন আর তানপুরা। পরিতোষ শুনলেন। আকাশবাণী কলকাতা। আজ শনিবার, ছাব্বিশে শ্রাবণ ১৯১৭ শকাব্দ। দিলীপের গলা।

কীরে দিলীপ, কেমন আছিস রে! মেয়ের বিয়ে দিলি শুনলুম, কই আমায় নেমন্তন্ন করলি না তো! তোদের পরিদাকে ভুলে গেলি রে? কতদিন তোদের সঙ্গে কাজ করেছি, বল? হ্যাঁ রে, তোকে তো সকালবেলায় পাই না কখনও ; কী ব্যাপার, নাইট ডিউটি করছিস যে বড়? বাড়িতে ঝগড়া বাঁধাসনি তো? সেদিন বুঁচকির গান শুনলুম। বেশ রেকেছে গলাটা। আয়, একদিন আয়। খুব দেখতে ইচ্ছে হয়। ছন্দা আর তরুণকে তো টিভিকে দেখি। সেদিন গৌরীকেও দেকলুম, বেশ শুকিয়েছে। হ্যাঁ রে, তোর ভাইটা, কী যেন নাম, বেশ ফরসা ফরসা, তোর মত নয়, ইশ, কি যে হল আমার মাইরি, নামটা মনে পড়চে না...কেমন আছে রে ও? একদিন আয়। তোকে তো রাত্তির ছাড়া রেডিওতে পাব না। আমি আবার রাতে চোখে দেখি না ভাল, সেই যে রে, ক্যাটারাক্ট অপারেশন হল না—

কলকাতা 'খ' ঘোরলেন। সুবন্ধ সঙ্গীত হচ্ছে। কে গাইছে? আগ্রা ঘরানা? ফৈয়াজ খাঁ মনে হচ্ছে...। বেশ লাগছে। বন্ধ দরজার ওপারের বৃষ্টির ব্যস্ততা বয়ে এনেছে এই সুর। এই রাগ। এটা কি কোনও মাল্লার? ভৈরব মেশানো আছে এতে? একটু পরেই ঘোষণা শুনলেন, আজকের এই ভরা বাদল দিনে আমরা এতক্ষণ সুরদাসী মাল্লার শুনলাম ফৈয়াজ খাঁ...এর কণ্ঠে। বাঃ এখনও কান ঠিক আছে।

বাঃ কী সুন্দর এই অ্যানাউন্সমেন্ট। কী সুন্দর কণ্ঠ। কে? কানখাড়া করে পরের ঘোষণাটি শুনলেন। নতুন গলা। একদম ফ্রেশ্। ক্যাজুয়াল? নাকি নতুন লোক নিল? হ্যাঁ গো, তোমাকে নতুন মনে হচ্ছে। বেশ অ্যানাউস্‌মেন্ট করছিলে যা হোক। কিছু মনে কোরো না। নতুন চাকরি পেলে?

হ্যাঁ।

বাঃ খুশি হলুম। আমার নাম পরিতোষ গুহ্ বুঝলে!

ও! আপনিই পরিতোষ গুহ! আপনি ভেটারেন ডিউটি অফিসার ছিলেন, চৌত্রিশ বছর চাকরি করেছেন রেডিওতে। আপনার কত গল্প শুনেছি। চার বছর হল রিটায়ার করেছেন। স্টুডিওকে আপনি বলতেন মন্দির। প্রোগ্রামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ইনস্ট্রুমেন্টাল ফিলার বাছতেন। একবার রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর গিটারে 'সাত ভাই চম্পা জাগো রে' হচ্ছিল শুনে আপনি অন্য একটা ফিলার নিয়ে ছুটে যেতে গিয়ে পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছিলেন। আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এক্সরে টেবিলে ওঠানোর মুহূর্তে ঘড়িতে চোখ পড়েছিল আপনার। দেখেছিলেন আটটা পঁচিশ। আপনি চিৎকার করে বলেছিলেন ডাক্তারবাবু, আপনার পায়ে পড়ি। আমাকে এক্ষুনি

একটা ফোন করার ব্যবস্থা করে দিন। সাড়ে আটটার সময় একটা গ্রামোফোন রেকর্ড বাজবে। ওটার সেকেন্ড কাটটা যে ডিফেকটিভ্। ট্র্যাক-ব্যাক করতে পারে। তাড়াহুড়োয় হাসপাতালে চলে এলাম, অ্যানাউন্সারকে যে বলিনি...।

পরিতোষ বৃষ্টিভেজা সকালটাকে দরজার ওপাশে রেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকলেন। তার ফ্ল্যাটে গেলেন। রেডিও অফিসে একটা ফোন করলে ভাল হত। অ্যানাউন্সার ছেলেটির নাম জানতে ইচ্ছে করল। বাপাইদের দরজা খোলা। বউমা উঠে গেছে। বাথরুমে জলের শব্দ। এ সময় একটা ফোন ঝপ করে মেরে দিলে হয়। পর্দার ভিতরে উঁকি দিলেন পরিতোষ। বিছানায় পাতলা গোলাপি শোবার পোশাকে বউমাই ঘুমোচ্ছে। জিভ কাটলেন পরিতোষ। বাথরুমে জলের শব্দ চলছে। বাঁচা গেল। বাপাই বোধ হয় আজ সকাল সকাল বেরুবে। ছটা কুড়ির খবরে নিম্নচাপের কথা বলেছে। আজ এরই মধ্যে বেরুতে হবে? অনুভাকে ওঠানো দরকার। মেঘের অন্ধকার আর বৃষ্টির ঠাণ্ডা ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। পার্টিশনের দরজার কাছে মুখ নিয়ে ওপাশে যেন বউমা না শোনে। কী করে বলবেন, ওঠো অনুভা, বেলা হয়ে গেছে, বাপাই বেরুবে, বউমা এখনও ঘুমুচ্ছে...। বললেন, হ্যাঁগো, দোর খোলো বাজার যাব। টাকা নেবো।

অনুভার গলায় পরিতোষ শুনলেন—উঠি। তারপরেই শুনলেন এ মা...। ওই এ-মার মধ্যে পরিতোষ শুনতে পেলেন কাননদেবীর গলায়—'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হল মরি লাজে।'

পরিতোষ এবার ছাতা নিয়ে দুধ আনতে বেরুলেন। দেশবন্দনা বেজে চলেছে নাইলনের ব্যাগে। 'বঙ্গভূমি মা, তোমায় ছেড়ে আমি ওগো কোথাও যাব না।' কেন যাবি না? কোলে বসে থাকবি? গতকাল হল, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা...। ওটা যে 'ধনধান্যপুষ্পভরা'। দিলীপকুমার রায় 'ধনধান্যপুষ্পভরা'ই গাইতেন। গতকাল গানটা শুনেই উশখুশ করছিলেন পরিতোষ। শ্রোতারা চায় আকাশবাণী থেকে শুদ্ধ গান, শুদ্ধ উচ্চারণ যাবে। লোকগীতি না লোকোগীতি, অতুল না ওতুল, উদ্যোগ না উদযোগ, কোনটা শুদ্ধ এ নিয়ে কত বাগবিতণ্ডা করেছেন ডিউটিরুমে। কত তর্ক। তর্কই, কারণ ফয়সালা করার মালিক তো পরিতোষ নন, উনি তো ডিউটি অফিসার। এসব ফয়সালা হতে পারে আরও বড় জায়গায়। অতুল না ওতুল এ নিয়ে দুশ্চিন্তা না করলে পরিতোষের মাইনে পেতে কোন অসুবিধা হবার কথা ছিল না। তবু পরিতোষ এসব না করে পারতেন না। আড়ালে পরিতোষকে নিয়ে অনেকে হাসাহাসি করতেন। অনেক নিক্‌নেম জুটেছিল। পাকা গুহ, সুনীতিকুমার, মিঃ নোট, এরকম। খুব নোট লিখতেন পরিতোষ। ইনস্পাইট অফ মাই প্রিভিয়াস নোট রিগার্ডিং...এই অবধি পড়েই হায়ার অফিসার হয়তো মনে মনে বলতেন, কে হে তুমি হরিদাস পাল? ওই নোটে পরিতোষ হয়তো বলতে চেয়েছিলেন, বারবার বলা সত্ত্বেও কেন রোমান হরফে অনুষ্ঠানের বিবরণ পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে অনেক অসুবিধা হতে পারে। একটি নাটকের নাম লেখা হয়েছে Babla Kanta। ঘোষক ওই নাটকের নাম বাং লা কাঁটার বদলে বাবলাকান্ত পড়লে কি খুব অন্যায় করবে? শাসন গাইনকে শ্মশান গাইন পড়া হতে পারে। এইভাবে সুনন্দ/সুনন্দা, নবনীত/নবনীতার গণ্ডগোল হতেই পারে। আর কতটা কল্পণাপ্রবণতা থাকলে AMAR PODA BO/ লেখাটিকে পড়া সম্ভব আমার পড়া বই।

গতকাল তো ধনধান্যে পুষ্পে ভরা শুনেছিলেন। তারপরই অস্বস্তি হতে লাগল

পরিতোষের। ভেবেছিলেন, একটা ফোন করা জরুরি। না, বাপাইয়ের ঘর থেকে নয়। পাবলিক বুথে গিয়েছিলেন পরিতোষ। বুথ-এর ছেলেটি বলল, রেডিও অপিস? পরিতোষ লজ্জার হাসি হেসে বললেন, জানোই তো। লাইনটা পেলেন না পরিতোষ। ছেলেটি বলল, আপনাদের অফিস ভোগে। পরিতোষ বাড়ি চলে এসেছিলেন। বাপাই চলে গেলে তবেই ফোনটা করা যাবে। সাড়ে আটটা বেজে গেল তবু বাপাইয়ের স্নানে যাবার নাম নেই। জিজ্ঞাসা করলেন, কী রে আপিস যাবিনি? পরিতোষ যখন জেনেছিলেন বাপাই বর্ধমানে যাবে বারটার ট্রেনে, তখন সিদ্ধান্ত করেছিলেন আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। ফোনটা করেই ফেলা যাক। রিসিভার ওঠাতেই বাপাই বলল, ব্রডকাস্টিংয়ের কী খুঁত খুঁজে বার করলে আবার! একটু যেন ঝাঁঝ। পরিতোষ বললেন, না রে, ওসব কিছু নয়, সব সময় কি আপিসে ফোন করি নাকি আমি! এখন ভাবছিলাম তোর মেসোকে ফোন করব একটা। পেসমেকার বসিয়ে এখন কেমন আছেন, বহুদিন...

পরিতোষ দুধের লাইনে। ছাতার ওপরে টুপটুপটুপ জল পড়ছে। টুপুর টুপুর জলের নূপুর। একটা গান আছে না, টাপুর টুপুর সারা দুপুর নূপুর বাজায় কে...যেন এক কাজলা মেয়ে...। আরতি মুখোপাধ্যায়ের গান। সুর সুধীন দাশগুপ্ত। লিরিক? ‘সুবীর হাজরা? নাকি সুধীনদারই?...

দুধটা নেওয়া হয়ে গেল। এবার জল এল তোড়ে। রিম রিম ঝিম বৃষ্টি। মান্নার গান। মাটির কানে কানে এ কি কথা নিয়ে পড়ে ঝরে ঝরে/আমার সারাদিন কিভাবে কেটে যায় শুধু তুমি তুমি করে। জীবনে বহুবার লগ করেছেন পরিতোষ, কিন্তু চোখ বুজেও কোনদিন, ‘তুমি তুমি’র শরীরী মূর্তি পাননি। এখন একবার সর্বাণীর কথা মুহূর্তের জন্য মনে এল, ক্লার্ক, অমনি পরিতোষ মনে করার চেষ্টা করলেন গানটির কে সুরকার, কে গীতিকার, কোন কোম্পানীর রেকর্ড...। টাপুর টুপুর বৃষ্টি ঝরে কোন সে আকাশ থেকে/ও আমার কমলিনী শিহরিয়া যায়। আহা হেমন্ত। ফুলেশ্বরী ছবির। কী যেন কী যেন...। ছাতা মানছে না। অঝোরধারা। ঝরঝর বরিষে বারিধারা। ইশ্ কী কাণ্ড, একবার একটা এল.পি.তে এটা ছিল। প্রখর বৈশাখে, যখন একেবারে বৃষ্টি নেই, কলকাতা শহর কাতরাচ্ছে তখন ‘ঝরঝর বরিষে’ বেজে গিয়েছিল। রাস্তার মধ্যে, ছাতার তলায় একা পরিতোষ এগার বছর আগেকার ঘটে-যাওয়া ঘটনার অনুতাপে জিভ কামড়ালেন। তখন বাজ ডাকল। ঘন যৌবনে নব যৌবনা বরষা...

এখন বাসের ছাতে বৃষ্টি। বৃষ্টিমন্দিরা। ফাঁকা লরি বয়ে নিয়ে গেল কিছুটা অন্ধকার। ‘আজি ঝরোঝরো মুখর বাদর দিনে’—গাইতে গাইতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠেন পরিতোষ। ওঁর গলায় সুর নেই তেমন, তবু নবীন মেঘের সুর লেগেছে...। জামাকাপড় সপসপ করছে ভিজে। নাইলনের ব্যাগে রেডিওটা ভিজে গিয়েছে। দুধের ক্যানটা ঠিক জায়গায় রাখবার আগে, নিজের গা মুছবার আগে ট্রানজিস্টারটাকে তোয়ালে দিয়ে মুছে নিলেন। মুছু করলেন। আহা বাছা ছুনু। তারপর ঠিকঠিক কাজ করছে কিনা দেখবার জন্য রেডিওটা খুললেন। রিম রিম ঝিম বৃষ্টি। মান্নার গান। একী আশ্চর্য! একটু আগেই গানটির কথা ভেবেছিলেন। আমার সারাদিন কীভাবে কেটে যায় শুধু তুমি, তুমি, তুমি তুমি করে...। বাঃ, কে তুমি? কী নাম তোমার যে এই গানটা ঠিক করেছ? আবার সেই সুন্দর কণ্ঠটা শুনতে পেলেন—আজকের এই বৃষ্টিভেজা দিনে এবার আর একটি গান। ঘুরে ফিরে সেই রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে হয় আমাদের...। খুব আস্তে আস্তে

ফেড ইন করল—আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে...। একটু আগেই শরীর থেকে বেরিয়ে আসছিল গানটা। কী ব্যাপার, কোন টেলিপ্যাথির খেলা চলছে নাকি! একটা টেলিফোন করতেই হবে।

পরিতোষ ঘড়ি দেখল। হিসেবমতো এখন বাংলা টক মানে কথিকা হবার কথা। তার বদলে বর্ষার গান কী করে হল? টকার কি আসেনি, নাকি টেপ জমা পড়েনি? তাহলে নিধারিত অনুষ্ঠানের পরিবর্তে কথাটা বলে দেওয়া উচিত ছিল। যত ভাল কণ্ঠই হোক, এই ব্যাপারগুলো ভুললে চলবে কেন? তখন পরিতোষের মনে হল, অনুষ্ঠানটা তো প্রথম থেকে শোনা হয়নি, ছেলেটা হয়তো শুরুতেই বলে দিয়েছিল। এই যে ছেলেটি আজকের বর্ষাটর্ষা বলে গান চালাচ্ছে, শুনতে যদিও ভালই লাগছে, কিন্তু এই ধরনের অ্যানাউন্সমেন্টে রিস্ক আছে। হয়তো বনগাঁয় কিংবা কৃষ্ণনগরে কিংবা মুর্শিদাবাদে বৃষ্টি হচ্ছে না। আজ অবশ্য সেই রিস্ক নেই। আজ সর্বত্র বৃষ্টি হচ্ছে। ডিপ ডিপ্রেশনের বৃষ্টি। খবরের কাগজে নিম্নচাপের ব্যাপারটা স্টোরি হয়েছে। ছেলেটার মাথায় কি এই ব্যাপারটা, মানে কনসেপশনটা ছিল? ও কি জেনেশুনেই এটা করেছে? আচ্ছ, কথিকার পরিবর্তে বর্ষার গানগুলো বাজাবার সুসিদ্ধান্তটা কার? নাঃ, একটা ফোন না করলে আর চলছে না।

অফিসে ফোটটোন করলেই বাপাই, বউমা দুজনেই রাগ করে। বলে, রিটায়ার করে গেছ, পেনশন পাচ্ছ, ব্যস। কে তোমাকে এইসব রেডিও সংস্কার করতে বলেছ? আজকাল কি রেডিও শোনে? পরিতোষ হয়তো বললেন না রে, আমি একটু মনিটর করছি, আর রিপোর্টটা জাস্ট ওদের জানিয়ে দিচ্ছি। বাপাই হয়তো বলল, এরকম করো না বাবা, তোমাকে ওরা জাস্ট পাগলা ভাববে। রিটায়ার করার পর মনিটর করতে হয় না। বাপাই বেরুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? যদি সকালের শিফটের ছেলেগুলো চলে যায়? বাপাই আজ সকাল সকাল স্নান করল, কিন্তু বেরুচ্ছে না কেন? বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। যা হবার হবে, ফোনটা করেই ফেলা যাক। একবুক শ্বাস গ্রহণ করলেন পরিতোষ। শ্বাস নয়, সাহস, যেন স্টেশন ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকছেন। একটা গলা খাঁকারি। মানে কি, মে আই কাম ইন? আবার শ্বাস নিলেন। পি. এফ-এর লোন নিয়ে ছেলে মানুষ করা হয়েছে। খটাকসে ফোনটা ওঠালেন। বাপাই কি কপাল কুঁচকে আছে? নাকি হাসছে? একটু উপরে ওঠা ভ্রূ? কচি বাচ্চার পাতা ভরিয়ে দেয়া আঁকিবুকি দেখার সময় যে হাসি গুরুজনের? নাকি দাঁতে চেপে আছে ঠোঁট? নাকি এক্ষুণি চলে যাবে ঘর ছেড়ে, পায়ে শব্দ হবে থপ থপ। পরিতোষ স্বগতোক্তি করেন। সলিলকি। একটু কনগ্রাচুলেট করতে হবে ফর হিজ ভেরি গুড প্রেজেন্টেশন। রিং করছেন, পাচ্ছেন না। বেশ কয়েকবার করলেন। হচ্ছে না। হঠাৎ বাপাই খবরের কাগজ থেকে মুখ ওঠাল।

অফিসেই তো?

হ্যাঁ। কোন দোষটোষ নয়। একটা কনগ্রা...

ঠিক আছে পরে ফোন করো। আমার যে একটা এস.টি.ডি আসার কথা, ঠিক নটায়। পরিতোষ দেখলেন দেওয়াল ঘড়িতে ঠিক নটা বাজতে পাঁচ। পরিতোষের পায়ে এবার থপ থপ হয়। পাঞ্জাবিটা গলিয়ে নেন। ছাতা নেন।

এই বৃষ্টিতে চললে কোথায়!—অনুভার এই প্রশ্নে নিরুত্তর থেকেই পরিতোষ রাস্তায় নামলেন। জল থই থই। 'তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ, তা তা থৈ থৈ।' বৃষ্টিতে

অনেকদিন অফিসে আটকে গিয়েছেন রাত্রে, তখন সোদপুর থাকতেন পরিতোষ, গাড়ি পেতেন না। রাত্রে কত গল্প, মজা। দাদাঠাকুরের গল্প শুনতেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, এঁদের গল্প শুনতেন পুরনো পিওন শশধরের মুখে। নতুন আসা ছোকরাদের বলতেন, রেডিওর পুরনো বাড়ি গার্স্টিন প্লেসের গল্প, বীরেন্দ্র ভদ্রর গল্প, একটি শিল্পী ভূতের গল্প, যে কিনা একা ঘরে সারারাত পিয়ানো বাজাতো। বৃষ্টি এখন কমে গেছে অনেক। মিহি ঝিরিঝিরি। গতকালই গান শুনছিলেন এই ঝিরি ঝিরি বরষা উথাল পাথাল/মন চায় চোর হতে কী করি এখন। এটাও তো গান। গান শুনব না, শুনব না, বলে যদি এখনকার ছেলে ছোকরারা গান বাঁধে, কী করা যাবে! জল ঠেলে টেলিফোন বুথে এলেন পরিতোষ। কয়েকবারের চেষ্টায় আকাশবাণীর ডিউটি রুম-এর ফোন পেলেন।

—আমি পরিতোষ গুহ বলছি।

—কে পরিতোষ গুহ!

—আমি, আমি, মানে একজন পুরনো ইয়ে। আপনি কে বলছেন ভাই?

—আমি একজন ডিউটি অফিসার বলছি।

—কী নাম ভাই?

—নাম কী হবে? আপনার দরকারটা কী বলুন।

—দরকার মানে, —আজ একটি নতুন কণ্ঠ শুনলুম, তো, আটটা দশ-এ। গ্রামোফোন রেকর্ড-এ বর্ষার গান প্রেজেন্ট করছিল, ছেলেটিকে একবার ডেকে দিন না ভাই!

—ও কে তো এখন ডাকা যাবে না, স্টুডিও তে আছে।

—ও, আচ্ছা। ওর নামটা কী ভাই!

—অনির্বাণ ঘোষ।

—নতুন?

—হ্যাঁ।

—কোনো খবরটবর দেবার ছিল?

—না—না ঠিক আছে।

টেলিফোনে তীব্র ঝটাং। তখনও কাচের ঘরের ভিতরে পরিতোষ। কাচের দেয়ালে করাঘাত—কী হ'ল দাদু, হয়ে গেছে তো বেরিয়ে আসুন না। পরিতোষ কাচের বাইরে এসে একদলা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। বাজ পড়ল। ছাতা খুললেন পরিতোষ।

ছেলেটা, মানে ওই ডিউটি অফিসারটার ওপর কোনও রাগ নেই। ঠিকই তো করেছে ছোকরা। স্টুডিও থেকে কি যখন তখন ডাকা যায়! পরিতোষ নিজেও এরকমই করতেন। একবার কাজী সব্যসাচী অনুরোধের আসর প্রেজেন্ট করছিলেন, হেমন্তদা, মানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ফোনে চেয়েছিলেন সব্যসাচীকে, পরিতোষ সবিনয়ে বলেছিল এখন নয় হেমন্তদা...।

বাবুঘাটের একটা বাস দাঁড়ালো স্টপেজে। আচমকা উঠে পড়লেন। অফিস টাইম, তবুও ভিড় নেই। বৃষ্টির জন্য? বসতেও পেলেন পরিতোষ। বাসের ভিতরে চোখ ঘুরে বেড়ায়। এরকম সময়েই সর্বাণী যায়। পরিতোষের জেনারেল ডিউটি থাকলে মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যেত বাসে। শেষ দিন, যেদিন রিটায়ার করবেন, ফেয়ারওয়েল দেওয়া হবে, সেদিনও সর্বাণী ছিল। সর্বাণীই দেখেছিল পরিতোষকে। এগিয়ে এসেছিল। বলেছিল

পরিতোষদা, নেমে পড়ুন। আজ ট্যাকসিতে চলুন, আমি ভাড়া দেব। পরিতোষ বলেছিল তা কেন? দিব্যি তো বসেই যাচ্ছি। সর্বাণী পরিতোষের কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা টেনে বলেছিল, চলুন না, রিকোয়েস্ট।

পরিতোষ ট্যাকসিতে উঠেছিল সেদিন। সর্বাণী ওর ব্যাগ থেকে বের করেছিল একটা প্যাকেট। বলেছিল, একটা পাঞ্জাবির কাপড় আছে পরিতোষদা, ভাবছিলাম কী ভাবে দেয়া যায়! পরিতোষ বলেছিল, আবার এসব কেন?

এমনি। আপনাকে আমি...। আপনার ওই সাজেশনটা আমার জীবনটাকে, মানে...। আপনি আমায় বাঁচিয়েছেন...আপনাকে অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করে। কিছু দিতেও ভয় করে। ভাবছিলাম আজকের ফেয়ারওয়েলে...। ফেয়ারওয়েল কথাটা বলতে খারাপ লাগছে আমার। জামাটা বানিয়ে পরবেন কিন্তু।

পাঞ্জাবিটা বানাননি পরিতোষ। বানালেই পরতে হবে। পরলেই কাচতে হবে, আছড়াতে হবে, নিংড়োতে হবে, তারপর ছিঁড়ে যাবে একদিন। অনুভা ঘর মোঝার ন্যাতা করবে।

আকাশবাণী ভবনের সামনেটায় ভিড় কেন? কিসের জটলা? ভিড়ের ভিতরে উঁকি দিয়ে পরিতোষ দেখেন ভেজা ফুটপাথে একটি রক্তাক্ত মানুষ। মাথার ফাটল থেকে বেরিয়ে পড়েছে হলুদ। এসব সহ্য হয় না। অন্য দিকে চোখ ফেরাতে গিয়ে মানে হল, সতু না? সতুই তো। সত্য মজুমদার। গায়ক। বহু পুরনো গায়ক। ‘তোমার শরীরে স্বর্গ এসেছে নেমে’। কী সাহসী গান সে সময়ের। সতুরই লেখা, সতুরই সুর। সতু, তোর কী হল? ‘মরণের পরে আমারে রাখিও মনে।’ গ্যার্স্টিন প্লেসে এই গানটা যেদিন লাইভ গাইছিল সতু, সেদিনই জয়েন করেছিলেন পরিতোষ। পরিতোষ হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, সতু...। কিন্তু আওয়াজ হল না কোনও। পুলিশের কালো গাড়ি আর কালো ধোঁয়া নিয়ে গেল সতুকে। দু হাত ঝুলছে বাতাসে। ‘বাতাস কেন পাতা ঝরায় হলুদ বনে।’ সতুর গান। কয়েক ফোঁটা রক্ত চুপচাপ পড়ে রইল সামনের পিচে। কাক এল।

‘লোকটা হাঁ করে দেখছিল মাইরি ওই বিল্ডিংটা। একটা অ্যাম্বাসাডার মেরে দিয়ে ভোঁ।’ একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলল। আকাশবাণীর সামনে দাঁড়ানো সি.আর পি টি নির্বিকার বলল, ‘আরে এ আদমী ইহা পর খাড়া হোকে ইস্ বিল্ডিং কো দেখতা রহতা থা। মুঝে পাগল লাগতা থা। মার দিয়া অ্যাম্বাসাডার...।’

সতু একা একা তাকিয়ে থাকতো এই বাড়িটার দিকে? এখন ওই বাড়িটার ভিতরের স্টুডিও থেকে গড়িয়ে আসা শীতল বাতাসে ‘আমারে রাখিয়ো মনে মরণের পরে’ কী আছে? স্প্যানিশ গীটারের আর ড্রামের ঝিনচ্যাক। নতুন শিল্পীদের পদপ্রক্ষেপে অব্যয়ী ভাব। এফ এম-এর নতুন সম্প্রচারে স্টিরিও হাসির হি হি। অদ্ভুত এক ভাষার গ্রন্থনা—ভাবছি কি এখন পুরনো কিছু বাংলা গান বাজাবো। কারণ কি, ওল্ড ইজ গোল্ড। বিক্রি হয়ে যাওয়া টাইম স্লটে ব্যবসা-বাক্য। ওখানে সতু নেই, সতুর ধুলো-জমা আটাত্তর আর পি এম-এর রেকর্ড নেই।

সতুর গান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। খুব বেশি বিড়ি খাওয়ার জন্য কিনা কে জানে, নডিউল হয়ে গিয়েছিল গলায়। বেসুরো হয়ে গিয়েছিল সতু। পরিতোষ-কে বি মাইনাস দিতে হয়েছিল। ক্রমশ বাতিল হয়ে গেল সতু। অথচ এই সতু কতদিন ধরে ভাল গান

গেয়ে মাতিয়েছে। গানের জন্য চাকরি-বাকরিও করল না ঠিক করে। বউটা চলে গেল। তবু আমি গান গেয়ে যাব ও গো....আটাত্তর আর পি এম-এর কালো রেখায় সব হারানো পুরনো।

পরিতোষ ডিউটি রুমের পদ্মগ্রিলের বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরের ডিউটি রুম দেখে। দেখে র‍্যাকের উপরে ধুলো-জমা লগ বুক। ওই সব বইয়ের খাঁজে খাঁজে পরিতোষের হাতের লেখা আছে। সই আছে। আনন্দ উত্তেজনা মনঃকষ্টের ইতিহাস আছে ফসিল অক্ষরে। পরিতোষ পদ্মগ্রিলের বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরের ঘরটিকে দেখেন দেয়ালের ঝুল সহ। ঘরে বসা ছেলেটিকে দেখেন, ছেলেটির চেয়ারটিকে দেখেন, নিজের প্রাচীন অস্তিত্বটিকে দেখেন।

ছেলেটি বলে—কিছু বলবেন?

হ্যাঁ মানে—আপনি কি সত্যেন মজুমদারের নাম শুনেছেন?

—সত্যেন মজুমদার? সিকিউরিটি অফিসার? সে তো সত্যেন মল্লিক।

—উঁহু। জানেন না? খুব পপুলার গায়ক ছিলেন একসময়।

—ও। তা এখন কী হবে?

—ওঁর একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে আজ আকাশবাণীর সামনে।

—ও। শুনেছি একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। একজন লোক স্পট ডেড।

—আচ্ছা, পরিতোষ গুহর নাম শুনেছেন কখনও?

—কে সে?

পরিতোষ চুপ করে থাকেন। চারিদিকে তাকান। কেউ কি চেনা নেই? শুধু পুরনো আলমারিগুলো, গান্ধীজির ছবি আর দেয়ালের ঝুল বলছে কেমন আছ পরিতোষ?

ছেলেটি বলল, অ্যাকচুয়ালি আপনি কী চান বুলন তো।

পরিতোষ বললেন, অনির্বাণ ঘোষ নামে নতুন অ্যানাউন্সারটি এসেছে, ওর সঙ্গে একটু কথা বলতাম।

—চলে গেছে।

—আবার কবে ডিউটি?

ছেলেটি যেন একটু গলা চড়িয়ে বলল, অপেক্ষা করুন ডিউটি চার্ট দেখে বলতে হবে।

পরিতোষ চারদিকে দেখেন। কেউ কি নেই? এমন কি দিলীপও, যে ছেলেটিকে বলত, এনাকে চেনো না তুমি? ছিঃ, ইনি হচ্ছেন...

'কুহু কুহু কোয়েল যদি ডাকে', বাঃ মাধুরী চট্টোপাধ্যায়। সেভেনটি এইট আর পি এম। মন মোর উদাস হয়ে থাকে এ ব্যথা বোঝাবো কাকে বোকাকে বোকাকে বোকাকে... বোকাকে...আর্তনাদ করে ওঠেন পরিতোষ। শরীর থেকে লাফিয়ে পড়ল পুরনো অভ্যেস।

—এই, কী হচ্ছে, থামাতে বল, ট্র্যাকব্যাক করছে যে রেকর্ডটা...। ছেলেটাকে কবে বলেছিলাম বাতিল করে দাও...।

পরিতোষ বাইরে যান। দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ান। চেনা কাঁঠালচাপা গাছটির কাছে যান, গাছ থেকে একটি বাতিল ফুল ওঁর পায়ের কাছটিতে পড়ে।

এবার উপরে ওঠেন পরিতোষ, দু একজন 'আরে, কেমন আছ পরিতোষদা' বললে বড় খুশি হওয়া যেত। লম্বা করিডরের দু পাশের নেম প্লেটে অচেনা নামের মাঝখান

দিয়ে হেঁটে যান পরিতোষ। কেউ কি নেই যে আন্তরিক হেসে বলবে...।

নিউজরুমেও একবার ঢুকলেন পরিতোষ। চেনা কি কেউ আছে? পরিতোষ দেখলেন, দুজন অচেনা। একজন ডেস্কে। বুলেটিন তৈরী হচ্ছে।। ও বলছে, একজন লিখছে। পরিতোষ শুনলেন—'লালবাজার সূত্রে জানা গেছে আজ সকালে আকাশবাণীর সামনে একজন বৃদ্ধ পথদুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায় নি।'

পরিতোষ বলেন, ও তো সত্য মজুমদার। বহু পুরনো আর্টিস্ট, আমাদের গায়ক।

—কিন্তু আপনার কথায় নামধাম বলে দেব? আপনারও তো ভুল হতে পারে! ওদের বাড়ির থেকে বা অন্য কোন সোর্স থেকে...

—আমি পরিতোষ গুহ, আমি তো বলছি...

—আপনি কে?

পরিতোষ বলে, আমি কে এই অফিসের ইঁট কাঠ দরজা জানে, চৌত্রিশ বছর, জানো চৌত্রিশ বছর চাকরি করে গেছি আমি...

ছেলেটি বলে, বরং লিখে যান ওঁর সম্পর্কে যা জানেন। আমরা ক্রশচেক করে নেবার চেষ্টা করব...।

পরিতোষ কাগজ বের করে লিখতে থাকে সতু। সত্যেন। সত্যেন মজুমদার। সত্যেন মজুমদার।

তারপর কলমের সন্ত্রাসে ছারখার করলেন কাগজের সাদা। তারপর লিখলেন, পরিতোষ গুহ। জন্ম ১৬ই আগস্ট, ১৯৩৪, হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে। পিতা হারানিধি গুহ, মাতা করুণাময়ী দেবী। ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া...

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে পুরলেন পরিতোষ। অচেনা নাম সাজানো লম্বা করিডোরের মাঝখান দিয়ে চলছেন। কাগজটা কাকে দেবেন? কাকে? সর্বাণীকে?

কুহু কুহু কোয়েল যদি ডাকে/কেন যে মন উদাস হয়ে থাকে/একথা বোঝাব কাকে বোকাকে বোকাকে বোকাকে....

দেশ, ১৯৯৫

আত্মজীবনীমূলক রচনা

দোলের দিন বুবাটা-টুবাই দুভাই রঙের বালতিটা বিউটির সামনে নিয়ে এল। ওদের মা চিৎকার করে বলল, অ্যাই, এখানে কী হচ্ছে। বাইরে নিয়ে যা। ওরা তখন বিউটিকে ছাদে নিয়ে গেল, আর একমগ লাল রং ঢেলে দিল। বিউটি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, ওর এখন লেজ নাড়ানো উচিত কিনা। দু-চারবার নাড়িয়ে বন্ধ করে দিল। লেজের সমস্যা হল নাড়ানো শুরু করলে ঝপ করে বন্ধ করা মুশকিল। যখন ছাদে নিয়ে যাচ্ছিল, লেজটা নাড়াতে নাড়াতেই যাচ্ছিল। টুবাই ওর কানটা ধরে টানল। আদর? লেজ নড়ছে। আজ মাইরি পুরো রেড করে দেব। লেজ নড়ছে। পা দিয়ে একটু ঠেলা দিল বুবাই। আদর? লেজ নড়ছে। বুবাই-টুবাই এরপর ঝপ করে একমগ লাল রং ওর গায়ে ঢেলে দিল। গা সিরসির গা সিরসির করে। লেজ আর নড়ে না, থামে। গা-টা ঝাঁকাল বিউটি। রঙের ছিটে লাগল বুবাই-টুবাই-এর গায়ে। দেখলি, ও কিরকম আমাদের রং দিয়ে দিল। প্রশংসা। লেজ নড়ছে। ওরা ছাদের রেলিং থেকে চ্যাঁচাল এই ববি, সানু, টিনটিন—এখানে চলে আয়, দেখবি। হোয়াট এ ফান।

লিফ্‌ট-এ চেপে ন-তলার ছাতে চলে এল ছ-সাত জন। ওরা নীচের লন-এ রং খেলছিল।

রগড় দেখবি? এই বলে টুবাই আবার একমগ জল বিউটির গায়ে ঢেলে দিল। বিউটির চামড়া ঝিকির ঝিকির কেঁপে উঠল। এবং রঙের ছিটে ছড়াল। একটা ছেলে বলল কুকুরের সঙ্গে মানুষকে রং খেলতে দেখলাম ফার্স্ট টাইম। গিনেস বুকে পাঠিয়ে দিস। অন্য একজন বলল, তোমরা কুকুরের সঙ্গে রং খেলছ বিকস ইট ইস ভেরি সেফ, কারণ কি, কুকুর তো আর পিচকিরি মারতে পারে না। বিউটি একটু লজ্জা পেল। ইশ্, ও কেন পিচকিরি মারতে পারে না। বুবাই বলল, পিচকিরির দরকার নেই ওর, সাড়া বডি দিয়েই তো রং ছিটোচ্ছে। এটা প্রশংসা। লেজ নড়ে উঠল ফের। আবার একমগ জল ঢেলে দিল ওর গায়ে। একটা ঘেউ শব্দ বেরিয়ে এল ওর শরীর থেকে। বিউটি করতে চায়নি এটা। এটা প্রতিবাদ নয়। তবু শরীরের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে ঘেউ। সেই কবে, ওর প্রাচীন পুরুষ, যখন জঙ্গলে ছিল, নিজস্ব ঘেউ শব্দে স্বজাতিকে জানাতো আক্রান্ত হবার সংবাদ, ঘেউ সংকেতে জানাতো কাছে এসো, কিন্তু এরা বহু পুরুষ গৃহপালিত হয়ে গেছে। ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাংস খেতে হয় না, হলুদ মাখা সেদ্ধ মাংস পায় কাচের প্লেটে, তবু মাংস ছিঁড়ে খাবার কর্নোসিয়াল দাঁত রয়ে গেছে ওর চোয়ালে এখনো। সেই কবে, বন্য জীবনে বিশ্রাম করার সময়, ঘুমের আগে, ঘুমের অনিশ্চয়তার আগে জায়গাটা ঘুরে ঘুরে বুঝে নিতে হত হাওয়ার প্রবাহ, হাওয়ার বিপরীতে থাকত ওদের নাক, যাতে শত্রুর গন্ধ টের পেতে পারে। আজ, এই গৃহপালিত জীবনে মোজাইক গৃহকোণে পরিপাটি বিছানাটির কাছে এসেও আজও ওরা শোবার আগে আড়াইপাক ঘোরে। লক্ষ বছরের অভ্যাস শরীর থেকে শরীরে বয়ে যায়। শরীরে

রয়ে যায়।

ঘেউ শব্দটা করে একটু যেন লজ্জিত হল বিউটি। বুবাই-টুবাইয়ের দিকে তাকাল। সানু নামের চশমা পরা ছেলেটি বলল, এত রং ঢালছিস, কিন্তু ওর গায়ে দেখ, রং লাগছে না। ও যদি স্পেনিয়াল হত, এতক্ষণে কালারফুল হয়ে যেত। ওদের কত বড় বড় লোম। ববি বলল স্পিৎস্ বা টেরিয়ার হলেও হত। সানু বলল, টেরিয়ার-ফেরিয়ারের চেয়ে স্পেনিয়ালের লোম লম্বা।

ববি বলল, তুই কিচ্ছু জানিস না। ইয়র্কশায়ার টেরিয়ার দেখেছিস? আমার মাসীর বাড়ি আছে। এই বড় বড় লোম। টিনটিন গম্ভীরভাবে বলল, সবচেয়ে বড় বড় লোম হয় পুডুলদের। ফ্রান্সের ডগ। তুই দেখেছিস?

ইয়েস। ভি ডি ও-তে। মামা তো ফ্রান্সে থাকে। ক্যাসেটে দেখেছি।

পম্ দেখেছিস? পম্? সুস্নাতদের আছে। কী লাভলি। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে।

বিউটি এইসব শুনছিল আর লজ্জা পাচ্ছিল। ও তো নেড়ি কুকুর। কুত্তা, নেড়ি কুত্তা। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে বুবাই-টুবাই। ওর গায়ে লম্বা লম্বা লোম নেই। ওর রং সাদা নয়, অফ হোয়াইটও নয়, এমনি রং। রাস্তার শুকনো শালপাতার মতো। বিউটি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে যদি রাস্তা দেখে, রাস্তায় পড়ে থাকা রুটি দেখে, লোকজন দেখে, তখন লোকজনও ওকে দেখে। অবাক হয়ে দেখে ব্যালকনির সাদা রং গ্রিলের ফাঁকে মুখ বের করে আছে সে কেমন অ্যালসেসিয়ান? পাড়ার চেনা লোকেরা, যারা জানে ও অ্যালসেসিয়ান নয়, নেড়ি, ওরা হাসে। ও কি তবে আর ব্যালকনিতে দাঁড়াবে না? কিন্তু বুবাই-টুবাই যে মাঝে মাঝেই ওকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখে ব্যালকনিতে। বলে হাওয়া খা।

না, বিউটির চেন দরকার নেই। ও তো অ্যালসেসিয়ানদের মতো বিকট শব্দে ভয়ংকর হতে পারবে না কোনোদিন। পালিয়ে যেতেও পারবে না আর রাস্তার অন্য নেড়ি কুকুরদের কাছে। বুবাই-টুবাই তবু ওকে চেন-এ বেঁধে রাখে। কারণ অন্য ফ্ল্যাটের অন্য কুকুররা, হাউন্ড স্পিৎস্ বা টেরিয়ার-রা চেন-এ বাঁধা থাকে। বিউটির জন্য ডগ-বিস্কুট দরকার নেই, কোনো দরকার নেই, বাসি রুটিই যথেষ্ট, তবু ওরা ডগ-বিস্কুট নিয়ে আসে, ডগ-সোপ মাখিয়ে স্নান করায়। মাঝে মাঝে সকালে বা বিকেলে হাতে চেন ধরে বেড়াতে নিয়ে যায় টুবাই বা বুবাই। অম্লানবাবু কল্যাণবাবুরা তখন ওদের সিল্কের মতো লোমওলা বা ধনুকের মতো তীব্র অ্যালসেসিয়ান নিয়ে বেরিয়েছে, হাগানো প্লাস ওয়াকিং, ওরা বলে কীহে তোমাদের মহারাজটি ঠিক আছে তো? সকালের ঠিকে ঝিরা কাজে বেরুতে শুরু করলে চেন লাগানো বিউটিকে দেখে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসে। কেউ বলে খেঁকিটার বরাত দেখ। বলে, কপালগুণে গোপাল তাঁতী। বলে, ওর পেটে ঘি হজম হচ্ছে কেমনে লো! বলে, গায়ে দাদ চুলে বাবরি। বলে, বাবুদের খেয়াল। ময়না টিয়া উড়িয়ে দিয়ে খাঁচায় পোষেন কাক। বিউটির লজ্জা করে ভীষণ লজ্জা করে।

কী করবে ও। ওর তো এসব কিছুতেই নিজস্ব দায়িত্ব নেই। ওর জন্ম ছ-নম্বর জলট্যাংকির তলায়। বিউটি ওর বাবাকে চেনে না। রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো খ্যাকখ্যাক করা লোম ওঠা কুকুরদের মধ্যে যে কেউ ওর বাবা হতে পারে। ওর মাকে চেনে না ও। লেজের তলায় দগদগে লাল হয়ে যাওয়া মাংস পুঁটুলি বয়ে বেড়ানো এঁটো

খাওয়া কুকুরীগুলোর মধ্যে যে কেউ ওর মা হতে পারে। অনেক দিন আগে, বছর খানেক হবে, যখন বারান্দার ব্যালকনিতে ওকে গ্রিলের সঙ্গে চেন দিয়ে বেঁধে সামনের প্লেটে দিয়েছিল গুঁড়ো কেক আর রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাওয়া একটা কুকুরীর ছেঁড়া মাংসে হামলে পড়া কাকেদের তাড়াচ্ছিল সমবেত কুকুরদের আর্ত ঘেউ ঘেউ, তখন বিউটি গ্রিলের এধার থেকে তীব্র চিৎকার করে উঠেছিল। বলেছিল আমি, আমিও। রাস্তার কুকুররা ওর দিকে নিরুত্তাপ তাকিয়েছিল। পাত্তাহীন, ও যেন ওদের কেউ নয়। যেন এই ভাষা ওরা বোঝে না। ও কেন খেঁকি না হয়ে বিউটি হল।

বিউটি বহুবার শুনেছে ওর বিউটি হবার বিত্তান্ত। সোফার গভীরে ঢুকে যাওয়া গায়ে গন্ধমাখা লোকজন কার্পেটের ওধারে, ঘরের কোণায় বসা কুকুরটাকে দেখিয়ে বলেছে—ঠকেছ নিশ্চয়, ঠিক গঙ্গার ধারের বেদেরা অ্যালসেসিয়ান বলে নেড়ির বাচ্চা গছিয়েছে।

বুবাই-টুবাইয়ের বাবা অধ্যাপক। মা ব্যাংকে। বলেন, জেনে শুনেই রেখেছি। মানে রাখতে হয়েছে।

কেন?

আর বোলো না, বুবাই-টুবাইয়ের কাণ্ড।

মানে?

মানেফানে কিছু নেই। এসব পাগলামির কোনো মানে হয় না। একদিন খেলতে গিয়ে ওরা দেখল কতকগুলো কুকুরের বাচ্চাকে কাকে ঠোকরাচ্ছে। একটা মরে গেছে। ওরা কোলে করে নিয়ে এল একটাকে। এনেছে তো আর তক্ষুনি ফেলে দিতে পারি না, মরেটরে যাবে। ভাবলাম একটু বড় হয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসব। ওরা কিছুতেই ছাড়তে দেবে না, কান্নাকাটি। একদিন মানিকতলায় ছেড়ে এলাম, ঠিক চলে এসেছে ফের। বোঝো। এমনিতে কুকুরটা খারাপ না খুব একটা। বিউটি...কাম হিয়ার...। লেজ নাড়তে নাড়তে সামনে এলে ও শুনেছে বাব্বাঃ বিউটি! হেঃ হেঃ হেঃ।

আরে বিউটি তো ভালো। টুবাই তো নাম রাখতে চেয়েছিল ডিম্‌পল। আমি বললাম ডিম্‌পল রাখিস না, মারফার খাবি। আরে বাবা, রাস্তার কুকুরদের নাম যেমন হয়, কালু ভুলু এই সব রাখ, তারপর মনে হল এটা আবার ডগ নয়, বীচ। বীচদের নাম প্রপোস্‌ড হল—জলি, মলি, সুইটি, বিউটি। আরে বাবা দেশী কুকুরদেরও নাম হয় কেমন বিদেশী। দেশী কুকুরদেরও নাম কেউ সৌদামিনী রাখে না। টেঁপি, লক্ষ্মী, চঞ্চলা কত নাম হতে পারত। কিন্তু কুকুরদের নাম বিদেশীই হয়। যাই হোক, বিউটিই রাখা হল শেষ পর্যন্ত। ছোটবেলায় তো বিউটিফুলই ছিল। সমস্ত বেবিই সুন্দর। তারপর যতবড় হতে লাগল, ততই আসল রূপ বেরুতে লাগল...

ও যে কী করবে ওই সব সময়। শুধুই কি লেজ নাড়বে? অতিথিদের পায়ের গন্ধ নেবে? নাকি ঘেউ শব্দটাকে যতটা পারা যায় নমনীয় মধুময় ও প্রভুভক্ত করে ও উচ্চারণ করবে কেঁউ। পাড়ার লোকজনের কাছে নেড়িটা একটা মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে...

কলকাতার কড়চায় জানিয়ে দাও। ছেপে দেবে..মানেকা গান্ধীর কাছে খবর চলে গেলে প্রাইজটাইজ পেয়ে যাবেন.. এসব কথার মধ্যে গুঁজে থাকা অপমান কুকুরটা বুঝতে

পারে মাঝে মাঝে। কিন্তু ও সাতশো ষাট স্কোয়ার ফিট থেকে পালিয়ে রাস্তায় চলে যেতে পারে না। কেন যে পারে না। কেক নয়, মাংসের লোভ নয়, একটা অদৃশ্য কিছু আছে যা ওকে টেনে রাখে। বশ্যতা? কুকুর জানে না। রাস্তার কুকুরদের দিকে চেয়ে দেখেছে ; কথা বলতে চেয়েছে বিউটি। অবহেলাই পেয়েছে। ডগ-সোপ আর ডিওডরেন্ট মাখা বিউটির শরীর থেকে ওর জ্ঞাতি ও আত্মীয়রা আর কুকুরের গন্ধ পায় না। রাস্তায় বের হলে রাস্তার কুকুরদের চোখে বিউটি পড়ে নিতে পারে—শালী, বেলা মারাচ্ছিস? গৃহপালিত? কেকফুটুনী?

কিন্তু কী করবে বিউটি? বিউটি হবার পিছনে ওর নিজস্ব কোনো অবদান নেই। গৃহপালিত হবার জন্য ও অ্যাপ্লাই করেনি কখনো কোথাও, আর ওর অন্তর্গত রক্তে বহুপুরুষ ধরে কী যে আছে, কেউ খেতে দিলে, সামান্য আদর কিংবা আদরের অভিনয় দিলে সত্তার গভীরে মিশে যায়। তিরস্কার-লাঞ্ছনা- অপমান-পোঁদে লাথিতেও কৃতজ্ঞতা মরে না। একটি রুটির বিনিময়ে নিরবধি লেজ নাড়া চলে। বিউটি ওই বাড়ি, ওই টুবাই-বুবাই, ওই অপমান ছেড়ে কিছুতেই, কিছুতেই বেরোতে পারে না।

বিউটি যদি ডায়রি লিখতে পারত, ও হয়তো এইরকম কিছু লিখে যেত।

শাদামতো যেটা খেলাম ওটা দুধ। যেটা চুষলাম ওটা রবার। মায়ের নয়। শাদামতো যেটা উপরে রয়েছে ওটা সিলিং। আকাশ নয়।

যারা আমায় দুধ খাওয়াল ওরা বুবাই-টুবাই। আমার ভাইবোন নয়।

বুবাই-টুবাই আমার প্রভু।

বুবাই-টুবাইদের ঘরে কত কিছু। পায়ের থাবা দিয়ে একটা বাক্স ছুঁলে বাক্সর ভিতরে টুং শব্দ হয়। ব্যালকনি দিয়ে দেখেছি আমারই বয়সী, আমারই মতো দেখতে একটা কুকুর থাবা দিয়ে একটা ছুটন্ত ইঁদুর চেপে ধরল। আমি থাবা দিয়ে কালোবাক্সে টুং শব্দ করি। বুবাই ওদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে শেকহ্যান্ড, টুবাই আমার থাবাটা হাতে ধরে বুবাইয়ের হাতে গুঁজে দেয়। বুবাই বলে থ্যাংক ইউ। এখন ওরা শেকহ্যান্ড বললেই আমার নখগুলো সাবধানে মাংসের ভিতরে লুকিয়ে ফেলে থবার নরম ওদের হাতে গুঁজে দিতে পারি।

মাঝে মাঝে বুবাই-টুবাই ওদের বিছানায় আমাকে নিয়ে খেলত। ওদের বিছানা কি নরম। বুবাই-টুবাইদের মা একদিন এসে বলল, তোদের বিউটিকে আর বিছানায় ওঠাবি না। ওরা বলল, কেন, কী হয়েছে? ওদের মা বলল, দেখছিস না ও বড় হয়ে গেছে। এখন ও জার্ম ক্যারি করছে। ওর গায়ে বাজে গন্ধ হবে। ওরা বলল, কেন বাজে গন্ধ হবে। স্নান করে তো। ওদের মা বলল, তবুও গন্ধ হয়। নোংরা গন্ধ। যদি বিছানায় ওঠে, কোনো কথা শুনব না। সোজা বাড়ির বাইরে করে দেব। আমাকে নামিয়ে দিল খাট থেকে। এখন আমি ওদের খাটের উপরের নরমে যাই না। খাটের তলায় মাঝে মাঝে যাই।

একদিন একটা লোক এল। ডাক্তার। বুবাই-টুবাইদের মা বলল আমার ছেলেদের পাগলামি ভালো করে দিন তো। কুকুরটাকে নিয়ে দেখছেন তো কি করছে। ডাক্তারবাবু বললেন, ওসব কিছু নয়। ছেলেরা বড় হলে দেখবেন ঠিক হয়ে যাবে। নিজেরাই বিদেয় করে দেবে।

আমি রোজ দেখি বুবাই-টুবাই বড় হচ্ছে কিনা। কাতর হয়ে দেখি। ভয়ে ভয়ে দেখি।

আমাকে বেড়াতে নিয়ে যায় সকালবেলায়। গলায় চেন। ঝনঝন শব্দ হয় রাস্তার সঙ্গে চেনের। একদিন একটা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হিসি করি। দুর পেকে একটা বড় কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ইয়া লম্বা জিভ। মোটা লোমওলা ল্যাজ। ওই ল্যাম্পপোস্টটা ওর। ও ওখানে হিসি করে। কুকুরটা আমার দিকে তেড়ে আসতে চাইছে। কুকুরটার চেন যার হাতে সে ঝুঁকে পড়েছে। সামলাতে পারছে না, প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ। আমি পালাই। ছুটে যাই একটা মিষ্টির দোকানের পাশের গলিতে। ওখানে আমার মতো দেখতে কুকুরগুলো আমার গলার চেন দেখে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। আমার গায়ের গন্ধ শোঁকে আর ঘেউ ঘেউ করে। বুবাই এসে আমাকে একটা লাথি দেয়। বলে, পালিয়েছিস কেন? ভিতু কোথাকার, তোকে না রোজ গ্লুকন-ডি খাওয়াই, ফাইট দিতে পারলি না।

কে যে কী চায় অমার কাছে।

বাড়িতে সবাই টিভি দেখে। আমিও দেখি। গাড়ি দেখি, রাস্তা দেখি। কত রকমের খাবার দেখি। টিভিতে দেখা লাল খাবার হলুদ খাবার শাদা খাবার বাড়ির টেবিলেও দেখি। আমাকেও দেয়। তখন মনে হয় টিভি খাচ্ছি। টিভিতে কুকুরও দেখি। কেউ আমার মতো নয়। আয়নায় শুধু আমার মতন কেউ থাকে।

সন্ধেবেলা ফ্ল্যাটবাড়ির তলায় এখন আলো জ্বলে উঠছে। পাখির পালক গেঁথে গেঁথে তৈরি করা একটা জিনিশকে ওরা মারে। ওটা একটা খেলা। বুবাই-টুবাইরা ওই খেলা খেলে। আমি একদিন ওই খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। ওখানে বুবাইদের বন্ধু টিনটিনদের ওই অ্যালসেসিয়ানটা ছিল।
আমাকে দেখেই আমাকে কামড়াতে লাগল। আমি বললুম আউচ্। ঘেউ নয়, কেঁউ নয়, আউচ্। আমার কান দিয়ে রক্ত বেরুল, নাক দিয়ে, আমিও কামড়েছিলাম। ফাইট। তারপর ঘাড় কামড়ে ধরল আমার। আঃ নয়, উঃ নয়। আউচ্।

টিনটিনের বাবা বুবাইয়ের বাবাকে বলেছে ওদের অ্যালসেসিয়ানকে কুকুরে কামড়েছে বলে ডাক্তার দেখাতে হয়েছে। ইনজেকশন নিতে হয়েছে।

বুবাই-টুবাই ওদের মামার বাড়ি। বাড়িতে কর্তা-গিন্নী। একটা গাড়ি চড়াল আমাকে। বেড়াতে যাচ্ছি। কী মজা। যেমন ও বাড়ির লোমওলাটা যায়, লম্বা লেজওলাটা যায়, কুঁতকুঁতেটা যায়। আমি কিন্তু সিটের উপরে বসিনি। সিট তো বলতে গেলে বিছানাই। আমার তো বিছানায়

বসা বারণ।

এক জায়গায় এসে গাড়িটা থামল।

গিন্নী বলল, ছেড়ে দিতে কষ্ট হচ্ছে।

কর্তা বলল, আমারও কি হচ্ছে না।

আমায় বলল, নাম বিউটি নাম। পিছনে ঠেলা দিল। আমি নেমে গেলাম। ওরা নামল না। গাড়ি ছেড়ে দিল। দেখলাম ওরা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমাকে দেখছে। রাস্তায় আমারই মতন একজন নেড়ি বলল কে রে তুই? আমি বললাম, আমি তোমাদেরই লোক। ও বলল, এ যে দেখি কবি। ফোট্।

—আমি দেখলাম মাংসের দোকান। দোকানের সমানে কুকুর। কালু ভোলা জলি আর নাম ছাড়া কুকুরেরা। বিক্রি না হওয়া মাংসের ছাঁট ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে একটা ছেলে। কুকুরেরা ছুটে গিয়ে লুফে নিচ্ছে আমি দেখলাম। দূর থেকে। আমার ভিতর থেকে কে যেন বলল যা, তুইও লম্ফ দে। কিন্তু আমার পা এগোল না। তৃষ্ণ এগোয়।

ওরা সামনের থাবায় মাংসের টুকরো আঁকড়ে ধরে। ছুঁচালো দাঁতে ছিড়ছে।.আই অ্যাম এ কমপ্লান গার্ল। টুং। তারপর এইসব দেখতে দেখতে রাস্তা, রাস্তার মাঝখানে শাদা শাদা দাগ, গাড়ির চাকা, চাকার দাগ, দাগের গন্ধ, গন্ধ পেতে পেতে, টিভি, কিচ্যাপ ও সস্-এর গন্ধ পেতে পেতে, পাপোশ, পদধূলির ও পদাঘাতের গন্ধ পেতে পেতে, প্রভুদের গন্ধ পেতে পেতে কি করে কি জানি, কি করে কি জানি ওই বাড়িতে হাজির হয়ে গেলাম।

সেদিন ফাংশান। উঁচু বেদি হয়। বেদির সমানে পরদা থাকে। সামনে চেয়ার থাকে। চেয়ারে লোক বসে। সাঁওতাল নাচ হবে। ফরশা মেয়েরা সব কালো রং মাখল। লাল পাড়ের শাড়ি পরল। বেদির দুপাশে দুটো খড়ের ঘর।

একজন সত্যিকারের সাঁওতাল মেয়ে, চাকরি করে কোথায়, ঠোঁটে লাল মাখল, গালে শাদা মাখল। ও বলল একটা কুকুর চাই। সাঁওতালদের উঠোনে একটা কুকুর থাকে। নাচ শেখানোর জন্য ওই মেয়েটিকে বুবাইয়ের মা এনেছিল। ওদের অফিসের। কুকুরটা কিন্তু অর্ডিনারি হতে হবে।

তখন আমার ডাক পড়ল।

নাচতে নাচতে মেয়েরা আমার ল্যাজ মাড়িয়ে দিয়েছিল বলে আমি দুবার জোরে ঘেউ করে উঠেছিলাম। সবাই হাততালি দিল। বলল বিউটি দারুণ অভিনয় করেছে।

পুরুষ কুকুরগুলো কী সুন্দর। ওদের গায়ের সুঘ্রাণ বাতাসে মিশেছে বলে ভাদ্রের বাতাসে বুক ভরে যায়। ওদের গায়ের ঘায়ের মাছি মুখের নিশ্বাসে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। এত উঁচু ব্যালকনি থেকে আমার বাতাস কি এতটা দূরে পৌঁছবে?

এই বাড়িতে বেড়াতে এসেছে বুবাই-টুবাইদের কে যেন। বেড়াতে না অন্য কাজে কি যেন। ঘোমটা-পরা কে যেন। পাঁউরুটিতে যখন ওরা মাখন মাখিয়ে দেয়, ও বলে না—না—না, আমার মাখন লাগবে না। শুধু শুধু পাঁউরুটি খেতে আমার খুব ভালো লাগে। বাথরুমটা খুব চকচকে দেখে বলেছিল, অন্য কলঘর নেই? রাত্তিরে মাত্র দুটো রুটি খেল। বলল, আমার এতেই হবে। আমাকে দেখিয়ে বলল, ঠিক ওর মতো একটা আমাদের বাড়িতে আছে, দাওয়ায় থাকে। আমার গায়ে হাত বুলোল। ওই বউটাকে আমার খুব ভালো লাগল। আপন আপন

লাগল। তার পর, অনেক রাত হয়েছে। দেখলাম বউটা বারান্দার ডিভান থেকে উঠে রান্নাঘরের আলো জ্বালল। কৌটো খুলে ক্রিম বিস্কুট, পটেটো চিপ্‌স খাচ্ছে। কাজুবাদাম এক মুঠো নিল, কিন্তু দুটো-তিনটে নিয়ে বাকিগুলো রেখে দিল ফের। আমার কি এখন ঘেউ ঘেউ করা উচিত? আহা খাক। আহা খাক।

আমার গায়ে নাকি গন্ধ হয়েছে। তাই স্প্রে করে দেয়। ওই গন্ধ আমার ভালো লাগে না। রাস্তার কুকুরদের ওই গন্ধ আমার গায়ে লেগে থাকে না কেন? আমার মতোই একটা মেয়ে, আমার চেয়ে অনেক রোগা, নোংরা আর অসুস্থ। ওকে দেখে একটা পুরুষ কুকুর পাগলের মতো ছুটে গেল। অন্য একটা পুরুষ ছুটে আসা পুরুষটিকে বলল, তুই যা, ও আমার। আমি তখন রাস্তায়। গলায় চামড়ার বেল্টে শান্তিনিকেতনের কাজ। রুপোলি চেন।

আমায় দেখে পাগল হল না কেউ। ছুটে এল না কেউ, ভালবাসল না কেউ।

কাল সকালে একটা কালো রঙের কুকুর আমার কাছে এসেছিল। বলেছিল, তুমি কী সুন্দর। বলেছিল, একটু দাঁড়াবে? ও আমার গায়ের কাছে এসেছিল। চেন, লোহার চেন আমাকে টেনে নিয়ে গেল।

এখন, এই ফ্ল্যাটবাড়ির নতলার ছাতে বিউটি নাম্নী কুকুরটিকে ঘিরে রগড় চলছে। এরকম রগড়ে ভালোবাসা কতটা কে জানে? ছাতে বা লনে এরকম রগড় মাঝে মাঝে হয়। ওকে মুখে করে বল নিয়ে আসার ট্রেনিং দেয়া হয়। লাফানোর ট্রেনিং দেয়া হয়। বুবাইদের বাবা বলে ও এসব পারবে কেন? এজন্য পেডিগ্রি চাই। যতই আধুনিক করার চেষ্টা কর না কেন, দিশি ইজ দিশি। বিউটির কানে কানে কতদিন ওয়াকম্যান লাগিয়ে ফারিন্দো বব ডিলান মাইকেল জ্যাকসন চালিয়েছে। কফি খাইয়েছে। হট ডগও! দিশি ইজ দিশি।

এখন, এই ছাদে বিউটির কানের কাছে ছোট্ট একটা ইংরিজি গালাগাল দিল একটা ছেলে।

বুবাই বলল, ওকে খেপিও না। রেগে গেলে কিন্তু ফেরোসাস হয়ে যাবে।

অন্য একজন বলল, ঠিকই তো। এসব ফালতু কুকুর কামড়ালে র‍্যাবিস মানে জলাতঙ্ক হয়ে যেতে পারে।

এই সময় বুবাইয়ের বাবা ছাদে এল। বলল, এখুনি কুকুরটাকে নিয়ে ফোর ডি-তে চলে আয়। ফোর ডি মানে ফোর্থ ফ্লোর, ডি ফ্ল্যাট। ওখানে ডক্টর সমাদ্দার থাকেন। ডক্টর সমাদ্দার ভেটারনারি ডাক্তার। নিজস্ব একটা কুকুরের হাসপাতাল আছে ওর। উনি খুব ব্যস্ত, আজ হোলির দিন এই কমপ্লেক্সের কুকুরগুলিকে নানারকম ভ্যাকসিন ট্যাকসিন দিয়ে দেবার কথা।

ডাক্তার সমাদ্দারের লিভিংরুমে কুকুরের গার্জিয়ানরা এবং টেরিয়ার, স্পিৎস্ অ্যালসেসিয়ান এই সব।

বুবাই-টুবাই বিউটিকে নিয়ে ঢুকল। বুবাইয়ের বাবা ওখানেই ছিল। রগড় করল। বলল, এই যে এসে গেছে আমাদের কমপ্লেক্সের ভিআইপি। তখন ডাক্তার সমাদ্দারের হাত একটা স্পিৎস্-এর পিঠে। পিঠে খেলা করছে আঙুল। ডাঃ সমাদ্দার আঙুলের হাতছানিতে স্পিৎস্-এর মালিকানীকে আরো সামনে ডাকলেন। বললেন, এই স্পেসিস্‌টা

খুব দামি। জানেন? এর বাচ্চা হলে এক-একটার দাম কত হবে জানেন? একে ব্রিড করান।

এর মেল পাব কোথায়? ভদ্রমহিলাটি বললেন।

সেটা আমার ব্যাপার। মাই হেডেক। তবে একটা কথা আছে। এখন তো স্প্রিং। এই সময় ওদের আর্জ হয়। তখন ওভালিউশন হয়। কিন্তু এর কোনো সিম্পটম নেই। এই সময় ওদের এখানটা মানে ভ্যাজাইনাটা এনলার্জ হবার কথা। এর হয়নি। বয়স কত হল?

দু-বছর।

তবে তো ফুল গ্রোন আপ। পূর্ণ যুবতী। মানুষের মাপকাঠিতে এর বাইশ বছর বয়েস, অথচ এই বসন্তেও দেখুন, কিচ্ছু হয়নি। এরকম ঘটনা অবশ্য আনন্যাচারাল নয়। বন্যজীবন, যেটা ওদের স্বাভাবিক জীবন ছিল, সেই জীবন থেকে সরে এসে গৃহপালিত হয়ে হয়ে এদের অনেক কিছুই হারাতে হয়েছে। তবে একে আমি ব্যবস্থা করে নেব। একে কিছু ইস্ট্রোজেন দিলেই আর্জ এসে যাবে, ভ্যাজইনা বড় হয়ে যাবে...। স্পিৎস্-এর গায়ে হাত বুলোচ্ছিলেন ডাক্তার সমাদ্দার।

বুবাইদের বাবা বিউটির শরীরের দিকে তাকালেন, শরীর দেখছেন, শরীর। বিউটির লেজের তলায় কমলা কোঁয়ার মতো স্ফীতির স্পষ্টতা। বুবাইয়ের বাবা ডাক্তার সমাদ্দারের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন আমাদের কুকুরটার তো তাহলে...

হ্যাঁ। ফুল। প্রি হিট এ আছে ও...

যদি পেট-ফেট বাধিয়ে ফেলে...

রাস্তায় যায় নাকি?

ছেলেরা তো নিয়ে যায়...

অ্যান্টি ইস্ট্রোজেন দিয়ে দেব। দুদিনেই ওটা একদম শুকিয়ে যাবে।

ডাঃ সমাদ্দর স্পিৎস্‌কে দিলেন ইস্ট্রোজেন। নেড়িকে অ্যান্টি ইস্ট্রোজেন।

রবিবারের দুপুরবেলা সে এক কাণ্ডকারখানা। বুবাই-টুবাই ওদের ঘর বন্ধ করে বিউটিকে নিয়ে পড়ল। বলল, তোকে আনকমন করব। ওদের বাবার চুলে দেবার কলপটা নিয়ে এল। শিশির গায়ে লেখা আছে পার্মানেন্ট ডাই। ব্রাশ দিয়ে ওর সারা গায়ে ডোরা কাটল। বলল, ইউ আর নো মোর নেড়ি। জেব্রা ডগ। বিকেলের মধ্যে সারা গায়ে কালো কালো রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কানে জেম্‌স্ ক্লিপ এঁটে তাতে প্লাস্টিকের ফুল গুঁজল। বলল প্লাংক। তারপর ওকে লন-এ নিয়ে এল। যারা দেখল হি-হি করল। রাস্তায় নিয়ে এল। যারা দেখল হি-হি করল। ওর ভাইবোন জ্ঞাতিরা কি ওকে চিনতে পারল না? ওরা ঘেউ ঘেউ করল। বিউটি এখন ডোরাকাটা।

যাচ্ছে। কানে প্লাস্টিক। যাচ্ছে। শরীরে অ্যান্টি ইস্ট্রোজেন যাচ্ছে। ল্যাজ নড়ছে। অভ্যেস নড়ছে।

বিউটির কাছে এল সেই কালো রঙের ছেলে কুকুরটা। কিছুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে চলল।

ছেলেটা বলল, কেমন আছ?

বিউটি বলল, ভালো।

বিউটি ওর সঙ্গে কখনো সাতপা হাঁটেনি। এখন হাঁটল। শুঁকল। ছেলেটা বলল, ছাই ভালো। ধুস। চলে গেল।

অনেকদিন পর বিউটির থাবার নরম থেকে বেরুল নখ। নখের আঁচড় কাটল ফুটপাথে। আর নখের সংকেতে লেখা ওঁর আত্মজীবনীর ভূমিকা ফুটপাথেই পড়ে রইল।

শারদীয় প্রতিক্ষণ, ১৯৯৪

অ

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য একটা বিশেষ স্বাস্থ্য প্রকল্প আছে, যেখানে তাঁরা চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন, এটাকে বলে সি জি এইচ এস, মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিম। অবসরপ্রাপ্তরাও এই সুবিধা পেতে পারেন। বস্তুত, অবসরপ্রাপ্তরাই সি জি এইচ এস-এর ডিসপেনসারিতে বেশি ভিড় করেন, কারণ তাঁদের হাতে অনেক সময়। তাঁরা নিজেদের সুগার, প্রেসার, কোলেস্টেরল, বাত, ছানি, প্রস্টেট ইত্যাদি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন, নাতি-নাতনিদের কত বুদ্ধি, দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যাখা করেন, আজকাল শাক-সবজিতে আর স্বাদ নেই, পোলট্রির ডিমে পুষ্টি নেই, হাইব্রিড ফলে ভিটামিন নেই ইত্যাদি ব্যাপারে সহমত পোষণ করেন ; ভারতের পক্ষে পাকিস্তান আক্রমণ করা উচিত কিনা, বধুমাতাদের ঘরের মধ্যে শাড়ির পরিবর্তে ম্যাক্সি পরা উচিত কিনা এ নিয়ে বিতর্ক করেন। অবসরপ্রাপ্তা মহিলারাও আছেন, তাঁরা তাদের অফিস জীবনে মহিলাদের সমান অধিকার নিয়ে অনেক কথা বলেছেন, অথচ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত সিটে বসা কত কাচুমাচু পুরুষকে উঠিয়ে দিয়েছেন ঠিক নেই। রিটায়ার করার পরও এইসব ডিসপেনসারিতে অলিখিত মহিলা বেঞ্চি সৃষ্টি করেছেন, সেখানেই তাঁরা বসেন, সন্তোষী মায়ের পূজাপদ্ধতি, হরিদ্বারের বৌদির হোটেল, বাঁধানো দাঁতের ঢিলে হয়ে যাওয়া, এইস্‌ব গল্প করেন। আমাদের গল্প শুরু হচ্ছে এরকমই একটা ডিসপেনসারিতে।

এই ডিসপেনসারিতে এক ভদ্রলোক প্রায়ই আসেন, তাঁর নাম ডি ডি মিত্র। বয়েস এখন পঁচাত্তর মতো হবে। চুলগুলো সাদা কিন্তু বেশ ঘন। অনেকটা কবি সুভাষ মুখার্জির মতো। কিন্তু দাঁত একটাও নেই। কানেও শুনতে পান না। হিয়ারিং-এইডস লাগানো আছে, যাকে অন্যরা বলে 'ছিপি', তাতেও কাজ হয় না তেমন। খুব বেশি ডেসিবলের শব্দ হলে হিয়ারিং এইডস-এর মাধ্যমে শুনতে পান। যেমন গাড়ির হর্ন, বোমা ফাটা, নাতি-নাতনিদের মিউজিক সিস্টেম কিংবা এই ডিসপেনসারির গ্রুপ ডি ম্যাডামের গলা।—'বলি ও মিত্তির বাবু, এটা হাসপাতাল এখানে চ্যাঁচাবেন না।' মিত্তির বাবু বলেন, কেন খামোখা রোজ এক কথা বলেন, আমি তো প্রায় ফিশফিশ করেই কথা বলি। আসল ব্যাপারটা হল মিত্তির বাবু বুঝতেই পারেন না কত জোরে তিনি কথা বলছেন। কিন্তু মিত্তির বাবুকে কথা বলতেই হয়। সংগঠন করা লোক। অফিসে রিক্রিয়েশন ক্লাব করতেন, নাটক করতেন, পরে পশ্চিম বাংলার বাইরে বদলি হয়ে কালী পুজো দুর্গা পুজো করেছেন। কিছুদিন আগে একটা সংস্থা তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন। ট্রিপ্‌ল 'অ'। 'অসুস্থ অবসরী অনুকূল।' মানে অসুস্থ অবসরপ্রাপ্তরা, যারা এই ডিসপেনসারিতে আসেন, তাদের নিয়েই একটা সংগঠন আর কী। কিন্তু প্রশ্ন উঠতেই পারে, কোনো সংগঠনের এরকম নাম হয় কিনা। অসুস্থ অবসরী সমিতি বা সংগঠন বা সংস্থা এরকম

কিছু হওয়া উচিত ছিল। 'অনুকূল' কেন? আসলে এটাই মিত্তির বাবুর রোমান্টিকতা। যৌবনেও ছিল, এখনও আছে। দুটো 'অ'-এর পর সমিতি, সংস্থা, এইসব মানায়? ট্রিপ্‌ল 'অ' করতে গেলে অন্য কোনো জুতসই শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে অনন্যোপায় 'অনুকূল'। একটা বাইকালার প্যাডও ছাপিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু সংগঠনটা করা গেল না। আর কেউ তেমন উৎসাহিতও হলেন না। কেউ বললেন, 'আমার ভাই প্রেসার হাই এসবের মধ্যে আমি নাই'। কেউ বললেন 'রোজ বারোবার ওষুধ খাচ্ছি, এরপর কোথায় সময় পাচ্ছি?' একজনকে ধরাধরি করে সভাপতি বানিয়েছিলেন ডি ডি মিত্র, মানে ধরণীধর মিত্র, যাকে কলিগরা ধরাধরি মিত্র বলেই ডাকতেন, কারণ উনি নাকি ধরাধরি করতে ভালোই পারতেন। যাইহোক, যাকে সভাপতি বানিয়েছিলেন, অল্প কিছুদিন পরেই তাঁর স্ট্রোক হয়। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কাকতালীয়, কিন্তু এরপর অবধারিত ভাবেই ট্রিপল 'অ' অন্তর্হিত হয়।

আজ ওইসব কথাই হচ্ছিল। দু-জন মাত্র ডাক্তারবাবু এসেছেন। অন্যদিন তিন জন বা চার জন থাকেন। যিনি ইনচার্জ, তিনি তাঁর চেম্বারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। বেশ ভিড় হয়ে গেছে। দু-একজন একটু ইনিয়ে-বিনিয়ে ইনচার্জের কাছে গিয়ে বলেছেন আপনিও একটু দেখুন না স্যার। ইনচার্জ ডাক্তার পাত্তাই দিচ্ছেন না। ধরণীধরবাবু তখন দন্তহীন উচ্চারণে বলছিলেন—'এজন্যই একটা সংগঠনের দরকার। যদি আমাদের ওই ট্রিপ্‌ল অ থাকতো, তাহলে কিছুতেই এরকম হত না। ওনারা আমাদের কথা একেবারেই ভাবেন না। রিটায়ার করেছি বলে কি মানুষ নই নাকি?...' ইত্যাদি এবং একটু জোরেই। যেমন বলেন আর কী।

ঠিক তখনই মেয়েদের বেঞ্চি থেকে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধা। ওর হাত কাঁপছে। একটু এগিয়ে এলেন। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটেন। কে কথা বলে, ডি ডি এম না? কাঁপা কাঁপা গলায় বৃদ্ধাটি বলেন। ধরণীধর বাবুর কথা থেমে যায়। মহিলাটি প্রায় সামনেই এসে দাঁড়িয়েছেন। কী হল, কথা থেমে গেল কেন? মহিলাটি বলেন।

কী আশ্চর্য, তুমি?

উঠে দাঁড়ালেন ধরণীধরবাবু। লাঠির হাতলে রাখা এই বৃদ্ধার কম্পমান হাতের উপর হাত রাখতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিলেন তিনি।

—দোলা, ইয়ে, মৃদুলা, তুমি এখানে?

—দেখাতে এলাম। আপনার ওই টিপিক্যাল গলা শুনেই বুঝেছি। কেমন কাটছে রিটায়ার্ড লাইফ?

—না, না, টায়ার্ড লাগছে না। তুমি বোসো দোলা, এই বেঞ্চিতে বোসো।

—না, ঠিক আছে। আপনিই বসুন ধরণীদা। আমার কষ্ট হচ্ছে না।

—না-না, কোলেস্টেরল নর্মাল। সুগারটা একটু হাই। কানে একটু কম শুনি। এটাই অসুবিধে।

—ও বুঝেছি, বুঝেছি।

ওই বৃদ্ধা এবার আরও একটু জোরে বলেন, 'বাড়ি করেছেন?'

ধরণীবাবু কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গেলেন। আঙুল মটকে বললেন, না না আমি আড়ি করব কেন? আসলে তুমিই তো আড়ি করলে। নাও, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ,

বোসো।

ওই বৃদ্ধার হাঁটু কাঁপছিল।

বৃদ্ধার সঙ্গে ছিল বছর তেরো-চোদ্দোর একটি মেয়ে। ঝালর দেওয়া কমলা রং-এর টেরিলিনের ফ্রক। মেয়েটি বলল দিদা, বোসো।

বৃদ্ধা বসলেন। বসেই পাশের বৃদ্ধকে বললেন, একটু চেপে বসলে আর একজন হয়ে যাবে।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই বলে দু-পাশের অপেক্ষারতরা একটু সরে বসলেন। কারুর কারুর মুখে বাঁকা হাসি ফুটল। ধরণীধর ওই বৃদ্ধার পাশে বসে কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে বসে রইলেন। তারপর বৃদ্ধার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, দোলা, পঁচিশ বছর পরে তোমার পাশে বসেছি।

তখন ওই পঁয়ষট্টি বছরের দোলা বোধহয় কিছু বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যা বলতেন, সেটা বোধহয় চেঁচিয়ে বলার নয়। বৃদ্ধা লাঠি দিয়ে ধরা মোজাইকে আঁকিবুকি কাটলেন। যেরকম আঁকিবুকি কাটতে চেয়েছিলেন, তাও পারলেন না। হাত কাঁপছিল। হাত কবে থেকে এরকম কাঁপছে? নার্ভের কিছু?

বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন।

—কবে থেকে?

দুটো আঙুল দেখালেন বৃদ্ধা।

—দু মাস?

অন্যভাবে মাথা নাড়লেন। নিষেধের।

তবে তো দু-বছর। বহুদিন হয়ে গেল। পারকিনসন নয় তো?

ঠোঁট উলটে দিলেন। তারপর চুপ করে বসে রইলেন।

ফ্রক পরা মেয়েটি বলল, এখানে বসে থাকলে হবে? তোমার তো অন্য ডাক্তার, তোমাকে তো ওই ঘরে ডাকবে।

গলায় বেশ ঝাঁঝ মেয়েটির। ধরণীধর ওই বৃদ্ধাকে দেখতে থাকেন। হাতটা। পরিষ্কার হাত। গত পঁচিশ বছরে হাতে শাঁখা উঠেছিল কিনা বোঝা যাচ্ছে না। হাতের চামড়া কুঁচকে গেছে। একটা ঈষৎ নীল শিরা পায়ে চলা পথের মতো এঁকেবেঁকে শরীরের গভীরে মিশেছে। ওই নীল শিরার দিকে তাকিয়েছিলেন ধরণীধর। একবার ছুঁতে ইচ্ছে হল। দোলার হাত কি এখনও ওইরকমই নরম আছে?

—মৃদুলা গোস্বামী...মৃদুলা গোস্বামী...নাম ডাকছে পাশের ঘর থেকে। মেয়েটি বলল, ওই দেখ নাম ডাকছে। চলো। হাত ধরে উঠাল মেয়েটি।

ধরণীধর নাম ডাকা শুনতে পেলেন না। তাহলে বুঝতেন পদবির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

বৃদ্ধাটি ওঠেন, উঠে দোলা হয়ে গিয়ে ধরণীর দিকে একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। পাশের বুড়োটিকে বলেন, ওঁর কানের কাছে মুখ রেখে একটু বলে দিন তো—যেন আমার জন্য অপেক্ষা করেন।

এরপরই ধরণীধরের বেঞ্চিতে রসের প্রবাহ। ষাটোর্ধরা সবাই চ্যাংড়া ছোঁড়া হয়ে যায়।

একজন বললেন, আবার দেখা হবে। আর একজন বললেন, এখন একটু বিজ্ঞাপনের বিরতি। অসীম দত্ত একটা কাগজে লিখে ধরণীধরের সামনে রাখল। জ্যাকফ্রুট গাম। ধরণীধর ওই রসিকতাটা গ্রহণ করলেন। বলল, হ্যাঁ। কাঁঠালেরই আঠা। লাগলে পরে ছাড়ে না। ষাট-বাষট্টি বয়সের যাঁরা তাদের অনেক বাচ্চা মনে করেন ধরণীধর। সত্তরের উপরে যাঁরা, তাদের সঙ্গেই রসিকতা করেন। মাঝে মাঝে একটু আধটু আদিরসাত্মকও। জ্যাকফ্রুট গাম যিনি লিখেছিলেন, সেই অসীমবাবু, তিনি এখন সেভেনটি টু। ক্রনিক অ্যাজমা। মুখগহ্বরে ইনহেলার নিয়ে সেদিনের খবরের কাগজে কাশ্মীর সমস্যায় চিন্তিত প্রধানমন্ত্রীর মুখের উপর ডট পেনে লিখলেন, **X.M** একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নও বসালেন। ধরণীবাবুর সামনে কাগজটা ধরতে ধরণীবাবু সামান্য মুচকি হাসি হেসে বললেন, ইয়েস্য। একস্ট্রা ম্যারিটাল। ওয়ানস আপন এ টাইম।

'ওয়াল্স আপন এ টাইম' দিয়ে কোনো বাক্য শুরু হওয়া মানেই তো গল্প। সবাই উৎকর্ণ হল।

তখন কলকাতাতেই পোস্টিং ছিল আমার। অ্যাসোসিয়েশনেরও নেতা। নাটক-টাটকও করি। শিলিগুড়ি অফিস থেকে মৃদুলা গোস্বামী কলকাতা আসতে চাইলেন। ওর ভাইটাইদের পড়াবেন এখানে। এক ভাই আর্ট কলেজে পড়তে চায়, আর এক ভাই সিরামিক টেকনোলজিতে চান্স পেয়েছে। কার যেন একটা চিঠি নিয়ে দেখা করেছিল আমার সঙ্গে। শেষকালে ওর কলকাতায় হয়ে গেল। আমাদের অফিসেই। আমি তখন ফরটি ফাইভ। ও থারটি ফাইভ মতো হবে আর কী। সেবারই আমরা অফিস ক্লাব থেকে রক্তকরবী করলাম। এর আগেও বহু নাটক করেছি। প্রতিবারই ভাড়া করা হিরোইন। সেবারই প্রথম বাইরের হিরোইন ভাড়া করলাম না। মৃদুলা গোস্বামী নন্দিনী, আর আমি বিশু।

অসীমবাবু ধরণীধরের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন, তারপর? তারপর আর কী? নাটকটা বেশ হল। জমে গিয়েছিল।

—নাটকের কথা কে শুনতে চাইছে মশাই, নাটকের বাইরে যে টাটক হল সেসব কথা বলুন। অসীমবাবু আর একবার ইনহেলার গ্রহণ করে চেঁচালেন।

গ্রুপ ডি ম্যাডাম ধেয়ে এলেন। কী শুরু করেছেন আপনারা ইস্কুলের বাচ্চাদের মতো, অ্যাঁ? ডাক্তারবাবু বলে পাঠালেন, ওনার অসুবিধে হচ্ছে।

কিচ্ছু অসুবিধা হচ্ছে না। অন্য একজন বলেন। নিন, গো অন।

যেসব সিনিয়ার সিটিজেনরা জড়ো হয়েছেন, তাঁদের কেউ রোজ জেলুসিল-ডায়জিন খান, কেউ বা অ্যালট্রকসিন, কেউবা সরবিট্রেট, কেউ ল্যাসিকস। তেল ঝাল বন্ধ, মিষ্টি বন্ধ, ঘি-মাখন বন্ধ। আজ অনেকদিন পর একটা কিছু টক ঝাল মিষ্টি পাওয়া গেছে।

মৃদুলার বাবা ছিল না। দুই ভাই-মা। দুই ভাইয়ের গার্জিয়ান মৃদুলাই। বলত—ভাইরা দাঁড়ালে, তবে আমার মুক্তি। আমার বউ আমাকে টিফিন করে দিত রুটি, পরোটা এইসব। তখন ওসব চাউ-মাউ চালু হয়নিকো। আমি আমার কৌটো খুলে ওকে মাঝে মধ্যে টিফিন দিতুম। একদিন বউ স্যান্ডউইচ করে দিয়েছিল। ওকে একটা দিতেই ও কী যে খুশি হল কী বলব। বলেছিল স্যান্ডউইচ খেতে ও ভীষণ ভালোবাসে। তারপর ওকে বলেছিলাম তুমি স্যান্ডউইচ খেতে এত ভালবাস? তোমাকে খুব ভালো স্যান্ডউইচ

খাওয়াব। অফিসের পরে ওকে নিয়ে কফি হাউসে গিয়েছিলাম। ওখানে খুব ভালো স্যান্ডউইচ করত। এখন করে কিনা জানি না। কফি হাউসেই ওকে দোলা ডাকলুম।

ও আমাকে একটা সোয়েটার বুনে দিল, বেগুনি রং-এর। বউ জিজ্ঞেস করল কে দিয়েছে? আমি মিথ্যে কথা বলেছিলুম। বলেছিলুম বাইরের মেয়েছেলেরা আসে, পয়সা নিয়ে বুনে দেয়, ওরকম একজন খুব ধরাধরি করল, আমি না করতে পারলুম না। বউ বললে এই রং কে পছন্দ করেছে, আমি বললুম কেন, আমিই করেছি। রংটা ভালো নয়? বউ বলল, এই ক্যাটক্যাটে রংটা তোমার পছন্দ? বিচ্ছিরি। তোমায় মানায় এই বয়সে? রেখে দাও! ছেলে পরবে কিছুদিন পর। তখন ছেলে-মেয়ে বড়ো হয়ে গেছে। ছেলের সিক্স-সেভেন। আর মেয়ে বোধহয় টেন-এ।

শীত এসে গেল। ওই সোয়েটারটা পরতাম না। ও বলতো, পরছেন না কেন সোয়েটারটা? আমি বললুম, এখন কি আর এসব রং আমায় মানায়? বয়েস হয়ে গেছে না? দোলা বলল, কী বলছেন ধরণীদা, কিচ্ছু বয়েস হয়নি আপনার। আপনি তো ইয়ং। বয়েস তো মনে। আপনি কী অ্যাক্টিভ এখনও। কী সুন্দর নাটক করেন, কত কী করেন। আপনার মোটেই বয়েস হয়নি। আসুন না আমাদের বাড়িতে একদিন দুপুর বেলা। সারাদিন কাটাব। মা গেছে মাসির বাড়ি। ভাইরা বেরিয়ে যায়। একদিন সি এল নিয়ে নিন।

থামলেন ধরণীবাবু।

অনেক জোড়া চোখে 'তারপর'? লেখা রয়েছে বেশ বুঝতে পারলেন।

ধরণীবাবু চুপ।

একজন কনুই খোঁচা দিয়ে বললেন, 'আসল জায়গায় থেমে গেলেন কেন? বলুন। সি এল নিলেন?

একবুক প্রশ্বাস নিয়ে ধরণীবাবু বললেন, 'একদিন অফিস কেটে সিনেমায় গিয়েছিলুম। গুপি গাইন বাঘা বাইন। একটা ক্যাডবেরি কিনেছিলুম। দুজনে হাফ হাফ খেয়েছিলুম। সিনেমা হলেই বেরোবার সময়, আমার বউ-এর সঙ্গে একেবারে সামনাসামনি। বউ আর ছেলে মেয়ে।

তারপর?

তারপরই নাম ডাকল। ডি ডি মিত্র...। ধরণীবাবু ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকলেন।

চেম্বার থেকে মিনিট দশেক পর ধরণীধর যখন বেরিয়ে এলেন, দেখলেন সামনেই মৃদুলা বসে আছে। মৃদুলার মুখে মৃদু হাসি। একেবারে একইরকম।

সঙ্গের মেয়েটি বলছে, ও দিদা, তোমার তো হয়ে গেছে, এবার চলো। মৃদুলাদেবী বলছেন, দাঁড়া না, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, আর দশ মিনিট।

ধরণীধর বললেন, চলো দোলা, বেরোই। মৃদুলার এক হাতে লাঠি, অন্যহাত মেয়েটির হাতে। বাইরে শরতের সোনা রোদ। দাঁড়ানো রিকশাগুলির দিকে মৃদুলাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটি।

ধরণীধর বললেন, দোলা, আজ আমাকে বলো, বলতেই হবে, কেন তুমি পোর্টব্রেয়ারে ট্রান্সফার নিয়ে নিলে হঠাৎ? কেন আমার একটা চিঠিরও উত্তর দিলে না? কেন তুমি...মৃদুলা লাঠিটা ছেড়ে দিয়ে ওর তর্জনিটা ঠোঁটের উপর রাখল। মানে চুপ। লাঠিটা পড়ে গেছে। আঙুলটা কাঁপছে ঠোঁটের উপর। ধরণীধর পড়ে থাকা লাঠিটা উঠিয়ে

নিলেন নিচু হয়ে। মৃদুলার হাতে ধরিয়ে দিলেন। লাঠিটা ধরতে গিয়ে ধরণীধরের হাতটাও চেপে ধরেন মৃদুলা। দোলা। বুড়ো বয়েসেও দোলা লাগে। মৃদুলা ধরণীধরের কাছে আসেন। মুখের কাছটায় নারকেল তেলের গন্ধ পাচ্ছেন ধরণীধর। কানের কাছে মুখ দিয়ে মৃদুলা বলেন, আবার আসতে হবে আমাকে, বারো তারিখে। বেলা দশটায়।

মৃদুলা রিকশায় ওঠেন।

ঠিক এক সপ্তাহ পরই বারো তারিখ এসে গেল। সেদিন সকাল থেকেই টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। নিজেই বাজারে গেলেন, একটু মুরগির মাংস কিনলেন। শশা, ক্যাপসিকাম, টমেটো কিনলেন এবং পাঁউরুটি। যে মেয়েটি রান্না করতে আসে, তাকে বললেন স্যান্ডউইচ কর। মেয়েটি স্যান্ডউইচ শোনেনি কখনো। ধরণীধর বলে দেয়।

ধরণীধর এখন বিপত্নীক। পুত্রবধূও বাড়ি নেই, ওর বাপের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গেছে। ধরণীধরের নাতনিটিও মায়ের সঙ্গে পুরীতে। পুজোর ছুটি কিনা। অবশ্য ধরণীধরের ছেলেটি যায়নি। ওর বোধহয় ছুটি পাওয়ার সমস্যা ছিল। কিন্তু মুখে বলছে, বাবাকে একা রেখে কী করে যাব। ধরণীধরের ছেলেটি রান্নাঘরে ঢুকে স্যান্ডউইচের বহর দেখে আশ্চর্য হয়! আজ তো মৌ নেই। মৌ-এর ইস্কুলের টিফিনের জন্য মাঝেমাঝে স্যান্ডউইচ করে মৌ-এর মা। তবে কেন এত স্যান্ডউইচের ঘটা? কাজের মেয়েটি বলে দাদু বলেছে।

জিজ্ঞাসা করলে ধরণীধর বলেন, সি জি এইচ এস এর বন্ধুদের একটু খাওয়াতে ইচ্ছে হয়েছে।

সেই পাঞ্জাবিটা বার করলেন আলমারি থেকে, ন্যাপথোলিনের গন্ধমাখা গরদের পাঞ্জাবিটার গলায় এমব্রয়ডারি করা। রিটায়ার করার দিন তিনেক আগে পোর্টব্লেয়ার থেকে একটা প্যাকেট এসেছিল পোস্টে। সঙ্গে একটা চিরকুট। দুটো লাইন।

'আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক
ওগো দুখ জাগানিয়া।'

এটা রক্তকরবীতে আছে। বিশুপাগলার গান। এখনও শীত পড়েনি। যদিও টিপ টিপ বৃষ্টি ছিল, সজল বাতাসে সামান্য হিমছোঁয়া ছিল, তাতে সোয়েটার লাগে না। সেই বেগুনি সোয়েটারও বার করে নিলেন ধরণীধর। একটা ছাতা নিয়ে বের হলেন। সকাল ন-টা।

ধরণীধরের বাড়ি থেকে দমদমের সি জি এইচ এস-এর এই ডিসপেনসারির দূরত্ব বেশি নয়। রিকশায় মিনিট পনেরোর মতো লাগে। ডিসপেনসারির কাছাকাছি এসে রিকশাটা ছেড়ে দিলেন।

এই ডিসপেনসারিটা দমদম এয়ারপোর্টের স্টাফ কোয়ার্টারের ভিতরে। এখানকার রাস্তায় লোকজন খুব একটা থাকে না। বড়ো বড়ো গাছ। গাছগুলো ভিজেছে অনেকক্ষণ। রাস্তার কালো পিচও ভেজা। একটা গাছতলায় দাঁড়ালেন ধরণীবাবু। গাছে দুটো বুলবুলি পাখি। কচু পাতায় জল-মুক্তো। মাদার ডেয়ারির দুধের প্যাকেট ঢেকে গেছে চূর্ণ কামিনী দলে। উল্টে থাকা আইসক্রিম কাপের উপরে বসে আছে ফড়িং। পৃথিবীটা মাইরি কী বিউটিফুল। ও আসবে। ও আসবে। সেই যে চলে গিয়েছিল ও, সেই কতবছর আগে,

কিচ্ছু বলেনি, শুধু নির্বাসন চেয়ে নিয়েছিল। সেবার, সিনেমা হলে ধরা পড়ে যাবার পর ধরণীধর ভেবেছিলেন অনেক হয়েছে। আর নয়। কথা বলতেন না আর। মৃদুলা বলেছিলেন, কী হল? এসব তো পার্ট অফ দি গেম।

ধরণী বলেছিলেন, তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয় মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তারপরে দিকহারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। রক্তকরবীর ডায়ালগ। মৃদুলা বলেছিলেন, কে বলল তৃষ্ণার জল আশার অতীত?

ধরণী বলেছিলেন, না। প্রলোভন দেখিও না। আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে। এটা প্রফুল্লর ডায়ালগ। ব্যাস, এটুকুই।

ওই তো, ও আসছে। পাখি ডাকছে, হাওয়া বইছে। তুমি এলে, অনেক দিনের পরে যেন বৃষ্টি এলো।

আহা! যদি একটা সিটি মারতে পারা যেত।

রিকশায় সঙ্গের মেয়েটিও আছে।

ধরণী ছাতা নাড়ালেন।

মৃদুলার হাতের ইশায়ার ধরণী পড়ে নিলেন এখানেই থাকুন, আমি আসছি। পড়ে নিলেন, বাব্বা, সেই সোয়েটার এখনও রেখেছেন? কী সারপ্রাইজ। ডিসপেনসারিতে কার্ড জমা দিলেন মৃদুলা। বেঞ্চিতে বসলেন। কয়েকমুহূর্ত পরে সঙ্গের মেয়েটিকে বললেন, একটা ভুল হয়ে গেছে রে সোনা, এক্স-রে প্লেটটা নিয়ে আসতে ভুলে গেছি, যা নিয়ে আয়। মেয়েটা চলে যেতেই লাঠি ভর করে দাঁড়ালেন মৃদুলা। ধীরে ধীরে বাইরে এলেন, ধরণীধর দেখলেন দোলা আসছে, সমস্ত বধিরতা তুচ্ছ করে নূপুর নিক্কণের গোপন শব্দ সমারোহ শুনলেন ধরণীধর। ধরণীধরের বুকের মধ্যে মোহনবাগান মাঠ হই-চই করে উঠল।

ধরণীধর একটু এগিয়ে গেলেন মৃদুলার দিকে। মৃদুলার মুখে রাই কিশোরীর হাসি। পাঞ্জাবি আর সোয়েটারের দিকে চোখ। ধরণীধর নয়, যেন প্রমথেশ বড়ুয়া বলছেন যমুনা বড়ুয়াকে, চলো, একটু ওদিক পানে চলো।

একটু সামনেই একটা বাঁধানো বটগাছ তলা। একটা শিব-পাথর রয়েছেন ওখানে, ফুলছড়ানো। ওই বাঁধানো চাতালে বসলেন।

—বিয়ে করেছ দোলা?

মাথা নাড়লেন মৃদুলা।

—কেন?

মৃদুলা শুধু হাসলেন একটু।

—স্যান্ডউইচ এনেছি ক-টা। তোমার জন্য।

ঝোলা ব্যাগ থেকে টিফিন কৌটো বার করলেন ধরণীধর।

মৃদুলা একটা তুলে, কাঁপা হাতে মুখে দিলেন।

কিছু পড়ে গেল মাটিতে। কাকেরা আনন্দ রব করল, গাছ পত্রবৃষ্টি করল। ধরণীধর বললেন, আমি খাইয়ে দিই?

মৃদুলা লজ্জা লজ্জা ঘাড় নাড়লেন, নিষেধের।

ধরণীধর তবু খাইয়ে দিলেন। একজন পথচারী ঘাড় ফিরিয়ে দৃশ্যটা দেখল। ধরণীধর

বললেন, দেখুক গে।

মৃদুলা একটু ঘোমটা টানার ভান করে চোখে একটা প্রশ্নচিহ্ন আঁকলেন। ধরণীধর চোখের ভাষা পড়ে নিয়ে বললেন, আমার স্ত্রী মারা গেছেন।

আবার প্রশ্ন চোখে।

দশ বছর হয়ে গেল। মেয়ের বিয়ে দিয়েছি।

জামাই জিওলজিক্যাল সার্ভেতে কাজ করে, এখন আছে হায়দ্রাবাদে। বাড়ি করেছি কমলাপুরে, জেসপ কারখানার পিছনে। ছেলেও ওই বাড়িতে। মেয়ের ঘরে দুই নাতি, ছেলের ঘরে এক নাতনি।

বাঃ। বেশ পরিপূর্ণ জীবন।

হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল সব। ধরণীধর মাথা নিচু করলেন। যেন কিছুটা অপরাধীর মতো বললেন, তুমি কোথায় আছ এখন?

মৃদুলা কাছে ডাকলেন ইশারায়। ধরণী কাছে গেলে, কানের কাছে মুখ রেখে বললেন, একটা বৃদ্ধাশ্রমে। কাছেই, কইখালিতে। ওই মেয়েটাকে রেখেছি, আলাদা টাকা দিই। আমার কাজ করে। এই বৃদ্ধাশ্রমে নতুন এসেছি। মাস তিনেক। আগে অন্য জায়গায় ছিলাম। রিটায়ার করেছি সাতবছর হল।

ভাই দুটো?

মানুষ হয়েছে। ওরা অনেক বড়ো হয়েছে। ওদেরও পরিপূর্ণ জীবন।

ও!

আবার স্তব্ধতা।

ধরণীধর কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করেন, আজ আমাকে বলবে তুমি কেন পোর্টব্লেয়ারে বদলি নিলে?

এ আর না বোঝার কী আছে? আপনার সাজানো বাগান যাতে আর না শুকিয়ে যায়।

দুটো বৃষ্টি ভেজা পাতা কেঁপে কেঁপে পড়ে যায়।

মৃদুলা সরে যায়। ধরণীধরের সঙ্গে দূরত্ব রাখে ফের। বলে, থাক ওসব কথা। শরীর কেমন? স্যান্ডউইচ খুব ভালো হয়েছে। একদম আগের মতো। কতদিন পর খেলাম।

ধরণীধর বললেন, তোমার পোর্টব্লেয়ারের অফিসে যত চিঠি লিখেছি, কোনো উত্তর পাইনি। তোমার পাঠানো পাঞ্জাবিটা পেয়ে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলাম, পাওনি?

মৃদুলা ঘাড় নেড়ে জানাল, পেয়েছি।

তবে কেন উত্তর দিলে না, জাস্ট ফিউ লাইনস? একদম ইচ্ছে করল না?

মৃদুলার কুঞ্চিত মুখে একটা রহস্যময় হাসি।

বিয়ে করলে না কেন পরে?

কোনো উত্তর নেই।

চাতালে পড়ে থাকা একটি ইটের টুকরো টেনে নিলেন মৃদুলা। হাতটা কাঁপছে। কিছু কি লিখতে চাইছেন?

মৃদুলা দেবীর সঙ্গে যে মেয়েটি ছিল সে এক্স-রে প্লেট নিয়ে এসে দেখল ওর দিদা

ওখানে নেই। অন্যরা বললেন, নামও ডাকা হয়েছে একবার, কিন্তু কেউ সাড়া দেয়নি। অসীম দত্ত মশাই এদিনও ছিলেন। তিনি মেয়েটিকে চিনলেন। বললেন, তোমার দিদাকে তো দেখলাম বাইরের দিকে যেতে, তা তো মিনিট চল্লিশ হয়ে গেল।

বাইরে খুঁজতে গেল সবাই মিলে। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল ওদের। দুজনে চুপচাপ বসে আছেন চাতালের উপরে। দুজনের মাঝখানে ইটের টুকরো অনেক লাল আঁকিবুকি।

গত পঁচিশ বছরের জমে থাকা কথা আঁকিবুকির সাংকেতিকে কথা বলা হয়েছে এতক্ষণ, যা ওরাই বুঝেছে শুধু। ওই চিত্রলিপিমালার দুই পাশে দুজন মূক বসে আছেন, বাতাসে মিহি বারিবিন্দু বহে যায়। দু-একটা আর্দ্র লাল বটফল পড়ে আছে ওই হার্দ আঁকিবুকির মধ্যে। তারই মধ্যে একটি মাত্র অক্ষর বোঝা যাচ্ছে, আদি অক্ষর সেটি, বর্ণমালার প্রথম অক্ষর। অ। ওই 'অ' কে ঘিরেই সমস্ত আঁকিবুকি।

অ দিয়ে কত কী হয়।

অধরা, অম্লান, অকৃতজ্ঞ, অপদার্থ, অখ্যাতি...। অভিমানও।

হাতি ও পিঁপড়ের গল্প

চা খাওয়া শেষ। প্লেটে চানাচুরের একটু গুঁড়ো রয়েছে, আঙুল দিয়ে চেঁচে জিভে লাগিয়ে নিল সুবীর। পলিও চানাচুর খেয়েছে, হাতে করে, ওর ঠোঁটের চারপাশে মশলা -গুঁড়ো। সুবীর পলির মশলা মাখানো ঠোঁটের দিকে তাকাল, তারপরই নজর সরিয়ে খোলা অ্যালজেব্রায়। ফ্যান ঘুরছে, চানাচুরের মৃদু গন্ধমাখা বাতাস। সুবীর বলল থাক, আর অঙ্ক করতে হবে না, বরং আজ একটু তোর আই কিউ টেস্ট করি। দেখি কেমন বুদ্ধি হয়েছে। আচ্ছা, বলতো পলি, একটা হাতিকে তিনটে স্টেজে কী করে একটা ফ্রিজের ভিতর ঢুকিয়ে দিবি?

পলি মাথা ঝাঁকাল। যাঃ, তাই আবার হয় নাকি? ফ্রিজের ভিতরে আবার হাতি ঢোকে নাকি?

—কে বলল ঢোকে না? ফ্রিজটা যদি বড় হয়?

—বড্ড জটিল করে ভাবিস। টেক ইট ইজি।

পলি চিন্তা করে। মাথা চুলকোয়, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে, তখন নুন ঝাল স্বাদ পায়, জিভটা বুলিয়ে নিয়ে বলে শুঁড়টাই তো সমস্যা। আচ্ছা, তিনটে স্টেজ তো, বলছি, যেন শুঁড়টা না ওঠাতে পারে, সে জন্য শুঁড়টা পায়ের সঙ্গে বেঁধে দেব। এটা হল এক নম্বর স্টেজ...

—উঃ, টেক ইট ইজি। সোজা ব্যাপারটাকে ফরনাথিং জটিল করছিস কেন?

পলি বলল, ও বুঝেছি, ওটা খেলনা হাতি। তুমি তো হাতির সাইজ বলে দাওনি...

সুবীর বলল প্লীজ বি সিম্পল। ফ্রিজটা খুলবি, হাতিটা ঢোকাবি, ফ্রিজটা বন্ধ করে, দিবি। ব্যস, হয়ে গেল তিনটে স্টেজে।

তখন পলির দৃষ্টিপাত সুবীরের দিকে। সুবীর ওই দৃষ্টিটা ওর সারা গায়ে মেখে নিল।

সুবীর এবার বলল—আচ্ছা, এবার বলতো পলি, ওই ফ্রিজেই একটা জিরাফকে ঢোকাতে হবে, চারটে স্টেজে। কী করবি?

—চারটে স্টেজ তো, ও বুঝেছি। প্রথমে ফ্রিজটা খুলব, হাতিটা বের করব, জিরাফটা ঢোকাব, ফ্রিজটা বন্ধ করে দেব, ব্যস, হয়ে গেল চারটে স্টেজে।

সুবীর এবার চোখ বড় বড় করে তাকাল পলির দিকে। সেকীরে পেরে গেলি? তুই নির্ঘাত জয়েন্টে চান্স পাবি। কী পড়বি রে—ডাক্তারি না ইনজিনিয়ারিং? বলেই পলির দু কাঁধে দু হাত রাখল সুবীর। এখন বারান্দায় পলির মা পলির ঠাকুর্মাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে আর বিড় বিড় বকছে—এত করি তবু নাম নেই, কী কষ্টটাই দিয়েছেন আমাকে। আমার নামে, কত নিন্দে করেছেন, তবু এই আমিই করি...পলির ঠাকুরমা শুনতে পারছে না। কানে কম শোনে। পলির কাঁধে সুবীরের হাত। পলি সুবীরের হাতটা

ধরল। ধরে সুবীরের হাতটা কাঁধ থেকে সরিয়ে হাওয়ায় ছেড়ে দিল। তার মানে পলি এখনও ওই রকমই আছে। নো চেঞ্জ, যদিও বড় হয়ে গেছে...। সুবীর পিটপিট চোখে পলিকে দেখল। পলি এখন একটা স্কার্ট আর গেঞ্জি পরে আছে। পলির এখন ক্লাস নাইন। এইট থেকে নাইনে উঠতে ফার্স্ট হয়েছে পলি। অঙ্কে নাইনটি ফোর। ওর প্রাইভেট টিউটর ছিল না আগে। কী করে থাকবে, পলির বাবা যে কারখানার ফোরম্যান ছিল, সেই কারখানা বন্ধ। এই কারখানার যন্ত্রপাতি সব নাকি পুরনো হয়ে গিয়েছিল, নতুন মেশিন বসাবে, বেশ কিছু ছাঁটাই করে দেবে, কর্মচারীরা রাজি হয়নি। শেষকালে বন্ধ হয়ে গেছে। ওই কারখানায় যারা এমনি শ্রমিক ছিল, তারা কেউ কেউ তেলে ভাজা বিক্রি করে রাস্তায়, কেউ জমির দালালি, কেউ হকারি, কেউ ফল কিংবা কাঁচা আনাজের ব্যবসা, কেউ আত্মহত্যা করে বেঁচে গেছে। পলির বাবা তো এমনি শ্রমিক নয়, ফোরম্যান, তাই এ সব কিছুই করতে পারেনি। পলির বাবা তখন বাড়িতেই বসে থাকত, আর দিবানিশি পলির মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করত। পলির ভাইটা মাঝে মাঝে ওই সব ঝগড়াঝাটির সময় কেঁদে উঠত। পলি কিন্তু ওই সব না শোনার ভান করে বলত সুবীরদা, এ বার এই অঙ্কটা করে দাও।

সুবীর পলিকে অঙ্ক করাতে যেত—পলি যখন সেভেনে পড়ে। সুবীর তখন ইলেভেনে। সুবীরদের দুটো বাড়ির পরেই পলিদের বাড়ি। পলিদের বাড়ির টালির চালে লাউগাছ, সুবীরদের বাড়ির কংক্রিটের তৈরি টালি-টালি ছাতে বোগেনভেলিয়া। সুবীরের মায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে ময়েশ্চারাইজার, পলির মার আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে আশ্চর্য মলম জল হাজায় অব্যর্থ। পলির মায়ের সঙ্গে সুবীরের মায়ের দেখা হয় গাছতলার শনির মন্দিরে শনিবার শনিবার। সুবীরের মাকে পলির মা এ রকম এক শনিবারে বলেছিল— দিদি, আপনার ছেলে তো মাধ্যমিকে স্টার পেয়েছে, কতগুলো লেটার, আমার মেয়ের অঙ্কটা যদি মাঝেমধ্যে দেখিয়ে দেয় সুবীরের মা পুরো বাক্যটা না শুনেই বলেছিল—ও বাব্বা মাথা খারাপ নাকি? এলেবেন ক্লাশে যা পড়ার চাপ, ওর সময় কোথায়? তারপর একদিন পলি সোজা সুবীরকেই বলেছিল সুবীরদা, আমার বাবার মাস্টার রাখার টাকা নেই, আমার অঙ্ক টঙ্ক আটকে গেলে একটু দেখিয়ে দিতে পারবে? সুবীর ওর জিনস-এর বকলসে হাত ঘুরিয়ে বলেছিল—আচ্ছা ঠিক আছে, রোববার রোববার বিকেলের দিকে যাবখনে।

সেভেনের পলি, রোগা রোগা, ঝাঁকড়া চুল, বড়বড় চোখ। সব রবিবার না হলেও প্রায় রবিবারই যেত সুবীর। তারপর শুধু রবিবারই নয়, মাঝে মাঝেই। অঙ্ক ছাড়াও ফিজিক্যাল সায়েন্স। কোচিং-এ কো-অর্ডিনেট জিওমেট্রি করে ফেরার সময় সাইকেলটা থামিয়ে—কী রে পলি, গড়ের অঙ্কগুলো হয়ে গেছে সব?

একদিন, পলি তখন এইটে—সুবীর একটু ফিজিক্যাল সায়েন্স, বোঝাচ্ছে। পলিমার। পলির গা থেকে একটা খুব সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছে। অ্যারোমেটিক গন্ধ। পলির বুকে তখন ফুল। সুবীর লিখল পলি+মার= পলিমার। সুবীর পলির মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নিজের ঠোঁটের দিকে আঙুল ছুঁয়ে বলল তুই এখানে একটু মার, আমি পলিমার হয়ে যাই। পলি খুব সহজ, রিনরিন হেসে বলেছিল এ রকম বোকাবোকা কথা বোলো না তো, আমি কিন্তু তাহলে ভাইফোঁটা দিয়ে দেব।

পলিটা এ রকমই। চিন্তায় যত পুরনো মেশিন। ওর বাবার কোম্পানির পুরনো মেশিন চেঞ্জ করা নিয়ে কিন্তু ঝামেলা, ও সব কিছু দেখছে, কিন্তু নিজের চিন্তা ভাবনার মেশিন পাল্টাচ্ছে না। সুবীরের বন্ধুটন্ধু কয়েকজন আছে ওর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে, ওরা ওদের গার্লফ্রেন্ডের কথা বলে, গার্লফ্রেন্ডকে কিস খাবার কথা বলে, সুবীরও বলে অবশ্য, মিথ্যে মিথ্যে বলে। গুল। পলিকে কিস খাবার মিথ্যে গল্প! পলি এ সব দেয় না। কনজার্ভেটিভ। বেলঘরিয়ায় থেকে কী আর হবে। সুবীর ভেবেছে ও কোম্পানি ক্লোজার করে দেবে। আর যাবে না পলিকে পড়াতে। কিন্তু না গিয়ে পারেনি। এক সপ্তাহ পর আবার গেছে। অঙ্ক পারলে থ্যাংকিউ বলে হাত বাড়িয়েছে। একদিন টেস্ট নিয়েছিল, পঞ্চাশে পঞ্চাশ। সুবীর ওর চুলে চুমু খেল। পরের মাসে আবার টেস্ট। পলি ছত্রিশ। সুবীর ঠিক বুঝেছিল, ইচ্ছে করেই চোদ্দ নম্বর ভুল করেছে পলি।

সুবীরের মা পলিকে পড়াতে যাওয়া নিয়ে সুবীরকে প্রচুর বকাবকি করেছে। বলেছে এই সব সেবাধর্ম করতে হবে না, নিজের পড়াটা দেখ। সুবীর বলতে পারেনি...মা, এটা বাগান করার মতোই একটা রিলাকশেসন।

কয়েক মাস হল পলির বাবা একটা চাকরি পেয়েছে বেলুড়ে। সকাল সকাল বেরিয়ে যায়, রাত করে ফোরে। পলি একদিন বলল, সুবীরদা, তোমার এখন টুয়েলভ হয়ে গেল, আমার জন্য আর সময় নষ্ট কোরো না। আমি জয়ন্ত স্যারের কোচিং-এ যাব। সুবীর বলেছিল—আমি কি কোনও দিন আর কিছু বলেছি, না কিছু করেছি। পলি বলল—না গো সুবীরদা। আমার জন্য আর সময় নষ্ট কোরো না। বাবা তো এখন চাকরি পেয়ে গেছে।

সুবীর এরপর আসেনি অনেকদিন পলিদের বাড়িতে। সাইকেলে যেতে পলিকে দেখেছে ওদের বারন্দায়, সাইকেল থামায়নি। একদিন সুবীর দেখল পলি একটা খুব সুন্দর সালোয়ার কামিজ পরেছে। সেজেছে। খুব সুন্দর লাগছে। বিকেল বেলা। সুবীরের মনে হল কোনো বয়ফ্রেন্ড বাগিয়েছে পলি। সুবীর ফলো করল। পলি ঢুকল স্টুডিও-ম্যাডোনায়। সুবীর দূরে দাঁড়িয়ে রইল। পলি যখন বেরুল, সুবীর সামনে এল, ভাবটা এমন—যেন দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। সুবীর বলল কীরে পলি, ছবি তুললি নাকি? পলি বলল হুঁ।

কেন রে? বালিকা বধূ হবি নাকি? বিয়ের ছবি?

হ্যাঁ।

ভ্যাট্, বল না, ছবি তুললি কেন?

এমনি।

এমনি এমনি ছবি তোলে নাকি কেউ।

তুললাম।

সুবীর ভাবল—হতে পারে। পলি হঠাৎ সুন্দরী হয়ে গেছে তো, নিজেকে ধরে রাখতে ইচ্ছে হয়।

পলি বলল—পড়াশুনো কেমন চলছে তোমার?

মোটামুটি।

একটু পর পলি বলল—কাউকে বোলো না সুবীরদা, আমার একটা ফটো সিরিয়াল

কোম্পানিকে পাঠাব। আমার এক বান্ধবীর দিদি সিরিয়াল করে। বলেছে ফটো দিতে।

সিরিয়ালে নামবি?

নামব বলছ কেন? সিরিয়ালে অভিনয় মানে কি নামা? নেমে যাওয়া?

তা নয়তো কি। তুই পারবি না। তোর দ্বারা হবে না।

কেন?

কেন আবার? তোর চিন্তায় তো পুরোনো মেশিন।

পুরোনো মেশিন মানে?

পরে বলব।

সুবীরদা, এখন একদম আর কথা বল না কেন?

তুই তো তাড়িয়ে দিলি।

ভ্যাট, তাড়ালাম নাকি? আমার জন্য তোমার কতটা সময় নষ্ট হচ্ছিল।

কে বলল?

আমি বুঝি।

এখন তো আমার আরও বেশি সময় নষ্ট হচ্ছে।

কেন?

বুঝিস না?

পলি তখন সুবীরের দিকে পরিপূর্ণ তাকাল। একটু হাসল। পলি কি বুঝেছে? বোঝার মতো বুদ্ধি হয়েছে তাহলে?

বারো ক্লাসের পরীক্ষাটা মন্দ হয়নি সুবীরের। তারপরই জয়েন্ট এন্ট্রাস। পরীক্ষা সবেই তো হয়েছে। সুবীরের মামাতো দাদা ডাক্তারি পড়ছে নীলরতনে। ও বলছে সার্জন হবে। সার্জন হলে হেবি ইনকাম। একটা অপারেশন মানে কয়েক হাজার। সুবীরের জ্যাঠার সঙ্গে ওর বাবার ঝগড়া। ওর জ্যাঠতুতো দাদা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। সুবীরকেও ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হতেই হবে। না হলে ওর বাবার প্রেস্টিজ থাকবে না। সুবীর এজন্য আলাদা কোচিং নিয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লেই গার্লফ্রেন্ড হবে। তখন এসব পলিফলি টাইপের পুরোনো মেশিনমার্কা মেয়েদের পাত্তাই দেবে না সুবীর।

আজ অনেক দিন পর এসেছে সুবীর পলিদের বাড়ি। পলি প্লেটে করে চানাচুর এনে দিয়েছে। একটু চাও। সুবীর বলল পলি, তুই কিন্তু বেশ বিউটিফুল হয়ে গেছিস। পলির কাঁধ থেকে পলি যে হাত নামিয়ে দিয়েছিল সেই হাত নাড়াল না। বলতেই পারত টেক ইট ইজি। বলেনি। লাভ নেই। সতীটাইপ। ওর বন্ধুদের গার্লফ্রেন্ডরা কত স্মার্ট। ইঞ্জিনিয়ারিংটায় চান্স হোক, পলিকে দেখিয়ে দেবে।

পলি, ফিজিক্যাল সায়েন্স-এ কত পেয়েছিলি রে?

নাইনটি।

জয়েন্ট দিবি?

ওরেব্বাবা। ওসব পরের কথা।

আচ্ছা, জিরাফের কনটিনিউয়েশনে আরও কথা আছে। বলি?

বলো। হেবি মজার।

শোন। বাঘের বিয়ে। সব জন্তু জানোয়ারের নেমন্তন্ন। সবাই গেছে। একটা জানোয়ার যায়নি।

কে যায়নি বলতো?

মানুষ জানোয়ার যায়নি। গেলেই তো বাঘ খেয়ে নেবে।

হ'ল না। জিরাফ যায়নি। কী করে যাবে? জিরাফ তো ফ্রিজে বন্দি।

—ও, তাইতো। সেই থেকেই বন্দি।

আরও আছে। বাঘের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে হাতি গেল মটোর সাইকেল চালিয়ে। পেছনে পিঁপড়ে। মটোর সাইকেল অ্যাকসিডেন্ট হ'ল। হাতি খুব ইনজোরড্ হ'ল। পিঁপড়ের কিছু হ'ল না। কেন বলতো?

পিঁপড়ের কী করে ব্যথা লাগবে? নিউটনের সেকেন্ড ল বলছে ফোর্স ইজিকালটু মাস ইন্টু অ্যাকসেলারেশন। পিঁপড়ের ভর তো খুব কম...

আবার আননেসেসারি ব্যাপারটা জটিল করছিস পলি, পিঁপড়েটা হেলমেট পরেছিল তাই ওর কিচ্ছু হয়নি।

পলি খুব সিরিয়াসলি ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাইতো। পিঁপড়েটা হেলমেট পরেছিল। সত্যিই তো। তারপরই হাসিতে ফেটে পড়ল। ওই হাসির শব্দ শুনতে শুনতে সুবীর চলে গেল। সুবীর একবারও পিছনে তাকায়নি। যদি তাকাত, দেখতে পেত জানলার শিক ধরে পলি দাঁড়িয়ে আছে।

সুবীর হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট ডিভিশন। দুটো লেটার, তবু সুবীরের বাড়ি নিস্তেজ। জয়েন্ট এনট্রান্সে হয়নি। ওর মা বেশ কয়েকবার বলেছে—যা না, আরও ওই পলিকে পড়া গে যা। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াগে যা। সুবীরের বাবার আন্ডারে কাজ করে একজন ক্লার্ক, তার ছেলেও জয়েন্টে চান্স্ পেয়েছে। ভদ্রলোক বাড়িতে এসে মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে গেছে। ওই লাড্ডু আজ সকালে পাড়ার কাকেরা খেল নেচে নেচে। সুবীরের জ্যাঠতুতো দাদা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ওর ভাই, সুবীরেরই বয়সী বাপ্পা, জয়েন্টে বেরিয়ে গেল। ডাক্তারি পড়বে। হাতে স্টেথো নিয়ে একদিন এ বাড়িতে আসবে। সুবীরের জ্যাঠা কি অপমানই করেছে সুবীরের বাবাকে। যদি উল্টোটা হ'ত, সুবীর জয়েন্ট পেল, বাপ্পা পেল না, তাহলেই না প্রতিশোধটা ঠিক ঠিক হত। সুবীরের বাবাতো কম খরচ করেনি সুবীরের পেছনে, তিনজন টিচার, জয়েন্টের জন্য আলাদা কোচিং ক্লাস, তবু...। সুবীরদের বাড়িতে গত দু দিন বাজার হয়নি। সুবীরদের কাজের লোক মুদি দোকান থেকে আলু-পিঁয়াজ নিয়ে গেল।

আজই পলির ঠাকুর্মা মারা গেলেন। পাড়ার ছেলেরা সব জড়ো হয়েছে। ম্যাটাডর দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে। অনেকেই শ্মশানে যাবে। পলির মা কাঁদছে—কতদিন কত আজেবাজে কথা বলেছিগো মা...। পলিরা বামুন। বামুনবুড়ি মরেছে বলে অনেকে এসে বুড়ির পা ছুঁচ্ছে। সুবীরের মাও এসেছে। মুখ গম্ভীর। সুবীর আসেনি ও মুখ দেখাবে না। সুবীর এখন শুয়ে আছে ছাতের ঘরে।

সুবীর সিলিং থেকে ঝোলানো ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ। এখন ঘরের

চারিপাশে তাকায়। দড়ি। কিছু কি লিখে যাবে? কী লিখবে? মা গো আমি অপদার্থ...। ন্যাকা ন্যাকা। একটা স্মার্ট কথা লিখে যেতে ইচ্ছে করে। বাবা-মা ছাড়া আর কে কাঁদবে। পলি?

ফ্যানটার দিকে তাকালেই যত আজেবাজে চিন্তা। বরং চোখ বুঁজে থাকা ভাল। সুবীর স্নান করেনি গত দু'দিন। লজ্জা করবে না এই শরীরে সাবান মাখতে, আজ সকাল থেকে খায়নি কিছু। ওর মা বলেছিল খেয়েনে, না খেলে কি আর জয়েন্টে চান্স হবে? ও খায়নি। মাখন-রুটিতে মাছি ঘুরঘুর করছে। পিঁপড়ের লাইন। ওর বাবা বলেছে—এ ভাবে ভেঙে পড়লে হবে? ট্রাই ফর নেক্স্ট ইয়ার। নেক্স্ট ইয়ার তো অনেক দেরি। ক'দিন পরেই তো জ্যাঠতুতো দিদির বিয়ে। যেতে তো হবেই। ওখানে বাপ্পার সঙ্গে দেখা হবে। বাপ্পা যদিও বাঁকুড়ায় চান্স পেয়েছে, কিন্তু ডাক্তারিই তো...। ও, ওর হস্টেলের কথা বলবে, কী ভাবে র‍্যাগ্ড হয়েছে বলবে, র‍্যাগিং নিয়ে কোনও কথা বলতে পারবে না সুবীর। ছিঃ। চোখ বুজে থাকে সুবীর। সব অন্ধকার। অন্ধকারই ভালো। বাইরে বলহরি শোনা যাচ্ছে।

চোখ বুজে থাকা সুবীর ওর চিলেকোঠার ঘরে অ্যারোমেটিক গন্ধটা পায়। সুঘ্রাণ। একটু চেনা। সুবীরের কপালে একটা নরম স্পর্শ। সুবীর চোখ খোলে। এক ঝালর চুল ঠিক ওর মুখের উপরে, চোখের উপরে। পলির হাত সুবীরের কপাল থেকে চোখের পাশে গিয়ে থামে, বলে কেঁদো না, কেঁদো না। তখনই সুবীর কাঁদে। চোখের জল গড়ায় ধুস্ অভিকর্ষ, ধুস্ নিউটন, জল আসে, আর ওখানেই পলির ঠোঁট।

পলি বলে বোকা কোথাকার। পলি দু হাতে ধরেছে সুবীরের গালটা—জীবনদীপের লোগোটার মতো। সুবীর লজ্জা পায়। পলির হাত সরিয়ে দেয় সুবীর।

—খুব পুরোন মেশিন তোমার। পলি বলে। পলি বলে, উঠে দাঁড়াও সুবীরদা, ওঠো...

সুবীর সত্যিই উঠে দাঁড়ায়। বলে, পলি, তুই চলে যা...। মা যদি...

—এত পুরোন মেশিন? —পলি আবারও বলে। সুবীর পলির দিকে তাকায়। সুবীর দেখে পলির চোখের কোনায় এক ফোঁটা জল নিউটনের সূত্র উপেক্ষা করছে। চোখের কোণায় জল লেগে রয়েছে, পড়ছে না।

মাইকেল ফারাডে, কুলাম্ব, হার্টস্-এর যাবতীয় সূত্রকে বিধ্বস্ত করে পলি ওই চিলেকোঠার ঘরের রং ওঠা চাদর ঢাকা বিছানার এক পাশে শুয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে বলে সুবীরদা, জিরাফের ওই গল্পটা কিন্তু শেষ হয়নি। আরও একটু আছে! বলি?

সুবীর ঘাড়টাও নাড়াতে পারে না।

পলি বলে—ওই যে হাতিটা, ওর তো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, মনে আছে? বলো, মনে আছে?

সুবীরের মাথাটা নড়ে উঠল।

পলি বলে হাসপাতালে হাতিটা তো শুয়ে আছে। একটা বেডে পিঁপড়েটাও শুয়ে আছে। পিঁপড়েটার তো কিছু হয়নি। ওর তো হেলমেট পরা ছিল, তা হলে কেন পিঁপড়েটাও শুয়ে আছে? কেন? বলো কেন?

সুবীর মাথা চুলকোয়।

—টেক ইট ইজি, টেক ইট ইজি...। ভেরি সিমপ্‌ল। জটিল করে ভাববারই দরকার

নেই।'

সুবীর মৃদুমন্দ হাসে। বহুক্ষণ পর, যেন বহুদিন পর। হেসে বলল, সরি পারব না। পলি বলে খুব সোজা। হাতিটার তো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, অ্যাকসিডেন্ট! ওর তো ব্লাড দরকার, পিঁপড়েটা ব্লাড দিল, যতটা পারল। পিঁপড়েটা ছাড়া আর কেউ তো ছিল না হাতিটার পাশে।

দুধওয়ালা

ছেলের বে'দেব। ছেলে আমার ইনজিনীয়র। ঐ রাস্তা তৈরির পেল্লায় পেল্লায় যন্তর আছে না, ছেলে এইটুকুন হলে কি হবে, ওসব তোয়ের করে। ওর নাম রাকিছিলাম বিকাশ। কেমন ধারা বিকশিত হয়েছে দ্যাকো। দেকলে সবাই বলবে বামুন কায়েতের ছেলে। আমি দুধ বেচি, মিথ্যে বলব না, দুধে জল দিই, কিন্তু জলে দুধ দিইনি কোনদিন। তাই ধম্মো আচে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মুক তুলি চেয়েছেন। ছেলে আমার মানুষ হয়েছে। ছেলেকে চোনা গোবর পরিষ্কার করতি হচ্চে না, কারুর কতা শুনতি হচ্চে না, খড়—খি মাকতি হচ্চে না, লোকের বাড়ি বাড়ি দুধ বিককির করতি যাতি হচ্চেনা, কারুর কতা শুনতি হচ্চে না—হ্যাঁগো ঘোষের পো, জলটা আর একটু কম দাও। ছেলে আমার ফুল প্যান্টালুনের ভিতরে জামা ঢুকোয়নি যখন খটখট হাঁটে, যেন থানার বড়বাবু, তখন কে বলবে ও হ'ল ইছাই ঘোষের ছেলে! কে বলবে ছোটবেলায় পেট ডিং ডিং নাকে সর্দি গুয়ে কিরমি! অঙ্কে বড় সাফ ছিল মাথা। ফেল করেনি পরীক্ষায় কোনদিন। ফোরেই বুঝেছিলাম ওর ব্রেনে বুদ্ধি আছে। ধারাপাত ঝাড়া মুখস্থ, ষাড় লিখতে ঠিকমত পেটকাটা মর্ধূন্যষ লিখতো। তা ম্যাট্রিক পাশ হয়ে গেল যখন, তখন গোঁপদাড়ি ওঠেনি ভাল করে। বলল টেকনিকাল পড়ব আমি। আমি বললাম যতটাকা লাগে দোব আমি, তুই ইনজিনীর হ'। বিকাশ আই টি আই ভর্তি হল। এই সজনেগাছি থেকে সাইকেলে দত্তপুকুর, তারপর ট্রেনে শ্যালদা। আবার শ্যালদা থেকে টালিগঞ্জের কলেজ। অনেক কষ্ট করেচে ছেলে। আমি বাপের ধম্মে করতে পারিনি, তবু যা পারিচি করিচি। আপেল বেদানা খাইয়েচি। নিজে বোষ্টম হয়ে মাগুর মেরে ঝোল খাইয়েচি। পাপ বললি পাপ, ধম্মো বললি ধম্মো। বিকাশ খুব কায়দায় লেখাপড়া করিচে। এই—লম্বা পেল্লায় কাগজের উপর লম্বা স্কেল ফিট করি কত ড্রয়িং করল, কত লম্বা লম্বা অংক। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ছাড়াও আরও কতরকমের অংক আচে আমি তার কী বুঝি! দু বছর এমনি পানা তপস্যা করি ছেলে আমার ইনজিনীয়ার হ'ল, ফিটার ইনজিনীয়ার। কাউকে চাকরীর খোশামুদি করতি হয়নি, কারুর পায়ে তেল মালিশ করতি হয়নি। ছেলে আমার চাকরী পেয়ে গেল। এদিকি মুখার্জী বাবু চৌধুরী বাবুদেরও জ্বলুনী হচ্ছে দেকে আমার মনেও যেটা হচ্ছে সেটাকে কী বলব, আহ্লাদ বলতো আহ্লাদ ; সেদিন মুখার্জীবাবু বল্লেন কিরে ইছাই, ইনজিনীয়ারের বাপ, এবার আর দুধ বেচে কী হবে? আমি বলি ছেলের পয়সায় খাব কোন দুখে? আমার হাত রয়িচে, রথ রয়িচে।

কাল সকালে আমি ষোল সের দুধ মেরেচি। ঘরে কারিগর আনালাম নরহরি সুইটস এর উত্তম। দুধমারা ছানায় রসগোল্লা তৈয়ের করিয়ে ক্যানে চাপিয়ে আমার সব খদ্দেরদের বাড়ি বাড়ি যাচ্চি। ক্যানের ভিতরের রসে ভাসা রসগোল্লার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ বলচে প্রেমানন্দে নাচরে, ইছাই, নাচরে ইছাই। সজনেগাছি গাঁ থেকে দুই কিলোমিটার

দত্তপুকুর রেলস্টেশন। রাস্তাটার দুপাশে ছ সাত বছর আগেও ছিল ধান জমি। এখন জমি ফুঁড়ে যত নিরালা, সবুজ নিকেতন, বসন্তবাহার, সবুজ পত্তর বেরোয়েচে। ওরাও আমার কাছে দুধ চায়। ডিম্যান আছে। এসব বাড়িতে দুধটা দিয়ে দিলে সাইকেলে কম হেঁদোতে হ'ত। কিন্তু পুরনো খদ্দেরদের ছাড়ি কি বলে! জমিদার বাড়ি, মুখার্জী বাড়ি, সাহা বাড়ি....পুরনো লোক এরা সব আমার বাপের আমলের খদ্দের। মাধববাবুরা হলেন জমিদার বংশের। তেনাদেরই পূর্বপুরুষ কাটোয়া থেকে তিনঘর ঘোষ আনিয়েছিলেন। খাইখালাসী বন্দোবস্তে। বছরকার তিন পার্বনে দুধ দই দেবে, খাজনা লাগবে না। আমি তো সেই ঘোষেদেরই বংশ। আর মাধববাবুরাও হলেন গিয়ে জমিদার বংশ। মাধববাবু, যাদববাবু রাঘববাবুরা হলেন তিন ভাই। ওধারে মেজকর্তার তিন ছেলে, ছোটকর্তার চার, আরও জ্ঞাতিগুষ্ঠিও আছে। এখন ঐ ইটক্যালানো জমিদারবাড়িতে আট নটা সংসার। এ তরফ সে তরফ মিলে দশ সের মানে দশ লিটার দুধ যায় রোজ। সাইকেলটা নাট মন্দিরের সামনে স্ট্যাণ্ড করি, সাইকেলের কিরিং লাগাই, দু একটা গোলা পায়রা চণ্ডীমণ্ডপে ডানা ঝটপটায়। দুশো বছর ধরে ঝটপটাচ্ছে। আবার কিরিং লাগাই, যেন ডাকছে আমার বাপ ঠাকুদ্দা পূর্বপুরুষ—কই গো মা জননীরা, এসোগো, আমি ঘোষের পো এয়েচি...সাইকেল কিরিং শুনে উঠোনে চলে আসে বড় তরফ, মেজ তরফ, সেজো, ছোট...শাড়ি, ম্যাকসি, শালোয়ারকামিজ। ঘটি স্টিলের ক্যান হরলিস্ এর বয়াম প্লাস্টিকের মগ...। আর আমি যেন দুশো বছরের পুরনো ঘোষের পো। আমি দুধ দিচ্ছি!

বড়কর্তার লুঙি চিনি আমি, মেজকর্তার ছাতা, উঠোনের কোণের জঞ্জালে কাচের বোতলগুলি কিসির আমি জানি। উঠোনে, বকুলগাছের নিচে পাথরের পরীর গায়ের সবুজ শেওলায় রক্ত ছিটা লাগিছিল কেন, তাও তো জানি। চণ্ডীমণ্ডপের কোণায় পড়ি থাকা পাল্কিতে ঘুণ পোকারা কাঠ গুঁড়োচ্ছে, সে আওয়াজ চিনি। ওদের কি করে বলি আর তোমাদের দুধ দিতি পারব না, দুধ দেব নতুন বাড়িগুলিতে, ধান ক্ষেত ফুঁড়ে যারা উঠতি নেগেচে নতুন নতুন! লিটারে দুটাকা বেশি দেবে ওরা, তবু পারিনা ছাড়তি, দুশো বছরের টান। এখন আমি প্রেসারের রুগী। হাইপ্রেসার। পঞ্চানন ডাক্তার প্রেসার দেখার যন্তরে ফচ্‌ফচ্ টিপতি টিপতি হঠাৎ থম মেরে গিয়ে বলিছিল সব্বোনাশ! ডাস্টোল সিস্টোল সব বেশি বেশি। নুন কম খাও কাকা, সাইকেল চড়া ছাড়ো। আমি বলি, আমি হলাম ঘোষ। সাইকেল ছাড়া চলে? পঞ্চা ডাক্তার বল্লে দ্যাখো—যত কম পারো.....তবে এবারে ছাড়ি দেবোনে। ছাড়তিই হবে। সাইকেলে হাপ ধরি যায়। মাঝে মাঝে ভাবি আমার আশে পাশের ঐসব নিরালা বসন্তবিহার দোলনা সবুজ পত্তোর গুলিতেই দোবো, ওসব বাবুরা আমার বাড়িতে এসেই দুধ ধরবে। এইসব ভদ্রলোকেরা সামনে দুয়ি দুধ নিতি মনের আরাম পায়। দুধ দুইবার চোঁ চোঁ শব্দে চিত্তে মহরম হয়। এখন না হয় বিশ-পচিশ সের বেচি, পাঁচসাত সের নয় কম বেচব। গরু একটা ছাড়ি দেব না হয়। কি করব। বয়স বাড়ে আর শরীলির দোষ বাড়ে। এবার গোটানোর পালা। মেয়েদের বে'দেয়া হল, ছেলেটা ইনজিনীয়ার হ'ল। আর। কী। এবারে খালি নাম কেত্তন। নামেই পাশ্চিত্তির হয়। পাপ বলো যদি ছেলের জন্যেই করিচি, আবার ধম্মোও বলতি পারো। বোষ্টম হয়ি মাগুর মাছ মেরিচি। ভাবতে পারো, আশি টাকা কিলো, তবু এনিচি, পয়সার কথা ভাবিনি, ছেলেকে বলিচি, পয়সার কথা মোটে ভাবতি হবে না। রোজ টিপিনে আপেল খাবি। ছেলেটা আমার মুখ রাখিচে। পাশ করতি না

করতিই চাকরি। সবে কুড়ি বছরের হ'ল। এখন কড়কড়ে নোট গুনছে ছেলেটা আমার। ওরে বাইশ; তেইশেই বে' দিয়ে দেবেনে। ঘরে টুকটুকে বউ আসবে। সরতোলা ঘি খাওয়াব ওকে।

ক্যানের মধ্যি ছলাক ছলাক। আনন্দে হরিবোল মন। নাম বিলাক ছলাক ছলাক। আজ মিষ্টি বিলিয়ে কয়ি দেব আর না। আর দোরে দোরে দুধ বিলোতি পারব না। পারোতো ঘরি এসি নে' যাও। হ্যা, বলব, নিয্যস বলব। বলতি পারব। এ কথা বললি আমারে কেউ বলতি পারবে না যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। বলতি পারবে না কেউ। ক্যানো বলবে! আমার ঘরে কেডা? না ইনজিনীয়ার খোকা। বড় মুখ করি বলব। আর এদিকি যে জমিদার ঘরের ছেলেরা বেকার বসি আছে সব...। এমন কি মাধববাবু, ইস্কুলের সেক্রেটারী, মুখে মাইক লাগোয়ি বক্তৃতে করেন, হাঁকলে দু চারশো লোক জড়ো হয়, সেই মাধববাবুর মুখ চুন হয়ি যায় আমার ছেলেরে দেকলি। কিরিং কিরিং...সরি যাও...আমি যাচ্ছি...ঘোষের পো, না, ইনজিনীয়ারের বাপ যাচ্ছি আমি, কিরিং...

ঐ যে অনন্ত যায়। অনন্তের অ বাদ দিলি নন্ত। সঙ্গে উ যোগ দিলি নন্তু। অনন্তকে নন্তু ডাকে সব। জমিদার বাড়ির পো। মাধববাবুর। ডিউটিতে যাচ্চে। দত্তপুকুর শান্তি পিপাসা বালিকা বিদ্যালয়ে। বলি ও অনন্তদা, ব্যস্ত আচ? ইদিক পানে, একটু আসবা? বলি একটু হাঁ করো, দুটো রসগোল্লা মুখে দিয়ে দি, শুনেচো নেশ্চই, আমার বিকাশ চাকরিতে ঢুকিচে...এট্টু মিষ্টি মুখ করাতাম...। অনন্ত একটু তাকালো শুধু। কপালে তিন থাক ভাজ বেরুল। যেমনি যাচ্ছিল তেমনি চলে গেল। আর অনন্তের বাপ মাধব চৌধুরী এমন দুর্ব্যবহার করলো, কিছু বলার নেই। বলছে, কী বলছ রোজ রোজ...। ইনজিনীয়ার—ইনজিনীয়ার। চামচিকেও পাখি, আরশোলাও প্রজাপতি, আর ফিটার মিস্তিরিও ইনজিনীয়ার। জাঙিয়ার বুকপকেট।

হুঃ এই ঘুরোলাম সাইকেল উল্টো দিকি। পঞ্চাডাক্তার কি ডাক্তারী পড়িচে কোন দিন? কলকাতা গেচে? ছিলতো অবিনাশ ডাক্তারের কম্পাউন্ডার। এখন পঞ্চারে ডাক্তার বলোনা তোমরা?

মার প্যাডেল শালা সাইকেল। জমিদারী মারাচ্চো! আজ স্টেশনের ভিখিরিদের খাওয়াব। ঝিম ঝিম করতিছে সারা গা। ঘুরতিচে নিউ এজ টেলার, মেক আপ সেলুন, মিষ্টিমুখ, সন্তোষী মা ক্যাসেট...। বমি বমি লাগিতিচে। বমি হবে, বমি। বমির সঙ্গে কী বেরুচ্চে? মাধব চৌধুরীর চোখ? নাক দে কী বেরুচ্চে! রক্ত! কার রক্ত? হরে কৃষ্ণ। মহাপ্রভু হে...

॥ ২ ॥

ফুল নেম বিকাশকুমার ঘোষ। ফাদারস নেম ইছাই ঘোষ। পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস ভিলেজ সজনেগাছি পোঃ দত্তপুকুর, নর্থ চব্বিশপরগনাস...। মান্থলি ইনকাম...কী লিখব আমি! নিল লিখব? নিল? এখন ইনকাম বলতে লাউডগা, গাছের নিমপাতা, আর পোস্ট অফিসের দুশো পঁচাশি টাকা সুদ। আর দিদিদের পাঠানো মানি অর্ডার। আজ ছ'মাস বাবা বিছানায়। রসগোল্লা বিলোতে গেছিল, রাস্তায় সেরেব্রাল অ্যাটাক। বাঁ অঙ্গ পড়ে গেছে। পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়। বেডশোর হয়ে গেছে। পিঠে পাউডার মাখাতে হয় ভাল করে। কথা বলতে পারে না। যেদিন চারটে গরু বিক্রী হয়ে গেল সেদিন আঁ আঁ আঁ করে কি সব বলতে চেয়েছিল বাবা, চোখের জল বেরিয়েছিল প্রচুর। ডান

হাতে নিজের গালে চড় মেরেছিল একটা। সেদিন সারাদিন মুখে তোলেনি কিছু। এরপরেও আরও একটা বিক্রি করতে হয়েছিল। সেটা কি বাবা বুঝেছে? সকাল বেলা উঠেই কানের পাশে ডান হাতটা দিয়ে হাম্বা শোনার চেষ্টা করে। গরুদের আলাদা গলার স্বর চেনে। হাম্বা শোনে আর গলার আঁ-আঁ শব্দ হয়। কিছু বলতে চায় বুধিকে? বিক্রি না করে করব কী? সংসার চলবে কি করে? আর গরুর খিদমত সামলাবেই বা কে? আমাকে তো কিছু করতে দিত না বাবা। গরুর দুধটুকুও দুইতে দিতোনা বাবা। আমি জানিনা গরুর বাঁটে ঘা হ'লে কি ওষুধ লাগে। সবুজ দাস্তের টোটকা। জানি না গরুর গরম হওয়া, পাল খাওয়ানো, পাল ধরানো। খুবাই রোগ জানি না। নামই শুনেছি শুধু। ইশরে আমার মধ্যে বাবার অস্বীকার। বর্ণাশ্রম অস্বীকার। ইশরে, আমি কেন যে অঙ্কে ফিফটি আপ পেতাম...।

কেষ্টকাকা কিনল জার্সিটা, বাজার দরের চেয়ে কমই দিল। জ্ঞাতি। দেশি দুটো কিনে নিল গরুর হাটের দালাল। একটা গরু এখনও রয়েছে। মা কিছুতেই বেচতে দেবে না ওটা। ঘোষদের বাড়ি, গরুর হাম্বা থাকবে না, চোনা ছাড়ার ছ্যারছ্যার থাকবে না, গোবরের গন্ধ থাকবে না, তা কি হয়? আর হাম্বা না শুনলে বাবার মন খারাপ হয়ে যাবে আরও। মায়ের সামান্য গয়না আর গরুটা ছাড়া আর কিছু নেই এখন, হার্গিস নেই।

চাকরিটা হঠাৎই গেল। কোম্পানীটা মর্ডানাইজেশন হবে। মর্ডান মর্ডান মেসিন বসবে, বিদেশী মেসিন। জার্মান কোম্পানী শেয়ার কিনেছে। অনেকেরই চাকরী গেল। পুরনোরা ক্যাশ পেল। কোন আন্দোলন হ'ল না। বেশি আন্দোলন হলে বিদেশী শেয়ার কমে যাবে। সব মেনে নিল ইউনিয়ন। আমি নতুন বলে পেলাম মাত্র তিন মাসের মাইনে, তার সবই বাবার চিকিৎসায় ভিত্তাল হয়ে গেছে। ডাক্তার বলে দিয়েছে বাবার ভাল হবার আশা নেই। একদিন মা শনিপুজো দিল। আমার হাতে সিন্নির বাটি। ঠাকুর, বাবাকে ভাল করে দাও বলতে গিয়ে বলে ফেল্লাম বাবাকে এবার তুলে নাও...। টেনে থাবড়া মারতে ইচ্ছে করছিল নিজেকে। মুখার্জীবাবু সেদিন আমাকে বলল কিহে, ইনজিনীয়ার, চাকরীটা কেমন চলছে। আমি বললাম জ্যাঠা, ইনজিনীয়ার বলছেন কেন? আমিতো ট্রেড সার্টিফিকেট পাওয়া মিস্ত্রি। মুখার্জীবাবু বল্লেন তা তোমার বাবা বলতো কিনা। আমি বল্লাম বাবার কথা ধরেন কেন....। মুখার্জীবাবু ভালই জানেন আমার চাকরী নেই। আমিতো এরকম কোন প্রতিজ্ঞা করতে পারি না—আপনাকে একদিন দেখে নেব মুখার্জীবাবু, আমিতো ফিটার। নাটবল্টুফিট করি, পুরোনো কেতার মেশিনে পুরনো টেকনিক। এখন নতুন নতুন সব কিছু। আমাদের এখানে নতুন আসেনি। আমি কী আর চাকরী বাকরী পাব?

সেদিন দত্তপুকুর স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের পাশে দেখি দুটো নতুন পোস্টার দত্তপুকুরের নতুন আকর্ষণ। কেবিল টিভি। মাত্র মাসিক একশত টাকার বিনিময়ে কেবিল কানেকশন নিয়া স্টার টিভি, জি. টিভি, এম টিভি, বিবিসি ইত্যাদির মনমাতানো অনুষ্ঠান। খোঁজ করুন অনন্ত চৌধুরী জমিদার বাড়ি, দত্তপুকুর। মানে, মাধব চৌধুরীর বিকম পাশ ছেলে ডিশ অ্যান্টেনা খাটাচ্ছে ওদের পুরনো জমিদার বাড়ির ছাতে। ওখান থেকে তার যাবে দত্তপুকুরের বাড়ি বাড়ি। নয়ানজুলির পাশ দিয়ে, আতা গাছের ফাঁক দিয়ে কেবল টিভির তার যাবে। তার যাবে সজনেখালির পথে নিরালা বসন্ত বাহার-সবুজ পত্রে।

স্টেশনের দেওয়ালে আর একটা পোস্টার। শুভ সংবাদ! শুভ সংবাদ! শুভ সংবাদ! দত্তপুকুরে মাদার ডেয়ারীর দুধ। বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করবারও ব্যবস্থা আছে। ডোর টু ডোর প্যাকেট সাপ্লাই করিবার জন্য বেকার যুবক চাই। দরখাস্ত সহ সাক্ষাত করুন। চঞ্চল মুখার্জী। ব্রাহ্মণপাড়া। দত্তপুকুর।

তারমানে দাঁড়াচ্ছে মুখার্জীরা এজেন্সী নিয়েছে। মুখার্জী দুধ বেচবে। আমি এখন দরখাস্ত লিখছি। দরখাস্ত সহ দেখা করতে যাব।

॥ ৩ ॥

বিকাশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ নিচু। মুখার্জীবাবু বললেন, চিন্তা করো না। তুমি নিশ্চয়ই প্রেফারেন্স পাবে। শত হলেও তুমি ঘোষ। দুধ তোমার হাতেই মানায়। অনেকেই চাইছে। মিত্তিরদের ছেলেটাও, যে টিকিট ব্ল্যাক করে, সেও বলছে সকালবেলাটায় এটা করবে। আমি ওকে দেবেনা। তিনজনকে দেব। হাফ লিটারের প্যাকেটে তিরিশ পয়সা কমিশন থাকবে। ডেইলি চল্লিশ লিটার অর্ডার ধরতে পারলে চব্বিশ টাকা। সকালে দু ঘণ্টার কাজ। মাসে সাড়ে সাতশো। বিকাশ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, মুখ নিচু। মুখার্জীবাবুর খালি গা। ধুতি পরা, গায়ে পৈতে। কাঁঠাল কাঠের চেয়ারের একটা হাতল নেই। ওখানে বসে নাভিকুণ্ডে তেল দিচ্ছিলেন। অশ্বত্থামার নামে তিনবার তিন ফোঁটা তেল মাটিতে ফেলে বললেন, সংকটে নিয়ম নাস্তি। হা চাকরি। ব্রাহ্মণসন্তান দুধ বেচবে। কী আর করব। নষ্টস্য কস্য গতি। বামুনের ঘরে গরু। তবে আমার চঞ্চল তো আর বাড়ি বাড়ি দুধ দুধ দিতে যাচ্ছে না! ও হ'ল এজেন্ট। আর তুমি যদি ব্যবসা-পত্তর ভাল করে দিতে পারো, তোমাকে কিছুটা পোরশান সাব এজেন্সি দিয়ে দেবোনে, বুইলে, তুমি পারবে। পারার কথা। তোমার বাবার সব খদ্দের গুলোকে তুমি ধরো। কী, পারবে না ঘোষের পো?

বিকাশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে, মুখ নিচু। মাধব চৌধুরী গোল থামের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছেন। সেগুন কাঠের চেয়ার। দেওয়ালে পূর্বপুরুষের ছবি, ক্যালেন্ডারে জ্যোতিবাবু হাওয়ায় নড়ছেন। চেয়ারটার পাশে একটা তুলো লাগানো কাঠি পড়ে আছে, কান খোঁচাবার। মাধববাবু বললেন, তোমাদের বংশে আমাদের বংশে কত দিনের আঠা, কিন্তু মাদার ডেয়ারীর দুধে মোটে ভিটামিন নেই। পাউডার গোলা দুধ। এমনিতেই সারের শাক সব্জী আর পোলট্রির ডিম খেয়ে পেটে গ্যাস হচ্ছে। তারওপর মাদার ডেয়ারীর দুধ খেতে পারব না। এখন কেষ্টর কাছ থেকে দুধ নিচ্ছি।

বিকাশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে, মুখ নিচু। মাধব চৌধুরী বললেন—শোন ঘোষ। কাজ আছে, জানোই তো, ছেলে আমার কেবলি টিভি না কি বলে, তার ব্যবসা করছে। কি করবে কোথায় চাকরী। তা শাস্তরে বলেছে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। জমিদারীও তো একধরনের ব্যবসাই ছিল। তা যা হোক, আমার অনন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে হ্যান্ডবিল বিলি করতে পারবে না, শত হলেও জমিদারের রক্ত রয়েছে। তোমায় কিছু হ্যান্ডবিল দিচ্ছি, দুধের প্যাকেট দিতে যাবে যখন, একটা করে হ্যান্ডবিল দিয়ে দিও সঙ্গে করে।

বিকাশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে, মুখ নিচু।

বিকাশ সাইকেল চালাচ্ছে এখন। ওর বাবার মত সাইকেলের হাতলের দুপাশে দুধের

ক্যান নেই, দুধের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ নেই। ওর সাইকেলের ক্যারিয়ারে প্লাস্টিকের সবুজ রং এর ট্রে। তাতে পলিথিনের প্যাকেট। প্যাকেট দুধ। এই দুধে বিকাশের নিজস্ব কোন নির্মাণ নেই। এই দুধের সঙ্গে নেই মিশে থাকা হাম্বা শব্দ, চোনার গন্ধ, গাভীর গভীর স্তন এবং আঙুলের কারুকাজ, খোল ভুষি কুচোখড়, দুব্বো ঘাস, কিচ্ছু নেই। বিকাশ সাইকেল চালায়। কচুগাছের পাশ দিয়ে, নয়ানজুলির ধার দিয়ে তারপর নিরালা বসন্তবাহার সবুজপত্রে। এই পথে বিকাশের সাইকেল যাচ্ছে আপাতত। প্যাকেট দুধ। নিরালা কিংবা বসন্তবাহার কিংবা কোন সবুজ পত্রের সামনে সাইকেল থামায়। সাইকেল-কিরিং করে না, কলিংবেল বাজায়। ভিতর থেকে বলে না কেউ ঘোষের পো এসেছে। বিকাশ এসেছে—এরকমও বলে না। বলে—ঐ, মাদার ডেয়ারী এলো।

গল্পমেলা, ১৯৯৬

ফুল ছোঁয়ানো

এইসব লোকাল ট্রেনগুলোর গা থেকে একটা গন্ধ বের হয়। বহুদিন ধরেই এই গন্ধটা একই রকমের রয়ে গেল। শেয়ালদা স্টেশনে এলেই এই গন্ধটা টের পায় হীরক। কামরাগুলোর মধ্যে সেই একই গন্ধ। কিসের গন্ধ ঠিক জানে না হীরক। এটা বোধহয় দারিদ্র্যের গন্ধ। কই, মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনগুলোতে তো এরকম গন্ধ পায় না হীরক।

আজকাল আর লোকাল ট্রেনে চাপাই হয় না। আগে শ্বশুরবাড়ি যেতে হলে লোকাল ট্রেনে চাপতে হত। একটা মারুতি কেনা হয়েছে বছর তিনেক হল। এখন শ্বশুরবাড়িও মারুতিতেই।

গাড়িটা গ্যারাজে দেওয়া হয়েছে, বউও গ্যারাজে—মানে শ্বশুরবাড়িতে। বাচ্চা হবে। হীরক খুব কম দিনই সোজা বাড়ি ফিরতে পারে। নানা জায়গায় যেতে হয়। যেমন লেক ক্লাব, মোটর ভেহিকেলস্ ক্লাব, ইন্দ্রপুরী স্টুডিও, দুরদর্শন ভবন, এরকম আরও কত জায়গা আছে যেখানে প্রডিউসার বা ডাইরেক্টার বা ওদের দালাল—চামচে—মোসাহেবদের ধরতে হয়। হীরক সিরিয়ালের চিত্রনাট্য করে। চাকরি করে আর ক'পয়সা হয়? ড্রাইভার সহ একটা গাড়ি মেনটেন করতে পারা এই চিত্রনাট্যের দৌলতেই। আজকাল এ লাইনে বেশ নাম হয়েছে হীরকের। হাত খালি থাকে না। নানা ধরনের চিত্রনাট্য করতে হয়। বাবা লোকনাথ মাহাত্ম্য থেকে গোপাল ভাঁড়ের রঙ্গরস, আবার 'প্রথম প্রেমের গল্প' যেমন করেছে, 'বাংলা আমার বাংলা'ও করেছে। এখন একটা ক্রাইম সিরিয়ালের কাজ চলছে—কালো নখের আঁচড়। শুরুতেই জোড়া খুন। এবং খুনগুলো একটা অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে। ডাইরেক্টার সৃজনছন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিল—আমরা একটু নতুনত্ব চাইছি আর কি। টিভির পর্দায় অনেক রকম খুন অলরেডি দেখানো হয়ে গেছে। অনেক জায়গাতেও, যেমন সমুদ্রের পাড়ে, পাহাড়ে, হোটেলে, রেল স্টেশনে, কিন্তু অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে এখনও কোনো খুন দেখানো হয়নি। একটা অ্যাম্বুলেন্সে খুনের সিকোয়েন্স তৈরী করুন।

হীরক করেছিল। অ্যাম্বুলেন্সেই খুন হয়ে গিয়েছিল প্রদীপ নস্কর।

প্রদীপ নস্করই আবার প্রডিউসার। ওর একটু সিরিয়ালে নামবার শখ ছিল। একটু কথা আটকে যায় ওর, অভিনয় দক্ষতাও নেই। ডাইরেক্‌টার বলেছিল—তাহলে ফার্স্ট মার্ডারটা ওকেই করে দিন।

মার্ডার হয়ে যায় প্রদীপ। অ্যাম্বুলেন্সেই। ইতিমধ্যে রিমা বাগচি ডেট দিয়ে দিয়েছেন। রিমা বাগচি হলেন তুমুল হিরোইন। আজকালকার ছোঁড়াদের ভাষায়—ব্যাপক। প্রডিউসার প্রদীপ নস্করের মনে সাধ জাগল—ওই রিমা বাগচির সঙ্গে অভিনয় করবে। প্রডিউসার নিজেই ওই ইচ্ছের কথা জানাল লেক ক্লাবে, হুইস্কিতে সোডা ঢালতে ঢালতে।

হীরক বলেছিল সেটা কী করে হবে? আপনি তো মরে গেছেন, ফার্স্ট এপিসোডেই—

প্রদীপ নস্কর বলেছিল—আমি ওসব বুঝি না। মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। তারপর ছোট একটা সিপ নিয়ে, হীকের কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রদীপ বলেছিল—একটা রেপ সিন দিন দেখি। বেশ জাম্পেস করে। হীরক আবার বলল—মরা লোক কী করে রেপ করবে? আপনার ছবিতে তো অলরেডি মালা পড়ে গেছে।

প্রদীপ রেগে গিয়ে বলল—কী চিত্রনাট্য করেছেন অ্যাদ্দিন ধরে? ফ্লাশব্যাক বোঝেন না, ফ্লাশব্যাক?

ঐ ফ্ল্যাশব্যাকের কথাই চিন্তা করছিল হীরক। কী করে প্রদীপ নস্করকে আবার খেলানো যায়, এটাই মাথায় খেলাতে শেয়ালদার তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে হাঁটছিল। তিন নম্বর ফাঁকা ফাঁকা ছিল, কারণ ট্রেনটায় লেখা ছিল কার শেড। নিশ্চিন্ত মনে একজন ঘড়ি-চশমাধারী ভদ্রলোক দুই কামরার মধ্যবর্ত্তী ফাঁকটুকুতে দাঁড়িয়ে শরীরের বাড়তি জলটুকু ত্যাগ করছিল, এমন সময় অচিরাৎ ঘোষণা তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটি কার শেড নয়, বনগাঁ যাবে।

হীরক যেন পায়ে স্বর্গ পায়। লাফিয়ে ওঠে, যেন ওয়াক ওভার। জানলার ধারে সিট পেয়ে যায়। ব্যাগটা সিটের পাশে রাখে। ওই ব্যাগের ভিতরেই রয়েছে খুন-প্রেম-জিঘাংসা-রক্তলীলা। ওরই মধ্যে একটা ধর্ষণ খেলাতে হবে, ধর্ষণ খেলবে প্রডিউসার স্বয়ং। হা-রে-রে-রে করতে করতে মুহূর্তের মধ্যেই ট্রেনের কামরা ভর্তি হয়ে গেল। চাপাচাপি, গাদাগাদি, আর একটু চেপে বসুন দাদা, যা হয় আর কি। হীরক জানলার পাশে। যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি। ওর ছেলেটাও ওখানে। স্কুল কামাই যাচ্ছে। ওকে নিয়ে আসবে। মা ছাড়াই থাকতে হবে। কী আর করা যাবে। কাল পরশু-শনিবার আর রবিবার দুদিনের ছুটিতে স্ক্রিপটা একটু এগিয়ে নেওয়া যাবে। উঁহু, এগোলে তো চলবে না, এবার একটু পিছতে হবে। ফ্ল্যাশ ব্যাক। রিমা বাগচি, শুধু ভাবছি। ভাবছি প্রদীপ নস্করের সঙ্গে তোমায় কীভাবে ভেড়াব? ভেড়াতেই হবে, নইলে প্রদীপ নস্কর অন্য স্ক্রিপ্ট রাইটার ভিড়িয়ে নেবে। মধ্যমগ্রাম ছাড়তেই হীরক সিট ছেড়ে ওঠে। সামনের ভীড় ঠেলে এগুতেও হবে। হৃদয়পুরে নেমে একটা রিকশা নিতে হয়। রিকশার সিটে বসে হীরকের মনে হল সাইড ব্যাগটা নেই। ওখানেই কালো নখের আঁচড়। ওখানেই রয়েছে দুটো খুন। চক্রান্ত, প্রতিহিংসা জিঘাংসা.....। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে। শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। শব্দ কী নিষ্ঠুর।

বউকে কিছু বলবে না ঠিক করেছিল হীরক। অ্যাডভান্স স্টেজে টেনশন ভাল নয়। কিন্তু হীরকের বউ বারবারই বলছিল—বল না গো—কী হয়েছে তোমার, তুমি এত গম্ভীর হয়ে আছো কেন? হীরক বলেছে...না কিছু না, এমনি। হীরকের বউ বলল, বুঝেছি বুঝেছি আমাকে দেখতে তোমার একদম ভাল লাগছে না। আমি এখন দেখতে এরকম হয়ে গেছি বলে আমাকে আর সহ্য করতে পারো না, তাই না? ঠিক আছে, আমিও তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না। ঠোঁট ফুলে গেল। হীরকের বউ-এর নাম সোহাগী। নামের সঙ্গে খুব মিল। হীরক সোহাগ করতে গেলে সোহাগী সরে গিয়ে বলল না, আমাকে ছুঁয়ো না, আমি দেখতে বিশ্রী হয়ে গেছি।

অগত্যা হীরক প্রকৃত ঘটনাটা বলে। সোহাগী নিজের মাথায় হাত দেয়। বলে—ও মা, কী হবে এবার? কটা এপিসোড ছিল?

হীরক বলেছিল গোটা তিনেক ছিল। একটা অ্যাডভান্স কাজ করে রাখতে চাইছিলাম। আর ছিল পুরনো এপিসোডের জেরকস।

সোহাগী বলল—ত হলে এখন কী হবে গো....

হীরক বলল, অতো ঘাবড়াবার কিছু নেই। নেক্সট শ্যুটিং সাতদিন পর, এর মধ্যে আমি ম্যানেজ করে ফেলব। সাধারণত একদিন স্টুডিও ভাড়া করে কমপক্ষে চারটে এপিসোডের রেকর্ডিং হয়, স্টুডিওতে হীরকের থাকা জুরুরী। কারণ কোন অভিনেতা এলেন না, কিংবা কোনো ব্যস্ত অভিনেত্রীর দুটো এপিসোডের পর অন্য কোনো অ্যাপো আছে বলে হয়তো সময় দিলেন না, আর তখন স্পটে দাঁড়িয়ে ডায়লগ চেঞ্জ করতে হয়। স্ক্রিপ্ট লেখা হীরকের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। শুধু কয়েকটা মোক্ষম ডায়লগ বারবার রিপিট হয়ে যায়। এই যা।

যাই হোক, আবার নতুন করে লিখতে হবে। এক দিকে ব্যাপারটা মন্দ হয়নি, কারণ এখন নতুন করে লিখতে গেলে ধর্ষণের কেসটা জম্পেস করে ঢোকানো যাবে। রাত্রে হীরকের অন্তঃসত্তা স্ত্রী শুয়ে আছে পাশে, আর হীরক মনে মনে একটি ধর্ষণের প্রস্তুতিপর্ব তৈরী করে চলেছে।

এর আগের এপিসোডগুলিতে হীরক যা করেছিল তা হল—বিখ্যাত হীরে ব্যবসায়ী অনিল চন্দ হঠাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাড়িতে তখন দারোয়ান আর পরিচালকরা ছাড়া আর কেউ ছিলনা। ওরাই অ্যাম্বুলেন্স ডাকে। অনিলবাবুর বাড়িতে যে রান্না করত, তার এক ভাই এসেছিল দেশ থেকে। সেও ছিল ওই অ্যাম্বুলেন্সে। সেই হচ্ছে প্রদীপ নস্কর। গালে হাত দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের আলো-আঁধারিতে বসেছিল। এর চেয়ে বেশি কিছু চায়নি প্রদীপ নস্কর। অ্যাম্বুলেন্সটি একটি ট্রাফিক সিগনালে থেমেছে। আর আচমকা কে বা কারা অ্যাম্বুলেন্সের জানলা দিয়ে পিস্তল ঢুকিয়ে ব্যবসায়ী অনিল চন্দ এবং প্রদীপকে খুন করে। এরপরে মোটামুটিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে প্রদীপ খুনের পিছনে কোনো মোটিভ ছিল না। ও এমনি এমনিই খুন হয়ে যায়। মানে খুনের বাই প্রডাক্ট আর কি। ব্যস, প্রদীপ নস্করের কাজ শেষ। আর রিমা বাগচি হচ্ছে ঐ অনিল চন্দ মশাইয়ের ছোট ছেলের বান্ধবী। এখন কী বৃহৎ সমস্যায় পড়েছে হীরক। বাড়ির রাঁধুনে বামুনের দেশতুতো ভাইকে দিয়ে গৃহকর্তার ছোট ছেলের বান্ধবীকে ধর্ষণ করাতে হবে। একেই বলে আতান্তরে পড়া।

বিছানায় আতান্তরে পড়ে আছে হীরক, পাশেই ওর বউ যেন অনেক যোজন দূরে রয়েছে। যেন যোজন-যোজন দূর থেকে একটা ভেসে এল—কী গো, আমাকে আর ছুঁতেই ইচ্ছে করে না বুঝি?

প্রদীপ হচ্ছে রাঁধুনে বামুনের দেশতুতো ভাই। তাহলে মেদিনীপুরেরই লোক।

গুড।

অনিলবাবুর ছোট ছেলে অরিন্দম ওর বান্ধবীকে নিয়ে দীঘা বেড়াতে যেতেই পারে গাড়িতে। পথে গাড়িটা খারাপ হয়ে গেল। অরিন্দম গেল গাড়ি সারাবার মেকানিক খুঁজতে, আর রিমা গাড়ির বাইরে বেরিয়ে ঘুরছে।

ও-কে।

গ্রামের একটু বাইরে। বাঁশ ঝাড়। রিমা একটা বাঁশের কঞ্চি ধরে গুন গুন গান

গাইছে। ঠিক এই সময় প্রদীপ নস্করের আবির্ভাব। রিমার হাত ধরে টেনে নিয়ে বাঁশ বাগানে এবং....

ভেরী গুড।

গল্পটাতে বেশ নতুন ভাঁজও খেলানো যাবে। প্রদীপের এমনি এমনি খুন হয়ে যাওয়াটা যেন একটু পানসে পানসে ছিল। এখন প্রদীপের খুনের পিছনে রিমা কিংবা অরিন্দমের অদৃশ্য হাত রয়েছে কি না এরকম একটা প্রশ্নচিহ্নের সামনে ব্যাপারটাকে দাঁড় করানো যাচ্ছে।

সকাল বেলা দু-দিস্তা কাগজ কিনে সিরিয়াল লিখতে বসে হীরক। লিখতে বসে কীরকম সব জট পাকিয়ে যায়। ওর মনে হয় যে স্ক্রিপ্টগুলো হারিয়ে গেছে সেটা ফিরে পাওয়া খুব দরকার। কী লিখেছিল ঠিক মনে নেই, বারবার চা-সিগারেট খেয়েও প্লটটাকে বাগে আনতে পারছে না। হীরক হাওয়া খামচাচ্ছে। মাথার চুল টানছে। পুরনো ক্লু মনে পড়ছে না, পুরনো ডায়ালগ মনে পড়ছে না। রিমা একটা অন্তর্বাস কিনেছিল। ওটার সাইজ চৌত্রিশ ছিল না ছত্রিশ ছিল মনে পড়ছে না। আদিনাথ নামে একটি চরিত্র আছে। সে গড়িয়া থাকে না গরিফা থাকে গুলিয়ে যাচ্ছে। পুরনো স্ক্রিপ্টগুলো ছাড়া লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু পুরনো স্ক্রিপ্টগুলো জেরকস সহ ব্যাগটা হারিয়ে গেছে। একটা করে কপি নিশ্চয়ই ডাইরেক্টার সৃজনছন্দের কাছে আছে। ওকে ফোন করে ওর কাছেই যেতে হবে, এখনই—উপায় নেই—। সেই মহামায়াতলা। গড়িয়া ছাড়িয়ে। নিজের ক্যালাসনেসের জন্য নিজেকেই ক্যালাতে ইচ্ছা করছে, এমন সময় একটা ফোন এল। হীরকের ফোন। হীরক বাড়ির ফোনটা রিডাইরেক্ট করে এসেছিল। টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে বলে এরকম একটা ব্যবস্থা করানো যায়। ওর কসবার ফ্ল্যাটের ফোন এখন হৃদয়পুরে বেজেছে।

ফোনের ওপার থেকে একটা খরখরে গলা—

হীরকবাবু মহাশয় আছেন?

অচেনা গলা। হীরককে যারা সচরাচর ফোনটোন করে, তাদের মধ্যে এরকম অমার্জিত গলা নেই।

হীরক বলে—আমিই সেই মহাশয়।

—আপনি কে বলছেন?

—আমাকে আজ্ঞে, চিনতে পারবেন না। আমি বাঁশপোতা গ্রামে থাকি, গাইঘাটা থানা। আপনার পালা লেখার কাগজে আপনার ফোনের নম্বর পেলাম। আপনি ট্রেনে আমার পাশে আপনার ব্যাগটা ফেলে গেছেন ছ্যার, ওটা এখন আমার নিকটেই রয়েছে। সেটা জানাবার জন্য চাঁদপাড়া বাজারে এসে টেলিফোন লাগালাম। আমিও পালা লিখি কি না, এসবের মর্ম বুঝি। আপনি ভুলে বেভুলে ব্যাগটা ফেলি গেছিলেন ছ্যার, আমি তুলি রেখেচি।

হীরক যেন দৈবফোন শুনছে। ও বলে দাদা, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব, আপনি আমার ভীষণ উপকার করলেন। থ্যাংকিউ দাদা, থ্যাংকিউ...

দৈবফোনে ভেসে আসে—ওসব থাক। মিটার উঠছে। আপনি সাক্ষাৎ এসি নিয়ে যান।

—কী ভাবে যাব?

—বনগাঁ লোকাল ধরবেন। ট্রেনে চাঁদপাড়া গেলি রিকশা নিতি হবে। যশোর রোডে বাস। বাগদার দিকি। ছত্রিশ নম্বর। দু'মাইল দূরে বড়কাঁদোর। বড়কাঁদোরে নেমি কাঁচা রাস্তায় মাইলটাক হাঁটা পথ বাঁশপোতা।

উরি ব্বাবা। রিকশা টিকশা নেই?

—না আজ্ঞে।

জিভে একটা অসন্তুষ্টির শব্দ করল হীরক।

—তা কবে দেচ্ছেন পায়ের ধুলো?

—তা আপনি এসে দিয়ে যেতে পারেন না? আমি যাতায়াত ভাড়া দেব, আরও কিছু দেব না হয়...।

—আমার শরীর বড় খারাপ। আমার যাওয়া সম্ভব নয়। ইতিহাস বইতে আলেকজান্ডার আর পুরুর গল্পটা মনে পড়ে ছ্যার?—হে পুরু, তুমি বন্দী, তুমি কি রূপ ব্যাভার আশা করো?—না রাজার প্রতি রাজার ব্যাভার। হে হে। আমিও পালা লিখি, আপনিও পালা লেখেন। বহুত মিটার উঠল। এবার ছড়তে হয়। ফোন রাখার শব্দ হল।

তাড়াতাড়ি একটা কাগজে লিখে নিল হীরক—চাঁদপাড়া স্টেশন, যশোর রোড, ছত্রিশ নম্বর বাস, বড়কাঁদোর...বাঁশপোতা। লোকটার নাম? নামই তো জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

হীরক ভাবল তবু চলে যাবে। বাঁশপোতায় পৌঁছতে পারলে ঠিকই খুঁজে বার করে নেবে। লোকটা পালা লেখে বলেছিল।

পরদিন রবিবার। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে গেল হীরক। বাঁশপোতা যাবে। বউকে বলল, তোমার যদি এই সব না হত, তোমাকেও নিয়ে যেতাম বেশ, বেশ একটা আউটিং হত। হীরকের বউ বলল—আমাকে তো একবারও থ্যাঙ্কিউ বললে না, আমিই তো তোমায় বুদ্ধি দিয়েছিলাম কিপ্টেমি না করে সব সময় প্যাডের কাগজে লিখতে।

টাইম টেবিল দেখে সোহাগী বলল—সাতটা কুড়ির ট্রেনটা চাঁদপাড়া পৌঁছবে আটটা পঞ্চাশে। আশা করা যায় সাড়ে দশটার মধ্যেই ওই ভদ্রলোকের বাড়ি পৌঁছে যাওয়া যাবে। ফেরার ট্রেনও দেখে দিল সোহাগী। বারোটা পাঁচে চাঁদপাড়া। পৌনে দুটো নাগাদ ফিরে আসতে পারবে। মফঃস্বলে ছিল বলে সোহাগী টাইমটেবিল কালচারটা বেশ জানে। হীরকের কিন্তু টাইমেটিবল দেখতে একদম ভাল লাগে না। ঠিক মতো ট্রেনটাকেই বের করতে পারে না। সোহাগী বলল, ফেরার জন্য বারোটা পাঁচ ধরতেই হবে, নইলে পরের ট্রেন একটা কুড়িতে।

শেষ শীতের ঘন কুয়াশা মাখানো সকাল। পাজামা-পাঞ্জাবী আর একটা চাদর নিয়েছে হীরক। আর একটা সাইড ব্যাগ জোগাড় করে দিয়েছে সোহাগী। দরজায় দাঁড়িয়ে সোহাগী বলল—গুডলাক। ওটাই দুগ্‌গা দুগ্‌গা। আজকাল পানের দোকানেও মিনারেল ওয়াটার পাওয়া যায়। কনডোমও। এক বোতল মিনারেল ওয়াটার কিনে নিল হীরক। কয়েকটা টফি। যেখানে যাচ্ছে ওখানে কিছু বাচ্চা কাচ্চা থাকতেই পারে। আর গোটা দশেক সন্দেশও কিনল। গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে লোকটা ফোন করেছে, ওর জন্য কটা মিষ্টি নিয়ে যাওয়া উচিত।

বারাসত ছাড়ালেই মাঠ। ধান কাটা শেষ, ধান গাছের গোড়াগুলি মাঠ জুড়ে সোনালী হয়ে আছে। মাঠের মধ্যে মাঝে মধ্যে দু-একটা একাকী বট গাছের ছায়া, দু-একটা পুকুরের টলটল জল, জলের হাঁস। এরকম দু-একটা নামহীন টেলিফোন পৃথিবীটাকে ভাল লাগিয়ে দেয়। একটা মাঠের মাঝখান দিয়ে মেয়েদের মাথার সিঁথির মতো একটা রাস্তা। আমার মন ভুলায় রে। ওই রাস্তায় একটা গরুর গাড়ি। গরুর গাড়িতে হীরক রায় মহাশয়। উঁহু, হীরক নয়, প্রদীপ নস্কর, আর পথে একাকিনী রিমা বাগচি। প্রদীপ রিমাকে গরুর গাড়িতে তুলে নেয়। ধর্ষণ। ধর্ষণ।

উঃ। নিজের গালে চড়-মারতে ইচ্ছে করে হীরকের। এই সুন্দর সকালটায় কেন মাছির মতো ঘুরে ঘুরে ধর্ষণ আসে। জানলায় চোখ রাখে হীরক। তারে বসা নীল মাছরাঙা। গরুর পিঠে চলে যাচ্ছে রাখাল বালক, চোখে গগল্‌স। তাল গাছে দুলছে একটুকরো সুখ—বাবুইপাখির বাসা। জানালা দিয়ে মাঠের গন্ধ মাখা হাওয়া আসে। ধানের গোলা থেকে এক ম্যাক্সিপরা বালিকা দু'মুঠো ধান দানা ছড়িয়ে দিল উঠানে, পাখিরা উড়ে আসবার আগেই এই দৃশ্য ছাড়িয়ে যায় ট্রেনটা। যমুনা নদীর পোল পার হয়। পার হয় গোবরডাঙা। মাঠ জুড়ে হলুদ-সাদা-লাল রং। ফুলচাষ। ঠাকুরনগর স্টেশনে কলকাতার ট্রেন ধরবে বলে প্ল্যাটফর্মে ঝুড়ি ভর্তি ফুল নিয়ে বসে আছে ফুলচাষী। কত টুকরো টুকরো সুখ এখনও ছড়ানো। কাগজে ঠিকানা কিংবা ফোন নম্বর পেয়ে গেলে এখনো খবর দেয় অচেনা কেউ। আস্তাকুঁড়ে পড়ে থাকা বাচ্চাকে তুলে এনে কোল দেয় কেউ। হলুদ সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেতে সবুজ টিয়াপাখির ঝাঁক নেমে এসে ফুলবীজ খেতে থাকলে মুগ্ধ চাষী, আহা পাখি তাড়ায় না, শোভা দেখে। এরকম ফুল এ লাইনে কবে থেকে হচ্ছে? এরকম এক ফুল বনে প্রদীপ নস্কর আর রিমা বাগচি। টিয়ার ঝাঁক উড়ে গেল, ফুল গাছগুলোর গোড়া ভেঙে যাচ্ছে....

চাঁদপাড়া নামল হীরক। কী সুন্দর নাম। স্টেশনের পাশে বড় বড় সেগুন গাছ। রিকশায় চাঁদপাড়া বাজার, তারপর ৩৬ নম্বর বাস, বড়কাঁদোর। ছোট কাগজের টুকরোর লেখা অনুয়ায়ী বড়কাঁদোর থেকে ডান দিকে চলে গেছে একটা কাঁচা রাস্তা—একটা দীর্ঘ আন এডিটেড স্ক্রিপ্ট। রোল অন বলে হাঁটতে থাকে হীরক। বাঁদিকে একটু নীচু জমি, জমিতে শোলা গাছ। শোলা কাটছে বউ-ঝিরা। শোলার গায়ে একটা জলজ গন্ধ। শোলার নরম শরীরে লেগে আছে পাতলা শেওলার সবুজ আস্তরণ। আর গুড়ি গুড়ি শামুক বাচ্চা। রাস্তার দু'ধারে কচুগাছ আর ঘোড়া কলমির গাছ। একটা টিউবওয়েল। সেটা নীল পলিথিন দিয়ে ঢাকা, এরপর দড়ি বাঁধা। কে জানে কেন? দু-একটি মানুষ সাইকেলে যাওয়া আসা করছে, ওদের গায়ে সকালের রোদ। দুরের মাঠে এখনও পাতলা সরের মতো কুয়াশা মাঠে ছাড়া গরুদের গায়ে গায়ে লেগে আছে। বাঁশঝাড়। শুকনো বাঁশপাতায় হলুদ বরণ হয়ে আছে সোনালী বাঁশের গা পিছলানো আলো। একজোড়া কাঠবিড়ালি ওই বাঁশবনে খেলছে। শুকনো পাতার সরসর শব্দ। এরকমই একটা বাঁশ বনে প্রদীপ নস্কর পেয়ে গেল রিমা বাগচিকে, তারপর শুকনো পাতার খরখর শব্দ, কাঠবিড়ালিরা পালিয়ে যায়, কাকেরা কা-কা করে, আর...

বাঁশপোতা কত দুর আর? একজন সাইকেল আরোহীকে জিজ্ঞাসা করে হীরক।

বাঁশপোতা কার বাড়িতে যাবেন? লোকটা সাইকেল থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

হীরক বলে—যার বাড়িতে যাব তার নাম জানিনা, তবে সে পালা লেখে।

লোকটা বলে তা বল্লে কি হয়? বাঁশপোতা হল পালা লিখিয়েদের গাঁ। ওখানে পাঁচ সাত ঘর আছে যারা পালা লেখে। আমি ওই গাঁয়েই থাকি। কী পালা লেখে?। সত্যনারায়ণের পালা, ফাংশান পালা নাকি পার্টি পালা?

হীরক বলে তাও জানি না।

—তবে দেখতে কেমন?

—আমি দেখিনি কখনও।

—তবে তো ভারি আশ্চয্যির কথা, কার বাড়ি যাচ্ছেন তাই জানেন না, অথচ যাচ্ছেন....

হীরক তখন ঘটনাটার বিবরণ দেয়।

লোকটা বলে আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আসগর আলি। আমি হলাম ঐ গাঁয়ের মেম্বার। একটু গাইঘাটা যাচ্ছি। আপনি যান, ঐ তো গাঁ দেকা যাচ্ছে। আপনি মোসলমান পাড়ায় গিয়ে খোঁজ করুন।

সরষের খেত দেখতে পেল হীরক। গুটি বেরিয়েছে। পাশেই একটা মাঠে এক দঙ্গল বাচ্চা ছেলে মেয়েকে দেখল হীরক। নিচু হয়ে কী যেন করছে। কিছু কি কুড়োচ্ছে ওরা। কোন বীজ? কোন ফল? ঠিক বুঝতে পারল না হীরক। ব্যাগ থেকে মিনারেল ওয়াটারের বোতলটা বার করে এক ঢোঁক জল খেল। ভাগ্যিস জল এনেছিল।

ঠিকই বলেছিল লোকটা। আসগর আলিই সেই লোক। বললেন—তখন ফোনে বললিই তো পাত্তেন। আজ আসবেন, আমি ইস্টেশনে থাকতাম। অসুবিধা কিছু হয়নি তো? হাতজোড় করলেন আসগর আলি। ওর চুল দাড়ি সাদা। রোগা চেহারা। হাত জোড়া করেই আছে। ওর নখের রং কালো, হাতের চামড়া গিরগিটির গায়ের মত খরখরে।

আসেন ছ্যার, বসেন।

একটা মোড়া নিয়ে এসে পেতে, দেন ঘরের বারান্দায়। লোকটা একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। পায়ের আঙুলগুলো এত মোটা কেন? কালচে। ফেটে গেছে, শুকনো রক্ত। কুষ্ঠ নয়তো?

লোকটা বলল—আর্টিস্‌দের এমন বেভুল হতিই পারে। ভোগান্তি। আর আর্টিসদের একটু আধটু এধার-ওধার গমানাগমন হওয়া খারাপ নয়। ইডারে বলা যায় রসের ভোগান্তি। ভ্রূভঙ্গী করার চেষ্টা করল আসগর আলি। ওর ভ্রূতে চুল প্রায় নেই, পড়ে গেছে। তবে তো কুষ্ঠই।

হীরক বলে বসব না, পরের ট্রেনটাই ধরতে হবে। আমার কাগজপত্র ঠিক আছে তো?

আছে। খুব যত্নে আছে। একটু জিরোয়ি নেন, এতটা পথ হেঁটি আসিচেন, কলকাতার লোক, হাঁটার অব্যেস নেই। একটু জল পানি খান।

—না, না, জলটল খাব না। ওসব দরকার নেই। যেন আঁতকে উঠল হীরক।

—আর্ষেনিকের ভয়? এক গেলাস খালি কিছু হবেনে। আমরা তো রোজ খাই। কী করব। আসগর বলল।

—এখানকার জলে আর্সেনিক আছে নাকি?

—জানেন না, এই তো...

দুটো হাত সামনে এগিয়ে দেয় আসগর আলি। নখের রং কালো, চামড়া মোটা, ফাটাফাটা, খরখরে।

—হাসপাতালে দেখাতি যাই। সেদিন একটু দেরি হল। ডাক্তারবাবুরা আমারে দেখোয়ে দেখোয়ে নেকচার দেলেন কিনা। অনেক লোক জন ছিল। খবরের কাগজে আমার ছবি উঠিচে। দেখাবনে। ওরা একটা মিষ্টির প্যাকেট দিল। ট্রেনে আমি আপনার পাশেই ছিলাম। আপনি খুব কাতর মনে কি যেন চিন্তা করতিছিলেন, মাথার চুলে পাক দিতিছিলেন। আপনি নেমি যাবার পর দেখলাম আপনার ব্যাগ। জানালা দে ডাকলাম কত, আপনি ছিলেন আপনার তালে, শোনতি পারলেন না। আরও সব প্যাসিঞ্জার ছিল, বলে কী আছে ব্যাগে দেখি, কেউ বলে বারাসতে মাস্টারের কাছে জমা করি দ্যাও। আমি ব্যাগ খুলি দেখি কাগজপত্তর ছাড়া অন্য কিছু নেই। আর কাগজে ডায়লগ লিখা। “জেনো লোভ হচ্ছে ঘুণপোকা। ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে যায়, সমস্ত শুভবোধকে পাউডার করে দেয় আর অস্তিত্বকে করে দেয় ঝাঁঝরা। ওই ঝাঁঝরা হওয়া ব্যক্তিত্বকে আর কোনো সিমেন্টেই সিল করা যায় না...... বলেন, মনে আছে কিনা। আমি ওই কাগজের মর্ম বুঝে বললাম এটা আমার কাছেই থাক, আমি পৌছ করে দেবনে। হ্যাঁগা, শুনছ, একটু জল বাতাসা নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণে কাগজটা দেখাই। আমার ছবি উঠিছে। আমি তো জানতাম না, খবর কাগজ রাখি না। ওই গনু হালদার আমায় দিয়ি গেল। মেম্বার।

দু'হাত বাড়ানো আসগর আলি, ছবির উপরে হেডিং ‘আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান’। খবরটা পড়তে থাকে হীরক। আসগর বলে জোরে পড়ুন ছ্যার, জোরে পড়ুন, আবার শুনি....পশ্চিমবাংলার ৮টি জেলায় ৩২ লক্ষ মানুষ বিপদমাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক যুক্ত জল খেতে বাধ্য হচ্ছেন। এর মধ্যে দশ হাজার মানুষ এখন আর্সিনিকোসিস রোগে আক্রান্ত। এর মধ্যে তিন হাজার মানুষ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন। গতকাল এক সরকারি হাসপাতালে আসের্নিকোসিসের চিকিৎসার বিষয়ে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। কয়েকজন চিকিৎসক ও বিজ্ঞান কর্মী ও পরিবেশবাদী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। গাইঘাটার বাঁশপোতা গ্রামের আর্সেনিকোসিসের রোগী আসগর আলি নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন স্বরচিত পদ্যছন্দে.....

আসগর বলে—পুরোটা তো বলতে দিল না। থামোয়ি দিল।

শোনবেন, কী বলিছিলাম। এখন তো কলম ধরতি পারি না ঠিক মত, কিছুদিন আগে লিকিছিলাম। খাতাটা নিয়ে আসি।

ইতিমধ্যে আসগর আলির বউ একটা প্লেটে করে খেজুরিগুড়ের চাক আর কাঁসার গেলাসে জল নিয়ে এসেছে। মোড়াটার সামনে একটা জলচৌকি টেনে জলচৌকির উপর রাখল। ওর নখের দিকে তাকাল হীরক। মনে হল যেন কালচে ছোপ।

আসগর আলি খাতাটা নিয়ে এসেছে। একটা আসন পেতে মেঝেতে বসল। সিমেন্টের মেঝে। পাঁচ ইঞ্চি গাঁথনির দেওয়ালের উপর টিন। প্লাস্টার হয়নি।

শোনেন তবে। আর্টিস ছাড়া আর্টিসের মর্ম কেউ বোঝে?
মরণ রয়েছে লেকা পানির ভিতরে।

মরণ বেধেছে বাসা শরীর গভীরে।
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে শুনি মরণের গান।
আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
মায়ের স্তনেতে রাখা দুধের মতন
রাখে পানি বসুন্ধরা করিয়া যতন
মানুষের লোভ নেয় সে পানি নিঙাড়ি
মাতা বসুন্ধরা কাঁদে, পড়ে অশ্রুবারি।
লোভই পরম রিপু বুঝিয়াছি সার
আমাকে ঝাঁঝরা করে, করে যে অসাড়
ঘুনের মতই ক্ষয় করে অহর্নিশ
তারপর তাহাতে ঢোকে যত পাপ বিষ।

একেবারে আপনার লেখা পালার ডায়লগের মতই ছ্যার। আচ্ছা, আপনি যা মনে ভাবেন তাই লিখেন ছ্যার?

হীরক মাথা চুলকোয়। ওর মাথা চুলকোবার নখের রং সাদা। ঝকঝকে সাদা।

তারপর বলি শোনেন—

পৃথিবীর বক্ষ হতে অমৃত তুলিল
আর পৃথিবীর ভিতরেতে বিষ জন্মে গেল
সে বিষ কে সরাবে, কে ঘুচাবে ভাই—
কালীয় সর্প আছে শ্রীকৃষ্ণ তো নাই।

জানেন তো ছ্যার, ত্রেতা যুগে কালিন্দীর দহে লুকিয়ে ছিল কালীয় সাপ। তার হাজারটা মুখ, আর মুখির ভিতরে বিষ জমা হলিই ঢেলি দিত কালিন্দীর পানিতে। আর ওই কালিন্দীর সঙ্গে ছিল যমুনার যোগাযোগ। সে কারণে যমুনার পানিও হয়ি গেছিল বিষাক্ত। বৃন্দাবনের লোক পানি খেতে পারে না। রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণ ঝাঁপিয়ে পড়লেন কালিন্দী দহে আর সাঁতরাতে লাগলেন। কালীয় সাপ থাকত পানির একেবারে তলায়। লুইকে। ওর মনে পাপ কিনা, ও তো জানে গুনাহ করিছে। খোদাতালার কাছে মুখ দেকাতি লজ্জা। আর আল্লার রসুল শ্রীকৃষ্ণ দহের পানি তোলপাড় কত্তিচেন। কালীয় সাপের আস্তানা কেঁপি উঠল। মুখ তুলি দেখে ল্যাংটা একটা ছোট্ট ছেলে। সাপ ওরে ধরতি গেল। সাপও ছোটে কৃষ্ণও ছোটে। কৃষ্ণও ঘোরে, সাপও ঘোরে। কৃষ্ণকে কিছুতেই আর কায়দা করিতে পারে না। শেষ কালে পরেশান হয়ি ফণা তুলি হাঁপাতি থাকে। কৃষ্ণ তখন এক লম্ফ মেরে একেবারে সাপের মাথায় উঠি দাপাতে লাগল। শুরু করি দিল নৃত্য। দুনিয়া কেঁপি উঠল। পায়ের ভারে থেঁৎলে যাচ্ছে কালীয় সাপের একেকটা মাথা। কালীয় দমন হল। বোঝলেন না? এ নিয়ে একটা পালা লিখার শখ ছিল। কিন্তু কলমটা যে ধরতি পারি না। তবে সার কথা হল—আমাদের তো কৃষ্ণ নাই, কে পিতিকার করবে? মাটির তলার পানি বিষ হয়ি গেছে, কিন্তু ডুমরা বিলের জল পাম্প করি ট্যাংকিতে উঠোয়ি পাইপে পাঠালি ভাল পানি পাই। কলকাতার ঘরে ঘরে কলের জল।

টিউকল খায় পাপীতাপী পুকুর খায় চোর।
কলের পানি পায় যার বহু পুণ্যের জোর।

আপনার কলকেতার লোক পূণ্যবলে কলের পানি পাচ্ছেন। আমরা পাব না। তবে ভোট দিয়েছি। গতবার রবারস্ট্যাম্প ছিল, এবার বোতাম টিপে ভোট।

আমি বললাম ভোট দেবনি। নেতারা বললেন কেন দেবে না? তোমার হাতের অবস্থা তো এখনও এমন হয়নি যে বোতামটাও টিপতে পারবে না।

কী হল, আপনার জল-মিষ্টিটুকু পড়ে আছে যে, খান।

হীরক কী করবে? ভয় পায়। ওর ব্যাগে মিনারেল ওয়াটারের বোতল রয়েছে। ওটা কি বের করা ঠিক হবে? এখন ব্যাগ থেকে মিনারেল ওয়াটার বার করে খাওয়া খুব অশ্লীল হবে, অশ্লীল। হীরক একটু পাটালি গুড় ভেঙে নেয়। এক চুমুক জলও খায়, একটা ছোট্ট চুমুক, যত ছোট চুমুক হতে পারে। আর্সেনিক গেল, আর্সেনিক।

আসগর আলি বলল—আমরা এই জলই খাই। দেওয়ালে একটা ছবি। হীরক জানে, ওটা দুলদুল ঘোড়ার। হীরক জিজ্ঞাস করে আপনি পালা লেখা ছাড়া আর কি করেন আসগর সাহেব....।

আমি কাদিরহাটি গ্রামে ডিপ টিউকল চালাই। মাটির তলার পানি বের করি মা বসুন্ধরার তো বিশ্রাম নাই, কতবার ফসল দিতি হয়। আউশ, আমন, বোরো....। হাইবিরিড ধান পানি টানে বেশি, আর ওই পানিতে আর্সেনিক। ধানের ভিতরেও কি সেই আর্সেনিক মেশে না?

থাকগে থাক, কথায় কথায় ভুলি গেছিলাম, নেন, আর একটু শোনেন আমার ওই আর্সেনিক কাব্য।—

দুনিয়ার বুকে আসে যে পাক শিশুরা
দুনিয়াতে কোনও দোষ করেনি তাহারা
আমারাই তাহাদের দিতেছি যে বিষ
আমরাই শয়তান দৈত্য আমরা ইবলিশ।

এমন সময় একটি বাচ্চা মেয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে আসে। আসগর আলি ওর কাব্যপাঠ থামায়। আমার ফতিমা এসিচে রে, আয় বেটি আয় বলতে বলতে বারান্দা থেকে নামে। দু'হাত বাড়ায়, কোলে নেয়, কাব্যখাতা পড়ে থাকে মেঝের উপর।

আসগর বলে, ওগো, পাটালি দাও দিনি এট্টু ফতিমা আসিল।

হীরকের ব্যাগে ছিল মিষ্টির বাক্সো, আর পকেটে টফি। এতক্ষণ বের করারই সুযোগ পায়নি। বাচ্চাটাকে দেখে ওর মিষ্টির বাক্সোর কথা মনে পড়ল। ও ব্যাগের চেনটা খুলে বাক্সোটা বের করল। বলল, বাচ্চাটাকে দিন। এটা আপনাদের জন্য এনেছিলাম।

আসগর বলল, এসব কেন আবার আনতে গেলেন। কিন্তু ওর ভ্রূহীন চোখের তারার নাচন দেখতে পেল হীরক। আসগর বাক্সোটা খুলে বাচ্চাটাকে সন্দেশ খাওয়াচ্ছিল। বাচ্চাটার পা দুটো লিকলিকে। ডান হাতও খুব অপুষ্ট। বাঁ হাতটা কিছুটা ভাল। মুখ দেখে মনে হয় সাত আট বছর বয়েস, কিন্তু শরীর দেখে বছর তিনেকের বেশি মনে হয় না। যদ্দুর মনে হয় রিকেট। হীরক তো ডাক্তার নয়, ব্যাঙ্কে কাজ করে মাত্র। চিত্রনাট্য

লেখে শখে। এখন শখে নয়, লোভে। মেয়েটার করুণ ঠ্যাং ঝুলছে।

হীরক ঘড়ি দেখে। এবার উঠতে হবে। ও পকেট থেকে টফিগুলো বের করে। ওই বাচ্চাটার হাতে একটা গুঁজে দেয়। বাচ্চাটা অবাক চোখে চায়। হাসে না, মুঠি খোলে না।

হীরকের হাতে অনেকগুলো টফি। কাকে দেবে? ওই নুলো মেয়েটা ছাড়া এতক্ষণ কোনও কিশোর-বালক টালকের দেখা পায়নি হীরক।

হীরক জিজ্ঞাসা করে—এখানে বাচ্চা-টাচ্চা নেই? অনেকগুলো টফি ছিল....

আসগর বলে—লজেনচুস্?-ও! তো বাচ্চা কাচ্চা এখন পাবেন কোথায়? ওরা সব তো ফুল ছোঁয়াতে গেছে। আমার অবিশ্যি নিজির কোনো বাচ্চা কাচ্চা নাই। সবাই আমার বাচ্চা।

এই যে ফতিমারে দেখতিছেন, পাশের বাড়ির মোক্তারের নাতনি। মোক্তার ওর মেয়ের শাদি দিল বাগদায়। দু'বছরের মাথায় তালাক খেয়ি আবার বাপের সংসারে। আমাদের চারিপাশে নানা রকমের আর্সেনিক বোঝলেন না। তা ওই মেয়েটা আমার খুব নেওটা। আসগর আদর করে মেয়েটাকে।

হীরক বুঝতে পারল না ফুল ছোঁয়ানো মানে কী। এটা তো মুসলমান পাড়া। এখনকার ছেলেমেয়েরা ফুল দিতে যাবে কেন কোন মন্দির টন্দিরে?

তাহলে হয়তো কোন পীরের দরগায় যায়। আধ ঘণ্টার উপর বসে আছে এখানে। ফুলটুল ছোঁয়াতে কতক্ষণই বা লাগে? আর অপেক্ষা করতে পারছে না হীরক। পকেটের টফিগুলোকে বের করে জলচৌকির উপর রাখল। বলল—বাচ্চারা ফুল ছুঁইয়ে কখন ফিরবে?

—বেলা বারোটার আগে না আসগর বলল।

হীরক বলল—তাহলে টফিগুলো রেখে দিন। বাচ্চারা এলে দিয়ে দেবেন। আমি উঠি। আমার ব্যাগটা দিন।

আসগর আলি ব্যাগটা নিয়ে আসে। বলে দেখে নিন সব ঠিক আছে কি না।

হীরক ব্যাগের চেনটা টেনে ফাইলটা বের করল।

'কালো নখের আঁচড়'। ভিতরে আরও একটা ধর্ষণ ঢোকাতে হবে।

হীরক সন্দেশের বাক্সো বার করার পর চেনটা আটকাতে ভুলে গিয়েছিল। আগের চিত্রনাট্য সমেত ব্যাগটা ওর এখনকার ব্যাগে রাখতে যাচ্ছিল। তখন আসগর বলল—একটা কথা কব ছ্যার?

আসগরের গলার স্বরটা অনেক পাল্টে গেছে। করুণ, কোমল।

—বলুন।

—আপনার ব্যাগে কি ওটা বোতলের পানি? দশ টাকা দামের? নুইকে রেখেছিলেন?

আঁচড়। কালো নখের আঁচড় অকস্মাৎ। হীরক বলে না, না, লুকিয়ে রাখব কেন?

—বলুন না...

—আমার এই ফতিমারে ক'ঢোক বোতলের পানি খাওয়ান না। পাক পানি। আর্সেনিক নাই। পিওর। পিওর।

হীরক বোতলের গলা ধরে ব্যাগের ভিতর থেকে টেনে হিঁচড়ে ওঠাল, ওই পরিশুদ্ধ

টলটল জল। জলটা কাঁপছে। হাত কাঁপছিল হীরকের।

হীরক বলে—ক ঢোক কেন, এটা রেখে দিন। আসলে বাড়ি থেকেই জল নিয়ে বেরনো অভ্যেস। আজ ভুলে গেছিলাম কি না, তাই কিনে নিয়েছি।

—চাঁদপাড়া বাজারে পাওয়া যায় এই জল। দশ টাকা দাম। আসগর বলে। ফতেমা কে হাঁ করায়। বলে নে ফতিমা। পানি খা, পানি খা, আর্সেনিক নাই। বাচ্চাটার মুখ ভেসে যায় জলে। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই আসগর ঘরের ভিতরে যায়। হীরক আসগরের কণ্ঠ শোনে—খাও, খাও, এক ঢোক মুকি দ্যাও। আসগরের বউ-এর কণ্ঠ—তুমি খাও।

এবার ফিরবে হীরক। আসগর আসে। বলে চলেন একটু এগোয়ে দিয়ে আসি। লুঙির উপর একটা হাওয়াই শার্ট পরে নেয় আসগর। টফিগুলো বুক পকেটে ভরে নেয়। বলে চলেন ছ্যার।

ওরা হাঁটছে। আসগর বলে আবার আসবেন বলতি পারছি কই। বাইরের লোক আসলি এক ঢোঁক পানি পর্যন্ত মুকি দিতি ভয় পায়। আমাদের এ দিকির গাঁয়ে ছেলেদের বে-সাদী হয় না। কেউ মেয়ে দিতি চায় না।

টিউকলগুলি সব সিল করিদেছে গব্বরমেন্ট। কচ্চে—এ পানি খাবা না। কিন্তু পানির আরেক নাম জীবন। খাব না তো কী করব? বলে পুকুরের জল ফুটিয়ে খাও। বললেই হয়, ভাত রাঁধার জ্বালানী নেই তো জল ফুটোবে। বলে এমনিও মরব, অমনিও মরব। আসগরের হাঁটতে একটু কষ্ট হচ্ছে। হীরক বলে, আপনার আর আসতে হবে না। এবার চলে যান, আমি চলে যাব।

আসগর বলল—আর একটু হাঁটি। কষ্ট হচ্ছে না খুব। এদিকের দশ-বারোটা গাঁয়ের কমসে কম একশো জনের অবস্থা আমার মত। আর বেশির ভাগ মানুষের নখে কালচে আভা। হাটে গেলি বুঝতি পারবেন। আর একটু হাঁটব। বাচ্চারা ফুল ছোঁয়াচ্ছে, সেখানে যাব। লজেন বিলোব। ওদের ফুর্তি দেখতি খুব ভাল লাগে।

আর একটু সামনে গিয়ে আসগর থামল। রাস্তা থেকে দেখা যাচ্ছে একটু দুরে কতকগুলি বাচ্চা সবুজ জমির উপর উপর নিচু হয়ে কী যেন করছে। আসবার সময়েও দেখেছিল হীরক।

আসগর বলল, ওই যে ওরা ফুল ছোঁয়াচ্ছে।

—ফুল ছোঁয়াচ্ছে মানে? হীরক জিজ্ঞাসা করে। আসগর বলে—ফুল ছোঁয়ানো জানেন না? ফুলি ফুলি আঙুল ছোঁয়াতি হয়। এখানে ড্যাঙা জমিতে এখন পটল চাষ চলতিছে। পটলের ফুল এল। এখন তো আর অত প্রজাপতি টজাপতি ফড়িং টড়িং নেই, পোকা মারার বিষে সব শেষ। এ ফুলের রেণু ও ফুলি না লাগলে বীজ হবে কী করে? বাচ্চারা তাই কচি কচি আঙুলে ফুল ছোঁয়ায়। এ ফুল থেকে ও ফুলে। পয়সা পায়। আমাদের মোটা আঙুলে ও কম্ম হবে না। আমার কোলে যে বাচ্চাটা দেকিছিলেন ছ্যার, ফতিমা, ওরে পুষ্যি নিতি চেয়েছিলাম। ফতেমার মারে বললাম— বেটি তোর মেয়েটা দে। লুলো মেয়েরে পুষি। আমি তো আর ক'দিন বাদেই এই সেঁকোবিষে মরব। তোর চাচী থাকবে কী নিয়ে। লুলো মেয়েডারে খাওয়াবে, হাগাবে, শোয়াবে আর টাইম পাস হয়ি যাবে। তা দিল না। ক্যান জানেন? ওর তো রিকেট, ওই বাচ্চার হাত কখনও

পুরুষ্টু হবে না, আঙুল কোনওদিন মোটা হবে না। সরু সরু আঙুলে ফুল ছোঁয়াতি পারবে। এখনি ফুল ছোঁয়াবার কাজ করে ফতিমা। ওরে জমির মধ্যে ওর মা ছেড়ি দ্যায়, আর ফতিমা হামাগুড়ি দে ফুলি ফুলি ঘুরি বেড়ায়। ফুল ছোঁয়ায়। পটল, করলা, ঝিঙে....

আসগর হাঁক দেয়—ওরে জাকির, বাবলু, গুপি, কানাই, শবনম, পাঁচি, মঞ্জু, ইদিকি আয় শিগগির আয়, লজেন খাবি আয়, এই দ্যাখ, লজেন....।

প্রজাপতিরা ছুটে আসে।

সোহাগী বলল, কষ্ট হয়নি তো কোনও?

জল দিল। কাচের গ্লাসে টলটলে জল। মেনিকিয়োর করা সাদা নখে নেল পালিশ।

হীরক মাথা নাড়ে।

সোহাগী বলে মন খারাপ কেন গো?

হীরক বলে না, কেন হবে মন খারাপ?

হীরক আবার জীবনে ঢুকে যায়। আর্সেনিকহীন জীবনে। চিত্রনাট্য খুলে বসে। একটা বাড়তি ধর্ষণ গুঁজে দেয়, ঠিক গুঁজে দেয়।

রাত্রে ঘুম ভেঙে যায় হীরকের।

মশারির ভিতরে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে সোহাগী। কাচের জানালা গলে কিছুটা চাঁদ বিছানায় বিছানা পেতেছে। সোহাগীর স্ফীত গর্ভ, ধীরলয়ে উঠছে, নামছে। হীরক দ্যাখে। আগামী প্রজন্ম আসছে। চোখ ভিজেছে, ও তো তবে ফুল হয়ে যাচ্ছে।

আয় প্রজাপতি, ফুল ছোঁয়াবি আয়।

শারদীয় বর্তমান, ২০০১

ইচ্ছেকুসুম

এবড়োখেবড়ো অক্ষরে লেখা একটা পোস্টকার্ড এল।

"প্রিয় বেগুন, শয্যাশায়ী হয়ে আছি, তোকে বড় দরকার। রাধাশ্রী সিনেমা হলের পিছনে নিবেদিতা পল্লীতে বোনের বাড়িতে আছি। বাড়ি চিনতে অসুবিধা নাই। একমাত্র ওই বাড়িটাই এখনও বাঁশের বেড়া, টিনের চালা। ওটা বোনের বাড়ি। বোনের নাম তাপু... চিঠিটার মাঝখানে শুকনো রক্তের দাগ। মশার?"

চিঠিটা লিখেছেন সিধুদা। সিধুদার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল মাস তিনেক আগে। আমার অফিসে এসে বলেছিলেন, তোদের বিখ্যাত ক্যান্টিনের খান দুই বিখ্যাত সিঙাড়া খাওয়াতে পারিস? ঠাণ্ডা হলে ভাল হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঠাণ্ডা কেন?

সিধুদা বলেছিলেন, তাহলে অ্যাকশনটা বেটার হবে। এমনিতেই তোদের সিঙাড়া ডিজেলে ভাজে। ঠাণ্ডা পিচে অম্বলটা সারাদিন ব্যাট করতে পারবে। বুঝলি না? খিদে টিদে পাবে না, সারাদিন খেতে হবে না আর....। আজ আর সেই পার্কসার্কাসে যেতে ইচ্ছে করছে না রে....। তারপরই বলেছিলেন চোখের ছানিটা পেকেছে, দেখতে পাচ্ছেন না ভাল। কোনও বিনে পয়সার ছানি অপারেশন ক্যাম্প থেকে অপারেশনটা করিয়ে নেবেন। বলেছিলেন, পার্কসার্কাসের একটা ট্রামে উঠিয়ে দিতে।

পার্কসার্কাস যাওয়া মানে হচ্ছে আনারকলি হোটেল। ঐ হোটেলে নাকি বিনেপয়সায় খাওয়ার হক আছে সিধুদার। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময় একটি মুসলমান পরিবারকে বাঁচিয়েছিলেন সিধুদা। ঐ পরিবারের কর্তা আনিসুজ্জামান সাহেব, তার দুই বিবি, আর পাঁচ বালবাচ্চা তিনদিন ছিলেন সিধুদার ঘরে। ঐ আনিসুজ্জামানই ছিলেন আনারকলি হোটেলের মালিক। উনি নাকি উইল করে গিয়েছিলেন, সিদ্ধেশ্বর দাস যতদ্দিন বাঁচবে, আনারকলি হোটেলে ফ্রিতে খাবে। এইসব সিধুদার কাছেই শোনা। আমি বলতাম, চলুন সিধুদা, আপনার আনারকলি হোটেলে খেয়ে আসি। সিধুদা বলতেন অ্যাজ পার উইল, ওনলি আই ক্যান এনজয় দ্যাট প্রিভিলেজ। তবে তোকে নিয়া গেলে অরা কিছু কইবে না, খুশিই হবে, কিন্তু হেইডা ভদ্রতা না।

সিধুদার দেশ ছিল বরিশাল। বরিশালের অনেক গল্প শুনেছি সিধুদার মুখে। বালাম চাল আর মর্তমান কলার গল্প, খালের ধারের বেতবন, নারকেলপাতার আড়ালে ঝিকিমিকি রোদে টিয়াপাখিদের খেলা, কীর্তনখোলা নদী, নদী-পাড়ের ঝাউবন, নদীর জল আর হাওয়ালাগা ঝাউবনের শব্দ, নদীতে সার সার স্টিমার, স্টিমার যায় খুলনা। খালাসিরা স্টিমার ছাড়ার আগে চিল্লায় পেয়ারার সাফাজান্নিরে, পেয়ারার সাফাজান্নি....। —এটার মানে কী বলতো? সিধুদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

আমি কি করে জানব? সিধুদাই বলে দিয়েছিলেন প্রে ফর আওয়ার সেফ জার্নি। সাহেব সারেংদের কাছ থেকে শেখা। বরিশাল শহরের ওপাড়ে কাউয়ার চর ছিল

সিধুদাদের গ্রাম। একবার ছোটবেলায় নৌকো করে মায়ের সঙ্গে গৈলা গ্রামের মামাবাড়ি যাচ্ছিলেন সিধুদা। শুরু হল ঝড়। আকাশে 'খাড়া ঝিলকি'। খুব 'ঠাডা' পড়ছে, মা বলছে দুর্গানাম কর। সিধুদা দুর্গানাম জপতে লাগলেন, কিন্তু ঝড় বেড়েই চলল। নৌকা গাঙের জলে 'আছাড়িপিছাড়ি' খাচ্ছে। মাঝি সিধুদার মাকে বলল, 'আল্লার নাম ন্যান বুনডি, মুশকিল আসান হইয়া যাইবে'। সিধুদা তখন দুর্গা ছেড়ে আল্লার নাম নিতে লাগল, আধ ঘন্টার পর মুশকিল আসান হল।— সেই ছোটবেলা থেকেই আমার মধ্যে আল্লা-দুর্গা একাকার, বুঝলি না?—সিধুদা বলেছিলেন।

সিধুদা অশ্বিনীকুমার দত্তর কথাও বলতেন। দেবকান্তি পুরুষ। তাঁর বাড়ির সামনে ছিল সুন্দর একটা রেলিং, তাঁর বাড়ির উঠোনের মাঝখানে ছিল একটা তমাল গাছ, গাছটির গোড়ায় একটা গোল বাঁধানো বেদী ছিল। একটা ধুতি পরে, গায়ে একটা উড়নি দিয়ে তমাল তলার চত্বরে হেঁটে বেড়াতেন তিনি, গৌরবর্ণ রূপ, সাদা ধবধবে গোঁপ, মাথায় ঝকঝকে টাক। উনিই নাকি সিধুদার মুখে বন্দেমাতরম মন্ত্র দিয়েছিলেন। যখন সিধুদার মুখে সবে কথা ফুটতে শুরু করেছে, তখন অশ্বিনী দত্ত সিধুদাকে কোলে নিয়ে বলেছিলেন, বাপধন, কওতো দেহি বন্দেমাতরম।

পরে বুঝতে পারি সিধুদা গুল মেরেছিলেন। অশ্বিনীকুমার সম্পর্কে একটা লেখা পড়তে গিয়ে পেয়েছিলাম উনি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। এখন সিধুদার যা বয়েস, হিসেব করে দেখেছি তখন ওঁর জন্মাবারই কথা নয়। একদিন জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম আপনার জন্ম কত সালে সিধুদা? সিধুদা বলেছিলেন—তখন তো আমাদের ব্যার্থ সার্টিফিকেট ছিল না, তবে যে দিন সূর্য সেনের ফাঁসি হয়, বাড়িতে অরন্ধন, তখন আমার বয়েস ৬/৭ বচ্ছর। এর কিছুদিন পরই মুকুন্দ দাস মারা যান। বাবার কী ক্রন্দন।

সূর্য সেনের ফাঁসি হয় ১৯৩৪ সালে। তাহলে সিধুদার জন্ম ১৯২৭/২৮ সাল নাগাদ। সিধুদাকে একদিন বলেই ফেললাম—সিধুদা, অশ্বিনীকুমার দত্ত আপনার মুখে বন্দেমাতরম দিয়েছিলেন, বলেছেন, তা কী করে হয়? আপনার তো ওকে দেখারই কথা নয়। সিধুদা হেসে বলেছিলেন, তুই ইতিহাসে এত স্ট্রং জানতাম না তো, অশ্বিনী দত্ত না হোক, ওঁর সাক্ষাৎ শিষ্যর মুখ থেকেই বন্দেমাতরম পেয়েছিলাম আমি। ঐ একই হল। হে-হে-হে।

কে সেই সাক্ষাৎ শিষ্য? জিজ্ঞাসা করতেই সিধুদা বলেছিলেন,. কে আবার? মুকুন্দ দাস! মুকুন্দ দাস! চারণকবি মুকুন্দ দাস সিনেমা দেখেছিস তো? অবশ্য ঐ সবিতাব্রতর সঙ্গে ওঁর মিল ছিল না। তবে হ্যাঁ, গলার স্বরটা প্রায় ওরকমই ছিল। ঠাডা লাগা গলা। ঠাডা বুঝস তো? বাজ। বজ্র। মুকুন্দ দাসের আসল নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর। ছিল একটা মুদি-দোকান। অশ্বিনী দত্ত ওঁর গায়ে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে মুকুন্দ দাস বানালেন। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, গেরুয়া পোশাক, কী সব গানরে, যেন ইলেকট্রিক কারেন্ট। মনের ভিতরে ছ্যাঁক লাগে। সিনেমায় আর কটা গানই বা আছে। 'আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম/তবে ফিরিঙ্গি বণিকের গৌরব রবি অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।'—আছে এটা সিনেমায়? গান ছাড়া যাত্রাও করতেন মুকুন্দ দাস। স্বদেশী যাত্রা। ওখানে আমিও রোল করেছি।

আপনিও রোল করেছেন সিধুদা? মুকুন্দ দাস যদি ১৯৩৪ সালে দেহ রাখেন তো আপনি তখন কতটুকু? পাঁচ-ছয় বছরের না?

—তাইতো, নয় আর বলছি কেন? ওইটুকু বয়েস থেকেই তো আমি মুকুন্দ দাসের চ্যালা।

আমি আর কথা বাড়াই না।

—বুঝলি, আমার বাবাও ছিলেন মুকুন্দ দাসের লোক। ওঁর সঙ্গে ঢোল বাজাতেন। গানেও গলা দিতেন। মুকুন্দ দাসের মৃত্যুর পর আমার বাবাও স্বদেশী-যাত্রা করেছেন। বাবার সঙ্গে আমিও। নাটক আর গান আমার রক্তে। আমাদের ফ্যামিলির সবাই গান-নাটকের লোক। আমার বোনও অভিনেত্রী। অথচ আমাদের কথা কেউ জানে না। আমার লেখা গান দেখে হরিপদ কুশারী কী বলতেন জানিস? ও! তোরা তো নিশ্চয়ই হরিপদ কুশারীর নাম শুনিসনি। তোদের শক্তি চট্টোপাধ্যায় কুয়োতলা উপন্যাসে হরিপদ কুশারীর কথা লিখেছেন। তোদের রেডিওতে একবার মহাশ্বেতা দেবীর ইন্টারভিউ শুনেছিলাম, সেখানে তিনি নিজের গলায় হরিপদ কুশারীর গান গেয়েছিলেন। সেই হরিপদ কুশারী ছিলেন ভাগনাসের লোক। ভাগনাস বুঝিল না? উৎপল দত্তকে ট্রট্স্কাইট বলে বার করে দিয়েছিল ভাগনাস। তা-ও বুঝলি না। কী করে রেডিও সেন্টারের অফিসার হলি, অ্যাঁ? ভাগনাস হল, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটের চারতলায় ছিল ওদের আড্ডা। রংপুরের ছেলে বিনয় রায় যেতেন ওখানে। রাজার ছেলে স্নেহাংশুকান্ত আচার্য যেতেন, হারীনদা যেতেন, মানে হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—গুপী গাইন বাঘা বাইনের সেই জাদুকর। হারীনদাও গান লিখতেন। সুরজ অস্ত হো গ্যয়া গগন মস্ত হো গ্যয়া। আঃ!

এই ভাবেই বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যান সিধুদা। আমি বিচার করতে যেতাম না কোনটা গুলপট্টি আর কোনটা নয়। সত্যিমিথ্যে মেশানো গল্পের মধ্যে মিশে যেতে বেশ লাগতো আমার। আসলে সিধুদা গল্পটা খুব ভাল বলতে পারেন—কখনও বাঙাল ভাষায় কখনও বা খাঁটি কলকাত্তাইতে।

সিধুদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল রাসটার্স বিল্ডিংয়ে আমার এক বন্ধুর চেম্বারে বছর চারেক আগে। আমি আকাশবাণীতে চাকরি করি শুনে উনি বলেছিলেন—দরকার আছে। একদিন আকাশবাণীতে যাব। এসেছিলেন ক'দিন পর। বললেন—বহুদিন পর এ বাড়িতে এলেন। বীরেন ভদ্রমশাই যখন ছিলেন, তখন আসতেন। বীরেন ভদ্রের পেতলের ডিবেটা থেকে নস্যি নাকে নিয়ে বাণীকুমারের চাদরে হাত মুছতেন। পঙ্কজ মল্লিক মশাইয়ের অস্টিন গাড়িতে চড়েছেন তিনি। আর বেলা দে-র গৃহিণীর অভিধানের প্রুফটা সিধুদাকেই দেখে দিতে হয়েছিল। তখন কয়েকটা কাবাব রান্নার পদ সিধুদাই লিখে দিয়েছিলেন বইতে। ওই পদগুলি আনারকলি হোটেলে শিখেছিলেন সিধুদা। এসব গল্পের পর বলেছিলেন উনি হচ্ছেন আকাশবাণীর একজন বহু পুরনো গীতিকার। রেডিওর ভাষায় অ্যাপ্রুভড় লিরিসিস্ট। সুধীরলাল চক্রবর্তী, সত্য চৌধুরী, মানবেন্দ্র মুখার্জি, এরকম অনেকেই ওঁর গান করতেন এক সময়, কিন্তু এখন আর কেউ করে না। আমি যদি কিছু সাহায্য করতে পারি। নতুন শিল্পীদের যদি ওঁর গান করতে বলি আমি। একটা গানের খাতা আমার কাছে রেখে গেলেন। সিধুদা বলেছিলেন একটু দেখবেন ভাই, কেমন? পরে খোঁজ নিয়ে দেখেছিলাম সিধুদার কথা ঠিকই। অ্যাপ্রুভড় লিরিসিস্ট-এর ফাইলে সিদ্ধেশ্বর দাসের নামটি রয়েছে বটে, কিন্তু গত পনেরো বছরে কোনো নতুন শিল্পীর কণ্ঠে সিধুদার গান ওঠেনি, তবে পুরনো শিল্পীদের গান, যেমন

বেচু চট্টোপাধ্যায়, সত্য চৌধুরী, জগন্ময় মিত্রদের গান বাজানো হলে সিদ্ধেশ্বর দাসের লেখা দুটো-একটা গান অবরে-সবরে বেজে যায়।

সেই থেকেই সিধুদা আসেন। প্রথমে 'আপনি' বলতেন আমাকে, খুব দ্রুতই 'তুই' হয়ে গেছি আমি। আমাকে একটা নাম দিয়েছেন আদর করে,—বেগুন।

নজরুল ইসলাম নাকি নলিনীকান্ত সরকারকে, বিশেষ সম্মান দিয়ে বেগুন নামে ডাকতেন। ওটা বেতার গুণনিধির সংক্ষিপ্ত রূপ। সিধুদা মাঝেমাঝে আমার কাছ থেকে টাকাও চেয়ে নেন, তবে বেশি নয়। তিনটে টাকা দে তো, আড়াই টাকা ভাড়া আর আট আনার বিড়ি। পাঁচ টাকা দিলে দু'টাকা ফিরিয়ে দিতেন। বলতেন দরকারের চেয়ে বেশি পেলেই প্রবলেম। হালে একটু অভাবে পড়েছেন বটে, কিন্তু চিরকাল এরকম ছিল না। চুটিয়ে সিনেমায় অভিনয় করেছেন। পাহাড়ি সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তীদের সঙ্গে। তুলসী চক্রবর্তীর স্ত্রী নাকি বাড়িতে নারায়ণ পুজো করাতেন, তাই তুলসী চক্রবর্তীকে রোজ 'কর্তাপাতা' আনতে হত। স্বামীর নাম নিতে নেই বলে তুলসীপাতা হয়ে গিয়েছিল কর্তাপাতা। এরকম কত গল্প যে শুনেছি সিধুদার কাছে....।

যে সব বিখ্যাত বিখ্যাত সিনেমায় অভিনয়ের কথা সিধুদা বলেন, তার মধ্যে একটা শশীবাবুর সংসার। ওখানে নাকি ডবল রোল। একদিন সিধুদাকে আমার বাড়িতে রাত্রে খেতে বলেছিলাম। কারণ সিধুদা বলতেন—কাবাব বিরিয়ানি খেয়ে খেয়ে মুখটা এক্কেবারে পচে গিয়েছে। বাঙালি খাবার কতদিন খাইনি, কুমড়োর শাক লাউঘণ্ট কিংবা পুঁই কুমড়ো....। যে দিন সিধুদাকে খেতে বললাম, সেই দিনই টি ভি তে চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে দেখলাম কী একট চ্যানেলে শশীবাবুর সংসার হচ্ছে। আমার খুব মজা হয়েছিল। বলেছিলাম, ভালই হল সিধুদা, আপনাকে দেখা যাবে। বেশ কিছুক্ষণ পরে কলকাতার গলির দৃশ্যে মাতাল অবস্থায় হেঁটে যাওয়া একটা লোককে দেখিয়ে সিধুদা বলেছিলেন ঐ দ্যাখ আমি। আর একটা থানার দৃশ্য ছিল। ও. সি.-কে একজন কনস্টেবল স্যালুট দিচ্ছে। সিধুদা বলেছিলেন ওই দ্যাখ, আমাকে স্যালুট দিচ্ছে। ওটা আমার সেকেন্ড রোল। এক-দেড় মিনিটের ওই দৃশ্যে সিধুদার তিন চারটে ডায়লগ ছিল। ওই একবারই সিধুদাকে নিয়ে গিয়েছিলাম আমাদের বাড়ি, কিন্তু সিধুদার বাড়ি আমি কখনও যাইনি।

শুনতাম, একা একা থাকেন উল্টোডাঙার তেলেঙ্গাবাগান অঞ্চলের এক বস্তিতে। অনেকদিন আগে নাকি একটা সংসারও হয়েছিল। সিধুদা বলেছিলেন, যখন কম্যুনিস্ট পার্টি 'ব্যান্ড' হয়, তখন সিধুদা আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে গ্রেপ্তার হয়ে যান। জেলে একটি মহিলা কমরেডের সঙ্গে প্রেম হয়। জেল থেকে ফিরে বিয়ে। কিন্তু সংসারের সুখ বেশি দিন হয়নি! দু'বছরের সন্তান রেখে স্ত্রী মারা যান, সন্তানটিও বেশিদিন বাঁচেনি। প্রায় শিশির ভাদুড়ির মতো কেস। তবে শিশির ভাদুড়ি কঙ্কাবতীকে বিয়ে করেছিলেন, সিধুদা আর বিয়ে করেননি।

হ্যাঁ, শিশির ভাদুড়ির প্রতি একটা আশ্চর্য রকমের ভক্তি দেখেছিলাম সিধুদার। বলতেন, দুটো মানুষ দেখেছি, ছোটবেলায় মুকুন্দ দাস আর যৌবনে শিশির ভাদুড়ি। হ্যাটস অফ। বলতেন ভাব, লোকটার কথা একবার ভাব, দ্যাট ভেরি শিশির ভাদুড়ি, দেনার দায়ে শ্রীরঙ্গম থেকে উৎখাত হতে হল, খেতে পাচ্ছেন না, সঙ্গীত-নাটক অ্যাকাডেমি ফেলোশিপ দিতে চাইল, বাপের ব্যাটা নিলেন না। পদ্মভূষণ ছুঁড়ে দিলেন, বললেন, খয়ের খাঁ বানাতে চাও? ওটি চলবে না। আমাকে সম্মান জানাতে চাও তো

একটা নাট্যশালা করে দাও। জাতীয় নাট্যশালা। সত্যজিৎ রায় সিনেমায় নিতে চাইলেন, বললেন, তুমি বাবা বড় ডিরেক্টার, নাম করেচো, তোমার হুকুমে আমাকে অভিনয় করতে হবে, সেটি হচ্চে না। টাকার জন্য চোখের ছানি কাটাতে পারছেন না, রাসবিহারী সরকার মশাই ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে ফাংশন করে টাকা তুলে দিতে চাইলেন, শিশিরবাবু ওটা হতেই দিলেন না। বললেন, ফাংশন কোরচো করো, ও টাকা আমি নেব না।

আমি জিজ্ঞাসা করেছি, শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে কখনও অভিনয় করেছেন? সিধুদা জিভ কামড়ে বলেছেন না-ন্ না, মিথ্যে বলব কেন? দূর থেকে দেখেছি।

সিধুদাকে নিয়ে আমার একটা গল্প লিখতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু ওঁর জীবনের থই পাই না। মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রায় অভিনয় করেছেন বরিশালে আবার ৪৬-এর দাঙ্গায় মুসলমান পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছেন। তবে কি পার্টিশনের আগেই কলকাতা চলে এসেছিলেন? কমিউনিস্ট পার্টির জন্য জেল খেটেছেন, আবার সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন। তাহলে নিজামের এস্টেটে চাকরি করলেন কবে? নিজামের এস্টেটের কথা বলছি এ কারণে :—একবার এক বেতার নাটকের অভিনেত্রী আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি প্রচুর টি.ভি. সিরিয়ালেও অভিনয় করেন। তাঁর গলায় ছিল একটা বড় মুক্তোর মালা। সিধুদাও তখন ছিলেন। সিধুদা ওই ভদ্রমহিলাকে বলেছিলেন, কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, আপনার মুক্তোগুলো দেখে মনে হচ্ছে আসল। অভিনেত্রী বলেছিলেন—ঠিকই ধরেছেন। সিধুদা বললেন, কিন্তু মুক্তোর গ্রেস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, ঠিকমত চাঁদ খাওয়ান না বোধ হয়।

অভিনেত্রী অবাক হয়ে বলেছিলেন—চাঁদ খাওয়ানো মানে?

—ও! মুক্তোর মেনটেনেন্স্ সম্পর্কে কিছুই জানেন না দেখছি। মুক্তোকে চাঁদের আলো খাওয়াতে হয়। সাদা পাথরের থালায় মুক্তোকে বিছিয়ে দিয়ে পূর্ণিমার জোছনায় রেখে দিতে হয়। মুক্তোয় হিম পড়ে। হিমে ভেজা মুক্তো জ্যোৎস্না খেয়ে খেয়ে লাবণ্য পায়, তবে না মুক্তোর আভা থাকে। নইলে মুক্তো বুড়িয়ে যায়। চাঁদের আলোই হল মুক্তোর টনিক।

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিরকম খাওয়াতে হয়? সিধুদা ডাক্তারবাবুদের কায়দায় বলেছিলেন বছরে চারবার, চারঘণ্টা করে।

আমি বলেছিলাম আপনি এত জানলেন কী করে সিধুদা? সিধুদা বলেছিলেন, আমি নিজামের নাজির ছিলাম যে। চাঁদ খাওয়ানোর রাতে প্রাসাদের ছাদে পাথরের রেকাবে মুক্তো বিছিয়ে বসে থাকতাম। এই চাঁদ খাওয়ানোর একটা সুন্দর নাম আছে। হামাম দার নুর এ বদর। আরবি কথা। মানে হচ্ছে জোছনায় স্নান। বদর মানে চাঁদ। আরবিতে চাঁদ কতরকমের হয় জানিস? প্রথম দিন থেকে পাঁচদিন পর্যন্ত শিশুচাঁদ হচ্ছে হেলাল। ছ'দিন থেকে দশদিন পর্যন্ত কমর। এরপর চাঁদের যৌবন এলে চাঁদের নাম হয় বদর। ওই বদর চাঁদের আলোয় বসরাই মুক্তো ভিজে যাচ্ছে, আর আমিনুদ্দি আশরফি গজল গাইছে ওই ছাদে। কেয়াবাত্।

দুই

আজ যাব কাল যাব করে সিধুদার কাছে যাওয়া আর হয়ে উঠছিল না। আমার বাবার শরীরটাও ভাল নেই। বিরাশি বছর বয়েস। বাবার তৈরি করা বাড়িতে আমরা তিন ভাই থাকি। আমাদের মা মারা গেছেন পনেরো বছর আগে। আমরা তিন ভাই বিবাহিত, কিন্তু বাবার জন্য একজন আয়া রাখা আছে। একটা এজেন্সি মারফত ওই আয়া পেয়েছি। এখন যে আছে, ওর নাম তাপসী। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বয়েস। ও বাবার সঙ্গে বেশ গল্পটল্প করে। সকালে আসে, সন্ধে পর্যন্ত থাকে। একদিন বাবাকে মুড়ি গুঁড়ো করে খাইয়েছিল। একবার কোথা থেকে যেন ডৌয়া নামের একটা ফল যোগাড় করে বাবাকে খাইয়েছিল। পঞ্চাশ বছর পর ওই ফল পেয়ে বাবা খুব খুশি হয়েছিলেন। সেই তাপসী গত চারদিন ধরে আসছে না। এজেন্সি থেকে অন্য লোক পাঠিয়েছিল। বাবার কিন্তু তাপসীদিকেই বেশি পছন্দ। আমি একদিন ওই এজেন্সিতে খোঁজ করলাম শুনলাম ঐ ভদ্রমহিলা কয়েকদিন ধরে আসছেন না। এলেই পাঠিয়ে দেবে। বাবাকে বললাম সে কথা। বাবা বললেন মনে হয় ওর শরীর খারাপ হয়েছে। তুই একবার খোঁজ নিয়ে আয়। ওর ঠিকানা বাবার খাতায় লেখা ছিল। তাপসী দাস। ছয় নম্বর নিবেদিতা পল্লী, কলকাতা-২৮, আমার খটকা লাগল। ব্যাগ থেকে সিধুদার লেখা পোস্ট কার্ডটা বের করি। নিবেদিতা পল্লী, তাপুদের বাড়ি। তাপসীই কি তবে তাপু?

অফিস থেকে একটু আগে বেরিয়ে কিছু আপেল কিনলাম। দমদম এয়ার পোর্টের এক নম্বর গেটের উল্টো দিকের রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগিয়ে জরাজীর্ণ রাধাশ্রী সিনেমা হলের পিছনের পিচ ওঠা এবড়োখেবড়ো রাস্তায় সাইকেল রিকশার ঝাঁকুনি খেতে খেতে যখন নিবেদিতা পল্লীতে পৌঁছলাম, তখন শাঁখ বাজছে। এসব অঞ্চলে এখনও সন্ধেবেলা শাঁখের শব্দ শোনা যায়, সকালে গলাসাধা। তাপসী দাসের বাড়ি খোঁজ করলে, একজন দেখিয়ে দিল। টালির চাল, বাঁশের চটার বেড়া। এরকম বাড়ি এ অঞ্চলে আর নেই। বাড়ির সামনে করবী গাছ বেয়ে মাধবীলতা উঠেছে। থোকা থোকা মাধবী কাঁচা ড্রেনের গন্ধকে হারিয়ে দিয়েছে। দরজার লোহার গ্রিলটা ঝাঁকিয়ে কয়েকবার শব্দ করতেই তাপসীদি এসে আমাকে দেখে অবাক হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বলেন, ও-মা....।

আমি বললাম, ক'দিন আসছেন না, বাবা চিন্তা করছেন, তাই খোঁজ নিতে এলাম। তাপসীদি বলেন, দাদার হঠাৎ শরীরটা খারাপ হয়েছিল, তাই যেতে পারিনি। কাল থেকে একটু ভাল আছে। আমি বলি আপনার দাদার নামি কি সিদ্ধেশ্বর দাস? তাপসীদি বললেন— হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনিও চেনেন?

ঘরে দুটো চৌকি। একটায় সিধুদা শুয়ে আছেন। বাঁ পায়ে প্লাস্টার। বিছানার চাদর খুব একটা পরিষ্কার নয়। মাথার কাছে একটা নাইলনের ব্যাগ। বেশ মশা। একটা টিউব ল্যাম্প জ্বলছে। সিধুদার পায়ের কাছে একটা ছোট বেড়াল। একটা গোলটেবিল, দুটো চেয়ার। একটা স্টিলের আলমারিও, আর কী আশ্চর্য, একটা বইয়ের আলমারিও আছে। বেড়ার দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার টেবিল ফ্যানের হাওয়ায় নড়ছে।

তাপসীদি বললেন, দাদা চিনতে পারছেন না। চোখে ছানি কিনা। চোখের সামনে মুখটা রাখুন....।

আমি তাই করি, বলি, চিনতে পারছেন সিধুদা? সিধুদা দু'হাত দিয়ে আমার হাত

চেপে ধরেন। বলেন—জানতাম তুই আসবি। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। বোস।

তাপসীদের জন্য আনা পলিথিন জড়ানো আপেলের ব্যাগ সিধুদার হাতেই দিলাম।

—কী আছে এতে!

—কয়েকটা আপেল। খাবেন আপনি।

—খামোখা আপেল আনতে গেলি কেন? এর চেয়ে যদি কিলো দুই আলু আনতিস....। সিধুদা উঠে বসলেন বিছানায়। বললেন, বোনটাকে বড্ড ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি রে। চোখের ছানির জন্য দেখতে পাচ্ছিলাম না ভাল, উল্টোডাঙায় আমাদের পেছল উঠোনে। পড়ে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙে তাপুকে খবর দিলাম, ও ট্যাক্সি করে নিয়ে এল। সত্তর টাকা মিটার উঠল। ছানিটা না কাটলেই নয়। তার উপর ক'দিন আগে ধুম জ্বর। এখন চলে যেতে পারলেই ভাল হয়। পেয়ারার সাফাজান্নিরে। হা-হা।

বেড়ালছানাটা গুটি গুটি করে পায়ের সাদা প্লাস্টার বেয়ে সিধুদার কোলে বসতেই তাপসীদি বিড়ালটার গলা ধরে সরিয়ে দিতে গেল। সিধুদা বেড়ালছানাটা ধরে বললেন, ও তোরই মতো মাতৃহারা জাহানারা, তোরই মতো বেচারি। এটা যে সাজাহানের ডায়লগ, আমি বুঝতে পেরেছি, এটা বোঝাতে গিয়ে সিধুদার দিকে তাকিয়ে চোখের ভঙ্গিতে জানলাম ওয়েল-সেড, কিন্তু সিধুদার মুখের রেখার কোনো পরিবর্তন দেখলাম না।

আমি সিধুদাকে বলি—এই বয়েসে একা-একা থাকেন কেন? এ ভাবেই তো বিপদ আসে।

সিধুদা বললেন আমার তো নিজের কাজ আছে, তাপুরও। যে যার মতো থাকাই ভাল।

আমি বলি, আপনি উল্টোডাঙায় অ্যাকচুয়ালি কি করেন বলুন তো?

তাপুই উত্তর দেয়। বলে কিস্‌সু করে না। আগে ওদিকের কাঠ চেরাইয়ের কলে খাতাপত্র লেখালেখির কাজ করত, সে সব চলে গেল, তারপর বস্তির ছেলেদের টিউশনি। এখন তো সেটাও পারে না। চোখে ছানি।

সিধুদা বললেন—আর থিয়েটার যে করতাম, সেটা বললি না?

তাপসীদি বললেন—হ্যাঁ, ওখানে কী একটা যাত্রার দলও করেছিল। উঠে গেছে।

আমি বলি—এবার ভাইবোন একসঙ্গে থাকুন। তাপসীদি বললেন, উপায় কী, এখন সেটাই করতে হবে। কিন্তু এতে অসুবিধেও আছে। ছিটলেমি সামাল দিতে পারি না। অসুবিধে আপনাদেরও। ওই তো, আপনাদের বাড়ির কাজে যেতে পারলাম না ক'দিন।

সিধুদা বললেন—ওদের বাড়িতেই যেতিস বুঝি? কী আশ্চর্য! ওর বাবারই গল্প করতিস?

তাপসীদি বললেন—হ্যাঁ। তাই তো দেখলাম। উনি আসতে বুঝলাম উনি তোমার চেনা।

—শুধু কি চেনা! নিজের লোক! সিধুদা বললেন।

আমি বললাম কিছু মনে করবেন না সিধুদা, আপনি বড্ড গুলতাপ্পি মারেন। আপনি বলেছিলেন, আপনার বোন অভিনয় করেন। সত্যি কথাটা বললে কি ক্ষতি হ'ত? কোনো কাজই ছোট নয়।

তাপসীদি বললেন, তবে আমি বলছি শুনুন। দাদা কিন্তু মিথ্যে বলেননি। আমি

ছোটবেলা থেকেই অভিনয় করতাম। নতুন ইহুদি-তে পরি করেছি। ছেষট্টি সালে যখন নতুন করে নবান্ন হ'ল, ম্যাডোনার রোল করেছি। তখন থাকতাম বালিগঞ্জ লেকের কাছে কলোনিতে। মেরিমেকার্স দলে নাটক করেছি। দেয়ালে দেখুন ছবি আছে, উৎপল দত্তর হাত থেকে বেস্ট অ্যাকট্রেসের পুরস্কার নিচ্ছি। আঙুলটা দেওয়ালের ছবির দিকে। ছবিগুলোয় ধুলে জমেছে, অনেককালের।

একটু থেমে তাপুদি বললেন, পরে অফিস ক্লাবে ফিমেল রোলের ভাড়া খাটতাম। এখন অফিস ক্লাবের নাটক তো উঠেই গেছে। করলেও নিজেদেরই এখন কত ফিমেল। ভাড়া করার দরকার হয় না। এখন আয়ার কাজ করি। এটাও তো অভিনয়। অভিনয় নয়? কখনও মেয়ের, কখনও বোনের, কখনও মায়ের অভিনয় করি। ঐ তো, আপনার বাবার যখন খুব জ্বর হয়েছিল, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম, উনি তো কেবলই বলছিলেন যাও রুমা, ঘরে যাও, অনেকক্ষণ সেবা করেছ তুমি। আমি বলেছিলাম তাতে কী হয়েছে বাবা। রুমা তো আপনার স্ত্রীর নাম, তাই তো? উনি তো আপনার বাবার কাছে যাবার তেমন সময়ই পান না। চাকরি করেন। কিন্তু আপনার বাবা ওকেই ভাবছিলেন, আর আমি ওঁর পুত্রবধূর অভিনয় করে গেছি। তাপসীদি হাসলেন। বললেন কিছু মনে করলেন না তো? আমি বলি না-না, ঠিক আছে। এখানে না এলে আপনাকে জানতেই পারতাম না।

আচ্ছা কীভাবে আপনি অভিনয়ে এসেছিলেন? যেন এফ. এম.এ-র টক শোয়ের প্রশ্ন করছি আমি।

—আমার বাবাও নাটক করতেন যে। মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রায়। যদিও সে যাত্রা আমি দেখিনি। পার্টিশনের পরে এদেশে এসে বাবা একটা চায়ের দোকান দিয়েছিলেন ফুটপাথে। নাসিরুদ্দিন রোডে।

সিধুদা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার বলে উঠলেন—

সকল কাজের মিলবে সময়
আগে ভাতের যোগাড় কর
দুটি ভাতের যোগাড় কর।

মুকুন্দ দাসেরই তো কথা।

তাপসীদি বলতে থাকেন—নাসিরুদ্দিন রোডে, বাবার ঐ চায়ের দোকানের পাশেই বহুরূপীর ঠিকানা। জানালা দিয়ে মহলা দেখেছি। ছোটবেলায়। শম্ভু মিত্তির, অমর গাঙ্গুলি, তৃপ্তিদি, ওদের দেখেছি যে...। বাবা আর দাদা মিলে একটা নাটকের দল করল কলোনিতে। ওখানে নতুন ইহুদি, দুঃখীর ইমান এইসব হ'ল। ভালই চলছিল, সব গণ্ডগোল হয়ে গেল দাদা যখন জেলে গেল। যাক সে কথা।

আবার ধন্ধে পড়লাম আমি। সবই তো মিলে যাচ্ছে—সিধুদা যা বলেছিলেন। মুকুন্দ দাসের কথা। জেল খাটার কথাও বললেন তাপসীদি। তা হলে কি সত্যিই সব? কম্যুনিস্ট পার্টির জন্য জেল খাটা, মহিলা কমরেডকে বিয়ে করা। কী কালারফুল জীবন! কিন্তু খটকা থেকে যাচ্ছে নিজামের নাজির ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম। সিধুদা বললেন, তুইও যেমন? নিজামের কাছে কেন খামোকা চাকরি করতে যাব?

বললাম, তা হলে খামোকা আমাদের অফিসে বসে ওইসব গুলপট্টি দিলেন কেন?

সিধুদা বললেন, তোর মাথায় কি আমার পায়ের মতো প্লাস্টার অফ প্যারিস?

বুঝিসনি ঐ অভিনেত্রী মোনালিসা মিত্তিরকে একটু বোর করছিলাম। ও কিছু অভিনয় জানে? ওর চেয়ে এই তাপু অনেক বড় অভিনেত্রী। অথচ টি. ভি. খুললেই ওর মুখ। সিধুদার মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। সেই মুখের দিকে চেয়ে থাকি।

সিধুদা বললেন—তোর সঙ্গে যে একটা কথা ছিল বেগুন....।

বলুন না।

'প্রাইভেট্'—বলে ঠোঁট কামড়ে ওঁর বোনের দিকে তাকালেন।

তাপসীদি বললেন,—কি? আমার সামনে বলা যাবে না বুঝি?

—আমাদের কথার মধ্যে তোর থাকার কোনও দরকার নেই তাপু। ঘরটা ফাঁকা হলে সিধুদা হাতের ইশারায় কাছে ডাকেন। বলেন—তোদের কথা শুনে জানতে পারলাম তোর বাড়িতেই কাজে যায় তাপু। কত করে দিস র‍্যা?

—সিক্সটি দি। এজেন্সি বোধ হয় দশ কেটে নেয়।

—তবেই বোঝ। কী কষ্টটাই করছে মেয়েটা। কী করে চালায় কে জানে। বোঝার উপর শাকের আঁটি জুটেছি আমি। আমার নাটক লেখা আছে। রেডিওতে করিয়ে দিবি? ক'টা টাকা পেতাম তবে...। গান তো কিছু করতে পারলি না। কত করে বললাম।

আমি বলি নাটকের ডিপার্টমেন্টটা তো আমি দেখি না সিধুদা, আমি দেখি স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান এইসব। সুতরাং নাটকের ব্যাপারে কথা দিতে পারছি না। তবে চেষ্টা করতে পারি।

সিধুদা বললেন—দে, এই ব্যাগটা এগিয়ে দে দেখি। মাথার কাছে যে মোটা নাইলনের ব্যাগটা ছিল, তার ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা মাফলার। আগামী শীতের। ব্যাগ থেকে বেরুল জামা, ধুতি, বন্ধ টেবিলঘড়ি, গিরিশ রচনাবলীর এক খণ্ড, ডি. এল. রায়ের সাজাহান। পুরো সম্পত্তি। পলিথিনের ভিতরে যত্নে রাখা দুটো লম্বা খাতা বার করলেন। একটু হাত বোলালেন খাতাটার গায়ে। যেন বললেন, 'তোরই মতো মাতৃহারা জাহানারা, তোরই মতো বেচারি।' খাতাদুটো আমায় দিলেন। খাতার মলাটে ঘোড়ায়-চড়া মানুষের ছবি। বাহাদুর খাতা। আমাদের স্কুল জীবনের। মলিন বরণ। পাতা উল্টে দেখি নাটকের নাম 'ফুল ঝরে যায়'। সিধুদা বললেন, সত্তরের দশকে লেখা। আর একটা খাতার উপর লেখা 'খেতাব'। সিধুদা বললেন, এটা শিশিরবাবুকে নিয়ে লেখা নাটক। শিশির ভাদুড়ি। স্বগতোক্তিতে নিঃশব্দ শুনলাম, 'বন্দেগী জাঁহাপনা'।

—শিশিরবাবুর পদ্মভূষণ প্রত্যাখ্যান নিয়ে এই নাটক। ঠিকমতো লেখা হয়নি, বুঝলি। একদিন স্বপ্নে ওঁকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। উনি চুরুট খেতে খেতে শুনছিলেন। একটু পরেই বললেন—ভিতরে যাই, গান শুনব। কঙ্কা, সায়গল চাপাও। তখনই বুঝেছিলাম কিস্‌সু হয়নি। ভেবেছিলাম পরে ঠিকঠাক করে নেব। আর হ'ল নারে। এই খুঁতো সন্তানটাই বেচে দিচ্ছি রে....।

সিধুদা চুপ। আমি শুনতে পাচ্ছি—আমি পাপী! ঘোরতর পাপী। পাপের প্রদাহে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছি। দেখুন—এই শীর্ণ দেহ, এই কোটরগত চক্ষু, এই শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ...

তিন

এইসব গান কে এখন আর করবে? এখনকার গান হয় এইরকম

সন্ধ্যাবেলায় নীল শাড়িতে তোমায় দেখেছি
হয়তো বা সেই ক্ষণেই তোমায় ভালবেসেছি।

কিংবা—

আয়রে পাখি লেজ ঝোলা
খেতে দেব কোকাকোলা
তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা
আমি গব্বর সিং।

সিধুদার খাতায় সলিল চৌধুরী মার্কা গান এখন কে আর করবে? যেমন চলো একসাথে পথে আমি। কিংবা বন্দরে বাঁধা জাহাজ ভেড়াও অন্দরে। তাও সলিল চৌধুরীর মতো কোয়ালিটি নেই। সলিল চৌধুরীর অনুকরণ। সত্যি কথা বললে, অক্ষম অনুকরণ। আর 'ফুল ঝরে যায়' ধরনের নাটকও সেই ব্যাপার। এখন ওসব থিম ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে মিডিয়া। শিশির ভাদুড়ির লেখা 'খেতাব' নাটকটা জমা দিলাম। নাটক বিভাগের অফিসার বললেন, ওটা একটু উল্টেপাল্টে দেখেছি, ওটা স্টেজ ড্রামা। ওটাতো অডিও নয়, তাই ওটা....।

বারবার 'ওটা' শব্দটা শুনতে খারাপ লাগছিল বলে আমি মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, নাটকটাকে যদি আমি রেডিওজেনিক করে দিই? উনি বললেন কিন্তু আগামী তিন মাসের প্ল্যানিং যে অলরেডি করে ফেলেছি।

সিধুদার জন্য কিছু একটা করতে ইচ্ছে করছিল আমার। কী করতে পারি আমি! কিছু টাকা দেব। কিন্তু আমি কতই বা দিতে পারি। আমারও তো সংসার আছে। ছেলের পড়াশুনো, বাবার চিকিৎসা। এমন সময় 'শিল্পী সুহৃদ' নামে একটি সংস্থার খবর পাই, যারা দুঃস্থ শিল্পীদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন। তাঁদের কর্মকর্তাদের মধ্যে দু' একজনের সঙ্গে আমার চেনাশোনা বেরিয়ে যায়। ওঁরাও শিল্পী মানুষ ওঁদের সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু মুশকিল হল ওঁরা কেউ সিদ্ধেশ্বর দাসের নামই শোনেননি। আমি বোঝানোর চেষ্টা করি। ওঁরা বলেন, একটা আবেদন করতে বলুন। অ্যাপ্লিকেশন। আপনি সুপারিশ করে দেবেন, আশা করি হাজার পাঁচেক টাকা দেয়া যাবে।

দরখাস্তটা আমিই লিখে নেব। লিখে, টাইপ করিয়ে সিধুদাকে দিয়ে সই করিয়ে আনব। আমি লিখতে শুরু করি।

মান্যবরেষু,

আমি একজন দুঃস্থ শিল্পী। বরিশালের চারণকবি মুকুন্দ দাসের স্বদেশীযাত্রায় আমার পিতা মুকুন্দ দাসের সহিত সঙ্গত করিতেন। আমিও শিশু শিল্পী হিসাবে মুকুন্দ দাসের পালায় অংশগ্রহণ করিয়াছি। পরবর্তীকালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সহিত যুক্ত হই, অভিনয় করি। নিজেও নাটক রচনা করি। কারাবরণও করি। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া একটি মুসলমান পরিবারকে....

এই পর্যন্ত লেখার পর থামতে হল। ৪৬ সালে কোথায় ছিলেন সিধুদা? পার্টিশনের আগেই কি এসেছিলেন? কিন্তু তাপসীদি বলেছিলেন পার্টিশনের পরে এ দেশে এসে ওঁর বাবা চায়ের দোকান দিয়েছিলেন, থাকতেন বালিগঞ্জের লেকের কাছে কলোনিতে।

ওই কলোনি তো ১৯৫০-এর আগে হয়নি। তবে?

তাপসীদিকে জিজ্ঞাসা করে নেব সে উপায় নেই। কারণ উনি আর আমাদের বাড়িতে কাজে আসেননি। এজেন্সিতে খবর নিয়ে জানলাম উনি এই বাড়িতে আসতে চাইছেন না আর। বোধহয় চেনাশোনার মধ্যে এ ধরনের কাজ করতে চাইছেন না। ভাবছিলাম সিধুদার বাড়ি গিয়েই ঠিকঠাক জেনে নেব। আবার ভাবলাম যা লিখেছি থাক। থাকতেই তো পারে কিছু কিছু সত্যি আছে যা মিথ্যেচাদরে ঢাকা থাকে। বাইরের মিথ্যেটা সত্যি নয়, ভিতরের সত্যিটাই সত্যি।

দরখাস্তটা অর্ধলেখাই ব্যাগে আছে, অফিস থেকে ফিরছি, কার্জন পার্কে কাবুলদার সঙ্গে দেখা। সিধুদাই একবার কাবুলদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কাবুলদা হলেন সিধুদার বহুদিনের বন্ধু। যুদ্ধের সময় আমেরিকান সৈন্যদের কাছ থেকে মাউথঅর্গান বাজানো শিখেছিলেন। মাউথঅর্গান বাজাতেন সিনেমার আবহসঙ্গীতে। প্লুরিসি হয়ে দম কমে গেল, তখন সিনেমা পত্রিকা করতেন। রুপোলি পর্দার সোনালি দিন শেষ হলে 'যৌবনের ভেলা' নামে একটা যৌন পত্রিকা চালিয়েছেন। নিজেই সম্পাদক, প্রুফ রিডার, লেখক, সার্কুলেশন ম্যানেজার এবং পত্রলেখক। কাবুলদাই বলেছিলেন, ওখানে 'চুপি চুপি বলি' নামে একটা বিভাগ ছিল, কাবুলদার প্রশ্নের কাবুলদাই উত্তর দিতেন, শুধু নাম পাল্টে যেত। কাবুলদাকে দেখলাম রাসমণির মূর্তির সামনে হাওয়াই চটিতে সেফটিপিন গাঁথছেন।

কাবুলদাকে বললাম—সিধুদার খবর জানেন তো?

কাবুলদা বললেন—জানি। যেতে পারিনি এখনও।

আমি বললাম, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল কাবুলদা, সিধুদার চিকিৎসার খরচের জন্য 'শিল্পী সুহৃদ' নামে একটি সংস্থায় দরখাস্ত করব, ওঁর সম্পর্কে কয়েকটা তথ্য জানা দরকার।

—তথ্য? হুইচ তথ্য ইউ ওয়ান্ট টু নো?

আমি বলি কম্যুনিস্ট পার্টি ব্যান হবার পর উনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কতদিন জেলে থাকতে হয়েছিল জানেন?

কাবুলদা বললেন—কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সিধুর জেল খাটার কোনও সম্পর্ক নেই তো।

—তবে যে শুনেছিলাম জেলে গিয়ে একজন মহিলা কমরেডের সঙ্গে প্রেম হয়...

কাবুলদা হাসলেন। বললেন, লেট হ্যাভ টি ফার্স্ট। কাছেই ভাঁড়ের চা ছিল। নিলাম। কাবুলদা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, আপনাকেও এই কথা বলেছে বুঝি? হাসলেন। বললেন, ও কিছু নয়। এগুলো হচ্ছে আনসেনসরড পার্ট। আসলে কি হয়েছিল বলছি। সিগ্রেট আছে?

দিলাম।

—জেল ওকে খাটতে হয়েছিল বছর দুয়েক। সেটা জাল পারমিট ছাপতে গিয়ে। ষাট-বাষাট্টি সালে পাঁউরুটির বেকারির জন্য ময়দার পারমিট লাগত। আমি ছিলাম একটা বেকারির ম্যানেজার। আমারও জেল হয়। জেলেই ওর সঙ্গে আমার দোস্তি। কয়েদিদের আমি মাউথঅর্গানে সলিল চৌধুরীর গানের সুর শোনাতাম।

—তাহলে বিয়েটা?

—হ্যাঁ। বিয়ে যাকে করেছিল সে জেনানা ফাটকে ছিল। জেলে খুব একটা দেখাসাক্ষাৎ হবার স্কোপ ছিল না। প্রেম হল পরে। মেয়েটির স্বামীহত্যার কেস ছিল। ওর স্বামী ওকে পণের টাকা নিয়ে দিনরাত খিস্তি করত। মারধোরও করত। একদিন নাকি ওর স্বামী বাইরের একটা পুরুষমানুষকে ঘরে ঢুকিয়ে বলেছিল, পয়সা রোজগার কর। ও সেদিন একটা শিলনোড়া ছুড়ে মেরেছিল ওর স্বামীকে!

—এটাই সত্যি?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আর একটা কথা। রায়টের ব্যাপারটা বলুন না কাবুলদা। একটা মুসলমান পরিবারকে নাকি বাঁচিয়েছিলেন ফর্টিসিক্সে?

—সে সময় তো এধারে ছিলই না সিধু। যদ্দুর জানি ওরা ফিফটিতে আসে।

—তা হলে আনারকলি হোটেলে ফ্রিতে খাওয়ার ব্যাপারটা কি মিথ্যে?

—মিথ্যেও না, সত্যিও না। ওদের খাতা লিখত সিধু। খাতা লেখার কাজটা ভাল করত সিধু। আইকম পাশ দিয়েছিল কিনা। আমাদের যে বেকারি ছিল, তার খাতা লিখতো। ময়দার পারমিটের ব্যাপারে সত্যি বলতে কি, আমিই ফাঁসিয়েছিলাম ওকে। এ জন্যেই ওর বোনের বাড়ি দেখতে যাইনি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আনারকলি হোটেলের খাতা দেখতো ও। সবই তো পার্টটাইম কাজ, টাকাও কম। হোটেল মালিকের ছেলে বি-কম পাশ করার পর ওর খাতা লেখার কাজ বন্ধ হয়ে গেল, তবু মাঝে মাঝে যেত। গেলে ওরা কিছু না খাইয়ে ছাড়ত না। সম্পর্কটা ভাল রেখেছিল কিনা। হিসেবের খাতা লিখত ও, কিন্তু নিজের জীবনের হিসেবটা ওর ঠিক মতো করা হল না। বুঝলেন ভাই, সিধু কিন্তু আসলে মনে মনে সারাজীবন নাটকের লোক রয়ে গেল, কিন্তু করা হল না।

এইটুকু বলে আমার হাতটা ধরলেন কাবুলদা। একটু অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলেন। গলাটা নামিয়ে বললেন ওই সংস্থাটা থেকে আমি কিছু হেল্প পেতে পারিনারে ব্রাদার? আই অ্যাম অলসো অ্যান আর্টিস্ট...।

সিধুদার সাহায্যের জন্য দরখাস্তটা আবার লিখি। ওঁর জীবনপঞ্জী থেকে দাঙ্গায় মুসলমান পরিবারকে বাঁচানোর ঘটনা, কিংবা বেআইনি কম্যুনিস্ট পার্টির কমরেডিনীকে বিয়ে করার ঘটনা বাদ দিয়ে দিই। সিধুদার ওই পোষা ইচ্ছেগুলোকে, মাতৃহারা, বেচারি ইচ্ছেগুলোর গলা ধরে ফেলে দিই আমি। তবুও ওই দরখাস্তে কত কী থাকে। ওগুলো নিষ্পাপ সত্য সব। সংগীত রচনার কথা, নাটক রচনার কথা থাকে। শুধু পূর্ণ না হওয়া ইচ্ছেগুলোর কথা দরখাস্তে থাকে না। ওগুলো স্বপ্নে থাকে।

দরখাস্তটা টাইপ করিয়ে বুকপকেটে ভরেছি। সিধুদার বাড়ি গেলাম সই করাতে। রবিবারের বিকেল। পুজো আসছে।

সিধুদা শুয়ে আছেন, তাপুদি জলপট্টি দিচ্ছেন কপালে। সিধুদার চোখ আধবোজা। বিড়বিড় করছেন। জড়ানো স্বরে শুনতে পাচ্ছিলাম পেয়ারার সাফাজান্নিরে। তাপুদি বললেন, ধুম জ্বর।

আমি বুঝলাম, এ অবস্থায় সই করাতে পারব না। আমি সিধুদার দিকে ঝুঁকে বললাম, আমি এসেছি সিধুদা। দরখাস্তটা এনেছি। একটু কালি যোগাড় করে টিপ সইটা করিয়ে নেব।

সিধুদা একটু চোখ খুললেন। সিধুদা কি চিনতে পারলেন আমাকে?

সিধুদা আবার চোখ বুঁজলেন। বিড়বিড় করতে লাগলেন আবার। ওঁর অস্ফুট জড়ানো গলায় শুনতে পাচ্ছি—দরকার নাই, দরকার নাই আমার পদ্মভূষণের। পদ্মভূষণ দিয়া কলাডা হইব আমার। লাত্থি মারি। খয়ের খাঁ বানাইতে চাও? সেইডা হইবে না। ফেলোশিপ দিবা? নিমু না, নিমু না। চক্ষের ছানি কাটাইবার টাকা আনছ বুঝি রাসবিহারী? দরকার নাই। স্বধর্মে আন্ধার ভাল।

তাপুদি বললেন, আবার শিশির ভাদুড়ি ভর করেছে।

আমি দেখলাম পশ্চিমের ছোট্ট জানালা দিয়ে আসা চিলতে রোদ্দুর প্লাস্টার-পায়ের উপর প্রণামের মতো লেগে আছে। আমি দেখলাম ইচ্ছেকুসুম ফুটছে সিধুদার সত্তায়। আমার বুকপকেটের সাহায্যপ্রার্থনা কুঁকড়ে যাচ্ছে। এখন কি আর ওসব সই করানো যায়? ফুটুক, ফুটে উঠুক ইচ্ছেকুসুমের মিথ্যে। আমি ওই পবিত্র পাপড়ি ছিঁড়তে পারব না।